বসুমতী-গ্রন্থাবলী-সিরিজ

স্বর্ণকুমারীদেবীর নূতনগ্রন্থাবলী

১। মিলন-রাত্রি, ২। বিচিত্রা, ৩। স্বপ্নবাণী, ৪। বিজয়ার আশীর্ব্বাদ,
৫। স্বপ্ন না কি, ৬। নবডাকাতের ডায়েরি, ৭। গল্প-প্রবন্ধমঞ্জুষা,
৮। কবিতা পারিজাতহার।

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত

উপেন্দ্রনাথ-মুখোপাধ্যায়-প্রতিষ্ঠিত
বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী-বৈদ্যুতিক-রোটারী-মেসিনে"
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত।

[মূল্য ১৲ এক টাকা

মিলন-রাত্রি

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত

মিলন-রাত্রি

প্রথম পরিচ্ছেদ

রক্তরাগরঞ্জিত উজ্জ্বল অপরাহ্ণে প্রসাদপুরের রাজকন্যা জ্যোতির্ম্ময়ী তাঁহার শিক্ষয়িত্রী কুন্দের সহিত নিভৃত কানন-কুঞ্জমধ্যে বসিয়া যাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, অনাদি তাঁহাকে পৌঁছিয়া দিয়া গেল।

—ইনিই কি তাঁহার বহু আকাঙ্ক্ষিত গুরুদেব! প্রণামান্তে জ্যোতির্ম্ময়ী তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন। ইনি সুপুরুষ নহেন; কুরূপও নহেন—ইঁহার বর্ণ ও মুখাবয়ব সাধারণ বঙ্গ-যুবকেরই ন্যায়। অসাধারণের মধ্যে ইঁহার সন্ন্যাসিবেশ এবং আশা-বিশ্বাস-দীপ্ত উজ্জ্বল দৃষ্টি। এই দৃষ্টিতে বেশ একটু কঠোর উগ্রভাবও মিশ্রিত ছিল। সন্ন্যাসীর আলখাল্লায় এ ভাব মোটেই বেমানান হয় নাই—বরং নয়ন-নয়নের প্রশংসা-সম্মানলাভের একটা কারণ-স্বরূপই দাঁড়াইয়াছিল।

জ্যোতির্ম্ময়ীও তাঁহাকে দেখিয়া আকৃষ্ট হইলেন, কিন্তু পরিতৃপ্ত হইলেন না। এ মূর্ত্তি ত তাঁহার কল্পনার দেবমূর্ত্তি নহে! মানববুদ্ধির অগম্য জ্ঞানোজ্জ্বল প্রভা ত এ দৃষ্টিতে নাই! ঋষিকল্প ভূত-ভবিষ্যধারণা-শক্তি ত এ মূর্ত্তিতে তিনি প্রতিফলিত দেখিতেছেন না! জ্যোতির্ম্ময়ী আশাহত হইয়া কুন্দের উদ্দেশে পার্শ্বে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, কুন্দ সেখানে নাই। তিনি বিস্মিত-নেত্রে ঊর্দ্ধে চাহিয়া নিঃশব্দ-দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। সুদূর তরুশাখা হইতে উড়িয়া আসিয়া একটি পাখী মাথার উপর হইতে ডাকিল—'কথা ক, কথা ক!'—পরিচিত আত্মীয়ের কণ্ঠস্বরে যেন সহসা আত্মস্থ হইয়া বালিকা পুনরায় আগন্তুকের দিকে দৃষ্টি-পাত করিয়া দেখিলেন, তাঁহার স্তব্ধ দৃষ্টি রাজকন্যারই মুখের উপর স্থাপিত।

সঙ্কোচ-মৃদু স্বরে জ্যোতির্ম্ময়ী তাঁহাকে কহিলেন, "আপনি আসন গ্রহণ করুন।" অতিথির অভ্যর্থনার জন্য উদ্যান-চৌকীর উপর একখানি পশমাসন বিস্তৃত ছিল। সন্ন্যাসী কহিলেন,—"আপনিও উপবেশন করুন।"

উভয়ে উপবিষ্ট হইলেন। আকাশের উজ্জ্বল আভা তখন ম্লান হইয়া আসিতেছিল—পাখীর বিদায়গানে কানন মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল; জ্যোতির্ম্ময়ীর পশ্চাতে সুচারু কারুকার্য্যময় কাষ্ঠস্তম্ভ-জড়িত যূথিকালতাবলী-বিলম্বিত ফুলগুচ্ছ দুলিয়া দুলিয়া মাঝে মাঝে তাঁহার মাথায় আসিয়া ঠেকিতেছিল; দুই একটি তাঁহার কোলে আসিয়া পড়িয়াছিল। অন্য যে সায়াহ্নে তিনি এখানে আসিয়া বসেন, সে দিন তাঁহার কণ্ঠোত্থিত মধুর সঙ্গীতে কাননতল মধুরতায় ভরিয়া উঠে। আজ তাঁহার এই স্তব্ধভাব তাহাদের যে ভাল লাগিতেছে না—ইঙ্গিতে এই কথাই যেন তাহারা জানাইয়া দিতেছিল।

রাজকুমারীও মনে মনে বুঝিতেছিলেন, এরূপ নীরবতা ভদ্রসমাজের রীতিবিরুদ্ধ, অতিথির পক্ষে সম্মানজনক নহে। তিনি ফুলগুলি কাপড় হইতে হাতে উঠাইতে উঠাইতে সন্ন্যাসীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "অনাদি-দা বল্‌ছিলেন,—আপনি আমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে চেয়েছেন?"

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন,—"সত্য কথা, কিন্তু আপনার পক্ষ থেকে কুন্দও আমাকে আহ্বান-নিমন্ত্রণ দিয়েছেন। দু'জনের অজ্ঞাতে আমরা দু'জনেই দেখ্‌ছি পরস্পরের দর্শন কামনা করেছি।"

তাঁহার কণ্ঠস্বর সবল, কিন্তু ভীষণ নহে। ভঙ্গীও সরস; কথা কহিবার সময় তাঁহার নয়নের উগ্রভাব স্নিগ্ধ হইয়া আইসে এবং চক্ষুতারকা বার বার ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া কথিত কথার সহিত প্রচ্ছন্ন গূঢ় কথাও যেন বলিতে থাকে।

জ্যোতির্ম্ময়ীর মনের ভাব লঘু হইয়া পড়িল, তিনি সহজভাবে এইবার কহিলেন,—"আমি গুরু-লাভের প্রত্যাশায় আপনার দর্শনপ্রার্থী হয়েছি। কিন্তু আপনি যে কেন আমার মত নগণ্য নারীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, এতে বড় আশ্চর্য্য হয়ে পড়েছি।"

"আশ্চর্য্য কিছুই নয়। যোগ্য শিষ্যলাভের জন্য গুরুও সমান আগ্রহবান্। আপনার ব্রত আমার ব্রত একই—উভয়েরই উদ্দেশ্য দেশমঙ্গলসাধন। পুরুষ-সঙ্কল্পের সহিত আত্মাশক্তির সহযোগেই প্রকৃতভাবে এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'তে পারে।"

"আপনি দেখছি বড় ভুল বুঝেছেন। আমি নিতান্ত শক্তিহীনা দুর্ব্বল নারী। গুরুকে দান করার মত তেজ আমার নাই, আমি সম্পূর্ণভাবে তাঁ'র কৃপাপ্রার্থী। এমন কি, যে পথ ধ'রে আমি চলেছি, তা'ও ঠিক কি না, আমি জানি না। দারুণ সংশয়ের মধ্যে আমি দিশাহারা। আপনি যদি দিব্য দর্শক হ'ন ত আমার এই সংশয় মিটিয়ে দিন।"

"তার আগে আমার প্রশ্নের উত্তর আপনাকে দিতে হবে। আপনি কি আমাকে গুরু ব'লে মান্‌তে প্রস্তুত আছেন?"

জ্যোতির্ম্ময়ী হঠাৎ নীরব হইয়া পড়িলেন, কি উত্তর দিবেন? তাঁহার মন ত এখনও ইঁহাকে গুরু-রূপে ঠিক বরণ করিতে চাহিতেছে না। থামিয়া থামিয়া তিনি বলিলেন,—"যদি আমার সংশয় মেটাতে পারেন—"

তিনি হাসিয়া কহিলেন, "পরীক্ষা চান? নূতন বটে। গুরুকে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করাই ত আমা-দের দেশের চিরন্তন প্রথা। যদি আমাকে গুরু ব'লে মানেন, তা' হ'লে বিনা প্রশ্নে বিনা সন্দেহে আমার উপদেশ পালন করতে হবে।"

আবার জ্যোতির্ম্ময়ী নীরব হইয়া পড়িলেন। এক দিন তিনি ভগবানের নিকট গুরু-মিলন প্রার্থনা করিয়াছেন, আর আজ গুরু-দর্শন পাইয়াও তাঁহার মন কেন অপ্রসন্ন? ইহাতে কি সেই সর্ব্বশক্তিমানের দানকেই অগ্রাহ্য করা হইতেছে না? তিনি সন্ন্যাসীর প্রশ্নের কোন উত্তর প্রদান না করিয়া সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার কি কোন গুরু আছেন?"

"আছেন।"

"কে তিনি? কোনও সিদ্ধপুরুষ বোধ হয়?"

"না। স্বয়ং দেশমাতাই আমার গুরু।"

"তিনি ত আমারও গুরু, কিন্তু আমি ত তাঁ'র কথার সব অর্থ ঠিক বুঝতে পারি না, আপনি বুঝেন কিরূপে? আমাকে সেইটুকু ব'লে দিন, দয়া ক'রে।"

একটা পরিপূর্ণ আকুলতার স্বরে জ্যোতির্ম্ময়ী এই প্রশ্ন করিলেন। সন্ন্যাসী কহিলেন, "সাধক মাত্রেই ত তাঁ'র অর্থ বুঝতে পারেন,—আপনিও ত এক জন সাধক!"

"না, আমি বুঝতে পারিনে,—জ্ঞান-সাধকরা এ বিষয়ে কি বলেন, আপনি খুলে বলুন।"

"সকলেই একবাক্যে বল্‌ছেন, 'স্বরাজ চাই', স্বাধীন ভারত চাই। আকাশে বাতাসে এই কথা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে আর আপনি শুন্‌তে পান না?"

"শুনতে পেয়েছি, কিন্তু উপায় কি, সে উপদেশ ত পাচ্ছি না—সেই কথাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি বলুন—বলুন আপনি, উপায় কি?"

উত্তর হইল—"শরীর-পতন কিংবা মন্ত্রের সাধন।"

"কিন্তু সে মন্ত্র কি? সেই মন্ত্রলাভের জন্যই ত উৎসুক হয়ে আছি।" রাজকুমারী অধীরভাবে এই কথা বলিলেন। সন্ন্যাসী ধীরভাবে কহিলেন—"সর্ব্বত্যাগী হ'তে পারেন যদি, তবেই সে মন্ত্র পাবেন।" রাজকন্যার মনে পড়িল শরৎকুমারকে, অন্তঃপ্রাণের মধ্যে দীর্ঘ-নিশ্বাস উঠিয়া সেইখানে আবদ্ধ রহিয়া গেল। তথাপি ইতিপূর্ব্বে শ্যামসুন্দরের পদতলে যাহার প্রেমকে বলিদান দিতে অপরাগ হইয়াছিলেন, আজ গুরুর মুখের দিকে চাহিয়া তাহাতেও স্বীকৃত হইয়া কম্পিত-কণ্ঠে কহিলেন, "পারব।"

"পারবেন? ঠিক বলছেন, পারবেন?"

রাজকুমারী আবার কহিলেন, "পারব। ধর্ম্ম ছাড়া মায়ের চরণে, সুখ-শান্তি ধন-জন সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করতে প্রস্তুত আছি।"

সন্ন্যাসীর বঙ্কিম অধরপ্রান্তে ঈষৎ হাসির রেখা ফুটিল, তিনি তাহা সংযত করিয়া লইয়া গম্ভীরভাবেই কহিলেন "এই ত কুণ্ঠা রেখে বল্লেন। ধর্ম্ম কথাটা ত মস্ত ফাঁপা জিনিস, এক জন খৃষ্টানের পক্ষে যা' ধর্ম্ম—এক জন হিন্দুর পক্ষে তা অধর্ম্ম। যোদ্ধার ধর্ম্ম নরহত্যা—কিন্তু সাধারণের পক্ষে এ কাজ মহাপাপ।"

জ্যোতির্ম্ময়ী চিন্তা শক্তি হারাইয়া ফেলিয়া অজ্ঞা-নের মত বলিলেন, "আপনার উপদেশ কি?"

"গুরুর উপর বিশ্বাসস্থাপন করুন; ধর্ম্মাধর্ম্ম তাঁ'কে স্থির করতে দিন। আর আপনি তাঁ'র আদেশ মেনে চলুন। যদি তা' পারেন, তবেই দেশমাতার সেবার অধিকারী হবেন। পারবেন কি? বলুন।"

সন্ন্যাসী দীপ্ত নয়ন সমধিক প্রদীপ্ত করিয়া প্রতি অক্ষরে জোর দিয়া এই কথা বলিলেন। স্ত্রীলোক পুরুষের নিকটে যে শক্তি, যে তেজ প্রত্যাশা করে—সেইরূপই শাক্তপূত তাঁহার এ বাণী; জ্যোতির্ম্ময়ী

অভিভূত হইয়া পড়িলেন; আত্মহারা মুগ্ধদৃষ্টি তাঁহার দিকে স্থাপিত করিয়া বলিলেন, "বেশ, তাই হ'বে, গুরুজী; মন্ত্র দান করুন।"

জ্যোতির্ম্ময়ী কর্ত্তৃক এই প্রথম গুরু সম্বোধনে সম্বোধিত হইয়া আনন্দসহকারে সন্ন্যাসী 'স্বস্তি' বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং রাজকুমারীকে আর কথা কহিবার অবসর না দিয়া দ্রুতপদে তাঁহার কানের নিকটে আসিয়া বলিলেন, "শবসাধন— "শবসাধন!"

জ্যোতির্ম্ময়ী শিহরিয়া উঠিলেন, তাঁহার দেহের উষ্ণ শোণিত যেন সহসা তুষার-শীতল হইয়া পড়িল, তাহার চলাচল বন্ধ হইয়া গেল, তিনি পাষাণ-পুত্তলিকার ন্যায় স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। সন্ন্যাসীও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। একটা কাঠবিড়ালী রাজকন্যার গা ঘেঁসিয়া লতাবল্লীর উপর উঠিল। তিনি চমকিয়া ডাকিলেন—"কুন্দদিদি!" এই সময়ে কুন্দ আসিয়া কহিল, "ডাক্তার আস্‌ছেন।" রাজ-কুমারী যেন দুঃস্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিলেন,— সন্ন্যাসী তাড়াতাড়ি যথাস্থানে গিয়া বসিলেন। তখন পূর্ণ সন্ধ্যা, চন্দ্রহীন আকাশ তারকাগুচ্ছে ভরিয়া উঠিয়াছে, তাহার আলোকরশ্মি শাখাপল্লব অতিক্রম করিয়া কাননতল অতি মৃদুভাবে আলোকিত করিতেছিল।

শরৎকুমার এখানে আসিয়া প্রথমে স্পষ্ট কিছুই দেখিতে পাইলেন না, পরে নয়ন অভ্যস্ত হইয়া আসিলে সেই ছায়ালোকে জ্যোতির্ম্ময়ীর নিকট সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইলেন; দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। একটা অজ্ঞাত বিপদের ভয় তাঁহার মনকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিল, প্রচ্ছন্ন তিরস্কারের সুরে কহিলেন, "রাজকুমারি, কাল আপনার অতিথিরা এসে পড়বেন! পরশু কন্‌ফারেন্স—রাজা বাহাদুর আপনার জন্য অধীর হয়ে উঠেছেন।"

রাজকুমারী সে কথা যেন না শুনিয়া কহিলেন, "ডাক্তার-দা, আমাদের মুক্তির পথ কি? ভারত স্বাধীন হবে কি উপায়ে, আপনি মনে করেন?"

উত্তর হইল, "ধর্ম্মবলে।"

সন্ন্যাসী উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "অমন একটা ফাঁকা কথা বল্‌বেন না। বিদেশি-বিবর্জ্জিত ভারত হবে কি উপায়ে, কখনও ভেবেছেন কি? যদি ভেবে কোন উপায় পেয়ে থাকেন ত বলুন।"

শরৎকুমার অবজ্ঞার সুরে কহিলেন, "ভারত কখনই বিদেশি-বিবর্জ্জিত হয় নি, হবে না— হ'তে পারে না। এ বাসনা, উন্মাদের প্রলাপ। তবে নৈতিক একতার বলে, ধর্ম্মবলে এমন এক দিন আস্‌তে পারে, যে দিন বিদেশীও স্বদেশী নামভুক্ত হ'তে বাধ্য হবে। এ দেশকে তারাও স্বদেশের মতই ভালবাসবে। আসুন রাজকুমারি, আর দেরী করবেন না।"

রাজকুমারী উঠিয়া দাঁড়াইয়া সন্ন্যাসীকে নমস্কার করিয়া বলিলেন, "আপনি তবে আজ আসুন, আর এক দিন কথাবার্ত্তা হবে। কুন্দদিদি, এঁকে নিয়ে যান।"

কানন-প্রদেশ অতিক্রম করিয়া শরৎকুমার জ্যোতির্ম্ময়ীকে কহিলেন, "আপনাকে সাবধান ক'রে দিই, রাজকুমারি, এই সব ভণ্ড সন্ন্যাসীদের কথায় ভুলবেন না, এদের সঙ্গ থেকে দূরে থাকবেন।"

রাজকুমারী কথাটা সুপরামর্শ বলিয়া বুঝিলেন— তথাপি অসন্তুষ্টভাবে কহিলেন, "আমি ত পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি নি।"

শরৎকুমারের হৃদয় বিদ্ধ হইল; তিনি সে জ্বালা সবলে হৃদয়নিভৃতে চাপিয়া কহিলেন, "বন্ধুলোকের হিতকামনায় উপযাচক হয়েও অনেক সময় উপদেশ দিতে হয়।"

"সে প্রার্থনাও ত করি নি।"

"তবে নিতান্তই অন্যায় করেছি, ক্ষমা করতে পারেন ত করবেন।" ইহার পর দুই জনে নিস্তব্ধে রাজা-বাহাদুরের নিকট আসিয়া পৌছিলেন।

* * * *

যথাসময়ে বিদ্রোহী দলের মিটিং বসিল। রাজ-কন্যা দেশমঙ্গলে সর্ব্বস্ব পণ করিতে উদ্যত; কিন্তু শরৎকুমার এ কার্য্যে তাঁহার বিঘ্নকারী। অতএব এই সভা কর্ত্তৃক অবিসংবাদিতরূপে তিনি দেশশত্রু বলিয়া বিবেচিত হইলেন ও লটারী দ্বারা তৎক্ষণাৎ তৎপ্রতি দণ্ড-ব্যবস্থা হইয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বর্ত্তমান শাসন-তন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহিতা অবলম্বন করিয়া ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের ক্রোধ-খড়্গের নিম্নে মাথা পাতিয়া দিয়াছে, সর্ব্বাগ্রে বাঙ্গালীর ছেলে। তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু কেবল তাহাই নহে, যে সহন-নীতি (Passive Resistance) ভারতবাসীর প্রকৃত মুক্তির পথ বলিয়া অধুনা পরিকল্পিত, তাহারও সূচনা এই বঙ্গদেশেই দেখা যায়।

সমগ্র বাঙ্গালার নেতৃবৃন্দ সদলবলে প্রসাদপুরে সমাগত। কাল কন্‌ফারেন্স বসিবে, আজ ক্লাউ-ডেন সাহেবের স্থলভুক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট প্রচারপত্র দ্বারা হুকুম দিলেন যে, মিছিলে বা সভায় কেহ "বন্দে মাতরম্" উচ্চারণ করিতে পারিবে না। ভারতীয় শাসননীতির বিরুদ্ধে কিছু দিন হইতে জনসঙ্ঘের মনে যে অসন্তোষ-বহ্নি প্রচ্ছন্নভাবে ধূমায়িত হইতেছিল, বঙ্গ-বিভাগের দ্বারা তাহা প্রজ্জ্বলন্ত আকারে বহির্বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। দেশের আবহাওয়া এখন অশান্তি-চাঞ্চল্যপূর্ণ। পক্ষপাতময় শাসননীতি ভঙ্গ করিবার অভিপ্রায়ে ছেলের দল বিশেষভাবে বদ্ধপরিকর। তাহারা প্রাণের মায়াহীন; সম্ভব অসম্ভব হিতাহিত জ্ঞান-শূন্য; জননী জন্মভূমির শৃঙ্খলমোচনজন্য নিজেরা শৃঙ্খল পরিতে বা প্রাণ দিতে কিছুমাত্র কাতর নহে। মায়ের নামে যাত্রা করিয়া, তরঙ্গসঙ্কুল বিপদ্‌সমুদ্রে দোদুল্যমান নৌকায় পা দিয়া তাহারা দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু তরণী নাবিকহীন; কর্ণধারের জন্য উদ্‌গ্রীব তাহারা যাহাকেই সম্মুখে দেখিতেছে, তাহাকেই গুরু বলিয়া ডাকিতেছে।

ম্যাজিষ্ট্রেটের পূর্ব্বোক্ত অন্যায় আদেশে যুবক-দিগের ক্রোধতপ্ত শোণিত তাপমান-যন্ত্রের উর্দ্ধসীমায় আসিয়া পৌঁছিল; নেতৃবর্গের নিকট হইতে শীতল পানীয়ের ব্যবস্থা লাভ জন্য তাঁহাদিগের মুখের দিকে তাহারা চাহিয়া রহিল। বলা বাহুল্য, নেতৃগণও যথেষ্ট উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তাঁহাবা বিবেচনা-শক্তি হারাইলেন না। পরামর্শ-সভায় স্থির হইল যে, গভর্ণমেণ্ট স্বয়ং যতক্ষণ আইন-প্রবর্ত্তন দ্বারা নিষেধাজ্ঞা প্রদান না করেন,—ততক্ষণ কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের এমন ক্ষমতা নাই যে, তিনি জনসঙ্ঘের কোন পবিত্র বন্দনাবাক্য উচ্চারণ নিষিদ্ধ করিতে পারেন। অতএব সাত কোটি বাঙ্গালীর প্রতিনিধি-সভা কখনই এক জন যথেচ্ছাচারী জুলুমদারের লাঞ্ছনা-অপমান বৈধ আদেশরূপে শিরোধার্য্য করিতে বাধ্য নহে। কিন্তু শান্তিভঙ্গ না করিয়া আইন-বিধি রক্ষা-পূর্ব্বকই, বাহুবলের পরিবর্ত্তে মনের বল অবলম্বনে এই বে-আইনী অনধিকার আদেশের প্রতিবাদ করা কর্ত্তব্য। এ জন্য যদি পুলিসের অত্যাচার সহিতে হয়, অকুতোভয়ে তাহা সহ্য করিয়া "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি করিতে করিতে সকলে অগ্রসর হইবেন। সভার এই পরামর্শানুসারে রাজা তাঁহার প্রহরী এবং লাঠিয়ালদিগকে মিছিলে যোগ দিতে নিষেধ করিলেন।

রাজভবনের কম্পাউণ্ড হইতে বেলা ৮টার সময় মিছিল বাহির হইবে। প্রাতঃকাল হইতে উদ্যোগ-পর্ব্ব আরম্ভ হইয়াছে। সভামণ্ডপ এ স্থল হইতে দূরে নহে, সভাপতিকে মোটরে বসাইয়া আর সকলে পদব্রজে মণ্ডপে গমন করিবেন, এইরূপ স্থির করিয়া, প্রয়োজন হইলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে অনাড়ম্বর প্রাণ-পাতের জন্য তাঁহারা প্রস্তুত হইলেন। মনে ধর্ম্মবল এবং হস্তে "বন্দে মাতরম্" নিশান ধরিয়া সকলে ক্ষমতাশালী রাজপক্ষের অন্যায় বাধার মধ্য দিয়া শোভা-যাত্রা করিলেন। রাজা অতুলেশ্বর গায়ক-দলের অগ্রণীরূপে মোটর-যানের অগ্রবর্ত্তী এবং প্রতিনিধি প্রভৃতি অন্যান্য লোক পার্শ্ববর্ত্তী এবং অনু-বর্ত্তী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। রাজা প্রথমে নিশান উঠাইয়া "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি তুলিবামাত্র শত শত হস্তের নিশান পতপত শব্দে উর্দ্ধে উঠিল—শত শত কণ্ঠে মেঘমন্দ্রনাদে "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি উচ্চারিত হইল। সে ধ্বনি শূন্যে বিলীন হইতে না হইতে দিঙ্মণ্ডল সুরের আগুনে জ্বালাইয়া গায়কদল মহোৎসাহে গান ধরিল;—

"বন্দে মাতরম্' ব'লে,—
আয় রে ভাই দলে দলে!
হই রে আগুয়ান, যায় যা'বে যা'ক প্রাণ,—
মায়ের কাজে আত্মদান, করব সবাই কুতূহলে।"

রাস্তার পরপারে অশ্বারোহী পুলিসকর্ত্তা তাঁহার পদাতিক দলবলের সহিত অপেক্ষা করিতেছিলেন। মিছিল রাজকম্পাউণ্ড অতিক্রম করিবামাত্র তিনি তাঁহার সহকারী সুবেদার, জমাদার প্রভৃতি তিন শত লোকসহ মিছিলের গতিরোধ করিয়া গান বন্ধ করিতে আজ্ঞা দিলেন। কিন্তু জনসঙ্ঘের একটি ক্ষুদ্র বালকও এ আজ্ঞায় ভীত হইয়া নিশান নামাইল না; আকাশ-ভেদী স্বরে আবার "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি উঠিল। গায়কদল গানের দ্বিতীয় কলি ধরিল—

"বল ভাই 'বন্দে মাতরম্'
সাত সমুদ্রের ঢেউ-তুফানে খেলুক গানের রং।
অস্ত্র নাইক হাতে, মোদের ভাবনা কি রে তা'তে,
ভক্তি মহাশক্তি, ও ভাই অজেয় ভূতলে
আয় রে ভাই 'বন্দে মাতরম্' ব'লে।"

পুলিসকর্ত্তার ক্রোধ-বিস্ময়ের সীমা রহিল না। এই নিরস্ত্র, বর্ব্বর, ভীরু জনসঙ্ঘকে দমনের জন্য তিন শত পুলিস-বলই তিনি যথেষ্ট মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সনাতন অভিজ্ঞতা ও ধারণা, মিথ্যা

করিয়া দিয়া আজ কি না সেই বর্ব্বরগণ সদর্পে চলিয়া যায়! এ কি অভূতপূর্ব্ব কাণ্ড! "পুলিস সাহেব" আর ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিলেন না, গায়কদিগকে গান নিবৃত্ত করিবার অভিপ্রায়েই প্রধানতঃ তদাজ্ঞায় রেগুলেশন লাঠিগুলা উদ্যত, বেগে উঠিতে পড়িতে লাগিল। আঘাতে কাহারও মাথা ফাটিল, কাহারও হাতের নিশান উড়িয়া গেল, কেহ ভূপতিত হইবামাত্র সহচর সেবকগণ কর্ত্তৃক শুশ্রূষাস্থলে নীত হইতে লাগিল। পুলিসের আক্রমণ আরম্ভ হইলেই রাজা অতুলেশ্বরের ধমনীসঞ্চিত বংশগত বীররক্ত সতেজে দেহ-সঞ্চারিত হইয়াছিল; তিনি সামান্য নিশান-যষ্টির দ্বারাই পুলিসের প্রকাণ্ড লাঠির আক্রমণ ব্যর্থ করিতে করিতে গায়ক-বালকদিগকে লইয়া অগ্রসর হইতে-ছিলেন। একবার তাঁহার শিরস্ত্রাণ মলমল পাগড়ির উপর লাঠির অল্প আঘাত লাগিল। এক জন পার্শ্বচর সেই সময় তাঁহাকে সবলে সরাইয়া না দিলে তাঁহাকে আহত হইতে হইত। অতুলেশ্বর মুহূর্ত্তমাত্র মুখ তুলিয়া তাঁহার রক্ষাকারীকে দেখিয়া লইয়া পুনরায় গায়কদলের সহিত গান করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন।

মোটর জনতার মধ্যে অতি ধীরে ধীরে চলিতে-ছিল। নিশ্চেষ্ট বন্দিরূপে প্রেসিডেণ্টের পার্শ্বে বসিয়া রাজকুমারী জ্যোতির্ম্ময়ী যেন দাহ-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন। ধৈর্য্যের এ কি ভীষণ অগ্নিপরীক্ষা! কয়েকদিন পূর্ব্বে তিনি স্বপ্নে যে অগ্নিদাহ অনুভব করিয়াছিলেন এ যে সেইরূপ ভীষণ কষ্টকর জ্বালা! তাঁহার ইচ্ছা হইতেছিল--দশভুজার মহাশক্তিতে তিনি সকলকে রক্ষা করেন---কিন্তু শক্তি নাই,---শক্তি নাই! নিতান্ত বলহীনা নিরুপায় নারী মাত্র তিনি!

বন্ধ মোটর হইতে সম্মুখের ঘটনা ভাল করিয়া দেখা যাইতেছিল না, জ্যোতির্ম্ময়ীর আগ্রহও ছিল না। অধিকাংশ সময়ই মুদিতনয়নে একাগ্রচিত্তে তিনি সেই সর্ব্বশক্তিশালী বিচারককে ডাকিতে ছিলেন।

গায়কদল গানের তৃতীয় কলি ধরিল—

"আমরা রক্তবীজের ঝাড়!
মরণ-মাঝেই গোপন মোদের সঞ্জীবনী বাড়!
চাই না রক্তপাত,—আমরা—কোর্‌বো না আঘাত;
ব্যর্থ কোরবো অরির অস্ত্র ধর্ম্ম কৃপা-বলে;
আয় রে ভাই দলে দলে, 'বন্দে মাতরম্' ব'লে!"

গায়কদিগের শত কণ্ঠের ঊর্দ্ধে রাজা অতুলেশ্বরের সবল কণ্ঠ সুস্পষ্ট ধ্বনিত হইয়া উঠিল। জ্যোতির্ম্ময়ী সেই ধ্বনিতে পরম পুরুষেরই অভয়বাণী যেন শুনিতে পাইলেন; তাঁহার হৃদয়-প্রাণ আশ্বস্ত হইয়া উঠিল। তিনি চক্ষু খুলিয়া দেখিলেন, প্রেসিডেণ্ট উঠিয়া দরজা-মুখে ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়া চালককে জিজ্ঞাসা করিতে-ছেন, "লাল পাগড়িগুলো স'রে পড়লো না কি হে? আর ত কই বেশী দেখতে পাচ্ছিনে। পাণ্ডালের কাছাকাছিও এসে পড়া গেছে দেখছি।" মোটর-চালক উত্তর করিল— "পুলিসকর্ত্তা এই একটু আগে কোথায় চ'লে গেলেন। পাহারাওয়ালাগুলো একটু দম নিচ্ছে বোধ হয়, হ্যা, আর মিনিট পনেরর মধ্যেই আমরা পাণ্ডালে পৌঁছিতে পারব।"

প্রেসিডেণ্ট যথাস্থানে বসিতে বসিতে দম লইয়া বলিলেন,— "পুলিস দেখছি ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছ থেকে কোন নতুন হুকুম আন্‌তে গেল!" তাহার পর পার্শ্বোপবিষ্ট নীরব স্তব্ধ জ্যোতির্ম্ময়ীর দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন,—"তুমি বোধ হয় খুব ভয় পাচ্ছ—রাজকুমারি?" উত্তর হইল— "ভয় পাবার ত কোন কারণ নেই। আমরা ত গভর্ণমেণ্টের বিপক্ষ বা শত্রু নই। আমাদের দেশবন্দনা-গীতিতে ম্যাজিষ্ট্রেট যে কেন এত ক্ষেপে উঠলেন—তা ত বুঝতেই পারিনে। এ দেশ কি তাঁদেরও বন্দনীয়, পূজ্য নয়?"

প্রেসিডেণ্ট বলিলেন,—তাঁদের এরূপ ভুল বুঝাই ত যত অনর্থের মূল! এতে মিত্রকেও তাঁরা শত্রু ক'রে তোলেন।"

এই সময় অদূরে রোরুদ্যমান বালক-কণ্ঠ হইতে "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি উঠিল। জ্যোতির্ম্ময়ী গাড়ীর দরজায় মুখ বাড়াইয়া দেখিলেন,—দুই জন পাহারা-ওয়ালা এক জন বালককে বাক্য-শাসনে গান নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া লাঠির শাসনে বলপূর্ব্বক ময়দানের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে; কিন্তু আহত হইয়াও বালকের গান বন্ধ হয় নাই।

এ দৃশ্য জ্যোতির্ম্ময়ীর অসহ্য হইয়া উঠিল। চালককে গাড়ী থামাইতে আজ্ঞা দিয়া প্রেসিডেণ্টকে তিনি বলিলেন,—"দেখছেন ত কি কাণ্ড হচ্ছে! আমি নেমে পড়লুম—হেঁটেই পরে পাণ্ডালে যাব—আপনি এগিয়ে চলুন; আমার জন্য অপেক্ষা করবেন না।"

প্রেসিডেণ্ট অবাক হইয়া গেলেন, তাঁহার বাক্য-স্ফূট হইবার অগ্রেই জ্যোতির্ম্ময়ী নামিয়া পড়িলেন। মোটরের পাশে বসন্ত এবং অনাদি রক্ষকতাকার্য্যে নিযুক্ত ছিল, তাহারা রাজকুমারীকে পথ করিয়া দিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ময়দানে ছোটখাট বেশ একটি ভিড় জমিয়া গিয়াছিল। রাজকুমারীকে এদিকে আসিতে দেখিয়া সকলেই - এমন কি, পাহারাওয়ালারাও- তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। তখন বালকের গান থামিয়াছে। শরৎকুমার দুই এক জন লোক সহ তাহার ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিতেছেন; সে মাঝে মাঝে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া উঠিতেছে। রাজকুমারীকে দেখিয়া সে অস্পষ্ট ক্রন্দনের স্বরে আবার 'বন্দে মাতরম্' বলিয়া উঠিল।

জ্যোতির্ম্ময়ী সাশ্রু-নয়নে তাহার দিকে একবার চাহিয়া দেখিয়া নিকটে দণ্ডায়মান পুলিস দুই জনের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "দেখ, বীরপুরুষ তোমরা, ভাল ক'রে এর দিকে চেয়ে দেখ। ছেলেটির ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত চেহারা দেখে কৃতার্থ হও, আনন্দ অনুভব কর। তোমাদের এই কীর্ত্তি ইতিহাস-গাথায় অমর অক্ষরে লিখিত থাকবে।"

জ্যোতির্ম্ময়ীর ক্রোধ-উত্তেজিত শ্লেষপূর্ণ এই তিরস্কার বাক্য অক্ষরে অক্ষরে না বুঝিলেও ইহার মর্ম্ম তাহাদের হৃদয়ে পৌঁছিল। এক জন পাহারাওয়ালা তাহার লজ্জাবনত দৃষ্টি হাতের লাঠির উপর স্থাপিত করিল, অন্য জন উদ্ধত ক্রোধে বালকের দিকে চাহিল। জ্যোতির্ম্ময়ী আবার বলিলেন,—"যাকে তোমরা এমন ক'রে জখম করেছ—সে কি তোমাদের শত্রু? না, তোমাদেরই এক জন ভাই?" 'ভাই'—কথাটা খুব জোরের সহিতই জ্যোতির্ম্ময়ী উচ্চারণ করিলেন। "ভাই হয়ে ভাইয়ের প্রতি এমন নির্য্যাতন? কেন - কি জন্য? সে আমাদের অন্নপূর্ণা দেশমাতাকে ভক্তিভরে বন্দনা করেছিল, তার এই অপরাধে? হায় রে দুর্ভাগিনী মাতৃভূমির হতভাগ্য সন্তান তোমরা! তোমাদের শত ধিক্!"

রাজকুমারী অতঃপর বালকের সেই পট্টি-বাঁধা মুখের দিকে কিছুক্ষণ করুণ কাতর নয়নে চাহিয়া থাকিয়া, মর্ম্মভেদী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সহসা সেই অনুতপ্ত পাহারাওয়ালাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, —"বল ত ভাই, একটি কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি; ঘরে কি তোমার মা আছেন?"

সে সবিস্ময়ে উত্তর করিল,—"আছেন মা-জি।"

জ্যোতির্ম্ময়ী বলিলেন,—তোমার লাঠির ঘায়ে ছেলেটির দেহে যে রক্তধারা ছুটিয়েছ, ঘরে গিয়ে দেখ গে তোমার মায়ের বক্ষ-পাঁজরার মধ্যে ঐ রক্ত জ'মে গিয়েছে, বেদনায় তিনি ছটফট করছেন।"

পাহারাওয়ালার মাতা বহুদিন হইতে শূলরোগে পীড়িত, জ্যোতির্ম্ময়ীর কথায় সে শিহরিয়া উঠিল। জ্যোতির্ম্ময়ী বলিতে লাগিলেন,—"এই ক্ষতবেদনা থেকে তখনি মাত্র তিনি শান্তিলাভ করবেন—যখন তুমি ভক্তিভরে 'বন্দে মাতরম্' ব'লে উঠবে।"

সহসা ভিড়ের মধ্য হইতে অস্পষ্ট গুঞ্জন-ধ্বনি উঠিল,—"এ গীত কি অন্নপূর্ণা মাতাজির বন্দনা! তা ত নয় -বাঙ্গালী লোকের এ রাজ-বিরোধ ঘোষণা!"

জ্যোতির্ম্ময়ী সচকিতে সেই দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক বলিলেন,—"ভুল কথা! বাঙ্গালী লোক রাজবিরোধী নয়। বৃটিশ সরকারের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী অনুগত প্রজা তাহারা।"

এই কথায় একাধিক পাহারাওয়ালা অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—"তবে বাঙ্গালী লোক ম্যাজিষ্ট্রেরের হুকুম মানছে না কেন?"

উত্তর হইল, "সরকার কি ম্যাজিষ্ট্রেটকে আমাদের ধর্ম্মে হাত দিতে হুকুম দিয়েছেন? মাতৃ-বন্দনা মাতৃ-পূজা আমাদের ধর্ম্ম। রাজ-অনুরোধে কি ধর্ম্ম ত্যাগ করা যায়, তোমরাই বল ভাইয়া।"

প্রশ্নকারী পুলিস হতবুদ্ধি, নিরুত্তর হইয়া পড়িল। আকাশে আবার 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি উঠিল। পূর্ব্বোক্ত অনুতপ্ত পাহারাওয়ালার ইচ্ছা হইতে লাগিল- এই বন্দনা গানে সে-ও যোগদান করে—কিন্তু বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

অশ্বের গ্যালপ শব্দ শ্রুত হইল—অদূরে অশ্বারোহী পুলিসকর্ত্তার মূর্ত্তি দেখিয়া পাহারাওয়ালার মনের গতির দোলা অন্যদিকে ফিরিল। যখন অশ্বরোহী নিকটে আসিয়া থামিলেন, তখন অন্যান্য পুলিসদলের মত সে-ও সমতেজে উন্নতমস্তকে সৈনিক-প্রথায় প্রভু-বন্দনা করিল।

"পুলিস-সাহেব" জ্যোতির্ম্ময়ীর পরিচিত;—কত সময়ে তাঁহার পিতার ভোজ-নিমন্ত্রণ-টেবিলে অতিথি হইয়া একত্র আহার করিয়াছেন। তিনি টুপী খুলিয়া রাজকুমারীকে সম্মান প্রদর্শন করিলেন, রাজকুমারী প্রতিব্যবহারে মাথা নোয়াইয়া ভদ্রতা রক্ষাপূর্ব্বক বালককে দেখাইয়া বলিলেন—"দেখুন দেখি, আপনার লোকেরা এই নিরীহ বাচ্ছাটির কি অবস্থা করেছে। আপনার আজ্ঞাতেই অবশ্য এরূপ ঘটেছে!" পুলিস-কর্ত্তা দেখিলেন—সত্যই বড় বাড়াবাড়ি পীড়ন হইয়া পড়িয়াছে। আর এরূপ মারপিটে যে তাঁহাদের অভীষ্টসিদ্ধি হইবে না, জনসঙ্ঘের ব্যবহার হইতে ইতিপূর্ব্বেই তাহা বুঝিয়া তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত এ সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে

গিয়াছিলেন এবং পুলিস-শাসন বন্ধ রাখিয়া—তাঁহাদের মতে উত্তেজনার যিনি মূলীভূত কারণ, তাঁহাকে অর্থাৎ সভাপতি মহাশয়কে বন্দী করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হাজীর করিবার হুকুম আনিয়াছিলেন।

জ্যোতির্ম্ময়ীর কথায় "very sorry, very sorry" বলিয়া তিনি দুঃখ প্রকাশ করিলেন। জ্যোতির্ম্ময়ী বলিলেন, "এখন এ দুঃখ আপনার মৌখিক, কিন্তু একদিন এ জন্য সত্যই আপনাদের sorry হ'তে হবে—আর এই 'বন্দে মাতরম্' গীত শুনে আপনারাও একদিন সম্মানভরে মাথা নোয়াবেন; এই আমার ভবিষ্যদ্বাণী!"

"পুলিস-সাহেব" একটু অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া উপহাসের ভাবে মাথা নোয়াইলেন। জ্যোতির্ম্ময়ী নিজের দলবলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"বল ভাই সকলে 'বন্দে মাতরম্'।" সকলে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি করিয়া উঠিল—"সাহেব" তাহা নিবারণের কিছুমাত্র প্রয়াস না পাইয়া নিস্তব্ধে চলিয়া গেলেন। মনে মনে বলিলেন—Poor thing! I wish she was not trapped into this dengerous pit. Thousand curses to that—leader.

নিরীহ প্রেসিডেণ্ট বন্দিরূপে ম্যাজিষ্ট্রেটের সমীপে আনীত হইলেন। "সাহেবের" অপর্য্যাপ্ত কটূক্তি তাঁহার উপর বর্ষিত হইতে লাগিল। শিরোভূষণরূপে তাহা ধারণ করিয়া তখনকার মত রাজ-জামীনে মুক্তিলাভ করিয়া তিনি সভায় ফিরিয়া আসিলেন। রাজা প্রেসিডেণ্টের সহবর্ত্তী হইয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে কন্‌ফারেন্স আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। সভামণ্ডপের এক পার্শ্বে গালিচা-শয্যার উপর শতাধিক আহত বালক—কেহ শুইয়া, কেহ বসিয়া আছে, সকলেরই পার্শ্বে তাহাদের নিশান। সভা বসিবার পূর্ব্বে যখন 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি উঠিল, তখন যাহারা শুইয়াছিল, তাহারাও নিশান উঠাইল, যাহার এক হাতে আঘাত লাগিয়াছিল—সে অন্য হাতে নিশান তুলিয়া ধরিল—দর্শকদিগের নয়নে জাতীয়-জীবনের কর্ত্তব্য-পথ যেন উহাতে মুক্ত হইয়া গেল। রাজকুমারী আহত বালকদিগের নিকটেই বসিয়াছিলেন; তাঁহার নয়নে অশ্রু—হৃদয়ে তপ্ত বেদনা; কিন্তু আশাপূর্ণ গর্ব্বোচ্ছ্বাসে তাঁহার মুখশ্রী দীপ্তোজ্জ্বল।—'রণ মত্ততার মধ্যে জীবনদান সহজ; কিন্তু ন্যায় কর্ত্তব্যের অনুরোধে শস্ত্রবলের সহিত নিরস্ত্র প্রাণপণ যাহারা করিতে পারে, তাহাদের জাতীয় মহত্ত্ব জগতে অতুলনীয় এবং এই মহৎ জাতির ভবিষ্যৎ যে আশা-সমুজ্জ্বল, তাহাতে সন্দেহ নাই।' এইরূপ চিন্তার মধ্যে জ্যোতির্ম্ময়ীর নয়ন যেন সাগ্রহে কাহার অন্বেষণ করিতেছিল—কিন্তু তাহার দর্শন পাইল না।

গান আরম্ভ হইল,—এ গানটি জ্যোতির্ম্ময়ীরই রচনা।

১

কেমন ক'রে বলব তোরে ভালবাসি কত,
মা গো ভালবাসি কত!
কিছু ত দেখি না মধুর তোমার রূপের মত!
চাঁদ কি ধরে তত আলো তুমি যত জ্যোতি ঢালো!
তব পদ-কোকনদে পারিজাত অবনত!
জননী গো জন্মভূমি নমস্কার শত শত!

২

হাসিতে নয়নে তব মণিরত্ন ঝরে;
নয়নের অশ্রুকণা প্রাণ-দাহ করে।
তুমি মা গৌরব-স্মৃতি, নয়নে আনন্দ প্রীতি
সকল সুখের নিদান তুমি, দুঃখ-সহন ব্রত!
জননী গো জন্মভূমি নমস্কার শত শত!

৩

শুনেছি ত্রিদিবে দেবী রূপে অতুলনা;
তুমি কি বিতর সেথা তব বিভাকণা?
মুকুট তব শশিরবি; তাই ত তারা মোহন ছবি—
তব হিম-নিকেতনে নন্দন কল্পনাহত।
জননী গো জন্মভূমি নমস্কার শত শত!

৪

ষড় ঋতু, মা তোমার বীণার ঝঙ্কার;
নব নব রাগে কিবা বাজে চমৎকার!
শীত গ্রীষ্ম বরষায়, বসন্তের পাখী গায়,
শ্যাম-কুঞ্জে পুঞ্জে-পুঞ্জে ফোটে ফুল অবিরত!
জননী গো জন্মভূমি নমস্কার শত শত!

৫

সাগর চরণ বন্দে গর্জ্জন তরঙ্গে—
বক্ষে গঙ্গা স্তন্যসুধা ঢালিছে অভঙ্গে!
অঞ্চলে ভরিয়া ধান্য সবে বিতরিছ অন্ন!
তোমাতে হয়েছি ধন্য দয়াময়ি, বঙ্গ-মাতঃ!
জননী গো জন্মভূমি নমস্কার শত শত!

গানের পর বক্তৃগণ একের পর একে তাঁহাদের বক্তব্য প্রসঙ্গের মধ্যে অদ্যকার এই অত্যাচার কাহিনী ওজস্বিনী ভাষায় বিবৃত করিতে লাগিলেন। বৃটিশ

ন্যায়ভক্ত পুরুষেরও বিশ্বাস শিথিলমূল হইয়া পড়িল,—তাঁহারা লজ্জাদুঃখে ম্রিয়মাণ নতমুখ হইয়া রহিলেন, যুবকদিগের শিরায়-শিরায় উত্তেজনার একটা স্তব্ধ আলোড়ন চলিল।

বক্তৃতার শেষে গায়কগণ দ্বিতীয় গান ধরিল—

১

ভাই রে চিরদিন কি শিশুর মত রবে ?
পল্‌তে ঝিনুক ফেলে দিয়ে চুমুক ধরবে কবে—
ও ভাই, চুমুক ধরবে কবে ?
কাঁদলে শুধু চল্‌বে না ত, পাষাণ তাহে গল্‌বে না ত,
কাঁদুনিতে বাঁধুনি দাও ভাষার মহা ভাবে—
জগৎ তখন বুঝবে কথা মুখের দিকে চাবে.
মানুষ হ'তে হবে তোমার যোগ্য হ'তে হবে।

গানের দ্বিতীয় কলি আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই "বন্দে মাতরম্" ধ্বনির মধ্যে রাজার সহিত প্রেসিডেণ্ট মণ্ডপে আগমন করিলেন। সভামধ্যে আনন্দের উচ্ছ্বাস প্রবাহিত হইল—বিজয়ী বীরের ন্যায় সমাদৃত হইয়া যখন তিনি আসন গ্রহণ করিলেন, তখন পূর্ব্বের অসমাপ্ত গান পুনরায় গায়কগণ গাহিতে আরম্ভ করিল।

২

বিধাতারে দোষো কেন—ভাগ্যে হাতে ধর;
ভাল ক'রে বাঁচবে যদি কষ্ট বরণ কর।
ফুঁয়ে কাঁটা ওড়ে না ভাই, চেষ্টা নিষ্ঠা সাধনা চাই,
এক চাণকের দেশে মিল্‌বে লক্ষ চাণক যবে—
জগৎ তখন চিন্‌বে তোরে আদর ক'রে লবে।
মানুষ হ'তে হবে রে, ভাই, যোগ্য হ'তে হবে।

৩

পড়্‌তে পড়্‌তে তবু ওঠো,
জ্ঞানের পথে এগিয়ে ছোটো,
ছোট বড়, ছেলে মেয়ে সঙ্গে লও গো সবে,
মিলন-বাতাসে বাঁধলে পালে, মহা শক্তি পাবে হালে,
নাবিক হয়ে চল্‌বে বেগে জাতির মহার্ণবে!
ধ্রুবতারার শুভ্র আলো পথ দেখাবে ভবে!
মানুষ হ'তে হবে তোমার যোগ্য হ'তে হবে!
পল্‌তে ঝিনুক ছেড়ে দিয়ে চুমুক ধরবে কবে—
ও ভাই, চুমুক ধরবে কবে?

সুরে, কথায় গানটি সকলের মর্ম্মস্থলে গিয়া পৌঁছিল। গায়কদিগকে যথোচিত ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক মডারেট প্রেসিডেণ্ট মহাশয় উত্তেজিত জনগণের শান্তপ্রলেপরূপ অভিভাষণ আরম্ভ করিলেন,—

"হে ভ্রাতাভগিনীগণ! আমাদের কর্ত্তব্য যেন প্রতিশোধস্পৃহায় মলিন হইয়া না যায়। রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্র স্মরণ কর—তদ্দ্বারা আমরা তাঁহার বৃটিশ প্রজার সহিতই সমধিকার লাভ করিয়াছি। কেবল তাহাই নহে, আমাদের মধ্যে এই যে জাতীয় জীবন স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছে, ইহাও বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা-দীক্ষার ফলে! এ জন্য যেন আমরা চিরকৃতজ্ঞ থাকি। আমাদের সম্বন্ধে ভারতীয় গভর্ণমেণ্টের শাসন-প্রণালীর যে সকল ক্ষুণ্ণতা আছে এবং স্থলবিশেষে রাজপুরুষদিগের নিকট হইতে আমরা যে সকল কঠোর আচরণ পাই, সে জন্য আমরা বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের ন্যায়তন্ত্রতার উপর বিশ্বাস না হারাই। অন্যায়ের জয় চিরদিন থাকে না; বৈধ আন্দোলন দ্বারাই আমরা ক্রমশঃ এই সকল অসঙ্গত বিধিব্যবস্থার প্রতিবিধান এবং রাজপুরুষদিগের প্রভাব ক্ষুণ্ণ করিতে পারিব। তবে এ জন্য যে চেষ্টা নিষ্ঠা সাধনা চাই, ইহা ঠিক।

"যে আইনবিধির প্রতিবাদের জন্য আজ আমরা সকলে এখানে মিলিত হইয়াছি, উক্ত বিধি আমাদিগকে সাধনার পথে বহুদূর অগ্রসর করিয়া দিয়াছে—তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই এবং এ জন্য এক পক্ষে গভর্ণমেণ্টই আমাদের ধন্যবাদভাজন। কিছুদিন পূর্ব্বে যাহা কল্পনার বিষয় ছিল, বঙ্গবিভাগের প্রসাদে আজ তাহা সত্য ঘটনা। আজ আমরা সপ্তকোটি বাঙ্গালী এক হইয়া, সমস্বরে এই বিধির প্রতিবাদ করিতেছি! এই বজ্রনিনাদ, বধির গভর্ণমেণ্টকেও যে অচিরে জাগাইয়া তুলিবে, ইহা ধ্রুব নিশ্চয়। আমাদিগের অদ্যকার কষ্টস্বীকার নিষ্ফল হইবার নয়—ঐ যে আমাদের আহত বালকগণ—উহাদিগের দেহ-বহির্গত রক্ত-সলিল দ্বারা আজ আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তি পত্তন করিয়াছে,—আমাদের মিলন উদ্দেশ্য আজ পূর্ণমাত্রায়"—

কণ্ঠাগত বাক্য বন্ধ রাখিয়া এইখানে সহসা তাঁহাকে থামিতে হইল। 'পুলিস-সাহেব' আসিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের একখানি অনুজ্ঞাপত্র তাঁহাকে প্রদান করিলেন! পত্রের মর্ম্ম এইরূপ—"এই কন্‌ফারেন্স সভা বন্ধ করিতে আমি আদেশ করিতেছি। আজ্ঞা পালিত না হইলে গুর্খা সৈন্য দ্বারা সভাভঙ্গ করিয়া দিতে বাধ্য হইব।"

বলা বাহুল্য, অতঃপর সভা বন্ধ করাই নেতৃগণ যুক্তিসঙ্গত জ্ঞান করিলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট জয়োৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু

রাজপুরুষদিগের এই দমননীতির পরিণাম কিরূপ বিষময় হইয়া উঠিল--ইহার ফলে এনার্কিজম্ কিরূপ দেশবিস্তৃতি লাভ করিল, ইতিহাস তাহার ব্যাখ্যা করিবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রাজ-ম্যানেজার শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যা অণুভার বিবাহ—অগ্রহায়ণের দ্বিতীয় সপ্তাহে। * রাজা অতুলেশ্বর এই বিবাহ উপলক্ষ্যে কন্‌ফারেন্সের দুই চারি দিন পরেই শেষ কার্ত্তিকে সদলবলে কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন। কন্যা জ্যোতির্ম্ময়ীও তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছেন।

অনেক দিন পরে, রাজসমাগমে মাণিকতলা-প্রাসাদ জনাকীর্ণ সহবশোভা ধারণ করিয়াছে।

রাজকুমারী আসিয়াছেন শুনিয়া হাসি যথাসম্ভব এক দিন তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিল। তাঁহাদের প্রথম দর্শন প্রণয়িযুগলেরই মত; আধো-বাধো আনন্দের ভাবে তাঁহরা পরস্পরকে চাহিয়া দেখিলেন। অণুভা তাঁহাদের এই মৌন-মিলন হাস্যমুখরিত করিয়া তুলিল। হাসি-গানে, সরস গল্পে পূর্ব্বাহ্ণ হইতে অপরাহ্ণবেলা যেন চকিতে কাটিয়া গেল। জ্যোতির্ম্ময়ীর বালসুলভ চপলতা আজ সখীদের সহবাসে অবাধ স্রোতে উৎসারিত হইয়া উঠিয়াছিল।

মাস অগ্রহায়ণ, চারিটা বাজিতে না বাজিতে রৌদ্রের আভা নিস্তেজ হইয়া পড়িল, দিনের আলো সায়াহ্ন-ম্লান হইয়া আসিল। অণুভা বলিল, "চল, ভাই রাণি, দিদি, আমরা নৌকায় বেড়িয়ে আসি।"

হাসি এই প্রস্তাবে খুবই খুসী হইয়া উঠিল। তিন সখীতে তাড়াতাড়ি সান্ধ্য-বেশভূষা সারিয়া লইয়া, ঘরের বাহিরে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, এমন সময়ে অনাদি আসিয়া হাজির হইল। রাজকুমারী আহ্লাদের স্বরে বলিলেন, "এই যে অনাদি-দা! কি মনে ক'রে? তা বেশ বেশ; তুমিও চল ভাই আমাদের সঙ্গে, আমরা কিন্নর হ্রদে নৌকাভ্রমণে চলেছি।"

অণুভা বলিল, "হাঁ, নৌকাডুবি হ'লে আমাদের তা হ'লে আর ভয়-ভাবনার কোন কারণ থাক্‌বে না। জান, ভাই হাসি, ইনিই আমাদের সেই কুমার অনাদি-দা, যাঁর সঙ্গে সে দিন তোমার আলাপ করিয়ে দিতে পারি নি ব'লে মনে আক্ষেপ র'য়ে গেছে। ইনি আমাদের—হাসি দিদি, বুঝ্‌লে, অনাদি দা?"

"বুঝেছি, ঠাকরুণ! তোমার আর অত ক'রে পরিচয় করিয়ে দেবার দরকার নেই।"

অনাদি সহাস্যে এই কথা অণুভাকে বলিয়া অতঃপর হাস্যজনক গম্ভীরভাবে হাসির দিকে চাহিয়া কহিল, "দেখুন হাসি দিদি, কুমারটুমার আমি নই; অত বড় হুমরো চুমরো লোক আমাকে ঠাওরাবেন না, আমি সামান্য অনাদি, বুঝ্‌লেন ত?"

অনাদির এই অসঙ্কোচ আত্মীয়তাপূর্ণ আত্ম-পরিচয়দান হাসির খুবই ভাল লাগিল। বক্তার বাক্যের সহিত চেহারারও সে মিল দেখিল।

অনাদির বর্ণ উজ্জ্বল গৌর, অথচ প্রখরতাহীন স্নিগ্ধ কোমল এবং তরুণ মুখশ্রী উগ্রতালেশশূন্য সরল-মাধুর্য্যে মণ্ডিত।

প্রশস্ত ললাট বলিতে যাহা বুঝায়, অনাদির কপালে বিধাতা সে কপাল আঁকেন নাই। তথাপি সে নিতান্ত ক্ষুদ্র-ভালও নহে। অধিকন্তু কপালমূলে কার্য্য-কারণবোধক ঢিবি দুইটা উঁচু হইয়া উঠিয়া তাহার মুখখানি বুদ্ধিশ্রীযুক্ত করিয়া তুলিয়াছে। চুলগুলি হাল-ফ্যাসানে, সাঁথির দুই পাশ হইতে তুলিয়া আঁচড়ান,—কিন্তু তৈলসিক্ত সযত্ন পারিপাট্যের অভাবে তাহা মাথার উপর ঠিক আঁটিয়া বসে নাই, তাহার কতক-গুলা দিগ্‌ভ্রষ্টভাবে এদিকে ওদিকে সরিয়া পড়িয়াছে। হাসির ভাই শচীনও এইরূপ করিয়া চুল আঁচড়ায় কিন্তু এ জন্য বোনটির নিকট হাস্য-বিদ্রূপের বদলে কোন দিন একটা প্রশংসাবাক্য লাভ করে নাই। আজ কিন্তু অনাদির মাথায় এ ফ্যাসনটা হাসির নেহাৎ অপছন্দ হইল না।

অনাদির নাসিকাও তীক্ষ্ণতাবিহীন, ইহা নিতান্ত খাট না হইলেও আদপেই কবির উপমেয় শুকচঞ্চুতুল্য সুদীর্ঘ নহে। মুখের মধ্যে সেরা তাহার চক্ষু, প্রকৃতই সে পদ্মপলাশলোচন এবং কমলপাপড়ি দুইটার মত সর্ব্বদাই তাহা যেন হাসিতেছে। এ সম্বন্ধে সে হাসির ঠিক জুড়িদার।

অনাদি যদিও রাজার খুব নিকট সম্পর্কীয় আত্মীয় নহে, তাঁহার পিতার বৈমাত্রেয় ভাগিনেয়ী পুত্র,—তথাপি মোটের উপর প্রসাদপুর রাজ-বংশের একটা আদর্শ ছাপ তাহার সমস্ত মূর্ত্তিতেই স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি রাজার এই দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়টিকে হঠাৎ তাঁহার দ্বিতীয় সংস্করণ বলিয়া

* স্বপ্নবাণী দেখ।

ভ্রম জন্মে। অনাদির চিবুক বিশেষরূপে মাতুল-বংশক্রম ঈষদ্দীর্ঘ, ওষ্ঠাধর প্রফুল্ল এবং দেহগঠনও রাজার তরুণ বয়সের অনুরূপ ছিপছিপে পাতলা। তবে অতুলেশ্বরের মূর্ত্তিতে, সারল্যের সহিত তাঁহার স্বকীয় সম্পত্তি যে একটি অনুপম গাম্ভীর্য্যমিশ্রিত, অনাদির চেহারায় এই ভাবটিরই একান্ত অভাব। বয়োবৃদ্ধি সহকারেও যে এই স্বভাবচঞ্চল বালকটি এক দিন মাতুলের উক্ত শ্রীসম্পদের অধিকারী হইতে পারে, তাহাকে দেখিয়া—অন্ততঃ এখন দেখিয়া,—সে সম্ভাবনাটুকু কাহারও মনে উদয় হয় না।

অনাদির দৈহিক সবল রূপ এক দিকে যেমন মুখের সরলশ্রীকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছে, অন্য দিকে তাহার ওষ্ঠাশ্রিত যৎসামান্য গোঁপের রেখাপাত স্বাভাবিক বালভাবের সহিত মিলিয়া তাহার প্রকৃত বয়ঃক্রমকে ক্যামারা-চিত্রের ন্যায় লোকনয়নে ক্ষুদ্রতর—অপ্রকৃতরূপে প্রতিফলিত করিতেছে। অনাদির বয়স ২২, কিন্তু হাসি তাহাকে সমবয়স্ক ভাবিয়া তাহার প্রতি সস্নেহে দৃষ্টিপাত করিল।

সাজ-সজ্জা এই রাজবংশীয় যুবকের একেবারেই সাদাসিধা। পরিধানবস্ত্রে নিপুণ ভৃত্যের বহু শ্রমসাধ্য আলম্বিত কোঁচার পত্তন বা পিরাণে গিলার কুঞ্চন নাই। সদ্যঃধৌত মোটা ধুতী পিরাণের উপর তাহার গায়ে একখানা আলোয়ান মাত্র জড়ান, তাহাতেই তাহাকে গ্রীকমূর্ত্তির ন্যায় সুন্দর মানাইয়াছে। বেমানান হইয়াছে কেবল তাহার পায়ে দেশী মোটা চামড়ার দেশী মুচির গড়া চটী জুতাজোড়া। ইহা-দিগকে পায়ের আগায় টানিয়া টানিয়া অনভ্যস্তপদে সে যখন চটাপট চলে, তখন হাস্যসংবরণ দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। রাজকুমারী তাহার পায়ের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আমরা ভাই, নৌকা-যাত্রায় চলেছি, গঙ্গাযাত্রার অভিপ্রায় ত আমাদের নেই। তুমি যদি এই চটী প'রে নৌকায় উঠ্‌তে যাও, তা হ'লে আজ আমাদের অতলে তলাবার সম্ভাবনা।"

অনাদি হাসিয়া বলিল, "কখনো না,—দেখে নিও।"—

"না ভাই, আমি দেখতে চাইনে, সে সখ্ আমার মোটেই নেই। আচ্ছা, তোমাকে যে সে-দিন জুতা এক জোড়া দিলুম—পর্‌বে না কখনো?"

"পর্‌ব—পর্‌ব। অত বাহারে জুতা কি আট-পৌরে পর্‌বার জিনিষ? তোমার বিয়ের দিন পর্‌ব।"

"দেখ অনাদি-দা—জ্বালিও না বল্‌ছি। বাহারে জুতা না পর্‌তে চাও, তা হ'লে দরোয়ানি মোটা নাগরা পর। তোমার এ চটীর চেয়ে সেও ঢের ভাল।"

"দেখ ভাই রাজকুমারী-দি, আর যা বল্‌তে হয় বলো, আমার চটীর নিন্দে কোরো না, সেটা আমার প্রাণে সইবে না, জান ত, বিদ্যাসাগর মশায় এই চটীজুতাকে পায়ের স্পর্শে মানুষ ক'রে দিয়ে গেছেন।"

অনাদির বলিবার ভঙ্গিতে সকলেই হাসিল—হাসি জুতাধারীর সৎসাহসে জুতার প্রতিও শ্রদ্ধাকৃষ্ট নয়নে চাহিল। অণুভা অনাদির কথার উত্তরে কহিল—"আর আমাদের কুমার বাহাদুর—মহতের জুতা ধারণ ক'রে মানুষ হবার চেষ্টা কর্‌ছেন!"

"আর তোমরা পাঁচ জনে মিলে আমাকে বাঁদর নাচাবার চেষ্টা কর্‌ছ। ধন্য ধন্য!"

অনাদির এই কথার উত্তরে অণুভা কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই হাসি কহিল, "কুমার সম্বোধন আপনি পছন্দ করেন না দেখছি, অনাদি-দা ব'লেই কি তবে আপনাকে ডাক্‌ব?"

অনাদির অমায়িক ভাব-ভণিতায় প্রথম দর্শনেই তাহার প্রতি যে আত্মীয়তাভাবের উদ্রেক হইয়াছিল, সহাস্য স্নিগ্ধমধুর স্বরে তাহা ব্যক্ত করিয়া হাসি এই প্রশ্ন করিল। অনাদি তাহার উত্তরে প্রফুল্লভাবে কহিল, "এ অনাবশ্যক প্রশ্ন হাসিদিদি! আমি ত আপনাকে, হাসিদি, বল্‌তে আপনার অনুমতির অপেক্ষা রাখিনি।"

রাজকুমারী কহিলেন, "বেশ করেছ, তুমি মস্ত বীরপুরুষ! এখন শ্রীজুতাসহ চরণ জোড়াটি বাড়াও দেখি! যে রকম গল্প ফেঁদেছ, এইখানেই দেখছি, আমাদের তুমি স্তম্ভাকৃতি দান করবে।"

"তাই না কি? তাই না কি? আমি কি মশয়দের দাঁড় করিয়ে রেখেছি না কি? যেতে হবে কোথায়? জল্‌কে? তবে আস্‌তে আজ্ঞে হোক্।"

বলিতে বলিতে পদদাপে সিঁড়ির ঘরটা সজাগ করিয়া তুলিয়া সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সে কহিল, "ওঃ, আসল কথাটা বল্‌তে যে একেবারেই ভুলে গেছি। হরিরাম তোমার সঙ্গে একবার দেখা করতে চায়। সে গাড়ীবারান্দায় অপেক্ষা করছে।"

রাজকুমারী বলিলেন, "কিন্তু তার সঙ্গে যদি এখন দেখা করি—তা হ'লে আজ আর নৌকায় যাওয়া হবে না। এমনিতেই দেরী হয়ে পড়েছে। তুমি তাকে ব'লে এস, ভাই, যে, সন্ধ্যাবেলা দেখা কর্‌ব এখন। ব'লেই কিন্তু তুমি শীঘ্র চ'লে এস, আমরা

সকলে মিলে অন্দর-পথে ঘাটযাত্রা করব—বুঝলে ত?”

“যে আজ্ঞে” বলিয়া সে চটাপট নামিয়া গেল। রাজকুমারী সিঁড়িপথে দাঁড়াইয়াই সখীদের সহিত গল্প সুরু করিয়া দিয়া কহিলেন, “আমার হরিরামকে যদি দেখ, হাসিদি, খুবই তোমার হাসি পাবে; কিন্তু তার গল্প যদি শুনতে চাও— ”

হাসি ব্যগ্রভাবে বলিল, “শুনব শুনব।”

“তা হ’লে কিন্তু হাসিটাকে কিছুক্ষণ চেপে রাখতে হবে—নইলে তার গল্প জমবে না।”

“আমি ঠিক বলছি রাজকুমারী—মোটেই হাসব না তখন।”

বলিয়া সে খুব খানিকটা হাসিয়া লইল। রাজকুমারীও হাসিয়া বলিলেন, “তা বেশ! এখনই তা হ’লে হাসির ফোয়ারাটাকে নিঃশেষ ক’রে নেও। তার পর হরিরাম যখন সনাতন চৌধুরী ঠাকুরের ধনুর্ব্বিদ্যার বিশদ ব্যাখ্যা করবে, তখন সমজদার শ্রোতার মত গম্ভীরভাবে সে কথা শুনে যেও। তবে আত্মরক্ষার্থ এইটুকু আগে থাকতে ব’লে রাখি যে, শুনতে শুনতে যদি নিদ্রারোগে ধরে—আমাকে কিন্তু তখন দায়ী করো না।”

অণুভা বলিল, “না হাসিদি, রাজকুমারীর কথায় ভয় পেয়ো না—হরিরামের গল্প তোমার ভালই লাগবে।”

রাজকুমারী হাসিয়া বলিলেন, “আমার কিন্তু সত্যি ভাই তার গল্প শুনলেই ঘুম পায়। যা হ’ক, সন্ধ্যাটাও তা হ’লে এইখানেই কাটাচ্ছ? আহারান্তে রাতে তার পর আমি নিজেই তোমাকে পৌছে রেখে আসব,—এই ঠিক রইল, কেমন?”

হাসি এ কথার কোন উত্তর না দিতে দিতে কুন্দ পশ্চাৎ হইতে ডাকিল, “রাজকুমারি!”

রাজকুমারী চমকিয়া চাহিয়া বলিলেন, “এই যে কুন্দদি, আমরা নৌকায় যাচ্ছি,—আপনিও চলুন না?”

কুন্দ সে কথার কোন উত্তর না করিয়া কহিল—“একবার এদিকে আসবেন? একটা কথা আছে।”

“গোপন কথা না কি?” বলিতে বলিতে রাজকুমারী কিছু দূরে সরিয়া কুন্দের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। কুন্দ তাঁহাকে চুপে চুপে যে কথা বলিল, তাহাতে তাঁহার মুখ বিষণ্ণ গম্ভীর হইয়া পড়িল, দু’জনে দু’এক মুহূর্ত্তকাল কথাবার্ত্তা হইবার পরে কুন্দ বিদায় গ্রহণ করিল,—রাজকুমারী সখীদের নিকট ফিরিয়া আসিয়া হাসিকে বলিলেন, “আজ ভাই একটা বিশেষ দরকারে আমায় ঘরে থাকতে হবে—অনাদি-দা এসে তোমাদের নৌকায় নিয়ে যাবেন।”

রাজকুমারী নৌকাভ্রমণে যাইতে পারিবেন না শুনিয়া সকলেই নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল। হাসি বলিল,—“আমারও ত ভাই নৌকায় যাওয়া হবে না! পরশু যে দাদার গায়ে হলুদ, সে কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলুম। কত যে গোছগাছ করার আছে। আমি না গেলে মা, দিদিমা সকলেই খুব রাগ করবেন।”

রাজকুমারী তাহাকে আর থাকিতে পীড়াপীড়ি না করিয়া কহিলেন, “হাঁ, সত্যিই ত; পরশু যে অণুদিদির গায়ে হলুদ। আজ তা হ’লে ছেড়ে দিচ্ছি হাসিদি—পরশু কিন্তু হলুদ নিয়ে তোমায় নিজেরই আসতে হবে। নইলে হলুদ-স্নান জমবে না, তার পর আমরা দু’জনে মিলে কনে সাজাব, এই সর্ত্তে ছাড় পেলে, এই মনে রেখো।”

হাসি বলিল—“আচ্ছা, বেশ, নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলুম, কিন্তু ফুলশয্যার দিন তোমারও ভাই কনে সাজাতে আসতে হবে—আসবে ত, ভাই? কথা দাও।”

“আসব বই কি, গায়ে হলুদের সাজ ত দাদা দেখতে পাবে না, ফুলশয্যার সাজ দাদার মনে ধরান চাই ত!”

অণুভা রাগের ভাণ করিয়া সলজ্জে কহিল—“যাও, আমি সাজতে চাইনে।”

রাজকুমারী হাসিয়া তাহার গাল টিপিয়া দিলেন। ইতিমধ্যে অনাদি আসিয়া জুটিল। রাজকুমারী তাহাকে কহিলেন—“অনাদি-দা, আজ আর ভাই নৌকাভ্রমণ হলো না। আমার মোটর গাড়ীবারান্দায় আছে—তুমি—প্রহরী হয়ে হাসিদিকে বাড়ী পৌছে এস দেখি।”

অনাদি স্ত্রীলোকের অস্থিরচিত্ততা সম্বন্ধে সংক্ষেপ কূটমন্তব্য প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের সহিত গাড়ীবারান্দায় আসিয়া মোটর-চালকের পার্শ্ব গ্রহণ করিল। হাসিকে মোটরে চড়াইয়া দিয়া রাজকুমারী ও অণুভা উভয়ে ভিন্ন পথে গৃহাভিমুখী হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অণুভাকে বিবাহ-যৌতুক দিবার অভিপ্রায়ে রাজকুমারী নিজের একছড়া দামী মুক্তার মালা

কুন্দবালাকে সঙ্গে আনিতে বলেন। যে ট্রাঙ্কের মধ্যে কুন্দ তাহা আনিয়াছিল, আজ সেটা খুলিয়া দেখিল —মালার মখমল কেস্‌টি যথাস্থানে আছে, কিন্তু তন্মধ্যে জিনিষটি নাই। অথচ ট্রাঙ্কের চব্‌স্-কল ঠিক বন্ধই ছিল, চোর-যাদুকর তালা-চাবি, কল-কব্জা না ভাঙ্গিয়াই জিনিষটি হস্তগত করিয়াছে, এ কি ইন্দ্রজাল! ভয়ে কুন্দবালার প্রাণ উড়িয়া গেল। এই সংবাদ জানাইতেই কিছু পূর্ব্বে সে রাজকন্যার নিকট গিয়াছিল।

জ্যোতির্ম্ময়ীর সজ্জাগৃহের পার্শ্বেই তাঁহার অলঙ্কার-বস্ত্রাদি রক্ষার ঘর। হাসিকে বিদায় দিয়া তিনি সেই ঘরে আসিয়া দেখিলেন,—লৌহ-সিন্দুকের দরজা খোলা,—তাহার নিকটে নীচে কার্পেটের উপর বসিয়া, সম্মুখে গহনার বাক্স রাখিয়া, গহনাগুলা কুন্দ নাড়াচাড়া করিয়া দেখিতেছে! দাসী-বাঁদি আর কাহাকেও সেখানে না দেখিয়া রাজকুমারী বুঝিলেন, কুন্দবালার এ অতিরিক্ত সাবধানতা! মনে মনে ইহাতে তিনি একটু হাসিলেন এবং কুন্দ তাঁহাকে দেখিবার অগ্রেই তাহার নিকটে আসিয়া বসিয়া— গহনাগুলার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,— "মালাছড়া কি পেলেন, কুন্দদি?"

কুন্দ সচকিতভাবে মুখ তুলিয়া তাঁহার দিকে বিষণ্ণ নয়নে চাহিয়া উত্তর করিল,—"না, পাওয়া গেল না।"

"আপনি ভুলে খালি 'কেস'টাই ট্রাঙ্কে পোরেন নি ত?"

"না রাজকন্যা, না। আর তা হ'লে ত এই গহনাগুলার মধ্যেই সে ছড়াটাও থাকত,—তাও ত নেই। কিন্তু আমি ঠিক জানি, আমি ভুল করি নি। গহনার বাক্সটা রঘুবীরের জিম্মায় দেবার সময় মতির মালাছড়াও কেসে পূরে—আলাদা এই ট্রাঙ্কের মধ্যে রাখি। আজ রঘুবীর যখন বাক্সটা দিলে, তখন ভাবলুম্—মালাছড়াও এই সঙ্গে সিন্দুকে তুলে ফেলি; ও মা, ট্রাঙ্ক খুলে দেখি, কেসের মধ্যে মালা নেই অথচ ট্রাঙ্কটা ঠিক বন্ধই ছিল।"

"আশ্চর্য্য ব্যাপার! আচ্ছা, কুন্দদি, কাপড় গোছাবার সময় জিনিষটা চুরী যায়নি ত?"

কুন্দেরও সেই সম্ভাবনা মনে উদিত হইয়াছিল। কিন্তু গোপন রহস্যজালে জড়িত হইয়া এ কথা প্রকাশ করিতেও তাহার সাহস হইতেছিল না। রাজকুমারীর উত্তরে সে একটু থতমত খাইয়া থামিয়া থামিয়া কহিল,—"আশ্চর্য্য কি, হ'তেও পারে।"

রাজকুমারী কহিলেন,—"আচ্ছা, আপনি যখন বাক্স গোছাচ্ছিলেন, সেখানে তখন আর কে কে ছিল —বলুন ত?"

কুন্দ শুষ্ককণ্ঠে উত্তর করিল,—"শশী দাসী ত ছিলই, আর—আর,—হ্যা—হ্যা, নতুন ঝিও ছিল।"

"নতুন ঝি কে? জগর মা?"

"হ্যা হ্যা সেই,—আর কেউ ছিল ব'লে ত মনে পড়ছে না।"

"শশী আর জগর মা? শশী ত খুবই বিশ্বাসী দাসী, একটি পিন্‌ও মাটীতে কুড়িয়ে পেলে সে তুলে রাখে। জগর মা একটু ন্যাকা ধরণের লোক বটে,— তবে চোর ব'লে ত তা'কে মনে হয় না। তবু একবার তাকে ডাক্‌তে বলুন ত।"

নতুন ঝি আসিয়া রাজকুমারীকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া কহিল,—"ডাক্‌তেছেন? কেন গো মা,— মুই পাশের ঘরে কাজ কর্‌তে নেগেছিনু,—সইমা যেতে বল্লে,—তাই চ'লে গেছনু।"

সে কথা কহিলেই রাজকুমারী হাসেন। আজ এখন হাসিটা চাপিয়া গম্ভীরভাবে কহিলেন,— "কল্‌কাতায় আসবার সময় এই বাক্সের মধ্যে এক-গাছি মতির মালা তোলা হয়েছিল, মনে আছে ত?"

"মতির মালা! সে কি হেন দেব্যি? কই, মুই ত, মা চক্ষেও দেহি নি!"

কুন্দ বলিয়া উঠিল,—মিথ্যাবাদী মাগী, দেখিস্ নি বলছিস্? আমার হাতের দিকে ভাল ক'রে চেয়ে দেখ্। এই জিনিষটা তুই-ই ট্রাঙ্কে পুরেছিলি, —শশী তখন অন্য কি কাজে বাহিরে গিয়েছিল, তুই তখন একলা আমার কাছে ছিলি।"

কুন্দ হাতের মখমল কেস্‌টি তাহাকে দেখাইল।

জগর মা বলিল,—এই অপূর্ব্ব দেব্যি! এটিরে সেদিনে দেহেছি ত। এনারেই আপনারা কও মতির মালা?"

কুন্দ রাগিয়া বলিল,—"ন্যাকামি দেখ, নিশ্চয়ই তবে তুই নিয়েছিস্।"

রাজকুমারী আর হাস্যসংবরণ করিতে পারিলেন না, উচ্চহাস্যে কহিলেন,—"না 'ওনাট্টা' মতির মালা নয়,—ওরই মধ্যে দ্রব্যি'টা ছিল।"

"মুই সে সব জানিলাম না বাপু—মুইকার জিনিষ-পত্তর যেনুটা যেথায় রইছে—দেহি—লও।"

ক্রন্দন ভাবে নাকিস্বরে সে এই কথা বলিল। আসল কথা—রাজকন্যার হাসিতে তাহার কান্নাটা জমিতেছিল না।

কুন্দ বলিল—"ও সব মায়াকান্না রাখ, কারে

মালাছড়া দিয়েছিস্, কবুল কর্। নইলে পুলিসের গুঁতোতে এখনি চেতনা জন্মাবে।"

জগর মা এইবার সত্য সচীৎকারে কাঁদিয়া কহিল,—"ওরে বাপু রে—পুলিসের মার। জান্ যে গেলক রে? পসনারে যহন ডাণ্ডার ঘা দিইল—সে যে জমীন্‌কে পড়িলো, আর ত উঠলক না হায় হায়! কি মার্ রে? মুই ত সে দ্রব্য চক্ষে দেখি নি, মা,—হেই মা,—পায়েরে রাখ মা,—তুই জগদম্বে।"

রাজকুমারী এবার গম্ভীরভাবেই বলিলেন,—"আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, মারধোর কিচ্ছু হবে না, তুমি সত্যি কথাটা বল। মতির মালার আর দাম কি? তুমি যদি বল সেটা কাকে দিয়েছ—তোমাকে একশ টাকা বক্‌সিস্ দেব—আর সোনার হার গড়িয়ে দেব।"

"তোমার পায়ে ধরি, কইছি, মা, মুই কিচ্ছু জানতাম না, মুই কিচ্ছুতে হাত লাগাইনি; ওনারা পুর্‌তেছিল—আমি দেখতে নেগেছিনুক।"

রাজকুমারী কহিলেন,—"ওনারা কে?"

উত্তর হইল—"তা মুই বল্‌তে নারিক,—এই সই-মা,—শশী ঠাকরুণ,—আর—আর"

"আরও কেউ ছিল না কি?"

"হ্যা গো মা, ছ্যালো বই কি, একটা পুরুষ মানুষও ছ্যালো। শশী যহন গেলক, তহন সেনাডা আসিই ত সব ভর্ত্তি কর্‌লে।"

এই কথাটাই এতক্ষণ কুন্দ চাপিয়া গিয়াছিল। সেই পুরুষমানুষ আর কেহ নহে, তাহার আত্মীয় সন্তোষকুমার। গুরুদেবের কি সংবাদ লইয়া সে তখন কুন্দের সহিত দেখা করিতে আসিয়া উপযাচকরূপে কুন্দকে বাক্স সাজাইবার সহায়তা করে।

রাজকুমারী আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন,—পুরুষ-মানুষ ত কেউ ভিতরে আসে না। পণ্ডিত মশায় এসেছিলেন না কি, কুন্দদি!"

কুন্দর গলা শুকাইয়া গেল—মাথা খারাপ হইয়া গেল কি বলিবে, কি ঢাকিবে, ভাবিবারও যেন শক্তি রহিল না। অস্পষ্ট গুঞ্জনে সে কহিল,—পুরুষ-মানুষ! কই আসেনি ত কেউ! ওঃ—"

কুন্দ সহসা অব্যাহতি লাভ করিল,—দ্বারদেশ হইতে এক জন দাসী নেপথ্যে খবর দিল—"ডাক্তার বাবু আস্‌ছেন।"

রাজকুমারী বলিলেন,—"এখানেই আস্‌তে বল তাঁকে।"

তাঁহার আদেশবাক্যধ্বনি বাতাসে মিলাইতে না মিলাইতে শরৎকুমার আসিয়া হাজির হইলেন। নমস্কারপূর্ব্বক কহিলেন,—"আপনার কি কোন গহনা হারিয়েছে, রাজকুমারি?"

রাজকুমারী হাসিয়া বলিলেন, "হারিয়েছে, আপনি কি চুরী করেছেন না কি?"

"অসম্ভব কি? দেখুন দেখি—এই মতির মালা আপনার কি না?"

রাজকুমারী বিস্ময়-প্রফুল্ল স্বরে উত্তর করিলেন,—"সত্যিই ত! এ যে আমারই হারান মালা? কোথায় পেলেন আপনি, বলুন।"

"এক জিন এসে আমাকে দিয়ে গেল।"

"না না, বলুন না,—ডাক্তারদা—বড্ড কৌতূহল হচ্ছে।"

"সত্যি বল্‌ছি,—ভেল্কি বাজিতে পেয়েছি।"

জগর মা এই সময় ডাক্তারের কাছাকাছি আসিয়া মালাগাছা দেখিয়া ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—"এই দেহ, মা—যা কইনু তা সত্যি কি না।" বলিয়া চোখ মুছিয়া স্বাভাবিক স্বরে ডাক্তারকে সম্বোধন করিয়া কহিল—"মশাই গো—দেহেন, বিচার করেন,—আপুনি কর্‌লে চুরী—আর এনারা মুইরে কইছে চোর—কি মারটাই মারছিলক গো!" জগর মা সম্ভাবিত পুলিসের মার অঙ্গে অনুভব করিয়া পুনরায় নাকিসুরে উঁহু উঁহু করিয়া উঠিল।

কুন্দ রাগিয়া কহিল,—"আহা,আহা, ম'রে যাই, বড্ড লেগেছে; এসো—এসো—পিঠে হাত বুলিয়ে দিই।"

রাজকুমারী ও শরৎকুমার হাসিতে লাগিলেন। এইরূপ অপ্রত্যাশিত রহস্য-সহানুভূতিলাভে সহজেই জগর মা'র কান্না থামিয়া গেল। সে প্রশান্তভাবে কহিল—"হাস্‌তেছেন—আপুনকারা—তা হাসর বার্ত্তা কি এনাটা—কউন ত মশাই? দেহুন বাবু—মুই পই পই করিক কইনু—পুরুষ মানুষ লইছেক—কেউ পিত্যয় গেলক না,—কইলেক—মার দিবে পুলিস আনি। এহন আপুনি খুলি কও সব কথা।"

রাজকুমারী সহাস্যে কহিলেন, "এঁকেই তুমি কাপড় গোছাতে দেখেছিলে বুঝি জগর মা?"

"পিত্যয় কর মা—এই দু' চক্ষে দেহেছি। হ্যাঁ গো—মালা-চোর কথা কও না ক্যান্? রঙ্গ দেহ! পরায়ে দেবার গো বুঝি ইচ্ছা! তা দাও গো—পরায়েক দাও।"

শরৎকুমার যে রাজকুমারীর বাগ্‌দত্ত বর—এ খবর রাজ্যের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই জানে; জানেন না কেবল তাঁহারা দুই জনে।

দাসীর এই বাক্যে উভয়েই সলজ্জ অনুরাগে পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রাজকুমারী বিগত পূর্ব্বাহ্নে যখন সখীদিগের সহিত রহস্যালাপে রত ছিলেন, সেই সময় রাজ-পরামর্শ-গৃহে গুপ্ত বিচারসভা বসিয়াছিল। রাজার অনুপস্থিতিকালে প্রসাদপুরের হাতিয়ারশালা হইতে অস্ত্র-শস্ত্র চুরী গিয়াছে, অস্ত্রশালার অধ্যক্ষাদি সহ দেওয়ান কুঞ্জবাবু এই সংবাদ লইয়া আজ প্রাতঃকালে কলিকাতায় আসিয়াছেন। আপাততঃ বিচারগৃহে রাজার নিকট তিন জন মাত্র উপস্থিত ছিলেন;—দেওয়ান, অস্ত্রাধ্যক্ষ এবং শ্যামাচরণ।

অস্ত্রাধ্যক্ষ কৃষ্ণনাথ বাবুর উদ্দেশে রাজা অতুলেশ্বর কহিলেন, "চোরাই অস্ত্রের যে তালিকা দেখছি, সংখ্যা ত এর নিতান্ত কম নয়। এক দিনে যদি এত হাতিয়ার চুরী গিয়ে থাকে ত ডাকাতী হয়েছে বলুন।"

উত্তর হইল—"না ধর্ম্মাবতার, এক দিনে নয়, ক্রমশঃ অল্পে অল্পে চুরী গিয়েছে, সেই জন্য গোড়া-তেই এ ব্যাপারটা আমরা ধর্‌তে পারি নি।"

"কিন্তু আপনার প্রধান কর্ত্তব্যই ত 'ওয়াকিবহাল' থাকা। একখানা অস্ত্রের স্থান শূন্য হ'লেই ত এক জন হুঁসিয়ার অধ্যক্ষের সেটা নজরে পড়া উচিত।"

দেওয়ান এবং শ্যামাচরণ উভয়েই অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে নীরবে এই বাক্যের অনুমোদন করিলেন। কৃষ্ণনাথও বুঝিলেন, এই অভিযোগবাক্য তাঁহার প্রতি অযথা আরোপিত হয় নাই।

রাজা পুনরায় কহিলেন, "আমি কল্‌কাতায় আসা পর্য্যন্ত সম্ভবতঃ এই চুরী চলেছে। আর আপনারা টের পেলেন কবে?"

দেওয়ান বলিলেন, "বিগত পরশু প্রাতঃকালে আমি নৌগ্রাম তদারক থেকে প্রসাদপুরে ফিরে এসে খবর পাই।"

কৃষ্ণনাথ কহিলেন, "আমরা জেনেছি, তার পূর্ব্বরাত্রে, যে রাত্রে খ্যাতনামা সনাতন ধনুক দেওয়াল থেকে নীচে প'ড়ে যায়।"

রাজা দেওয়ালে আলম্বিত ধনুর্দ্ধারী সনাতন রায় চৌধুরীর প্রতিকৃতির দিকে সচিন্তনয়নে চাহিয়া আপন মনেই যেন কহিলেন—"বন্দুক, তলোয়ার প্রভৃতি চুরীর অর্থ বুঝা যায়, কিন্তু অত বড় ধনুকটা সরাবার উদ্দেশ্য কি হ'তে পারে?"

শ্যামাচরণ এতক্ষণ নীরব ঔৎসুক্যে ইঁহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলেন, রাজার এই প্রশ্নে তিনিও অনেকটা স্বগতভাবেই মৃদুস্বরে কহিলেন, "এতেই ত এ মামলা বেশী জটিল হয়ে উঠেছে।"

দেওয়ান বলিলেন, "হরিরাম যা—বল্লে—তাতে—"

রাজা দেওয়ানকে নিরস্ত করিয়া কহিলেন, "হরিরামের কথা—তার পালায়, তার মুখেই শোনা যাবে! আপনার কি মনে হয়, কৃষ্ণনাথ বাবু?"

রাজা বিচারাসন গ্রহণ করিয়াছিলেন জাজিম আস্তরণ-বিস্তৃত এজলাস-গৃহে। তাঁহার দক্ষিণে বামে শ্যামাচরণ ও দেওয়ান, আর সম্মুখভাগে উপবিষ্ট ছিলেন অস্ত্রাধ্যক্ষ,—ইঁহার উপরেই বিচারকের অন্তর্ভেদী দৃষ্টির তেজ পূর্ণমাত্রায় নিপতিত হইতেছিল। সময়ে সময়ে তাহা অসহ্য বোধ করিয়া কৃষ্ণনাথ দৃষ্টি অবনত করিতেছিলেন। রাজার প্রশ্নে অস্ত্রাধ্যক্ষ একবার ঢোক গিলিয়া অবনতমুখে উত্তর করিলেন, "আমার মনে হয়, ধনুক হরণ চোরের উদ্দেশ্য ছিল না, সম্ভবতঃ অন্য অস্ত্র গ্রহণকালে ধাক্কা লেগে ধনুকটা নীচে প'ড়ে গিয়েছিল।"

এ অনুমান রাজার মনে লাগিল না, কিন্তু সংক্ষেপ "হুঁ" শব্দে তাঁহার মনোগত মন্তব্য শ্রোতৃবর্গের অনুমানগ্রাহ্য রাখিয়া তিনি পুনরায় জেরা আরম্ভ করিলেন, "আপনার জবানবন্দী থেকে এইটুকু বেশ বুঝা যাচ্ছে যে, হাতিয়ারশালা যে ক্রমেই শূন্য হয়ে পড়্‌ছে, ধনুক নীচে পড়ার পূর্ব্বসময় পর্য্যন্ত আপনারা তা' ধর্‌তেই পারেন নি। আচ্ছা, আমি কলকাতায় এলে পর অস্ত্রশালায় পাহারা দেওয়া কি বন্ধ হয়ে পড়েছিল?"

উত্তর হইল—"আজ্ঞে না, পাহারার কোন দিন কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নি।"

"তা হ'লে চোরেরা দেখ্‌ছি সম্মোহনবিদ্যা-পটু! যে সব হাতিয়ার চুরী গেছে তার মধ্যে তলোয়ার, বন্দুকও ত নিতান্ত কম নয়; প্রহরীদের চোকে ধুলো দিয়ে সেগুলো অনায়াসে বার ক'রে নিয়ে যাওয়াও ত কম বাহাদুরীর কাজ নয়!"

"আজ্ঞে ধর্ম্মাবতার, সদর দরজা দিয়ে চুরী হয় নি। লাইব্রেরীঘর ও হাতিয়ারশালার মধ্যে যে দরজা আছে, সেখান দিয়েই চোর যাতায়াত করেছে, আর অস্ত্র নামিয়ে দিয়েছে পিছনের জানালা দিয়ে—বাঁশবাগানের জঙ্গলে।"

"কিন্তু লাইব্রেরীর পথে অস্ত্রশালায় প্রবেশাধিকার ত নিষিদ্ধ। বিশেষ কারণ ছাড়া সে দরজা ত সচরাচর বন্ধ থাকারই কথা। আজকাল কি সেটা খোলা থাকে?"

অস্ত্রাধ্যক্ষ জড়সড় হইয়া কহিলেন, "খোলা থাকে না—তবে ছেলেরা লাইব্রেরীঘরে এসে যদি কেউ অস্ত্রশালা দেখতে চায় ত খোলা হয়ে থাকে। এটা ত আদেশবিরুদ্ধ না।"

"কিন্তু চৌরকার্য্যে অবসর প্রদান করা ত সে আদেশের গূঢ় তাৎপর্য্য নয়। ছেলেরা পাঠাগারে পড়তে এলেও তাদের উপর অলক্ষ্যে পাহারা দেওয়ার জন্য আপনার অধীনে একাধিক সহকারী নিযুক্ত আছেন। তাঁরা কি কেউ কর্ত্তব্যপালন করেন না? ছেলেরা কেহ পাঠাগারে এলে বা অস্ত্রাগার দেখতে চাইলে তাঁরা কি সঙ্গে উপস্থিত থাকেন না?"

অধ্যক্ষ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে উত্তর করিলেন—"থাকেন বই কি—থাক্‌বারি ত কথা—তবে কোনো সময় যদি কেহ কর্ত্তব্যভঙ্গ ক'রে থাকেন—তা ত বল্‌তে পারি নে; ভদ্রনামধারী ছেলেদের সব সময় ত অবিশ্বাস করা যায় না!"

"কিন্তু নিয়মপালন ও অবিশ্বাস করা এক কথা নয়। আপনার প্রধান সহকারী কে?

"সন্তোষকুমার চক্রবর্ত্তী।"

"বিশ্বাসী লোক?

"খুবই বিশ্বাসী কেবল বিশ্বাসী নন, তিনি কর্ম্মপটু এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ। তিনিই ত সর্ব্বাগ্রে প্রাণের মায়ামমতা ত্যাগ ক'রে চোর ধর্‌তে যান।"

অস্ত্রাধ্যক্ষ এইবার রাজার মুখের দিকে চাহিয়া বেশ সোৎসাহে এই কথাগুলি বলিলেন। রাজা প্রশ্ন করিলেন—"চোর ধরা পড়েছে?"

"না, ধর্ম্মাবতার। সন্তোষকে পিস্তলের গুলীতে জখম ক'রে সে চ'লে যায়।"

"সন্তোষ ছাড়া আর কেহই কি তখন চোরের কাছে এগোতে সাহস করে নি? প্রসাদপুর তা হ'লে ত দেখছি এত দিন ধ'রে কাপুরুষের দলই পোষণ করছে।"

অস্ত্রাধ্যক্ষ পুনরায় অবনতমুখে দুই হাতের আঙুলগুলা একত্র সংলগ্নপূর্ব্বক মোচড়াইতে আরম্ভ করিয়া বলিলেন, "আজ্ঞে না তা বল্‌ছি নে, ধর্ম্মাবতার; বন্দুকের শব্দ পেয়েই আর সকলে অস্ত্রশালায় ঢুকেছিল, চোর কিন্তু তখন লাইব্রেরীঘরে এসে পালাবার চেষ্টা কর্‌ছিল—সন্তোষ প্রথমে এই ঘরে এসে তাকে ধর্‌তে গিয়ে নিজে জখম হয়ে পড়ে। তা'র পর গুলীর শব্দে অন্য লোক সেখানে গিয়ে আর তা'র দেখা পায় নি।"

"সন্তোষের আঘাত কি সাংঘাতিক?"

"তা ত বোঝা যায় নি। হাসপাতালে সে রকম বিজ্ঞ ডাক্তার ত এখন কেহ নেই, যে তা তিনি ঠিক বুঝতে পারেন। তবে রোগীকে অচেতন অবস্থাতেই দেখে এসেছি। ডাক্তার শরৎ বাবু যদি তা'কে চিকিৎসা করেন, তা হ'লে বোধ হয় এ যাত্রা সে রক্ষা পেলেও পেতে পারে।"

"আচ্ছা, সে ব্যবস্থা আমি করব।" অতঃপর দেওয়ানের দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন,—"কোতোয়ালীতে কি এ সংবাদ দেওয়া হয়েছে?"

এই প্রশ্ন হইতে পাঠক বুঝিতেছেন, প্রসাদপুরে কোতোয়ালী নামধেয় একটা কার্য্যবিভাগ এখনও বর্ত্তমান। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মুসলমান আমলের ভূতপূর্ব্ব করদ রাজাদিগের সেই ক্ষমতা-গৌরব-নিলয় বর্ত্তমানে অনুষ্ঠানঠাটরূপেই বর্ত্তমান। যে স্থলে পূর্ব্বে প্রভূত ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাজ-কোতোয়াল বহু সৈন্যের অধ্যক্ষরূপে সহররক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত থাকিতেন, সেই স্থল এখন সৈন্যনিবাসের পরিবর্ত্তে ক্ষুদ্র একটি আদালতঘর মাত্র। অঙ্গুলিগণ্য শস্ত্রধারী প্রহরীর অধিনায়ক রাজ-কোতোয়ালের অধুনা প্রধান কাজ গোয়েন্দাগিরি—অর্থাৎ প্রসাদপুরের ফৌজদারী ঘটনাবলী ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের হুকুমে পুলিসকে তিনি জানাইতে বাধ্য। তবে কোন্ ঘটনা পুলিসকে জানাইতে হইবে, রাজার তাহা নির্ণয় করিবার অধিকার আছে। সাধারণতঃ ফৌজদারী-সংক্রান্ত সামান্য ঘটনাবলীর বিচার কোতোয়ালী হইতেই নিষ্পন্ন হইয়া যায়। জটিল মোকর্দ্দমাই পুলিসের গোচর করা হয়। নহিলে গভর্ণমেণ্ট রাজাকে দায়ী করিতে পারেন।

রাজার প্রশ্নে দেওয়ান উত্তর করিলেন,—"আজ্ঞে, হাঁ, কোতোয়ালীতে সংবাদ দেওয়া হয়েছে। তবে পুলিসকে সংবাদ দেওয়া হবে কি না—তা আপনার অনুমতিসাপেক্ষ।"

রাজা বলিলেন,—"এ ঘটনাটা পুলিসকে জানান উচিত মনে হয়। কি বলেন, শ্যামাচরণ বাবু?"

শ্যামাচরণ বাবু এতক্ষণ মৌনভাবে বিচার-প্রশ্নোত্তর শুনিয়া যাইতেছিলেন, রাজার জিজ্ঞাসায় উত্তর করিলেন,—"হ্যাঁ উচিত বই কি। তাহা ছাড়া এই চুরীর কথা সংবাদপত্রে প্রকাশ করা উচিত।"

রাজা বলিলেন,—"তা ঠিক, সে ভার আপনার উপরই থাক্।"

এই বলিয়া রাজা পুনরায় অস্ত্রাধ্যক্ষকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—"সন্তোষ ত আহত, অন্য সহকারী কেহ আপনার সহিত এখানে এসেছেন ?"

"এক জন ত রাজা বাহাদুরের সঙ্গে আগেই কলকাতায় আসেন--"

রাজা ধৈর্য্যবিচ্যুতস্বরে কহিলেন,—"সে কথা আমার মনে আছে, কিন্তু আমার ত মনে হয়, দুই জনের অধিক সহকারী রাজ-সরকার থেকে বেতন পেয়ে থাকেন!"

অধ্যক্ষ শুষ্ককণ্ঠে ঢোক গিলিয়া জড়সড়ভাবে উত্তর করিলেন,—"আজ্ঞে হাঁ, তিনি হাজির আছেন —কিন্তু—"

কৃষ্ণনাথের বক্তব্য শেষ না হইতেই রাজা দৃঢ়স্বরে কহিলেন,—"এ সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য কি, আমি শুন্‌তে চাই—তাঁ'কে ডাকা হোক্।"

কৃষ্ণনাথ ইহার পর আর দ্বিতীয় কথা কহিতে সাহস করিলেন না।

অল্পক্ষণের মধ্যেই তৃতীয় সহকারী জহরলাল পাত্র রাজসমীপে আসিয়া অভিবাদনপূর্ব্বক দাঁড়াইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রাজা প্রত্যভিবাদনপূর্ব্বক জহরলাল পাত্রকে কহিলেন,—"এত অস্ত্র চুরী গেল, আর আপনারা কেউ কিছু জানেন না ?"

পাত্র মহাশয় আস্তে আস্তে দুই একবার কাসিয়া গলাটা সাফ্ করিয়া লইয়া অবনতমুখে, ভীতকণ্ঠে কহিলেন,—"ধর্ম্মাবতার, আমি সে সময় ছুটীতে বাড়ী গিয়েছিলাম।"

রাজা অস্ত্রাধ্যক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন,—"কই আমাকে ত সে কথা জানানো হয় নাই ? আপনি ছুটী দিয়েছিলেন ?"

উত্তর হইল, "না, এ রকম ছোট-খাট বিষয়ে সন্তোষই আমার হয়ে কাজ করে।"

"সন্তোষ আপনাকে ছুটী দিয়েছিল ?"

জহরলাল রাজ-প্রশ্নের উত্তরে কহিলেন,—"আজ্ঞে হাঁ।"

"কবে ফির্‌লেন প্রসাদপুরে ?"

"চুরী প্রকাশের পরদিন। ফিরেই কলকাতায় রওয়ানা হয়েছি।"

"তা হ'লে চুরীর বিষয় বিশেষ কিছুই জানেন না আপনি ?"

"না, ধর্ম্মাবতার।"

"তবে আর আপনার এখানে থাকার প্রয়োজন নেই।"

জহরলাল যেন এতক্ষণ গভীর জলের মধ্যে হাবুডুবু খাইতেছিলেন, সহসা মুক্তিলাভ করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুট দিলেন। যাইবার সময় রাজাকে নমস্কার অভিবাদন করিতে পর্য্যন্ত ভুলিয়া গেলেন। রাজাবাহাদুর কণ্ঠাগত হাস্য সবলে দমন করিয়া দেওয়ানকে কহিলেন,—"এইবার হরিরাম সর্দ্দারকে ডাকা হউক।"

হরিরাম আসিয়া তাহার বর্শাসংযুক্ত লাঠি রাজপদতলে রাখিয়া ভূমিষ্ঠ-প্রণামপূর্ব্বক উঠিয়া করযোড়ে দাঁড়াইল।

রাজা কহিলেন,—"হরিরাম, তুমি দেখ্‌ছি খুবই অসমর্থ হয়ে পড়েছ—তোমার চোখের উপর দিয়ে এতগুলা হাতিয়ার চুরী গেল, আর তুমি কি না দেখ্‌তেই পেলে না ?"

হরিরামের চোখ জলে ভরিয়া উঠিল, বাল্য হইতে রাজসরকারের কার্য্যে সে জীবনপাত করিতেছে, কিন্তু এমন দুর্নামভাগী আর কখনও হয় নাই। সে রুদ্ধকণ্ঠে কহিল—"ধর্ম্মাবতার, ভয়ে কব—না নির্ভয়ে কব ?"

রাজা কহিলেন,—"নির্ভয়েই কও।"

করযোড়ে সে উত্তর করিল,- "এ সব রায়-মশায়েরই ষড়যন্ত্র, ধর্ম্মাবতার! আর 'সইকারী' যিনি হইছেন—তিনি তেনার চর।"

"এ রকম তোমার মনে হয় কেন ?"

"যত রাজ্যির চেনা অচেনা 'ছালে' পাঠশালায় ঢোকে, হাতিয়ারশালায় মজলিস্ করে—মুই রোজ দুই চক্ষে দেহেছি। ধর্ম্মাবতার ভাবিলেন, মুই কাণা হইছি —তা হই নাই,—ধর্ম্মবতার! মুই পঁই পঁই এ কথা কয়ে আস্‌ছি—তা কানে নেয় না তেনারা, ধর্ম্মবতার।"

কৃষ্ণনাথ এবার নির্ভীক সবলকণ্ঠে হরিরামের প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন,—"মিথ্যা বল্‌ছে ধর্ম্মাবতার! আমাকে কোন দিন এ কথা জানায় নি।"

হরিরাম কহিল,—"তোমারে না—তানারে—ওগো তানারে - তোমার সইকারীকে জানাইছি! তোমারে কইব কি, কইতে তিনি কি ছ্যালে; না তোমার এক দিন দেখা পাইছি। তুমি ত তেনার হাতে সব সমপ্পণ করি ঘুমতে নেগেছিলে!"

এ সত্য কথার প্রতিবাদ তিনি কি করিবেন,

কৃষ্ণনাথ খুঁজিয়া পাইলেন না। হরিরাম আবার কহিল, "বিচার করেন ধর্ম্মাবতার,—কয় কি না, তানারে কই নি! কর্ত্তার দেহা পালি ত তেনারে কইব,—দরোজা আগল দেওয়া মোর কাজ, মুই দু দণ্ড থাতি যাই—আর দৌড়ি ফিরি,—মুই তেনারে খুঁজি কহন—ধর্ম্মাবতার, বিচার করেন। সইকারীকে ত যহন তহন এ বাক্যি বলছি,—তিনি মোরে খালি ঘুসি উচোচ্ছে—বল্‌তে নেগেছে—'আমার উপর কর্ত্তা হইছ তুমি? যত বড় মুক নয়, তত বড় বাক্যি! কর্ত্তারি বলি—তোমারে দূর করব—তবে আমার নাম সইকারী।' ধর্ম্মাবতার—আপনি নেই—আমার মা জননী নেই; মহারাণী তপ-জপ নিয়া আছেন,—তাঁকে এ সব কথা কওয়া নিষেধ—দাওয়ান বন্দরে গেছেন—কি ক'রে যে দিন কাটাইছি—তা ধর্ম্ম জানেন।"

রাজা হরিরামের দীর্ঘ বক্তৃতায় বাধা না দিয়া নীরবে শুনিতে লাগিলেন। হরিরাম বলিয়া চলিল, —"সইকারী আমারে ঘুসি উচায়ে কি পার পাত? না; ধর্ম্মবতার, মুই অমন দশটা সইকারীকে পাপ্পরে গুঁড়া করি দেতাম; কিন্তু ধর্ম্মাবতার—যে রকম আদেশ দিইছেন—তা ত মানি চলতি হবে। সইকারী মোর কর্ত্তা—তার অঙ্গে হাত তুলি এ আদেশ নেই, মোর বুক ফাটি উঠ্‌ল রাগে—তবু মুই তার বাক্যি স'য়ে গেনু। এখন বিচার করেন, ধর্ম্মাবতার।"

সভা নিস্তব্ধভাব ধারণ করিল—হরিরামের প্রতি বাক্য সত্যের প্রতিমূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া সন্তোষকে দোষী প্রমাণ করিয়া দিল। রাজা কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, —"তোমার আর কিছু বলার আছে?"

হরিরাম বলিল,—"আছে ধর্ম্মাবতার,—শেষ বাক্যি কই নাই এখুনো। যখন দেয়ালের ধনুক নীচে পড়িলো—তহন মুই হাতিয়ারশালার দরোজা ভিড়াতে নেগেছি—তহনো তালা-চাবি পড়ে নি,—ছালিয়া যানারা পাঠশালায় ছিল, তানারা সব সেই চলি গেল। কি ভীষণ আওয়াজ সে,—মোর দে কাপি উঠিলো; ধনুক-ঘরে আসি দেহি, কেউ কোথাও নেই; পাঠশালার দরোজা খোলা; সেহানে ঢুকি দেহি—সইকারী অচেতন পড়ি আছে, আর গোঁ গোঁ করতি নেগেছে—তহনি আর সব্বাই আইল, ধরাধরি করি তানারে নিল হাসপাতাল—আর কর্ত্তাবাবুরে খবর দেল।"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"শুন্‌ছি সহকারী চোর ধরতে গিয়ে গুলীর আঘাতে জখম হন; এ বিষয়ে তুমি কি জান?"

হরিরাম বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল,—"সইকারী চোর ধরতি গিয়া জখম হইলো? কেনারা বলে? চোর আর কোন্‌টাই নয় ধর্ম্মাবতার; তেনাই চোর! ধনুক ধরা সোজা কি না; তার মধ্যে সনাতন চৌধুরী রায়-বংশের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করি থুইছে—তাতি হাত দিয়া উনি পার পাবে? ধনুক দেব্‌তা ওনার ওই দশা করিলো।"

রাজা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি গুলী করার শব্দ শোন নি?"

"না, ধর্ম্মাবতার—সে ভীষণ আওয়াজ শোনে-লাম; পিস্তলের আওয়াজ নয়।"

"তুমি বল্‌ছ—ধনুক পড়ার শব্দের কথা, কিন্তু তার পরে অন্য শব্দ পাও নি?"

"না ধর্ম্মাবতার!"

রাজা তখন কৃষ্ণনাথকে প্রশ্ন করিলেন,—"আপনি বলছেন, গুলীর শব্দ শুনে এরা লাইব্রেরী-ঘরে যায়, হরিরাম ত তা বলে না।"

কৃষ্ণনাথ বলিলেন,—"হরিরাম ধনুক দেখ্‌তেই ব্যস্ত ছিল, অন্যেরা শুনেছে।"

"যে শুনেছে, সে উপস্থিত আছে?"

"আজ্ঞে, আছে।"

রাজা তখন হরিরামকে বলিলেন,—"তুমি এখন যেতে পার।"

"যে আজ্ঞা ধর্ম্মাবতার" বলিয়া সে ভূমিষ্ঠ প্রণাম-পূর্ব্বক তাহার বর্শাযষ্টি হস্তে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—"ধর্ম্মাবতার, এরা মিথ্যা কইছে। সেই চোর, চোর আর কোনোটা নয়—আপুনি বিচার করেন।" বলিয়া ক্ষুণ্ণভাবে চলিয়া গেল।

অতঃপর অন্য প্রহরী দুই জন আসিয়া সাক্ষ্য দিল যে, পিস্তলের আওয়াজ শুনিয়াই তাহারা লাইব্রেরী-ঘরে যায় এবং সেখানে গিয়া সন্তোষকে অচেতনা-বস্থায় দেখিতে পায়।

সাক্ষ্যগ্রহণের পর তাহাদিগকে বিদায়দানপূর্ব্বক রাজা অস্ত্রাধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সন্তোষের শরীরে কোন্‌খানে গুলী লেগেছে?"

বিপদে পড়িলেই কৃষ্ণনাথের আঙুল মোচ্‌ড়ানি পায়, তিনি আঙুল মোচড়াইতে সুরু করিয়া কহি-লেন,—"আজ্ঞে, ধর্ম্মাবতার, সে খবরটা আমি ঠিক জানিনে, মনে হচ্ছে বুকের পাশে।"

"গুলী বার করা হয়েছে কি না, তা জানেন?"

"আজ্ঞে না, সে খবরটাও ঠিক দিতে পারছিনে। রাত্রে তা'কে আর দেখি নি, পরদিন ভোরবেলাতেই কি না এখানে রওয়ানা হয়েছি।"

"বেঁচে আছে কি মরেছে—সে খবরটা জানেন?"

রাজা বেশ একটু তীব্রস্বরে এই প্রশ্ন করিলেন। ইহার উত্তরে দেওয়ান কহিলেন,—"আজ্ঞে 'তার' পেয়েছি, সন্তোষ বেঁচেই আছে। আর আশা করি, শরৎবাবু গেলে তাকে শীঘ্রই সারিয়ে তুলতে পারবেন।"

রাজা কহিলেন,—"সন্তোষই এ বিচারে প্রধান সাক্ষী। তার জবানবন্দী পেলে সহজেই এ বিচার নিষ্পত্তি হ'তে পারত। আপাততঃ আমি প্রসাদপুর যাওয়া পর্য্যন্ত বিচার মুলতুবী থাক। আপনারা আজই সেখানে চ'লে যান, গিয়ে বেশ ভাল ক'রে তদন্ত করুন; এমন কি, সন্তোষ মারা গেলেও যেন সেই তদন্ত-ফলে সত্যাসত্য নির্ণয়ের সুবিধা পাওয়া যায়।"

দেওয়ানের প্রতি এই অনুজ্ঞা করিয়া রাজা কৃষ্ণনাথকে কহিলেন,—"পুনর্বিচার পর্য্যন্ত আপনি suspend হলেন। কৃষ্ণবাবু, আপনি হাতিয়ার-শালার দ্বিতীয় সহকারী তারানাথকে আপাততঃ এই কার্য্যে নিযুক্ত করবেন।"

এই বলিয়া রাজা বিচারাসন হইতে উঠিয়া পড়িলেন। অন্যান্য সকলেই তাঁহার দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলেন। কৃষ্ণনাথ উঠিয়া করযোড়ে কহিলেন,—"আমি ত জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ কোন দোষই করি নাই, ধর্ম্মাবতার!"

রাজা কহিলেন,—"জ্ঞানতঃ না করুন, অজ্ঞানতঃ আপনি পূর্ণমাত্রায় অপরাধী। নিজের গুরু দায়িত্ব-ভার সন্তোষের উপর ফেলে রেখে আপনি যদি নিশ্চিন্ত না থাকতেন, তা হ'লে আমার ত মনে হয়, এ চুরী ঘটতেই পারত না। এরূপ কর্ত্তব্য-অবহেলা কি অপরাধগণ্য নয়?"

কৃষ্ণনাথ কাতরকণ্ঠে বলিলেন,—"এবারকার মতন মার্জ্জনা করুন, ধর্ম্মাবতার!"

রাজা কহিলেন,—"সত্য কথা বলতে কি, আপনাকে গুরু দায়িত্বপূর্ণ কাজে রাখতে আর আমার সাহস হয় না। যা হউক, এখনও ত বিচার নিষ্পত্তি হয় নাই। যথাসময়ে এ বিষয়ে আমি ভেবে দেখব। আপনি যদি দোষমুক্ত হন, আপনার উপর পুনরায় যদি সম্পূর্ণ বিশ্বাসস্থাপন করতে পারি, তা হ'লে এ কাজ না হোক, অন্য কাজও আপনি পেতে পারবেন।"

অটল রাজ-মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া ইহার পর কৃষ্ণনাথের আর বাক্য নিঃসারিত হইল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সভাভঙ্গের পর রাজা অতুলেশ্বর পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে প্রবেশ করিয়া বিচারালয়ের মোগলাই-সাজ ত্যাগ করিলেন। এ সম্বন্ধে প্রসাদপুরের পুরাতন রাজকীয় প্রথাই তিনি মানিয়া চলিতেন। পরে তিনি বাঙ্গালীবেশ ধারণ করিয়া শ্যামাচরণের সহিত বৈঠকখানার দক্ষিণ বারান্দায় আসিয়া বসিলেন।

সম্মুখে সবুজ ঘাসের প্রশস্ত ময়দান,—তাহার পশ্চিম প্রান্তে বিলুণ্ঠিত বৃহৎ দীর্ঘিকার আংশিক জলখণ্ড তটভূমিস্থিত বিশাল রবার-বটের ছায়া বক্ষে ধারণ করিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। ময়দানের ধারে ধারে শীত ঋতুর বিচিত্রবর্ণ পুষ্পশোভা, স্থানে স্থানে কৃত্রিম জলপ্রপাত, মধ্যস্থিত ফোয়ারার দুই পার্শ্বে দুইটি মূল্যবান্ প্রস্তরমূর্ত্তি, হ্রদবাসী কিন্নর-কিন্নরী যেন কৌতূহলাক্রান্তভাবে উপরে উঠিয়া সহসা প্রস্তরমূর্ত্তিতে পরিণত হইয়াছে। ভিনাস-মূর্ত্তির মাথার উপর একটি খঞ্জন পাখী বসিয়া নৃত্য আরম্ভ করিল। রাজা দেখিয়া কহিলেন,—"নৃত্যশীল এই চঞ্চল পাখীটি পাতরকেও যেন প্রাণান্ত ক'রে তুলেছে!"

শ্যামাচরণবাবু কবি নহেন, রাজার দৃষ্টিতে এ দৃশ্যের মাহাত্ম্য দেখিতে অক্ষম হইয়া তিনি কহিলেন,—"খঞ্জনটি না নেচে যদি স্থির থাকত, তা হ'লে ওকে প্রস্তরমূর্ত্তিরই অঙ্গভুক্ত ব'লে মনে করা যেতে পারত।"

রাজা ঐ কথায় মনোনিবেশ না করিয়া, আরাম-চৌকির হেলানে আরামে মাথা রাখিয়াই, পূর্ব্ববৎ ভাববিভোরভাবে কহিলেন,—"আচ্ছা বলুন ত গাঙ্গুলি মশায়, আপনার কি মনে হয়? দেহগঠন সুন্দর ব'লেই কি আমরা এই মূর্ত্তিটিকে এত সুন্দর দেখি?"

শ্যামাচরণ সম্প্রতি গোঁফ জোড়া কামাইয়া ফেলিয়াছেন, তাহাতে চাড়া দিয়া বুদ্ধি শাণাইয়া লইবার আর উপায় নাই, মাথা চুলকাইয়া উত্তর করিলেন,—"তাই ত মনে হয়।"

ইতিমধ্যে খঞ্জন পাখীটি উড়িয়া গেল, রাজার দৃষ্টি তদনুসরণে একবার নীলাকাশে উত্থিত হইল। তাহার পর আবার ভিনাস-মূর্ত্তির দিকে নয়নপাত করিয়া শ্যামাচরণের মন্তব্যের প্রতিবাদস্বরূপ তিনি কহিলেন,—"আমার কিন্তু তা' মনে হয় না। আচ্ছা, দেখুন ত গাঙ্গুলি-মশায়, কোমলতা, প্রীতি, করুণা প্রভৃতি রমণী-হৃদয়ের রমণীয় ভাবগুলি ঐ প্রস্তরমূর্ত্তির সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে বেয়ে পড়ছে কি না?

কারিকর দেহসৌন্দর্য্যগঠনের সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রগুপ্তি দ্বারা যদি ওর মধ্যে ভাবেরও প্রাণপ্রতিষ্ঠা না কর্‌তেন, তা হ'লে কি মূর্ত্তিটি এত সুন্দর হ'ত? ওর দিকে একটুখানি চেয়ে থাকুন দেখি, একটি পরিপূর্ণ আনন্দতৃপ্তিতে আপনার মন ভ'রে উঠবে।"

শ্যামাচরণের মত অরসিক বৈষয়িক লোকও রাজার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ভাবুক-জনের মতই কহিলেন,—"তা ঠিক! এত দিনে কিন্তু এ ভাবে মূর্ত্তিটি কখনো দেখি নি!"

রাজা একটু হাসিলেন, তাহাতে তুষ্টির লক্ষণ প্রকাশিত হইল। তাহার পর চৌকির ঠেশ হইতে মাথা উঠাইয়া, দুই ইজি-চেয়ারের মধ্যবর্ত্তী টেবিলে সংরক্ষিত স-দেশলাই-পান-চুরুটের সরঞ্জাম নীরব ধন্যবাদস্বরূপই যেন তাঁহার হাতের নিকট সরাইয়া দিলেন। আতিথ্যের ত্রুটী হইতেছে—সম্ভবতঃ এই কথাটা এতক্ষণে তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। শ্যামাচরণের মনে কিন্তু পান-তামাকুর অভাব এ পর্য্যন্ত জাগিয়া উঠে নাই। গদি-মোড়া ইজি চেয়ারের হেলানে বসিয়া মখমল-বালিসের পা-দানীতে পদ-রক্ষাপূর্ব্বক আলোয়ান আবরণের উত্তাপ উপভোগ করিতে করিতে এমনই মোহমুগ্ধভাবেই তিনি রাজার গল্প শুনিয়া যাইতেছিলেন। হত্যাগন্ধদূষিত রাক্ষস-পুরী পার হইয়া এ যেন তাঁহারা পরীরাজ্যের দিকেই উধাও উড়িয়া চলিয়াছেন। কিছু পূর্ব্বে তিনি রাজার কঠোর বিচারকমূর্ত্তি দেখিয়াছেন; এখন তিনি ভাবুক কবি। সাধারণতঃ বৈষয়িক কাযকর্ম্ম উপলক্ষেই তাঁহাদের দেখা শুনা হয়, আজ যেন ছদ্মবেশী রাজার প্রকৃত রূপ সহসা নয়নে ধরা দিয়াছে। ঐ সৌভাগ্য ক্ষণকাল তাঁহাকে এমন ইন্দ্রিয়াতীত ভাবে অভিভূত করিয়া তুলিয়াছিল যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন অভাব-বিস্মৃতিই তখন আর তাঁহার মনের দ্বারে পৌছিতে পারে নাই। রাজহস্ত তামাকুপাত্র তাঁহার দিকে অগ্রসর করিয়া দিবা মাত্র তিনি যেন আবার বাস্তব-জগতে নামিয়া আসিলেন। তাঁহার ধূমপানলালসাও সঙ্গে সঙ্গে প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি সাগ্রহে রাজাতিথ্য গ্রহণ করিবার পর রাজাও প্রসাদস্বরূপ একটি সিগারেট মাত্র হাতে তুলিয়া লইলেন। তিনি অসময়ে তাম্বূল চর্ব্বণ করিতেন না। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলে, অচিরাৎ সিগারেটের মুখ হইতে ধূমায়িত বাষ্প এবং তাঁহাদের মুখ হইতে কুণ্ডলাকৃতি ধূম নির্গত হইতে লাগিল। ধূমপান করিতে করিতে রাজা এইবার হার্কিউলিস মূর্ত্তিটির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা, এই যে বীর অবতার হার্কিউলিস, এ মূর্ত্তিটি দেখে আপনার কি মনে হয়, বলুন ত, গাঙ্গুলি-মশায়?"

শ্যামাচরণ এই প্রশ্নসঙ্কটে পড়িয়া কিয়ৎকাল সঙ্কটহারী সিগারেটের ধ্যাননিমগ্ন হইয়া রহিলেন। পরে রাজপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার আশা মনে না রাখিয়াই আর একটি পান মুখে পুরিয়া দিলেন। তাহার পর চর্ব্বিত তাম্বূল ধূম-প্রেমে মজাইয়া উপ-ভোগ করিতে করিতে বেশ নিশ্চিন্তভাবেই উত্তর করিলেন,—"বীর অবতার ব'লেই মনে হয়।"

রাজা সহাস্যে কহিলেন,—"কিন্তু এই বীর অব-তারকে দেখে কি আপনি খুব একটা আনন্দ-মোহে মুগ্ধ হন? আপনার মাথা কি সম্মানভরে ওর পায়ের দিকে নুয়ে পড়্‌তে চায়?"

শ্যামাচরণ সিগারেটের ছাই-সুদ্ধ ছাইদানীতে ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে এবার নতমুখেই বলিলেন,—"আমি ত রাজা বাহাদুর, কবি নই। কোনো মূর্ত্তি দেখ্‌লেই মোহমুগ্ধভাবে তা'কে পূজা কর্‌তে আমার ইচ্ছা হয় না।"

রাজা নিজের মুখোদ্গীর্ণ ধূমপুঞ্জের গতি লক্ষ্য করিতে করিতে বলিলেন,—"আমিও ত মূর্ত্তিপূজক নই, গাঙ্গুলি-মশায়, আমি শুধু সুন্দর ভাবের ভক্ত। এই কাছাকাছি মূর্ত্তি দু'টি যখন আমি দেখি, আমার মনে যুগপৎ প্রীতি এবং অপ্রীতির সঞ্চার হয়। এই যে বীরমূর্ত্তি, সাধারণতঃ লোকে যে মূর্ত্তির এত ভক্ত, আমি দেখি, এর মধ্যে শুধু পশুবল; অর্থাৎ বাহু-বলের উদ্দাম একটা বিকাশ। আমাদের পশুস্বভাব তা'তে মুগ্ধ হ'তে পারে, কিন্তু মানবস্বভাবে দেবভাব যা' কিছু আছে, সেটুকু এ দৃশ্যে একান্ত কুণ্ঠিত, অপ্রীত হয়ে ওঠে না কি?"

শ্যামাচরণ এক জন 'পজিটিভিষ্ট,' রাজার মুখে কাণ্ট ঋষির পুরাতন উক্তিই নূতন ভাষায় শুনিয়া এক অনির্ব্বচনীয় সুখ-তৃপ্তি লাভ করিলেন। কিন্তু সুখের দিনে দুঃখের স্মৃতিই সর্ব্বাগ্রে মানুষের মনে আসিয়া জমে—তিনি দুঃখিত ম্রিয়মাণ ভাবে মুখের সিগারেট হাতে নামাইয়া ধরিয়া কহিলেন,—"কিন্তু দুঃখ এই,—রাজা বাহাদুর, সংসার যে বাহুবল নইলে চলেই না!"

"আপাততঃ চল্‌ছে না, এটা ঠিক!" উত্তরে এই বলিয়া রাজা বাহাদুর তাঁহার অর্দ্ধভুক্ত সিগারেট ছাইদানীতে রক্ষা করিয়া, আকাশের বর্ণবৈচিত্র্যে ভিনাসচিত্র কিরূপ লীলায়িত রূপ ধারণ করিয়াছে—তাহাই দেখিতে লাগিলেন। প্রকৃতপক্ষে অতুলেশ্বর নেশার জন্য তামুক সেবন করিতেন না,

আতিথ্যরক্ষার জন্যই প্রধানতঃ তিনি অল্পস্বল্প সিগারেট খাইতেন।

শ্যামাচরণ তাঁহার অঙ্গুলি-ধৃত সিগারেট পুনরায় ওষ্ঠাগ্রে লইয়া সঞ্জীবনী দুই এক টানেই তাহাকে দিব্য জ্বলন্তরূপ প্রদান করিয়া, রাজা বাহাদুরের উত্তরে কহিলেন,—"আপাততঃ কেন?—কোন কালেই চলে নি। সুরগণ চিরদিনই অসুর-বলের নিকট হার মেনেছেন; আর দেবভাব ত্যাগ ক'রে অসুরভাব অবলম্বন করেই ছলে বলে কৌশলে শেষে আত্মরক্ষায় সমর্থ হয়েছেন। ধর্ম্ম চিরদিনই, রাজা বাহাদুর, অধর্ম্মের সহায়তা ক'রে আস্‌ছে।"

রাজা দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে বলিলেন,—"বুঝেছি, গাঙ্গুলি মশায়—আপনি যা বল্‌ছেন, তা ঠিক। তবুও সেই দুর্লভ দেবভাবের আকাঙ্ক্ষাতেই মন চঞ্চল, ব্যথিত হয়ে ওঠে। সত্যই কি সংসার চিরদিনই পশুবলের উপরই স্থাপিত থাকবে? এমন এক দিন কি আস্‌বে না—যে দিন ন্যায়, মঙ্গল, সত্যকে আমরা জগতের একচ্ছত্র অধিপতি দেখ্‌তে পাব?"

"আপনার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে জগতেরও আকাঙ্ক্ষা যদি কোন দিন এক হয়, তবে অবশ্যই সে দিন কোন সময়ে আস্‌বে। কিন্তু এখনও ত তার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না—না স্বদেশে, না বিদেশে, কোথাও ত ধর্ম্মের যথার্থ সম্মান দেখ্‌তে পাইনে। এই দেখুন না—আমাদের স্বদেশী ছেলেদেরই কাণ্ডকারখানা! সাধু উদ্দেশ্যকেও অসাধুতার মোচড়ে তারা কিরূপ বিকৃত ক'রে তুলছে।"

রাজা ব্যথিতচিত্তে মৃদু দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন শ্যামাচরণ আবার কহিলেন,—"আমার কি বিশ্বাস জানেন রাজা বাহাদুর? প্রসাদপুরের এই অস্ত্রচুরী—তথাকথিত স্বদেশী ছেলেদেরই কাণ্ড; এবং খুব সম্ভব মাণিকতলাদলের সঙ্গে এদেরও একটা যোগাযোগ আছে।"

বেদনার একটা বিদ্যুৎশিখা রাজার বক্ষ হইতে উঠিয়া মস্তক ভেদ করিয়া চলিয়া গেল। তিনি চৌকি হইতে উঠিয়া বারান্দায় পা-চালি করিতে আরম্ভ করিলেন; দু' একবার পরিক্রমণের পর রেলিংএর নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। বারান্দার ছবির ঘড়িতে সুমধুর বাদ্যযন্ত্র বাজিয়া সময় নির্দ্দেশ করিয়া জানাইল, এখন অপরাহ্ণ তিন ঘটিকা।

গেটের বড় ঘড়িতেও ঢং ঢং ঢং করিয়া সজোরে তিনটা বাজিয়া উঠিল। রাজা দুইটার সময় বিচারকার্য্য শেষ করিয়া আসিয়া এক ঘণ্টাকাল মাত্র এখানে সুখগল্পে সময় অতিবাহিত করিয়াছেন। বাগানের মালী আসিয়া ঝরণাযন্ত্রে চাবি লাগাইয়া দিয়া গেল, শতধারে জলরাশি উৎক্ষিপ্ত, প্রক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়া কাননে নব-মাধুরী ফুটাইয়া তুলিল; প্রস্তরমূর্ত্তি দুইটিও কি এক বিচিত্র আভায় রঞ্জিত হইয়া সহসা যেন হাসিয়া উঠিল। রাজা আনমনে সেই দিকে চাহিয়া, কতক্ষণ পরে শ্যামাচরণের কথার উত্তরে স্বগত ভাবেই আস্তে আস্তে কহিলেন,—"তা নাও হ'তে পারে।"

শ্যামাচরণও একটু আগেই রাজার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি এ কথায় কোন উত্তর করিবার পূর্ব্বে প্রথমতঃ তাঁহার প্রায় নিঃশেষিত চুরুটটিকে চরম টানে মরণ দশায় আনিয়া ফেলিয়া সবল নিক্ষেপে বাগানের মাটীতে সমাধিদান করিলেন। তাহার পর টেবিলের কাছে আসিয়া পূর্ণাবয়ব আর একটিকে তৎস্থলাভিষিক্ত করিয়া লইয়া পুনরায় রাজার পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া কহিলেন,—"আপনি কি মনে ক'রে এ কথা বল্লেন—তা ত ঠিক বুঝতে পারছিনে, রাজা বাহাদুর!"

রাজা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার মল্যবান্ জামিয়ারখানার স্খলিত লুণ্ঠিত অঞ্চল স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া কহিলেন,—"বস্‌বেন, চলুন—বল্‌ছি।"

নবম পরিচ্ছেদ

প্রসাদপুরে কন্‌ফারেন্স হইয়া যাইবার অল্পদিন পরেই মাণিকতলার বিদ্রোহ-চক্রান্ত প্রকাশিত হইয়া পড়ে, বিদ্রোহিদলভুক্ত অনেক ছেলেকেই রাজা চিনিতেন। দেশের কার্য্যে উৎসর্গীকৃত তাহাদের জীবন এক দিন যে সুসিদ্ধিতে ধন্য হইয়া উঠিবে, এই আশাবিশ্বাসেই তিনি ভরপুর ছিলেন। যখন শুনিলেন, দেশমাতার এই সুসন্তানগণ বিলাতী আদর্শে অধর্ম্মের পথে চলিয়া তাহাদের সাধু উদ্দেশ্যপূর্ণ জীবন বিকৃত, ব্যর্থ করিয়া ফেলিয়াছে, তখন তাঁহার কষ্টের সীমা রহিল না। তাঁহার মনে হইল—স্বয়ং বিধাতা-পুরুষ এ দেশের প্রতি যখন বিমুখ, তখন এই অভিশপ্ত দেশের ভাগ্যপরিবর্ত্তনের আশা দুরাশা মাত্র। সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ-করুণায় তাঁহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। এই হতভাগ্য ভ্রান্ত দেশসেবকদিগের মুক্তির অভিপ্রায়ে যাঁহারা গোপনে অর্থ-সাহায্য করিয়াছিলেন, অতুলেশ্বর তাঁহাদের মধ্যে অগ্রণী। শ্যামাচরণের সন্দেহবাক্য তাঁহার অসম্ভব বলিয়া মনে হইল না, কিন্তু প্রসাদপুরেও যে এই ঘোর ব্যাধি সংক্রামিত

হইতে পারে, ইহা মনে করিতেও তিনি সাতিশয় কষ্ট বোধ করিলেন। ইহার ফলে, উক্ত চৌর্য্য ঘটনার অপর যে একটা সম্ভাবিত দিক আছে, তাহাকেই প্রবলতর সম্ভাবনার ভিত্তিতে দাঁড় করাইবার দিকেই তাঁহার ইচ্ছার গতি চালিত হইল। সুদক্ষ ব্যারিষ্টারের ন্যায় তৎপক্ষীয় যুক্তি-তর্কের আলোচনাপ্রবৃত্ত হইয়া তিনি কহিলেন,—

"ছেলেরা এর মধ্যে লিপ্ত থাকা অসম্ভব নয়, লিপ্ত আছে ব'লেই মনে হয়, কিন্তু ষড়যন্ত্রী—আমার বিশ্বাস সুজন রায় খুড়, ছেলেরা তাঁর চর মাত্র। হরিরামের কথাই এ সম্বন্ধে আমার প্রমাণ ব'লে মনে হয়।"

শ্যামাচরণ বলিলেন,—"কিন্তু প্রমাণ-প্রয়োগ ত তার কথায় বেশী কিছু পাওয়া যায় নি।"

"দরকার ছিল না। প্রসাদপুরের আদিরাজ সনাতন রায়ের ধনুক সম্বন্ধে আমাদের বংশগত একটা প্রবচন আছে, আপনি বোধ হচ্ছে তা জানেন না, জানলে হরিরামের কথার মধ্যে প্রমাণ-যুক্তির অভাব দেখ্‌তেন না।"

শ্যামাচরণ কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তে হস্তের চুরুট ছাইদানীতে রক্ষা করিয়া বলিলেন—"আপনাদের বংশে প্রবাদ প্রবচনের অভাব ত কিছু নেই; তার মধ্যে কোন্‌টি শুনেছি, কোন্‌টি শুনি নি, তা ত এখন মনে পড়ছে না।"

বলিতে বলিতে দাঁড়াইয়া, শ্যামাচরণ তাঁহার চৌকিখানা রাজার মুখোমুখিভাবে একটু ঘুরাইয়া লইয়া পুনরুপবিষ্ট হইলেন।

রাজা বলিলেন,—"সেই প্রবচনের সার ও সংক্ষেপ মর্ম্ম এই—সনাতন ধনুক বে-দখল হ'লে রাজ-বিভ্রাট ঘটবে এবং যিনি দখল করবেন, তিনিই রাজা হবেন। এখন জানেন ত রায়খুড়র মনটি কি ধাঁচে গড়া। ঐ বাক্যটিকে বেদবাক্যের মত আঁকড়ে ধ'রে, চিরদিনই এ ধনুকটি হাত করবার ফন্দীতে তিনি আছেন।"

এই প্রসঙ্গে সহসা শ্যামাচরণ মনশ্চক্ষুতে দেখিলেন, প্রসাদপুরের মৃত একটি নর-বানরের প্রহরিমূর্ত্তি। সুজন রায় কর্ত্তৃক উৎপীড়ননিযুক্ত উক্ত বনমানুষটি রাজ-হস্তে নিহত হয়। অতঃপর অতুলেশ্বরের প্রসাদভোগিরূপে এই বেশে সে দ্বারদেশের শোভা সম্পাদন করিতেছে।

শ্যামাচরণ সহাস্যে কহিলেন,—"হ্যা, ফন্দীতে শকুনি মামাকে রায় মহাশয় হার মানিয়েছেন সন্দেহ নাই। তবে রাখে কৃষ্ণ মারে কে! কোন ফন্দীতেই ত আপনাকে বা আপনার ধনুককে তিনি ঘায়েল করতে পারছেন না।"

হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা রাজার নয়নে উথলিয়া উঠিল। তিনি উর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া, মনে মনে সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার মঙ্গলময় ভাগ্যদেবতাকে স্মরণ করিয়া কহিলেন,—"হ্যা, রায় খুড়র এত উৎপীড়নের মধ্যেও আমি এবং আমাদের ধনুর্দেবতা উভয়েই যে এখনো টিঁকে আছি, এটা আশ্চর্য্যের কথা বই কি! জানেন ত, রাজ্যের লোকের বিশ্বাস, সনাতন ধনুক প্রাণবন্ত দেবতা—তাঁর অঙ্গে হাত লাগিয়ে কোন শত্রুরই নিস্তার নেই।"

"কিন্তু এ বিশ্বাস আপনার সংস্কার-অন্ধ খুড় মহাশয়কে ত বিচলিত করতে পারে নি?"

"বরঞ্চ চালিতই ক'রে আসছে। তিনি মনে করেন, তাঁর ঘরে অধিষ্ঠানলাভের জন্য ঠাকুর ম'রে আছেন; অতএব ঠাকুরকে জাগ্রত ক'রে তোলাই তাঁর কর্ত্তব্য কার্য্য। লোকে যদি নিজের নিশ্বাস-ফুৎকারে বিশ্বাসকে সজীব সৈনিক ক'রে না তুলত, তা হ'লে কি জগতে এত লাঠালাঠি মারামারি হ'তে পায়—এইটে ভাবুন দেখি?"

"তা ত বটেই। তবুও সে কথাটা সহজে মনে পড়ে না।"

"সুজন খুড় হাটতে শিখে পর্য্যন্তই বোধ হয় আমাদের উপর আক্রমণ সুরু ক'রে দিয়েছেন, আর আমরাও বর্ম্ম এঁটে দিব্যাস্ত্রকেও ব্যর্থ ক'রে আসছি। অনাদির মা'র বিবাহের সময় কাকা-বাহাদুরকে রায়-খুড় কিরূপ বিপদে ফেলেছিলেন, শুনেছেন কি সে গল্প মহারাণীর নিকটে?"

শ্যামাচরণ আগ্রহসহকারে উত্তর করিলেন,—"না।"

"রায় খুড়ই এ বিবাহের সম্বন্ধ আনেন। পাত্র তাঁরই দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়, বর সভাস্থ হয়ে বসবামাত্র রায় খুড় বল্লেন, 'রায়-বংশের পদ্ধতি অনুসারে বরকে ধনুক উঠিয়ে বল-পরীক্ষা দিতে হবে—সভাস্থলে ধনুক আনীত হোক।' উদ্দেশ্য অবশ্য বুঝেছেন। বর যাত্রীর সঙ্গে তাঁর যে সব গুপ্ত লাঠিয়াল আছে, পথ থেকে তারা ধনুক লুঠ ক'রে নিয়ে যাবে।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাজা একটি চুরুট মুখে লইয়া তাহাতে দেশলাই সংযোগে রত হইলেন। এই উপন্যাস-কাহিনীর শেষভাগে পৌঁছিতে শ্যামাচরণ তখন এতই কৌতূহলাক্রান্ত যে, তাঁহার ন্যায় তামাকু-খোর লোকও রাজদৃষ্টান্তে প্রলুব্ধতার লক্ষণ প্রকাশ না করিয়া অধীরভাবেই উপকথাশ্রবণলোলুপ

বালকের ন্যায় কহিলেন,—"তার পর, রাজা বাহাদুর ?"

রাজা বাহাদুরের চুরুট তখন বেশ ধরিয়া উঠিয়াছে—ধূমখোর না হইয়াও মজগুলভাবে তাহাতে দু' চার টান দিয়া দু' চারবার তিনি শূন্যে ধূম উড়াইয়া দিলেন—তাহার পর সিগারেট মুখ হইতে নামাইয়া ছাইদানীতে তাহা পুনঃ সংস্থাপিত করিয়া রুমাল দিয়া ওষ্ঠাধর মুছিতে মুছিতে বলিলেন,—

"রায় খুড়ুর জিবের ডগা থেকে কথাগুলা বার হ'তে না হ'তে তাঁর মনের মৎলবখানা যে কাকা-বাহাদুর বুঝে ফেলেছিলেন—তা ত বুঝতেই পার্ছেন ? এখন ভাবুন দেখি, কাকার কি বিপদ ! হয় ধনুক যায়, নয় বিয়ে ভাঙ্গে ! আপনি এ অবস্থায় পড়লে কি কর্‌তেন বলুন দেখি, গাঙ্গুলি-মশায় ?"

রাজা হাসিয়া এই প্রশ্ন করিলেন, গাঙ্গুলি-মহাশয় গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—"বল্‌তে পারি না, রাজা বাহাদুর। মাথায় ত এখন কোন বুদ্ধিই যোগাচ্ছে না।"

রাজা বলিলেন,—"তবে শুনুন, কাকা বাহাদুরও বড় কম ফন্দীবাজ ছিলেন না—।"

রাজার কথা সম্পূর্ণ না হইতেই শ্যামাচরণ কহিলেন,—"তা ত বোঝাই যাচ্ছে, নইলে কি রায় মহাশয়ের এই চক্রান্তের মধ্যে তিনি টিঁক্‌তে পার্‌তেন ?"

রাজা সহাস্যে অনুমোদনবাক্যে কহিলেন,—"তা ঠিক ! কাকা মহাশয় রায় খুড়ুকে সবিনয়ে জানালেন যে, এ স্থলে তাঁর রায়দাদা কেবল বর-কর্ত্তা নন, রায়-বংশেরও কর্ত্তা ব্যক্তি; অতএব গুরুজনের আদেশ দেবাদেশের ন্যায় তাঁর শিরোধার্য্য। কিন্তু গুপ্তভাণ্ডারে রক্ষিত লৌহ-ধনুক সভায় আন্‌তে একটু ত সময় লাগ্‌বে, ততক্ষণ জামাতা অন্তঃপুরে স্ত্রী-আচার পর্ব্ব শেষ ক'রে আসুন, নইলে লগ্ন ভ্রষ্ট হয়ে যেতে পারে।"

শ্যামাচরণের মুখে এতক্ষণ পরে হাসি বাহির হইল, তিনি প্রফুল্লভাবে কহিলেন,—"হাঁ, একেই বলে চতুরে চতুরে। প্রস্তাবে রায়-মশায় রাজী না হ'য়ে আর কি কর্‌বেন ?"

"তবে দেখ্‌ছি, খুড়ুকে আপনি এখনো চেনেননি ! তিনি এ প্রস্তাবে একেবারেই বেঁকে বস্‌লেন। বরকে সভাস্থল হ'তে তখনি তিনি উঠিয়ে নিয়ে যেতে উদ্যত, চারিদিকে হুলস্থূল প'ড়ে গেল, বর যদি ভিতরে ভিতরে আমাদের পক্ষ না হতেন, তা হ'লে এ বিয়ে কিছুতেই ঘটতে পেত না। জামাই সভাস্থল হ'তে উঠে রায়-খুড়ুর অনুসরণ না ক'রে কাকার সঙ্গে অন্তঃপুরে চ'লে আসেন, এবং সেখানেই বিবাহপর্ব্ব শেষ হয়।"

শ্যামাচরণ আনন্দের ও ঔৎসুক্যের দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন,—"আঃ, বাঁচা গেল, বাঁচা গেল, বিয়েটা তা হ'লে হ'য়ে গেল ! রায়-খুড় শুনে কি কর্‌লেন ?"

"কর্‌বেন আর কি, পৈতে ছিঁড়ে শাপ দিলেন।"

"সুখের বিষয় ব্রহ্মশাপে এখন আর বজ্রাগ্নি ছোটে না !"

"কিন্তু বাক্যাগ্নির জ্বালাটা এ যুগেও ত কিছু কমেছে বলে মনে হয় না। বরঞ্চ অনেক সময়ে সে জ্বালা এমনই সঙ্গীন হয়ে ওঠে যে, তখন বেল পড়লে উড়ন্ত কাককেও আমরা কারণ ব'লে মেনে নিই। হাজার হোক্ স্মার্ত্তচূড়ামণির সন্তান ত আমরা। অনাদি জন্মাবার কিছুদিন পরে তার পিতা যখন মারা গেলেন, মা তখন কাতরচিত্তে সেই শাপান্তের জন্য স্বস্ত্যয়ন আরম্ভ ক'রে দিলেন; আর রায় খুড় উল্লসিত হয়ে উঠে, তাঁর চামুণ্ডামন্দির ছাগ-মহিষ-রক্তে ভরিয়ে তুল্‌লেন। নরবলির উপায় থাক্‌লে বোধ হয় আনন্দের সহিতই তিনি সে কায কর্‌তেন।"

"কি পাষণ্ড ! এ যে ঠিক উপন্যাসের কথা ! যা হোক্, তাঁর মতলবটা যে সিদ্ধ হয় নি, এতেই বড় আহ্লাদ হচ্ছে।"

"এর পর আর একবার তিনি ধনুক লুঠের চেষ্টা করেন—কাকা বাহাদুরের শ্রাদ্ধের সময়। প্রসাদ-পুরের কোন রাজার দেহান্ত হ'লে, পিণ্ডদাতাকে শ্রাদ্ধক্ষেত্রে সর্ব্বাগ্রে সনাতন ধনুকের পূজা কর্‌তে হয়। খুড় ভাবলেন, ধনুক লুঠের এ মহা অবসর তিনি ছাড়বেন না।"

"কি বিপদ্ !" শ্যামাচরণের এই উৎকণ্ঠাপূর্ণ বাক্যে রাজা হাসিয়া বলিলেন,—"বড় বেশী বিপদ্ হয় নি সেবার, আমরা খুবই সতর্ক ছিলুম, তাঁরই দু'চার জন লোক জখম হয়েছিল।"

"তা বেশ ! আশা করি, এ ঘটনা থেকে তিনি শিক্ষা লাভ করেছিলেন ?"

"হ্যাঁ, তার পর থেকে আর ধনুক লুঠের চেষ্টা করেন নি বটে, কিন্তু উপরোধ-অনুরোধের জ্বালায় আমাদের অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছিলেন। তবে যখন দেখ্‌লেন, পাষাণ তাতে গল্‌বার নয়, তখন থেকে শাসনবাক্য ধরেছেন যে, তিনি আমার নামে

মোকদ্দমা আন্‌বেন—কারণ, ধনুকের প্রকৃত মালিক তিনিই, তিনি ছাড়া আর দ্বিতীয় ব্যক্তি কেউ নয়, তাঁর দেহেই সনাতনশোণিত বহমান, আমি কোথাকার কে, দৌহিত্রবংশের সন্তান মাত্র।"

করুণরসাদিনাট্য এইরূপ কৌতুক-রহস্যে শেষ করিয়া রাজা থামিলেন, থামিয়া আর একটি সিগারেট গ্রহণ করিলেন। এবার শ্যামাচরণের নিকটে মহাজনপ্রদর্শিত পথ উপেক্ষিত হইল না। সিগারেট জ্বালাইয়া লইয়া রাজা বলিলেন,—"আমি যে কেন রায় খুড়কেই এই অশ্ব-চুরীর মামলাতে প্রধান অপরাধী মনে করছি তার কারণ ত সব শুনলেন, এখন আপনি বলুন দেখি, আপনার কি মনে হয় ?"

শ্যামাচরণ এতক্ষণ রঙ্গমঞ্চের এক জন উৎসুক শ্রোতা ছিলেন, এখন প্রকৃত জীবন-নাট্যে মন্ত্রিরূপে আহূত হইয়া গম্ভীরভাবেই কহিলেন,—"ধনুকটি দেখছি, রায়বংশের গৃহবিগ্রহ ; এটি লাভের জন্য এ হেন কায নেই, রায়-মশায় যা করতে না পারেন—তাও বুঝছি, তবুও আমার মনে খটকা লাগছে এই যে, ধনুক চুরীর চেষ্টা ত হয়েছে পরে, অশ্ব-চুরী চলেছে যে তার পূর্ব্ব থেকেই।"

"হ'তে পারে, খুড়র চরেরা অশ্ব-চুরীতেই প্রথমে হাত পাকাচ্ছিল!—আমাকে যে কোন রকমে হোক্ জব্দ করাই ত তাঁর উদ্দেশ্য ? তা ছাড়া অত বড় ভারী ধনুকটা লোকের চোখে ধুলো দিয়ে উড়িয়ে নেবার পূর্ব্বে কসরৎ ত করা চাই,—অশ্ব-চুরী ক'রেই প্রথমটা দেখছিল—ধরা পড়ে কি না।"

শ্যামাচরণের এ কথা মনে লাগিল না, তিনি মুখগৃহীত ধূম নাক দিয়া ছাড়িতে ছাড়িতে বলিলেন,—"কিন্তু সন্তোষ যদি রায়-মশায়ের চরই হবে, তবে ওকে গুলী করলে কে ?"

এর সহজ সিদ্ধান্ত,সম্ভবতঃ ও রায়-খুড়র চর নয়। সন্তোষ যাদের বিশ্বাস ক'রে অশ্বশালায় ঢুকতে দিচ্ছিল, তারাই যে অবিশ্বাসী—হয় ত বা প্রথমটা সে তা বোঝেই নি—তার পর বুঝে সত্যই চোর ধরতে গিয়ে সে গুলী খেয়েছে। নইলে মাঝে থেকে সন্তোষের উপর গুলী পড়বার অন্য কোনই কারণ ত খুঁজে পাওয়া যায় না।"

কথাটা অযৌক্তিক নহে, তবুও শ্যামাচরণের সন্দেহ মিটিল না। ভুক্তাবশিষ্ট চুরুটটি ছাইদানীতে রাখিয়া তিনি বলিলেন,—"সন্তোষের জবানবন্দী না পেলে কিন্তু সত্যটা ঠিক ধরা যাচ্ছে না।"

রাজা হাসিয়া বলিলেন,—"তবে ত তাকে বাঁচিয়ে তুলতেই হচ্ছে। আর আপনার ভাগিনেয়টি যমের সঙ্গে সন্ধিস্থাপনে যেরূপ পটু—তাঁর দৌত্যে এ কার্য্যে যে আমরা সিদ্ধিলাভ কর্‌ব—এ আশাও দুরাশা নয়।"

রাজা কথা কহিতেছিলেন শ্যামাচরণের সহিত—তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল—ভিনাস-মূর্ত্তির দিকে, উত্তরে শ্যামাচরণ যখন বলিলেন,—"কই, প্রসাদপুরে যাবার কথা ত শরৎকুমারকে এখনো বলা হয় নাই," তখন রাজা সচকিতে চৌকিতে সোজা হইয়া বসিয়া বিস্ময়প্রকাশক স্বরে কহিলেন,—"বলা হয় নি এখনো। তাই ত! দেখুন দেখি অন্যায় কাণ্ড! ঐ মূর্ত্তি দু'টি আমাকে কাযের কথা সব ভুলিয়ে দেয়।"

বলিতে বলিতে তিনি টেবিলে সংস্থিত তাড়িৎ ডাকযন্ত্রের দিকে হাত বাড়াইয়া দিলেন, কল টিপিয়া দ্বারস্থ হরকরাকে ডাকিবেন, এই অভিপ্রায়। কিন্তু সহসা তাঁহার উদ্যত হস্ত নিরুদ্যমে পুনরায় চৌকির হাতার উপর আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। রাজা সাহ্লাদে বলিয়া উঠিলেন,—"এই যে! যমকে স্মরণ করতে স্বয়ং যমদমন এসে উপস্থিত! এস ডাক্তার, এস এস,—তোমার জন্যই আমরা অপেক্ষা ক'রে আছি!"

দশম পরিচ্ছেদ

শরৎকুমার একখানা ছোট চৌকি টানিয়া লইয়া তাঁহাদের কাছাকাছি আসিয়া বসিলেন। রাজা সাদর আগ্রহে বলিলেন,—"আর একটু এগিয়ে বোসো ডাক্তার, আরো কাছে,—আর একটু—"

শরৎকুমার উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাতের টানা হ্যাচড়ে চৌকিখানা অনতিবিলম্বে রাজার মনোমত স্থানে আনিয়া ফেলিয়া তদুপরি স্থিরভাবে যখন বসিলেন,—তখন রাজা হাস্য অনুমোদনবাক্যে কহিলেন,—"এখন ঠিক হয়েছে, এইবার কথা কবার বেশ সুবিধা হবে।"

অতুলেশ্বরের এই সহজ আদর-আপ্যায়ন ও সন্তুষ্টিভাবের মধ্যে শ্যামাচরণ, ভাগিনেয়ের প্রতি তাঁহার অসামান্য স্নেহগভীরতা উপলব্ধি করিয়া বেশ একটু আনন্দলাভ করিলেন। মুহূর্ত্তকাল মনে মনে সঙ্গোপনে এ আনন্দ উপভোগ করিবার পর খোসমেজাজে কহিলেন,—"শরৎকে যে আদেশ দিতে হবে দিন, রাজাবাহাদুর, আমি একবার দেওয়ানের সঙ্গে কথা ক'য়ে আসি।"

শ্যামাচরণ চলিয়া গেলে রাজা শরৎকুমারকে কহিলেন,—"প্রসাদপুরের চৌর্য্যকাণ্ডের কথা অবশ্য শুনেছ ডাক্তার ?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"সন্তোষকে কি তুমি চেন ?"

"চিনি একরকম, আপনার ওখানেই দু'চারবার দেখাশুনা হয়েছে।"

"লোকটা কি রকম ব'লে মনে হয় ?"

"এক জন ভক্ত দেশসেবক। তাদের কার্য্যশক্তিই এ ভারতে সত্য, বাদ্‌বাকী সর্ব্বৈব মিথ্যা—এই তার মনোগত ভাব ও বিশ্বাস।"

রাজা একটু হাসিয়া বলিলেন,—"এ চুরীতে লিপ্ত থাকা তার পক্ষে সম্ভব ব'লে কি মনে কর তুমি ? অনেকেই তাকে সন্দেহ করছে।"

"অসম্ভব নয়।"

"উদ্দেশ্য ?"

"আমাদের সকলেরি যা—দেশোদ্ধার।"

রাজা তাঁহার মনের ব্যথা আর প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারিলেন না,—ক্ষুব্ধ হৃদয়ের আবেগ স্বরে প্রকাশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"দেশোদ্ধার অর্থাৎ দু' চারটে খুন জখম। তাতে কি কখনো দেশোদ্ধার হ'তে পারে ? এ সঙ্কল্প যে পাগলের আগুন-খেলা।"

"ক্ষুদ্র আগুনও ত জ্বলে উঠে দাবানল সৃষ্টি করতে পারে ?"

"কিন্তু বনের বাঘ-ভালুক ধরা পড়বার আগেই কোটালে বানে সে আগুন নিভিয়ে দেবে। মরতে মরবে যত ক্ষুদ্রপ্রাণ কীটপতঙ্গ, পাখীপাখালি। ক্ষতি তাতে আমাদেরই ; ভারতবনের সুন্দর জীবগুলিরই তাতে উচ্ছেদসাধন হবে।"

"লাভ-লোকসানের তৌলদণ্ড হাতে নিয়ে ব'সে এ পর্য্যন্ত কেহ কখনো কোন মহৎ কায করতে পারে নি।"

"তা ঠিক ! কিন্তু বিনা সাধনাতেও এ পর্য্যন্ত কোন মহৎ কায সিদ্ধ হয় নি।"

"আপনি আরামবাসে ব'সে বাহিরের অত্যাচার-অপমান তেমন ক'রে দেখতে পান না, তেমন ক'রে অনুভব করেন না, আপনার দেশানুরাগ কবির আরাম কল্পনামাত্র, কিন্তু যাদের মনুষ্যত্ব অহরহঃ নখাঘাতে, পদাঘাতে ক্ষতবিক্ষত—তাদের জ্বালা যে অসহ্য। শুভ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করতে হ'লে তারা প্রাণে বাঁচে কই ?"

রাজা দুঃখিতভাবে বলিলেন, "ডাক্তার, তুমি আমাকে ভুল বুঝছ ! রাজপুরুষের অত্যাচারে তোমাদের চেয়ে আমি কম মর্ম্মপীড়িত নই। আমিও এক সময় ঐ রকম মোরিয়া হ'তে হ'তে র'য়ে গেছি। তার পর ভগবৎপ্রসাদে বুঝেছি—ওরূপ অত্যাচারে আমরা মুক্তি লাভ করতে পারব না।"

"আমিও তাই মনে করি। তবুও অন্যপক্ষের মত ত উপেক্ষায় উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাদের সঙ্গে তর্কে-বিতর্কে আমার বাঁধা বিশ্বাসও সংশয়-দোলায় দুলতে থাকে ! আপনারা 'মোরিয়া' হয়ে যেখানে থেমে গেছেন, সেই পদাঙ্ক অনুসরণে নব-সৈনিকদল যারা চলেছে, তারা থামতে চায় না ; কালের এ মাহাত্ম্য ! কর্জ্জন-আইনকৃত সমগ্রদেশের প্রতি অপমান কি সহজে ভোলা যায় ? প্রসাদ-পুরের কনফারেন্স দিনের অযথা পীড়ন কথাটাই একবার ভাবুন দেখি ? তাতে কি মানুষ ঠাণ্ডা থাকতে পারে ? রাজপুরুষেরা আমাদের আশা অধিকার যদি একটুও মেনে চলতেন, অন্ততঃ মানুষের প্রতি মানুষের যে কর্ত্তব্য,—সেই শিষ্টাচারটুকুও যদি আমাদের দিতেন—তা হ'লে কি এ বিদ্রোহের ভাব কারো মনে জাগে ? আমাদের জিনিষ তাঁরা আমাদের যতটুক দেন—তা-ও এমন অবজ্ঞাভরে যে, উচ্ছিষ্ট গ্রহণের মত তাতে প্রাণমন কুণ্ঠিত হয়ে পড়ে।"

এ কথার সত্যতা বুঝিয়া রাজা নীরবে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। শরৎকুমার উত্তেজিতভাবে আবার বলিলেন—"আপনাদের মত গুরু না পেলে আমিও যে ঐ দলে ঢুকে পড়তুম্—তাতে সন্দেহ মাত্র নেই। Constitutional agitation ! হায় রে ! অর্থাৎ হাত পেতে ধাত বুঝে চেঁচান। কিন্তু যে জাতের কুলগৌরব রক্ষা হয় দুর্ব্বলের গিলে ফাটিয়ে, আঁতে ঘা না দিয়ে তাদের নীরব করা যায় কিরূপে বলুন ত—এ কথার সদুত্তর কি ?"

"তেজস্বী মনের তর্জ্জনী-ইঙ্গিতেও দুর্ব্বল শাসিত হয়। আমাদের আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা মনের অধীনতা যদি কখনো ঘোচাতে পারা যায়, তবেই আমাদের মধ্যে স্বাধীনভাবের সহজ এবং স্থায়ী তেজ সঞ্চারিত হবে।"

"কিন্তু তেজঃসঞ্চার কি 'যুগান্তর'-প্রদর্শিত উপায়ে হচ্ছে না ? এখন কি ট্রাম গাড়ীতে বা ট্রেণে শাদা মানুষ কোনো 'কালা আদমীকে' স্বচ্ছন্দচিত্তে অপমান করতে সাহসী হয় ? বাঙ্গালীর কাপুরুষ নাম যে ঘুচেছে, এটা মানেন ত ?"

"মানি, ডাক্তার, মানি। কিন্তু 'যুগান্তরের' উত্তেজনাই যে তার মূলীভূত বা একমাত্র কারণ—তা বলতে পারিনে। 'যুগান্তর' প্রকাশের বহুপূর্ব্ব থেকেই—অন্ততঃ বাঙ্গালীর অসাড়প্রাণে অপমান

বেদনার সাড়া জেগেছে। সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিকার-চেষ্টাও সুরু হয়েছে ; তার পর—"

"তার পর 'যুগান্তরের, প্রলয়ভেরী বাজিয়ে যুগান্তর এসে দেখা দিয়েছেন। আপনি কি বলেন,—এ কুম্ভকর্ণ জাতের ঘুমের ঘোর ভাঙ্গাতে এরূপ ভেরী-নিনাদের প্রয়োজন ছিল না?"

"যুগান্তরের কার্য্যকলাপের সঙ্গে আমার মত-বিরোধ যতই থাক—"যুগান্তরের উদ্দীপনা যে একেবারেই নিষ্ফল হয়েছে, এ কথা বল্‌তে পারিনে। যুগান্তর যে দেশের প্রাণের ভিতর প্রবল একটা আশা উৎসাহের স্রোত বইয়ে দিয়েছে এও অস্বীকার করি নে। যুগান্তরের ডাকে শত শত ছেলে প্রাণের মায়া ছেড়ে—মায়ের আঙ্গিনাতলে এসে দাঁড়িয়েছে। এই মহাশিক্ষায় গুরু শিষ্য উভয়েই ধন্য। কিন্তু যখন দেখি, এই মাতৃপূজাক্ষেত্রে নরবলি অনুষ্ঠানের জয়োল্লাস প'ড়ে গেছে, তখনই সব আনন্দ নিরানন্দে ঢেকে যায়। যুগান্তর-কল্পিত উপায় যে দেশকে ব্যাপক এবং স্থায়িভাবে স্বাধীন শক্তিতে উদ্বুদ্ধ করবে, এ কথা আমার মন স্বীকার করে না।"

"কিন্তু আপনার মত সাত্ত্বিক গুরুর উপদেশ লাঞ্ছিত তান্ত্রিক শিষ্যগণ গ্রহণ করবে না ত! কাপালিক গুরুর প্রতি তারা নিষ্ঠাবান। দীর্ঘ সাধনায় বিশ্বাসহীন—অপমান-অসহিষ্ণু তাহারা চায় আশুফল ; রাতারাতি দেশের শৃঙ্খলমোচনে তারা বদ্ধপরিকর, তাদের আপ্তবাক্য হচ্ছে Now or never। এই উৎসাহভরা মনে ব্যর্থতার সন্দেহ বা মৃত্যুর বিভীষিকা নেই। নিজেদের ভগবৎ-প্রত্যাদিষ্ট জ্ঞানেই জয়োল্লাসে তারা উন্মত্ত।"

রাজা অতি দুঃখে একটু হাসিলেন তাহার পর গম্ভীরভাবে বলিলেন, "যদি এরূপ খুন-জখমই ভগবানের অভিপ্রেত হোত,তা' হ'লে কি ট্রেন-বম্ নিষ্ফল হয়, না মজঃফরপুরের হত্যাকাণ্ড নিরীহ স্ত্রীহত্যাতেই শেষ হয়? আচ্ছা, একটু ভেবে দেখ দেখি—এই যে তোমাদের ইংরাজবিদ্বেষ—যার দরুণ তোমরা পরশুরাম-এত গ্রহণ করেছ, তারই বা মূলে কতটা উগ্র হেতু আছে? ইংরাজ রামরাজা না হোক্—রাক্ষস রাজাও নয়, স্বাধীন ইয়োরোপেরও অনেক রাজার চেয়ে তারা ভাল, স্বার্থদ্বন্দে তারা সুবিচারী না হ'লেও, নিজের সুবিধায় বে-আইনী-আইন চালালেও, তবু তাদের আইনকানুনের একটা ব্যবস্থা আছে প্রজামঙ্গলের তারা প্রকৃত প্রস্তাবে উদাসীন নয়। তা ছাড়া ইংরাজের শিক্ষা দীক্ষার গুণেই যে আমাদের অন্ধনয়ন ফুটে উঠেছে,—হৃদয়ের নব-আশা উচ্চাকাঙ্ক্ষা জেগেছে—তারও ত কোন ভুল নেই। সুতরাং এজন্য তারা আমাদের কাছে যৎকিঞ্চিৎ কৃতজ্ঞতারও দাবী রাখতে পারে না কি? তার পরিবর্ত্তে তোমরা যদি তাদের উচ্ছেদ-সাধনে ব্রতী হও—তা হ'লে তোমরা পতিত উদ্ধার করতে যে পারবে না, এটা ধ্রুব নিশ্চয়—মাঝে থেকে তোমরাই সর্ব্বপ্রকারে পতিত হবে।"

বলিয়া রাজা থামিলেন ; তাঁহার মূর্ত্তিতে একটি সুগভীর বিষাদ-বেদনা প্রকটিত হইয়া উঠিল। শরৎ-কুমারও সহানুভূতি-পীড়িত হইয়া সান্ত্বনাপ্রদানের ইচ্ছাতেই যেন উত্তরে কহিলেন—"ইংরাজ-উচ্ছেদ-সাধন ত বাস্তবিক কারো অভিপ্রায় নয়—আসল অভিপ্রায় ছলে-বলে কৌশলে তাহাদের শক্তি খর্ব্ব করা। রাজশক্তিকে দমন করতে না পারলে আমাদের দেশকে ত পাব না। আপনারা শাসনে সমধিকারলাভের জন্য চীৎকার করছেন, রাশি রাশি রেজলিউসন পাশ করছেন, পোকামাকড়ের খাদ্য হওয়া ছাড়া সে সব রেজলিউসনের কি সার্থকতা আছে, বলুন দেখি? এতদিনের পর এখন যে রিফর্ম্মস্কিমের একটা কথা শোনা যাচ্ছে—এ কি শুধু বিদ্রোহিতার ফল নয়?"

রাজা হাসিয়া বলিলেন—"আমরাও যেমন, তোমরাও তেমনি সবাই সমান বাঁদর কি না—তাই ওদের হাতের কলা দেখে আনন্দে নৃত্য করতে লেগে গেছি। আসল কাজ রইল প'ড়ে আর আমরা চীৎকার ক'রে মরছি আর তোমরা কাটা-কাটি ক'রে মরছ এতে যে কাজ একেবারে কিছুই হচ্ছে না, তা যদিও বলতে পারিনে, তবে ঠিক পথটা ধরলে কায খুব এগিয়ে যেত। মাণিকতলার সেই মহামতি ছেলেরা—যারা অসি দ্বারা স্বাধীনতা লাভ করতে গিয়েছিল, তারাও শেষ মুহূর্ত্তে নিজেদের ভুল যে বুঝেছে, তাতে আমার মনে সংশয় নেই। সাহসের বা অস্ত্র-শস্ত্রের অভাব ছিল না ত তাদের, কিন্তু ধরা পড়বার সময় আত্মরক্ষার জন্য একটা বন্দুকের আওয়াজ পর্য্যন্ত করে নি তারা। আর নির্দ্দোষীদের রক্ষা করার জন্য মুক্তকণ্ঠে আপনাদের দোষ স্বীকার ক'রে নিয়ে অকুণ্ঠচিত্তে পুলিসের ঘূর্ণা-বর্ত্তে ঝাঁপ দিয়েছে! এইখানেই তাহাদের মনের খাঁটি মহত্ব, খাঁটি সাত্ত্বিকতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে—তাদের পূর্ব্বানুষ্ঠিত প্রচণ্ড নীতিকে ক্ষণিকের ভুল-ভ্রান্তি ব'লে প্রমাণ ক'রে দিচ্ছে।"

"কিন্তু এ ভুল যে দেশের প্রাণের ভুল। সে ভুল যত দিন না ভাঙ্গে, তত দিন এমনিই চলবে। ব্যর্থতার

ভয়ে পিছু হঠা কাপুরুষের ধর্ম্ম,—সফলতা এক মুহূর্ত্তে না-ও আস্‌তে পারে—একদিন যে সিদ্ধিলাভ হবেই—এই তাদের ধ্রুব বিশ্বাস। মাণিকতলার দল ধরা পড়েছে ব'লে তারা দ'মে যায় নি;—পুলিস-দমনেও এ চক্রান্ত বাড়বে বই কমবে বোধ হয় না।"

"কিন্তু এখনকার বিপ্লবপন্থী দল—মাথা হারিয়ে কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানশূন্য নিষ্ঠুর কবন্ধ হয়ে উঠেছে। ইংরাজ খুন-জখমের চেষ্টা আপাততঃ ততটা আর শোনা যাচ্ছে না—বোধ হয়, এ কাজটা তাদের পক্ষে তত সহজসাধ্য নয়। স্বদেশী খুন স্বদেশী ডাকাতিতেই এখন তারা বিদেশী দস্যুদেরও অনুকরণীয় হয়ে উঠেছে। হায় হায়! স্বজাতিপীড়নেই স্বরাজ্যলাভের ব্যবস্থা! সত্যই ভারতের মঙ্গলদেবতা ভারতভূমি থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন।"

শরৎকুমার এই গম্ভীর প্রসঙ্গে লঘুভাব প্রদান করিয়া কহিলেন—"কিন্তু দেশে ছেলেদের মনে যে কার্য্যোদ্যম-ক্ষুধা জেগে উঠেছে, তার ত একটা খোরাক চাই। যদি সৈনিকপদ তাদের জন্য খোলা থাকত, তা হ'লে এ ক্ষুধার জ্বালাটা থেমে যেতে পারত। কিন্তু আপনারা এত দিন বক্তৃতায়, কবিতায় জঠরানল জ্বালিয়ে তুলে অন্ন দেবার বেলা এখন বল্‌ছেন,—যা বাছারা চ'রে গিয়ে খা, অথচ সেই তারা চ'রে খেতে আরম্ভ করেছে অমান কাহুনি গাচ্ছেন—হায় হায়! গোল্লায় গেলি বাছাধনরা! বেচারারা কি করে বলুন ত?"

রাজাও একটু হাসিয়া বলিলেন, "কিন্তু বেচারাদের সত্যই যদি উদ্দেশ্য হয় দেশোদ্ধার করা - তা হ'লে গোল্লায় গেলে ত চল্‌বে না। মেরে-ধরে ইংরাজকেও তাড়ান যাবে না—দেশবাসীকেও স্বাধীনতার কলমা পড়ান চলবে না। দেশমাতাকে ভালবাস্‌তে শিখ্‌লেই তাঁর স্বার্থপর সন্তানগণও তাঁর মঙ্গলে নিজের মঙ্গল জ্ঞান ক'রে স্বার্থত্যাগী হ'তে শিখবে। কিন্তু দেশসেবকদের এরূপ নিষ্ঠুর আচরণে স্বাধীনতার প্রতি জনসাধারণের অনুরাগ বাড়্‌ছে, না বিরাগ জন্মাচ্ছে,—এতে দেশমাতার শৃঙ্খলমোচন হচ্ছে—না বিশৃঙ্খলা বাড়্‌ছে, সেইটে বল দেখি? ইংরাজ প্রজাপীড়ন করে, এই অজুহাতে তোমরা তাদের দণ্ডনীয় জ্ঞান কর, অথচ ভারতবাসীর খাঁটি যে মহত্ব,—আদর্শ যে ধর্ম্মনীতি, তাকেই পদদলিত ক'রে বিলাতী করালীমূর্ত্তি সেজে ভ্রাতৃ-রক্তপানে তোমরা উল্লসিত হয়ে উঠেছ! এই ত দেশভক্তির পরিণাম। দুঃখে, ক্ষোভে, অসহ্য যন্ত্রণায় হৃদয় জ্বলে ওঠে।" বলিয়া রাজা নীরব হইলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

রাজার ক্ষুব্ধ বাক্যের উত্তরে শরৎকুমার বিনীত-স্বরে কহিলেন, "অবশ্য দেশ-ভক্তির দোহাই দিয়েও এরূপ দেশপীড়নকে সমর্থন করা যায় না, তবুও তাদের পক্ষে এইটুকু বলার আছে যে, ডাকাতী করার জন্যই তারা ডাকাতী করছে না। সব কাজেই ত অর্থবল চাই। অনন্যোপায় হয়েই তারা ডাকাতী ধরেছে। আপনারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাদের ত অর্থ যোগাবেন না।"

"দেশের কাজে সাধ্যমত অর্থ অনেকেই যোগাচ্ছেন, আমিও যুগিয়ে থাকি। মায়ের নামডাকে লোকের চাঁদাদানে যে কিরূপ আগ্রহ, ন্যাসনাল-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠার দিন তুমিও ত তা দেখেছ? তবে মারপিটের জন্য চাঁদা তোলা দুষ্কর, এটা ঠিক।"

"আচ্ছা, আবার আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, বে-আদপি মাপ করবেন, বিনা অস্ত্রে বৃটিশ-কেশরীকে বশ করতে পারা গেছে, এমন কোন নজীর আপনি দেখাতে পারেন?"

রাজা অতি দুঃখেও একটু হাসিয়া বলিলেন, "আমিও তর্কের খাতিরে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—তোমাদের অস্ত্র কোথায়—তাই তা হ'লে দেখাও আগে? প্রসাদপুরের মর্চেধরা দু'চারখানা বন্দুক তলোয়ার, আর বমপটকা প্রস্তুতের একখানা শিশু-শিক্ষা—এই ত অস্ত্র সম্বল তোমাদের! কিন্তু পুরাকালের দ্রোণশর্ম্মা স্বয়ং সশরীরে এসে আজ যদি তোমাদের আচার্য্য হয়ে দাঁড়ান, তা হ'লে তাঁকেও পশ্চিমের প্রবল-প্রতাপ আধুনিক বিজ্ঞান-দৈত্যাচার্য্যের নিকট পরাভব মান্‌তেই হবে।"

"তা হ'লে কি আপনি বলেন, এ দাস জাতির মনুষ্যত্ব রক্ষার চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র, মার খেতেই আমরা জন্মেছি—অতএব মার খাওয়ারূপ কর্ত্তব্য-কর্ম্ম-সাধনেই পতিত আমাদের স্বর্গলাভ?"

"না, তা' আমি বলিনে। এইখানেই আমাদের মতভেদ।

চাই না রক্তপাত—আমরা কোর্ব্ব না আঘাত,
ব্যর্থ করব অরির অস্ত্র ধর্ম্ম-কৃপাবলে—

এ কথা আমার মুখের কথা নয়, মনের প্রকৃত ভাব। নিরস্ত্র আমরাও বলহীন নই,—ধর্ম্মবল,

আধ্যাত্মিকবলই আমাদের বল। এই বলের উৎকর্ষণে যে দেশাত্মবোধ জ্যোতিঃ আমাদের মনে জ্বলে উঠবে— বাইরের ঝটিকা-ঝঞ্ঝায় তা'র নির্ব্বাণ নেই। সে মহালোক বিশ্বজাতির মধ্যে আমাদের আত্ম-প্রতিষ্ঠার পথ উদ্ভাসিত ক'রে তুলবে। এই কথা তোমাকে গোড়াতেই বলেছি, আবার স্পষ্ট ক'রে বলছি।"

"দেখুন, এ রকম বড় বড় কথাগুলোকে ঠিক ধরা-ছোঁয়া যায় না। বাহুবল বল্লেই বরঞ্চ আমরা মূর্ত্তি-মন্ত একটা ভাব প্রত্যক্ষ করি যে ভাবে ধর্ম্মবল, মনের বল সব কিছুই দেখতে পাই না। কিন্তু অধ্যাত্ম-বল কথাটিতে প্রথমেই আমাদের মনে এসে দেখা দেয়—জটাজূটধারী যোগি-সন্ন্যাসীর ভণ্ডামী শুনা যায়, তাঁরা না কি অনেকে দুঃসাধ্যসাধনও করতে পারেন কিন্তু চোখে কখনো সেরূপ কাণ্ড দেখি নি, —আর স্বরাজের পথে আমাদের তাঁরা এগিয়ে দিতে পার্ব্বেন ব'লে মনে বিশ্বাসও নেই। আপনি বুঝিয়ে দিন দেখি কৃপা ক'রে, সে অধ্যাত্মবলটা কি—যাতে ক'রে আমরা স্বরাজলাভ করতে পারব এবং তার সাধনপথই বা কোথায়?"

রাজা সহাস্যে বলিলেন, "আজকাল সারা পশ্চিম ভূরাজ্য ভারতকে অধ্যাত্মগুরু ব'লে স্বীকার করছে, আর ভারতসন্তান তোমরাই এ শক্তিতে বিশ্বাসহীন! কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্?"

শরৎকুমারও হাসিয়া বলিলেন, "কিন্তু দেশের অধ্যাত্মগুরু যাঁরা, তাঁরা ত সকলেই আমাদের প্রতি বিমুখ হয়ে পশ্চিমমুখে ধাবিত, কি করি বলুন?"

"এই যে সব ছেলেরা দেশকে ইংরাজের অধীনতা মুক্ত করবার জন্য প্রাণপাত করছে তাদের কি আত্ম-শক্তির কিছু অভাব আছে? কিন্তু শব-সাধনায় সে শক্তি প্রেতবল লাভ করছে। তপস্যাবলে যে শক্তি পুণ্যশক্তিতে পরিণত হয়, তাকেই বলে অধ্যাত্মবল।"

"ভয় লাগিয়ে দিলেন যে! আগে মুনি-ঋষিরা যুগযুগান্তরব্যাপী তপস্যায় কাম্যফল লাভ করতেন,— তাঁরা ছিলেন মৃত্যুঞ্জয়। কিন্তু রাজপীড়িত দৈবপীড়িত মরণপথের পথিক আমাদের দেখছি তা হ'লে কোন আশাই নেই।"

শরৎকুমারের এই গম্ভীর কৌতুকে রাজা হাসিয়া বলিলেন, "তবুও আশায় বুক বাঁধতে হবে। স্বরাজের অধিকারী যদি হ'তে চাও ত সঞ্জীবনী সুধার আবিষ্কারে উঠে প'ড়ে লাগ।"

"মা দুর্গা ব'লে ঝুলে পড়াও যে এর চেয়ে সহজ, রাজাবাহাদুর; আর পথও জানিনে, কথাটা শোনা মাত্রই এক পা না বাড়িয়েও যে গোলক-ধাঁধার মধ্যে গিয়ে পড়েছি।"

"হ্যাঁ, একরূপ অসাধ্য-সাধন বই কি, চারিদিকের গভীর বন-জঙ্গল কেটে যদি পথ করতে পার—তবেই ত সেই মানস-পাহাড়ের মধু চাকের সন্ধান মিলবে, আর সেই কষ্ট যদি স্বীকার করতে না চাও ত চির-কাল জঙ্গলেই প'ড়ে থাক। অনেকে আইরিশদের সঙ্গে আমাদের অবস্থার তুলনা করেন; কিন্তু তাদের অধীনতা পরিপূর্ণভাবে বাইরের—বহিঃশত্রুর দমনেই তাদের জয় অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু আমাদের মনঃপ্রাণ আত্মা পর্য্যন্ত যে অধীনতার ডোরে ক'ষে বাধা! স্ত্রীজাতির উচ্চ অধিকার আমরা মানতে চাইনে— বর্ণবিভেদ আমরা ভুলতে পারিনে। হিন্দু মুসল-মানের মিলন আমরা অসম্ভব জ্ঞান করি, বিলাতে গেলে আমাদের অধঃপতন হয়, নীচ জাত মন্দিরে ঢুকলে দেবতাও তা'কে নির্য্যাতন করেন, আর এই সব সংস্কার-মাহাত্ম্যে পতিত হলে ধরাখানাকে আমরা সরা জ্ঞান করি—হায় রে! মনের এই সব জঙ্গল সাফ না ক'রে দিলে স্বরাজ-প্রতিষ্ঠার স্থানই বা কোথায়, তাই বল ত?"

শরৎকুমারও এবার গম্ভীরভাবেই বলিলেন,— "আজ কাল অনেকের মনেই এ সত্য জেগে উঠেছে—কিন্তু সারা দেশের মতি-গতিকে এই ভাবে ফিরিয়ে তোলা একরূপ অসম্ভব বলেই মনে হয়। বুদ্ধ, চৈতন্যও যে এ চেষ্টায় হার মেনেছেন।"

"অসম্ভব নয় ডাক্তার, অসম্ভব নয়। যখনই আমি মনে করি অসম্ভব, তৎক্ষণাৎ দৈববাণী শুনতে পাই—'না না, অসম্ভব নয়।' কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর নির্ভীকতা, বাঙ্গালীর সাহস, হাস্যকর কৌতুক প্রহসনের বিষয় ছিল—আর এখন বীরত্বে বাঙ্গালী ইংরাজসিংহেরও ভয়ের কারণ হয়ে পড়েছে। যে সব শক্তিশালী যুবক বিপ্লব-চক্রান্তে মেতেছে— তারা যদি বোঝে সে পথে নয়, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত পথেই ভারতের মুক্তি তা হ'লে তাদের সমবেত চেষ্টা কখনই নিষ্ফল হবে না।'

তাহার পর তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "যোগ্যতালাভের জন্য তোমরা উঠে প'ড়ে লাগো, ডাক্তার। ঘাতকের কায ছেড়ে মুক্তির লাঙল কাঁধে ক'রে—নবীন চাষার দল তোমরা, বৌদ্ধযুগের আদর্শে গ্রামে-গ্রামে নগরে-নগরে তোমাদের মনঃ-শুদ্ধির উৎকর্ষণ-পদ্ধতি প্রচার কর, তা হ'লে

তপস্যা-তুষ্ট ভগবান্ এক দিন স্বয়ং হলধররূপে অভ্যুদিত হয়ে নিজ হাতে হল ধর্‌বেন।"

"তাঁ'র উদয়ে ত সকল সমস্যারই সমাধান হয়ে যাবে। কে বল্‌তে পারে, অস্ত্রচালনা দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় তিনি স্বরাজলাভের পথ নির্দ্দেশ করবেন না? যুগান্তরকারী কল্কি-অবতারের বীররূপই ত আমাদের কল্পনাপটে মুদ্রিত!"

রাজা হাসিয়া বলিলেন, "তুমি দেখ্‌ছি অস্ত্র না ধ'রে ছাড়বে না; লোকের অঙ্গচ্ছেদ ক'রে ক'রে অস্ত্রের উপরই তোমার বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মে গেছে। নবীন চালক যদি স্বরাজলাভের জন্য অস্ত্রচালনায় উপদেশ দেন, তবে তিনিই পাঞ্চজন্য ঘোষণা ক'রে তোমাদের সারথি হবেন। কিন্তু এখনো সে সময় আসে নি, আমাদের আত্মশক্তি এখনও ভ্রূণরূপ অস্ফুট, অপূর্ণ। তোমাকে আমি এ কথা বোঝাতে পারছি কি না, জানি না; তবে তোমাদের অস্ত্র-পাণ্ডাগণ—মাণিকতলার সেই বালকরা যে ধরা পড়ার সময় এ কথা বুঝেছে, তা'তে সন্দেহ নেই!"

রাজা মুহূর্ত্তকাল থামিলেন, তাহার পর অন্তরঙ্গ বন্ধুর নিকট হৃদয় উদ্‌ঘাটন করিয়া মনের জ্বালানিবৃত্তির উদ্দেশ্যেই যেন কহিলেন—"দেখ ডাক্তার, এ দুঃখ আমি কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারিনে, যে মহাপ্রাণ বালকদের আমরা হারিয়েছি, তাদের শোক আমি কিছুতেই ভুল্‌তে পারিনে—তারা দিগ্‌ভ্রান্ত না হ'লে দেশের প্রাণে তারা ইন্দ্রধনু ফুটিয়ে তুল্‌তে পারত। এত শক্তি তাদের বৃথা কাযে নষ্ট হ'ল?"

"আমার কিন্তু তা' মনে হয় না। ভুলই করুক, আর যাই করুক, তাদের আত্মোৎসর্গ বৃথা যায় নি।"

"তা ঠিক, এ সংসারে কোন energyই বৃথা যায় না—সব ভুলভ্রান্তির মধ্যে থেকেই ভগবান্ পরাফল আদায় ক'রে নেন। কে বলতে পারে—এই শিক্ষাই তাদের ভবিষ্য জীবন-গঠনের সোপানপথ নয়?"

বলিয়া রাজা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সর্ব্বশক্তিমান্ নিয়ন্তৃপুরুষের উদ্দেশে মনে মনে কহিলেন,—"হে অকূলের কর্ণধার, তাদের রক্ষা কর, প্রভু, এই শিশুমতি বালকদের মোহকৃত অপরাধ মার্জ্জনা ক'রে কূলে তুলে নিয়ে এদের পুণ্য কাযের অবসর দাও।"

তকমাধারী ভৃত্য কিছু পূর্ব্বে এখানে আসিয়া বারান্দার পাশের বড় টেবিলে চা'র সরঞ্জাম গুছাইতেছিল—সে মৃদু-মধুর ধ্বনিতে ঘণ্টা বাজাইয়া জানাইল—চা প্রস্তুত।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

রাজা উঠিয়া শরৎকুমারকে বলিলেন,—"আসল কথাটাই তোমাকে এখনও বলা হয় নি, ডাক্তার, চল, চা খেতে খেতে বল্‌ছি। এতক্ষণ তর্কে-বিতর্কে বোধ হয় তোমার গলা শুকিয়ে গেছে।"

তাঁহারা উভয়ে চা-টেবিলের সম্মুখে আসিবামাত্র খানসামা চা-দানী হইতে দুই পেয়ালা চা ঢালিয়া উভয়ের নির্দ্দিষ্ট আসনের নিকট ধরিয়া পরে রাজ-ইঙ্গিতে ট্রে শুদ্ধ চা-দানী শরৎকুমারের হাতের কাছে রক্ষা করিল। রাজা বলিলেন,—"ব'স ডাক্তার, তুমি খেতে আরম্ভ কর—আমি মুখে একটু জল দিয়ে আসি।"

রাজা স্নানের ঘর হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,—"চা'র পেয়ালা নিয়ে চুপচাপ ব'সে আছ দেখ্‌ছি? আজ রাণী আসেন নি—বোধ হয়, সখীবেষ্টিত আছেন, আজ তোমাকে নিজের আতিথ্যের কায নিজেই করতে হবে—বুঝলে ত, ডাক্তার?"

রাজকুমারী যে সখীবেষ্টিত নহেন—এই গুপ্ত রহস্য প্রকাশে রাজার ভুল ভাঙ্গিতে প্রয়াস না করিয়া শরৎকুমার দাঁড়াইয়া উঠিয়া সহাস্যে কহিলেন, "আতিথ্যের কিছুমাত্র ত্রুটি হবে না, রাজাবাহাদুর, সেজন্য ব্যস্ত হবেন না।"

উভয়ে আসন গ্রহণ করিবার পর খানসামা কেক, মিষ্টান্ন প্রভৃতির থালা যথাক্রমে একটির পর একটি আনিয়া উভয়কে এক একবার দেখাইতে লাগিল। তাঁহারা ইচ্ছামত পার্শ্বস্থিত নিজ নিজ রেকাবে ভোজ্য-দ্রব্য কিছু কিছু উঠাইবার পর থালাগুলা পুনরায় টেবিলে যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া ভৃত্য অতঃপর দ্বার-প্রান্তে হরকরার নিকট গিয়া বসিল। আপাততঃ তাহার পরিবেষণ-কার্য্য এইখানেই শেষ, চা মিষ্টান্ন সকলই তাঁহাদের হাতের কাছে, আবশ্যকমত নিজেরাই তুলিয়া লইতে পারিবেন এবং প্রয়োজন বুঝিলে ঘণ্টা বাজাইয়া তাহাকে ডাকিবেন।

রাজা দু'এক ঢোক চা-পান করিবার পর বলিলেন,—"দেওয়ানের সঙ্গে আজই কি তুমি প্রসাদ-পুর যেতে পার্‌বে? সন্তোষ গুলীর আঘাতে শয্যাগত, সেখানকার ডাক্তাররা তোমাকে চায়।"

শরৎকুমার চা'র পেয়ালাটা মুখ হইতে নীচে নামাইয়া রাখিয়া বলিলেন, "অবশ্যই। আমিও কিন্তু, রাজাবাহাদুর, যে কথা আপনাকে বলতে এসেছিলুম, এখনও বলা হয় নি।"

"অন্যত্র পালাবার কথা নয় ত? ভয় হয় যে শুনে।"

শরৎকুমার সহাস্যে বলিলেন, "এ ভয় নয়, বিস্ময়! একটা ভেল্কীবাজির মধ্যে প'ড়ে গেছি, রাজাবাহাদুর!" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া তিনি পকেট হইতে রাজকুমারীর মুক্তার মালা বাহির করিয়া টেবিলে রাখিয়া দিলেন।

রাজা মালাছড়া হাতে উঠাইয়া লইয়া দেখিতে দেখিতে কহিলেন, "এ ত মনে হচ্ছে রাণীর মালা?"

"এই মালা আমার বাক্সের মধ্যে পাওয়া গেছে।"

শুনিবামাত্র রাজার মনে হইল, রাজকুমারীই এ মালা গোপনে ডাক্তারের বাক্সে রাখিয়া, যে কথা মুখে তাঁহাকে বলিতে পারেন নাই—প্রকারান্তরে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন।

রাজা মনের কথা মনেই রাখিয়া—মালাগাছি শরৎকুমারের হাতের কাছে রাখিয়া বলিলেন,—"এ মালা তুমি পেয়েচ, তুমিই রাখ; তবে যাঁ'র মালা, তিনিই যদি ফিরে চান ত তাঁ'কেই পরিয়ে দিও।"

এই সুস্পষ্ট ইঙ্গিতে শরৎকুমারের মুখ লজ্জা-রক্তিম হইয়া উঠিল,—মালাগাছা টেবিলেই পড়িয়া রহিল,—তিনি মনের ভাব ঢাকিবার অভিপ্রায়ে শূন্য পেয়ালাটা মুখে উঠাইয়া ধরিলেন। এই সময় সহসা শ্যামাচরণ গৃহাগত হইয়া টেবিলে মতির মালা দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এ কি, মতির মালা এখানে প'ড়ে যে? রাজকুমারীর মালা-না? এক পেয়ালা চা দে, শরতা।"

শরৎকুমার পেয়ালাতে চা ঢালিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজা জানেন, শ্যামাচরণ স্যাণ্ডউইচ-ভক্ত, তাহার থালাখানা তাঁহার দিকে ঠেলিয়া দিয়া একটু চাপাহাসি হাসিয়া বলিলেন, "এ মালা ডাক্তারের লেখার বাক্সে পাওয়া গেছে।"

রাজা যা' মনে করিয়াছিলেন, ঠিক সেই কথা শ্যামাচরণের মনেও উদয় হইল। তিনিও মনে মনে হাসিয়া মনে মনে বলিলেন, "এমন বোকা ছেলে যদি দুটি দেখে থাকি! এ ছেলের যদি এ দিকে কাণা-কড়ি বুদ্ধি ও সাহস থাক্‌ত, তা হ'লে কোন্ জন্মেই কায গুছিয়ে ফেলতে পার্‌ত।"

মুখে বলিলেন, "আশ্চর্য্য কাণ্ড ত! যা' বাবা রাজকুমারীর কাছে, তিনি নিশ্চয়ই এর একটা explanation দিতে পার্‌বেন।"

তাঁহাদের উভয়ের ভাবগতিক বুঝিয়া শরৎকুমার লজ্জিতভাবেই বলিলেন, "সেখান থেকেই আস্‌ছি। আমার বাক্সে তাঁর মালা পাওয়া গেছে শুনে তিনিও খুব আশ্চর্য্য হয়েছেন।"

তবুও এ কথায় শ্যামাচরণের মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিল না-বাঙ্গালা দেশের মেয়ে—তাদের বুক ফাটে তবু মুখ ফোটে না! রাজকুমারী হয় ত বা লজ্জায় কথাটা চাপিয়া গিয়াছেন!

সন্দিগ্ধভাবে তিনি কহিলেন, "রাজকুমারীও বল্‌তে পার্‌লেন না? আচ্ছা, আমরা তদারক ক'রে দেখব এখন, তুই এখন যা', কাপড়-চোপড় গুছিয়ে নিগে,—বেশী দেরী কর্‌লে চল্‌বে না—দেখছিস্ ত ৫টা বাজে।"

সকলেই ঘড়ীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। রাজা বলিলেন, "এত দেরী হয়ে গেছে—বুঝতে পারি নি।"

শরৎকুমার বলিলেন, "আচ্ছা, আমি তবে ট্রাঙ্কটা গুছিয়ে আসি, সময় বেশী যাবে না তা'তে। আমি ফিরে এসে মালাছড়া নিয়ে রাজকুমারীকে দিয়ে আস্‌ব এখন। এখন আপনার কাছেই থাক।"

শরৎকুমার চলিয়া গেলে রাজা বিস্ময় প্রকাশ-পূর্ব্বক কহিলেন, "ব্যাপারখানা কি, গাঙ্গুলি মশায়, কিছুই ত বুঝতে পার্‌ছিনে।" শ্যামাচরণ তখন দুই টুকরা রুটিই এক সঙ্গে মুখে পুরিয়াছিলেন, কতকটা গিলিয়া ফেলিয়া জড়িতকণ্ঠে কহিলেন, "তাই ত, আপনি একবার রাজকুমারীকে জিজ্ঞাসা করুন না? কি জানি, লজ্জায় শরৎকুমারের কাছে কোন কথা যদি চেপে গিয়েই থাকেন।"

রাজা কহিলেন, "না, গাঙ্গুলি মশায়, রাণী যখন বলেছে, সে এ সম্বন্ধে কিছু জানে না, তখন ঠিক কথাই বলেছে। এই যে ডাক্তার—এর মধ্যে কাপড় গোছান হয়ে গেল?"

শরৎকুমার গৃহাগত হইয়া বলিলেন, "না, রাজা-বাহাদুর, এই দেখুন, আর এক অদ্ভুত কাণ্ড!" বলিয়া একটি ক্ষুদ্র পিস্তল বুক-পকেট হইতে বাহির করিয়া টেবিলে রাখিয়া কহিলেন—"কাপড় গোছাতে গিয়ে ট্রাঙ্কের মধ্যে এই পিস্তল পেয়েছি; এ ত আপনার পিস্তল, আমার বাক্সে রাখলে কে?" সকলে অবাক্ হইয়া গেলেন। পিস্তলটা কেস হইতে বাহির করিয়া নাড়াচাড়া করিয়া দেখিতে দেখিতে রাজা বলিলেন, "এ-ও দেখছি সন্তোষের কায; কল্‌কাতায় আসার দু'এক দিন আগে সন্তোষ একটি ছেলেকে নিয়ে আমার কাছে চাঁদা চাইতে আসে। জান ত আমার চেক বইখানা লেখার টেবিলের খোলা টানার মধ্যেই থাকে, সেই টানার মধ্যে এই পিস্তলটাও ছিল।

চেকবই আমি যখন বার করি,সন্তোষ তখন তা দেখেছিল এবং পরে কোন সময়ে এসে সেখানা যে চুরী ক'রে নিয়ে গেছে, তাতেও সন্দেহ নাই। কিন্তু পিস্তলটা চুরী ক'রে তোমার বাক্সে রাখার উদ্দেশ্য কি ?"

শ্যামাচরণ কহিলেন, তোর সঙ্গে কি তার শত্রুতার কোন কারণ ঘটেছে ?"

"কই, আমি ত কিছুই জানি নে। তবে তাদের সমিতিতে যোগ দেবার জন্য সে আমাকে দেখা হ'লেই ডাকৃত, আমি তাতে রাজি হই নি -এতেই যদি তার কাছে অপরাধী হয়ে থাকি।"

হঠাৎ শরৎকুমারের মনে পড়িল, সেই সন্ন্যাসীকে, তাহার সহিত এ ঘটনার কিছু যোগ আছে না কি ? বিচিত্র কি ? কিন্তু এ কথা শরৎকুমার বাহিরে প্রকাশ করিলেন না- কেন না, রাজকুমারী এ সংস্রবে জড়িত।

শ্যামারণ বলিলেন, "স্পষ্টই ত তা হ'লে বোঝা যাচ্ছে, কেন সে তোমার শত্রু হয়েছে! বিপ্লবপন্থী ওরা, সোজা লোক ত নয় ? তোমাকে যে ওরা খুন ক'রে বসে নি, এই ঢের - এখন যা' বাবা, কাপড়চোপড় গুছিয়ে ফেল্‌গে।"

শরৎকুমার বলিলেন, -"যাচ্ছি, মামা, কাপড় গোছাতে আমার সময় বেশী লাগবে না, আপনি আশ্বস্ত থাকুন---আমি ঠিক সময়েই দেওয়ানের সঙ্গ ধরব।" তাহার পর রাজার উদ্দেশে কহিলেন, "আপনার পিস্তল আপনিই রাখুন তবে, আমি প্রসাদপুর যাচ্ছি - দেখি, সন্তোষের কাছ থেকে এ সম্বন্ধে কিছু খবর আদায় করতে পারি কি না ?"

রাজা বলিলেন, "না, পিস্তলটা তুমিই কাছে রাখ---যে রকম ষড়যন্ত্র চলেছে দেখছি তোমার সতর্ক থাকা উচিত।"

শরৎকুমার পিস্তল উঠাইয়া লইয়া মৌখিক ধন্যবাদ না দিয়া নীরব নমস্কারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন।

শ্যামাচরণ শরৎকুমারের পূর্ব্বকথার উত্তরে কহিলেন, "শুধু এ পিস্তলরহস্যের কথা নয় - অনেক কথাই তা'র কাছ থেকে আদায় করতে হবে--- বুঝলি, বাবা ? এখন সারিয়ে তোল্ ত তাকে আগে সেখানে গিয়ে।"

রাজা বলিলেন,—"হ্যাঁ, যমের সঙ্গে লড়াই করার জন্যই আপাততঃ প্রসাদপুরে তোমাকে পাঠান হচ্ছে, ডাক্তার, বিয়েটার পরে আমরাও গিয়ে পড়ব।"

শ্যামাচরণ বলিলেন, "দেখিস্ যেন হার মানিস নে, বাবা, তা হ'লে আমার মাথা হেট হ'বে—বুঝলি ত ? বিয়ের সময়টাই ঠিক তোর চ'লে যেতে হচ্ছে—অণুভার মনে খুবই দুঃখ হবে, কিন্তু উপায় ত নেই।"

শ্যামাচরণের নিজের মনে যে ইহাতে কতটা দুঃখ হইতেছে, সে কথা আর তিনি বলিলেন না। কিন্তু শরৎকুমারের তাহা বুঝিতে বাকী রহিল না। একটা বিষাদের ছায়া তাঁহার মনেও ঘনীভূত হইয়া আসিতে লাগিল।

হাসির আবরণে সে ভাব চাপিয়া তিনি বলিলেন, "আমি অণুকে বুঝিয়ে বল্‌ব এখন। আর দেরী করব না, মামা, আমি চল্লুম,- কাপড় গুছিয়ে এখনই আবার আস্‌ছি।"

তার পর সলজ্জ দৃষ্টিতে রাজার দিকে চাহিয়া আধোবাধো ভাবে তিনি কহিলেন, "মতির মালাগাছটিও তা হ'লে নিয়ে যাই,—রাজকুমারীকে ফিরিয়ে দিয়ে প্রসাদপুরে যাবার কথা তাঁকে ব'লে আসি।"

শরৎকুমার মালা লইয়া মৃদুহাস্যে ক্ষিপ্রপদে চলিয়া গেলেন,– রাজা শ্যামাচরণকে বলিলেন,— "দেখুন, গাঙ্গুলি-মহাশয়, প্রসাদপুরের অস্ত্রচুরীর খবর এখন পুলিসকে জানিয়ে কায নেই—খবরের কাগজেও বিজ্ঞাপন দেওয়া এখন বন্ধ থাক্। আমাদের বিরুদ্ধে একটা যে ষড়যন্ত্র চল্‌ছে, সেটা বেশ বোঝা যাচ্ছে—কিন্তু কি রকম ধরণের সে ষড়যন্ত্র, কোথা থেকে তার উৎপত্তি- যত দিন তা না জানা যায়—তত দিন খুব সাবধানে চল্‌তে হবে। পুলিস এখন এ খবর পেলেই---প্রথমে সন্দেহ করবে শরৎকুমারকে এবং তার গ্রেপ্তারেই পুলিসের কর্ত্তব্য শেষ হ'বে।"

শ্যামাচরণ ব্যস্ত হইয়া বলিলেন,—"তবে আমি চল্লুম – যে ছোকরাকে বিজ্ঞাপনগুলা দিয়েছি—তার কাছ থেকে এখনই সেগুলো ফেরত নিই গিয়ে। অবশ্য সে বিজ্ঞাপন কাল যাবার কথা—আজ না,—তবুও সাবধানের মার নেই।"

শ্যামাচরণ চলিয়া গেলে রাজা রেলিঙের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। তখন হ্রদের পরপারে অতল দিগন্ততলে সূর্য্য-গোলক ডুবিয়া পড়িয়াছে ;—মৃতপতির অনুগামিনী সিন্দুরসীমন্তিনী সতার ন্যায় শীত-অপরাহ্ণ বেলা, শেষ গৌরবে হাসিয়া উঠিয়াছে। কাননের তরু-শিখরে, হ্রদের জলে, প্রস্তরমূর্ত্তির আননে ক্রীড়মান রক্তিমচ্ছটা ধীরে ধীরে মৃদু হইতে মৃদুতরভাবে সায়াহ্নের ছায়ালোকে কিরূপ অপরূপভাবে আত্মলোপ করিতেছিল, রাজা দাঁড়াইয়া স্তব্ধভাবে সেই শোভা দেখিতেছিলেন! জ্যোতির্ম্ময়ী আসিয়া পিতার কণ্ঠলগ্ন হইয়া তাঁহার ধ্যানভঙ্গ

করিলেন। কিছু পরে শরৎকুমারও অনাদির সহিত প্রসাদপুরযাত্রার পূর্ব্বে তাঁহার বিদায়-পদধূলি লইবার জন্য আগমন করিলেন।

একমাত্র অনাদি প্রসাদপুরের চৌর্য্য-রহস্য ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এখন প্রসাদপুর যে শরৎকুমারের পক্ষে নিরাপদ স্থান নহে, ইহা সে ভাল করিয়াই বুঝিল। কিন্তু শপথে তাহার মুখ বন্ধ, কোন কথা স্পষ্ট করিয়া খুলিয়া বলিবার যো নাই; বন্ধুর এই সম্ভাবিত বিপদে নীরব রক্ষিরূপে সে তাঁহার সহযাত্রী হইল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

শরৎকুমার সন্তোষের বাম বাহুমূল পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন, পিস্তলের দ্বারা সে আহত হয় নাই। ক্ষতলক্ষণে কোনরূপ বিস্ফোটক দ্রব্যের আঘাতই প্রতীত হয়। ঘটনাস্থলে তৎক্ষণাৎ হাতটা কাটিয়ে দিলে সে বাঁচিতেও পারিত—কিন্তু এখন সে ক্ষত যে ভাবে আবক্ষঃ বিস্তার লাভ করিয়াছে, তাহাতে সে আশা অল্প; তথাপি বাহুচ্ছেদ ছাড়া তিনি অন্য কোন উপায় দেখিলেন না।

অপারেসনের পর প্রায় সপ্তাহকাল কাটিয়া গিয়াছে। রোগীর অবস্থা আজ অল্প ভাল, মাঝে মাঝে সে চেতনালাভ করিতেছে, কিন্তু মানুষ চিনিবার শক্তি এখনও ফিরে নাই, কথাবার্ত্তাও খুব এলো-মেলো। একবার চক্ষু মেলিয়া অনাদির দিকে চাহিয়া সে বলিল,—"গুরুদেব ?"

অনাদি এখানে আসিয়া অবধি তাহার সেবায় নিযুক্ত আছে। হাসপাতালের দুই এক জন কম্পাউণ্ডার সহকারী মাত্র, মাঝে মাঝে আসিয়া অনাদিকে অব্যাহতি প্রদান করে। ডাক্তারের আদেশে বাহিরের লোকের এখানে একেবারেই প্রবেশ নিষেধ। সন্তোষের দলের লোক এ পর্য্যন্ত কেহ জানে, না যে, সে পীড়িত অবস্থায় হাসপাতালে পড়িয়া আছে,—সকলেই জানে সন্তোষ রাজার কাছে, কলিকাতায়।

অনাদি সন্তোষের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে উত্তর করিল,—"কি সন্তোষ ভাল আছ ত ?"

সে প্রশ্ন রোগীর মাথায় পৌছিল না—সে পূর্ব্বের ন্যায় বিজড়িত অস্পষ্ট স্বরে কহিল,—"দেশশত্রু শরৎকুমার—মেরেছি তা'কে গুরুদেব।"

বলিতে বলিতে তাহার চক্ষু আবার বুজিয়া আসিল। কিছু পরে পুনরায় চোখ খুলিয়া সে বলিল, "আপনার আদেশ পালন করেছি—সে মরেছে।" উগ্র আহ্লাদে সে হাসিতে চেষ্টা করিল,—পারিল না—হাসির ভঙ্গীতে তাহার মুখ বিকৃতভাব ধারণ করিল।

অনাদি ব্রাণ্ডি-মিশ্রিত ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ তাহার মুখে প্রদান করিলেন, পান করিয়া সে নিঃঝুম রহিল,—সে দিন আর কোন কথাই কহিল না।

শরৎকুমারকে মারিবার উদ্দেশ্যে বোমা প্রস্তুত করিতে গিয়া তাহার দ্বারাই যে সে নিজে ঘায়েল হইয়াছে, সন্তোষের কথা হইতে অনাদি ও ডাক্তার উভয়েই তাহা সুস্পষ্ট বুঝিলেন।

দ্বিতীয় দিন শরৎকুমার আসিয়া তাহাকে ঔষধ দিবার পর সহসা সে বিছানায় উঠিয়া বসিল,—তাঁহাকে দেখিয়া বিকৃতকণ্ঠে বলিল,—"কে তুমি —ওঃ ১৫ নম্বর ?"

শরৎকুমার মস্তকের ইঙ্গিতে মৌনে তাহার কথায় সায় দিয়া ধীরে ধীরে তাহাকে পুনরায় বিছানায় শোয়াইয়া দিলেন। সে কহিল,—"বিজুমিঞা, জয় ভবানী,—জ্বালাও লণ্ঠন,—দোলাও নিশান,—"

শরৎকুমার বুঝিলেন,—লণ্ঠন অর্থে স্বাধীনতার আলোক, তিনি প্রত্যুত্তরে কহিলেন,—"জয় জয়—জ্বালো আলো—" এ কথায় তাহার মুখটা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, কিন্তু ওষ্ঠাধরে অল্প একটু হাসির রেখাপাত হইতে না হইতে তাহার নয়ন মুদ্রিত হইয়া পড়িল। সহসা আবার কিছু পরে জাগিয়া সে বলিয়া উঠিল "সে কাগজখানা ?"

"কি কাগজ ?"

"বুঝতে পার না,——রাজার—রাজার "

বলিয়া আবার নীরব হইয়া পড়িল। শরৎকুমার ও অনাদি উভয়েই উৎকণ্ঠিত হইয়া ভাবিলেন—রাজার কি না জানি কাগজ সে আত্মসাৎ করিয়াছে।

কিন্তু সে দিন তাহার নিকট হইতে আর কোন কথাই পাওয়া গেল না।

তৃতীয় দিন সকালে ক্ষতস্থানে ঔষধাদি দেওয়ার পর সে বেশ যেন প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিল। ডাক্তারের দিকে পূর্ণকটাক্ষে চাহিয়া কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। ডাক্তার বুঝিলেন,—তাঁহাকে সে চিনিবার চেষ্টা করিতেছে এবং এই প্রয়াস শ্রম তাহার দুর্ব্বল মস্তিষ্ককে এখনই ক্লান্ত করিয়া তুলিবে, তিনি তাহার চক্ষুর আড়ালে গৃহের অন্যত্র সরিয়া

গেলেন, অনাদিকে সে বেশ সহজেই চিনিতে পারিল,—তাহার দিকে চাহিয়া আহ্লাদিতভাবে কহিল,—"ভাই অনাদি, তুমি কি সেবাধারী হয়েছ?"

"হয়েছি বই কি?"

"তবে একটা কথা বলি শোন।" বলিয়া সাবধানতা অবলম্বনে অতি মৃদুকণ্ঠে বলিল,—"সব অস্ত্র চুরী করেছি—তুলক্রামের খুব সুবিধা।"

"ধনুকটাও চুরী করেছ?"

"না না, বড় ভারী! তুই কি নিবি? বন্দুক না তলোয়ার?"

ধনুক তাহা হইলে সে চুরী করিতে যায় নাই, সম্ভবতঃ অন্য কোন কারণে আপনা হইতে দেওয়ালচ্যুত হইয়া তাহা নীচে পড়িয়া গিয়া থাকিবে, ইহাই অনাদি মনে করিল।

উত্তরে সে কহিল,—"পিস্তল চাই আমি।"

রোগী বলিল,—"পিস্তল হাঃ হাঃ ডাক্তারের বাক্সে—"

"কেন?"

"তা'কে চোর ভাব বে—দেশশত্রু সে দেশশত্রু—পার করেছি তাকে।"

অনাদি বলিল,—"বেশ করেছ—কিন্তু তার অপরাধ?"

"রাজকুমারী যে তার বাধ্য—গুরুদেব?—গুরুদেব?"

বলিতে বলিতে সন্তোষের চোখ বুজিয়া আসিল, শরৎকুমার নিকটে আসিয়া তাহার মাথায় বরফ-জল ও অনাদি মুখে পানীয় দিতে লাগিলেন। কিছু পরে সে চোখ মেলিল,—অনাদি জিজ্ঞাসা করিল,—"কাগজখানা?"

সে অস্ফোচ্চারিত ভাষায় বিড়বিড় করিয়া উত্তর করিল,—"কাগজ—চেক, হুবহু সই করেছি বিজ্মিএা।"

কি সর্ব্বনাশ! রাজার চেক চুরী করিয়া জাল সই করিয়াছে না কি!

অনাদি কহিল,—"কোথায় রেখেছ?"

"পকেটে।"

ঘরের আলনায় টাঙ্গান সন্তোষের পিরাণটা শরৎকুমার হাৎড়াইতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু কিছুই পাইলেন না! কিছু পরে সন্তোষের চেতনা একটু ফিরিয়া আসিলে অনাদি তাহার কানের নিকট মুখ লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"চেক কোথায়? পকেটে ত নেই—?" সে শূন্য দৃষ্টিতে অনাদির দিকে চাহিয়া বলিল,—"গুরুদেব?"

"চেক কোথায়?"

"দেরাজে—দেরাজে।"

শরৎকুমার লাইব্রেরী-ঘরে সন্তোষের পূর্ব্বাধিকৃত দেরাজ খুঁজিতে চলিয়া গেলেন।

সন্তোষের জ্বর বাড়িতে লাগিল,—বিঘোরে সে নিঃঝুম হইয়া রহিল। সহসা দ্বিপ্রহরের পর একবার চোখ মেলিয়া অনাদিকে জিজ্ঞাসা করিল,—

"গুরুদেব, এখন কি যেতে হবে?"

"কোথায়?"

সন্তোষের ওষ্ঠাধরে হাসির যৎসামান্য রেখাপাত হইল সে কহিল,—"ভুলে গেলেন, তুলক্রামে?

অনাদি বুঝিল, সে ডাকাতির কথা বলিতেছে,—তাহার মাথায় বরফ-জল দিতে দিতে অনাদি কহিল,—"হাঁ, যেতে হবে বই কি। কোথায় বল ত?"

এ কথার উত্তর না করিয়া সে বলিল,—"যাচ্ছি চল। সর্দার—সুলতানাজ, তোগলক মিঞা—বাজিমাৎ! গুড় গুড় গুড়ুম"

এই সময় শরৎকুমার গৃহ-প্রবেশ করিলেন, সে তাঁহার দিকে কট্‌মট্‌ করিয়া চাহিয়া হঠাৎ ভীতস্বরে বলিয়া উঠিল,—"ও কে? ও কে? ডাক্তার? আমাদের আড্ডায়! সর্ব্বনাশ! সব প্রকাশ ক'রে দেবে—দেশশত্রু, ও দেশশত্রু! মার ওকে, মার—"

বলিতে বলিতে অতিরিক্ত উত্তেজনাবশে সে বিছানায় উঠিয়া বসিল এবং পিস্তল ছুঁড়িবার ভঙ্গীতে ডান হাতটা উঠাইয়া ধরিবামাত্র তৎক্ষণাৎ অজ্ঞান হইয়া আবার শয্যায় টলিয়া পড়িল—সঙ্গে সঙ্গে তাহার ক্ষীণ প্রাণ-বায়ুটুকু দেহ-বহির্গত হইয়া গেল।

* * * *

শরৎকুমার নব কার্য্যাধ্যক্ষের সহিত লাইব্রেরী-ঘরের আলমারি, ডেস্ক, দেরাজগুলি সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে লাগিলেন। কোন কাগজ-পত্র নব কার্য্যাধ্যক্ষ নষ্ট করে নাই। কাযের খাতাপত্র গুছাইয়া টেবিলে রাখিয়া বাজে কাগজপত্র তাড়া বাঁধিয়া 'থাকে' তুলিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু কোন তাড়ার মধ্যেই চেক পাওয়া গেল না, সন্তোষের সম্পত্তির মধ্যে একটা গুপ্ত দেরাজ—যাহার সন্ধান কার্য্যাধ্যক্ষও জানিত না একখানা নোট-বই আর দেয়ালের গায়ে কাঠের 'থাকের' উপর তিন একটা বিস্কুটের ভাঙ্গা টিন দেখিতে পাইলেন। টিনের মধ্যস্থিত দুই একটি আরকের শিশি—তাঁহার অনুমানের পক্ষে সাক্ষ্য দান করিল। টিনটা ঝাড়ুদার পরদিনই তুলিয়া এখানে রাখিয়াছিল।

এইরূপ খোঁজাখুঁজির পর হাসপাতালে পৌঁছিতে

তাঁহার অনেকটা বিলম্ব হইয়া পড়িল, পৌঁছিবার পর যে ঘটনা ঘটিল, তাহা পাঠক জানেন।

শরৎকুমার রাজাকে চেকের কথা জানাইতে সেই দিনই কলিকাতায় যাত্রা করিলেন। দেওয়ানেরও যাইতে ইচ্ছা ছিল; কিন্তু লাটের খাজনা সংগ্রহের আয়োজনে ব্যস্ত থাকায় যাইতে পারিলেন না। সন্তোষ-সংক্রান্ত ঘটনা পুলিসকে জানান হইবে কি না —এ সম্বন্ধে রাজাদেশ কি, তাহা জানিয়া দেওয়ানকে লিখিবার ভার তিনি ডাক্তারকেই প্রদান করিলেন। অনাদি শরৎকুমারের সহিত গেল না। সন্তোষের প্রলাপবাক্যে ডাকাতী সম্বন্ধে তাহার যে সন্দেহ জন্মিয়াছিল—তাহার মূলে কোন সত্য আছে কি না, সন্ধানের জন্য সে প্রসাদপুরে রহিয়া গেল। যে খাতাখানা শরৎকুমার সন্তোষের দেরাজ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, শবদাহ করিয়া আসিয়া অনাদি সেইখানা পড়িতে বসিয়া গেল।

ডাক্তারের সঙ্গে এইরূপ বোঝাপাড়া রহিল যে, অনাদি দুই এক দিনের মধ্যেই কলিকাতায় যাইবে, তবে যদি এখানে আরও কিছুদিন থাকা দরকার বোঝে ত পত্রে সে খবর ডাক্তারকে জানাইবে।

চেক চুরীর সংবাদে গাঙ্গুলী-মহাশয় রাজার সমস্ত চেক মিলাইতে বসিলেন। চেকের মুড়ি শুদ্ধ চুরী গিয়াছে—সুতরাং কেবল নম্বর মিলাইয়া চুরী-চেক ধরা নিতান্ত সহজ কার্য্য নহে। যাহা হউক, অনেক কষ্টে চুরী চেকের নম্বর যদি বা ধরা পড়িল—কিন্তু কোন্ নামে চেক কাটিয়াছে—টাকাই বা কত, তাহা ত বুঝা গেল না। তবে ব্যাঙ্কে গিয়া তিনি আশ্বস্ত হইলেন যে, সে নম্বরের চেক কেহ ভাঙ্গাইয়া লয় নাই।

মুক্তির নিশ্বাস ফেলিয়া শ্যামাচরণ তাহাদের আদেশ দিয়া আসিলেন যে, সে নম্বরী চেক কেহ ভাঙ্গাইতে আসিলে টাকা না দিয়া চেক আটকাইয়া রাখিয়া যেন তাঁহাদের খবর পাঠান হয়। রাজার মাথার উপর হইতে খুব একটা বিপদ কাটিয়া গেল। ইহাতে সকলেই বেশ একটু স্ফূর্ত্তি বোধ করিলেন।

অস্ত্র-চুরীর খবর রাজাদেশে এ পর্য্যন্ত পুলিসে জানান হয় নাই—চেকের কথাও রাজা অপ্রকাশ রাখিতে আজ্ঞা দিলেন। আসল কথা, প্রকাশ করিলেই ছেলেদের প্রতি পুলিস জুলুম আরম্ভ করিবে,—তখন তিনি ইচ্ছা করিলেও সে নির্য্যাতন হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেন না।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

মাণিকতলার রাজপ্রাসাদে অপরাহ্ণ কালে রাজকুমারীর পাঠগৃহের বারান্দায় দাঁড়াইয়া পণ্ডিত মহাশয় কুন্দের সহিত গল্প করিতেছিলেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের হাতে ছিল শিকলি-বাঁধা তাঁহার ময়না পাখীটি। সেটিকে তিনি কুন্দের দিকে বাড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন,—"লও কুন্দ, এটি আমার প্রাণপাখী, তোমার জন্যে এনেছি।"

পণ্ডিত মহাশয় অনুসন্ধানে জানিয়াছেন যে, ইংরাজী অনুকরণে আংটীদানে কন্যাকে বাগ্‌দত্তা করিয়া রাখা ব্রাহ্ম-পদ্ধতি। কিন্তু কুন্দের সংস্পর্শে আসিয়াও টোলের প্রাক্তন সংস্কার হইতে তিনি সম্পূর্ণভাবে এখনও মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই—চটি জুতা পরা পা দুখানি বিলাতি ষ্টিরাপের মধ্যে দিয়া ঘোড়ায় চড়ার কায়দাতে এখনও তিনি অনভ্যস্ত, অতএব নব্য সম্প্রদায়ের মত আংটীদানে engaged হইতে তাঁহার লজ্জাবোধ হইতে লাগিল। মূল্যবান্ আংটী দিতে পারিলেও বা এ লজ্জাকুণ্ঠা বিসর্জ্জন দিতে পারিতেন,—একটা সামান্য আংটী পরাইতে পরাইতে কি ভাষায় তিনি তাঁহার অসামান্য প্রেম প্রকাশ করিবেন? এই অকূল আকুল চিন্তাতরঙ্গে দোল খাইতে খাইতে তাঁহার মনতরী সহসা কূল দেখিতে পাইল,—কুন্দকে উপহার দিবার জন্য তিনি তাঁহার আদরের ময়না পাখীটি লইয়া আসিলেন, ইহার মত মূল্যবান্ জিনিস তাঁহার আর কি আছে!

কুন্দ কিন্তু ইহার মূল্য ঠিক বুঝিল না; সে রাগ করিয়া কহিল,—"আপনার পাখী আপনি রাখুন, আমি চাইনে। আমি জ্ব'লে মরছি এখন নিজের দুঃখে, এই সময় আবার আপনি এলেন জ্বালাতন করতে।"

কুন্দের নিকট এ রকম কথা শোনা পণ্ডিত মহাশয়ের অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, তিনি ইহাতে দমিলেন না—কেবল বাড়ান হাতটা টানিয়া যথাস্থানে রাখিয়া পাখীটার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন; পাখী মধুরকণ্ঠে "কুন্দ কুন্দ" বলিয়া নাচিতে আরম্ভ করিল। পণ্ডিত মহাশয় কহিলেন,—"কি হয়েছে, কুন্দ! কিসের দুঃখ?"

কুন্দ দুঃখের স্বরে কহিল,—"বড় বিপদে পড়েছি, পণ্ডিত মশায়।"

সে স্বরে কৃত্রিমতা ছিল না; পণ্ডিত মহাশয় নিজেকেই বিপদ্‌গ্রস্ত বিবেচনা করিলেন—উৎকণ্ঠিতভাবে কহিলেন,—"কি বিপদ্! বড় যে ভাবনা

লাগিয়ে দিলে! তোমার কি ফের অসুখ করেছে? আবার বাড়ী যাবে না কি, তা হ'লেই ত সর্ব্বনাশ!"

কুন্দের বিষণ্ণ মুখেও কৌতুকরেখা ফুটিল। মৃদু-হাসি হাসিয়া সে কহিল, "না, সে সব কিছু না—"

"তবে কি?"

"আমার দাদা ও সন্তোষদাদাকে রাজাবাহাদুর কর্ম্মচ্যুত করেছেন।"

"কেন? কি অপরাধে?"

"অস্ত্রশালা থেকে বন্দুক-টন্দুক কি সব না কি চুরী গেছে।"

পণ্ডিত মহাশয় ভাবিতভাবে কহিলেন,—"তোমার দাদার এমন মোটা মাইনের চাকরীটা গেল। ভাববারই ত কথা।"

"কিন্তু দাদা ত আর চুরী করেন নি। তবে তাঁর এ সম্বন্ধে কতকটা গাফেলি হয়েছে বটে। সন্তোষদা না কি—তার ছেলেছোকরা বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে অস্ত্রশালায় আড্ডা কর্‌ত। তা' দাদা কি ক'রে জানবেন যে, ভদ্রলোকের ছেলেরা চোর হবে।"

"তা ত ঠিক।"

"এই কথা যদি রাজাবাহাদুরকে কেউ বুঝিয়ে বলে!"

"তোমার দাদা কি তা বলেন নি?"

কুন্দ একটু চটা মেজাজে কহিল,—"তিনি কি বলেছেন না বলেছেন, আমি জানিনে—সম্ভবতঃ বলেছেন,—কিন্তু ফল ত কিছুই হয় নি। এখন সুপারিসই একমাত্র শেষ উপায়!"

"তুমিই ত রাজাবাহাদুরকে বল্‌তে পার।"

"সাহস হয় না,—পণ্ডিত মহাশয়; আপনি বলুন।"

সানুনয়কণ্ঠে কুন্দ এই অনুরোধ করিল। কিন্তু পণ্ডিত নয়ন বিস্ফারিত করিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিলেন;—"আমি রাজাবাহাদুরকে বল্‌ব! আমি যে কখনও মুখ তুলে তাঁর দিকে চাই নি! বেশ মুরুব্বি ধরেছ, কুন্দ!"

"তবে রাজকন্যাকে বলুন। তা' ত পার্‌বেন? তিনি যদি রাজাবাহাদুরকে বলেন—তবে দাদা নিশ্চয়ই মাপ পাবেন।"

"কেন, রাজকন্যা ত তোমারই প্রিয়সখী, কুন্দ বল্‌তে তিনি অজ্ঞান—তুমিই বল না।"

"না, আমার ভাইয়ের কথা বল্‌তে আমার লজ্জা করে, বিশেষ তিনি যখন কতকটা দোষী।"

আসল কথা, কুন্দ মনে মনে সন্তোষকে সন্দেহ করিতেছিল, সেইজন্য রাজকন্যার নিকট এ প্রসঙ্গ উত্থাপনে তাহার সাহসে কুলাইতেছিল না।

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন,-"আচ্ছা,বেশ। আমিই তবে রাজকুমারীকে বল্‌ব,—এখন পাখীকে নেও একটু? 'কুন্দ-কুন্দ' ক'রে চেঁচিয়ে ওর গলা যে ভেঙ্গে গেল, একটু আদর কর ওকে।"

পণ্ডিত মহাশয় কথা কহিতে কহিতে দাড়ির পরিবর্ত্তে অনবরত এতক্ষণ পাখীটির মাথায় হাত বুলাইতেছিলেন, সে কখনও ঘাড় পাতিয়া নীরবে আরামটা উপভোগ করিতেছিল, কখনও বা মাথা তুলিয়া নাচিতে নাচিতে 'কুন্দ কুন্দ' বলিয়া ডাকিয়া উঠিতেছিল, কুন্দের এতক্ষণ সে দিকে কিছুমাত্র মনোযোগ ছিল না; পণ্ডিত মহাশয়ের কথায় হাসিয়া সে এইবার পাখীটিকে হস্তে গ্রহণ করিল, পাখীটা আদর-প্রত্যাশায় মাথা নীচু করিয়া দিল, কুন্দ তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল।

পণ্ডিত মহাশয়ের বহুদিন প্রত্যাশিত মনের আকাঙ্ক্ষা সহসা যেন পূর্ণ হইল, এই চিত্রের দিকে আনন্দ-নির্নিমেষনয়নে তিনি চাহিয়া রহিলেন।

কিন্তু মর্ত্ত্যের আনন্দ চিরদিনই ক্ষণস্থায়ী; সহসা মোটরের ভেঁপুর শব্দ তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করিল।

কুন্দ ব্যগ্রভাবে বলিল,—"রাজকন্যা আস্‌ছেন; যান, পণ্ডিত মহাশয়, এই বেলা যান; তাঁ'কে এই বেলা ধ'রে পড়ুন।"

পণ্ডিত মহাশয়ের তখন যাইতে মোটেই ইচ্ছা করিতেছিল না, এই শুভক্ষণে যখন প্রেমালাপের জন্য তাঁহার প্রাণ হাপাইয়া উঠিতেছে—তখনই কি না সৈনিকপ্রথায় বিদায়ের কড়া হুকুম!

পণ্ডিত মহাশয় ক্ষুণ্ণচিত্তে কহিলেন,—"যাচ্ছি কুন্দ, এত তাড়াতাড়ি কি, তিনি ঘরে বসুন,—আমি তাঁ'কে গিয়ে বল্‌ছি।"

কুন্দ উৎকণ্ঠিত আবেগে বলিল, "তিনি ঘরে আসবেন কি হাসিকে নিয়ে বাগানে বস্‌বেন, কে জানে? তখন আর সুবিধা পাবেন না। যান—পণ্ডিত মহাশয়, এখনি যান—আর দেরী কর্‌বেন না।"

পণ্ডিত মহাশয় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া পাখীর উপর ঝুঁকিয়া অশ্রুপূর্ণ দাড়িটা তাহার ঘাড়ে আদরভরে ঘসিয়া দিলেন। এই অবসরে তাঁহার আলম্বিত শ্মশ্রুর অগ্রভাগ কুন্দের হস্ত স্পর্শ করিল, তন্মধ্য দিয়া তড়িৎ-প্রবাহ বাহিত হইয়াছিল কি না কে জানে! কিন্তু মুখ তুলিয়া পণ্ডিত মহাশয় তাহার কোন লক্ষণ দেখিলেন না; পাখীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,

—"চন্দ্রম—ময়না, তুমি নূতন বন্ধুর কাছে সুখে থাকো আর তোমার পুরাণ বন্ধুর কথা মাঝে মাঝে তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিও।"

পাখী—'কুন্দ কুন্দ' বলিয়া কুন্দের বক্ষে মাথা রাখিল, সে ঐ কথা ছাড়া আর কোন কথা শিখে নাই। পণ্ডিত মহাশয় সতৃষ্ণনয়নে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন,—মনে মনে বলিলেন,—"কি দুঃসাহস!"

———

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

হাসির সহিত রাজকুমারীর ভাবটা বেশ ভাল রকমই জমিয়া উঠিয়াছে। দেখা-শুনা এক দিনও তাঁহাদের বাদ পড়ে না। বিবাহপর্ব্ব শেষ হইবার পর নরেন সস্ত্রীক কর্ম্মস্থলে চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু নূতন বন্ধু পাইয়া অনুভাব বিরহে হাসির আর দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে না, অধিকন্তু জ্যোতিস্ময়ীর প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক আবির্ভাবে হাসির মা-দিদিমাও নববধূর অভাব অনুভব করিবার বড় একটা অবসর পান না। বাড়ীর সকলেই রাজকন্যার রূপে-গুণে মগ্ন, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা মুগ্ধ বাড়ীর কর্ত্তা কৃষ্ণলাল। তিনি এক-দিন ওঁ শব্দের ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি বুঝলে, মা, বল ত?"

জ্যোতিস্ময়ী অত্যন্ত সহজভাবে উত্তর করিলেন, —"জটিল অসম গ্রন্থির মধ্য দিয়ে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মহাসাম্যে মিলিত হচ্ছে, ওঙ্কার শব্দ আমাদের অন্তরাত্মাকে এই প্রবুদ্ধি দান করে।"

কৃষ্ণলাল বালিকার এই ব্যাখ্যা অবাক্ হইয়া শুনিলেন, কি সহজ ব্যাখ্যা! দিস্তা দিস্তা কাগজে লিখিয়া তিনি যাহা বুঝাইতে না পারিয়াছেন—বালিকা সংক্ষেপে দু'এক কথায় কি সুন্দররূপে তাহার ভাবার্থ প্রকাশ করিলেন!

এ বাড়ীতে আসিয়া যখন জ্যোতিস্ময়ী গৃহ-কর্ত্তাকে প্রণাম করিয়া দাড়ান কৃষ্ণলাল তাঁহার স্নিগ্ধবিদ্যুল্লতাসদৃশ মূর্ত্তির দিকে মুগ্ধনয়নে চাহিয়া ভাবেন, কোন্ স্বর্গের দেবী ইনি? না জানি কি উদ্দেশ্যে মর্ত্ত্যে ইঁহার আবির্ভাব? আশীর্ব্বাদ করিতে গিয়া কৃষ্ণলাল মনে মনে বালিকার প্রতি আনত হইয়া পড়েন।

হাসির মা-দিদিমা জ্যোতিস্ময়ীর স্বভাব-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ! কি অমায়িক সরলতা! রাজগৌরব, ধনগর্ব্ব এক ফোঁটা তাঁহাতে দেখা যায় না। দিদিমা'র কাছে পুরাতন দিনের গল্প কি আগ্রহেই জ্যোতির্ম্ময়ী শুনেন, আর রান্নাঘরের ধোঁয়া ও গরম অগ্রাহ্য করিয়া হাসির মাতার নিকট রান্না শিখিতেই বা তাঁহার কিরূপ উৎসাহ! কি যে ছাই-পাশ রান্না! কিন্তু রাজকন্যার মুখে তাহার প্রশংসা আর ধরে না।

হাসি রাজকন্যাকে প্রেমিকার দৃষ্টিতে দেখে। অন্যের মুখে তাঁহার রূপ-গুণের কথা শুনিলে সে খুবই আনন্দলাভ করে—কিন্তু নিজের মনে তাঁহার গুণাবলীর আলোচনা সে করে না—সমস্ত প্রাণে তাঁহাকে ভালবাসিয়া সে শুধু অন্তরে অন্তরে সুখ উপভোগ করে।

এই অনুকূল প্রীতিমধুর বায়ুর সংঘাতে জ্যোতি-স্ময়ীর মনের বালিকাসুলভ চাপা দরজাটি খুলিয়া গিয়াছে, হাসিখেলার মধ্য দিয়া নবজ্ঞান অভিজ্ঞানে তাহার দিব্যদর্শনশক্তিও বাড়িয়া উঠিয়াছে। তাহার মনে হইত, এ যেন সত্যযুগের পুণ্য ঋষিধাম, এখানে ধর্ম্মের সঙ্কীর্ণতা নাই, কুটিল-জটিল আলোচনা নাই, ওঙ্কাররূপ ইঁহাদের ধ্যান-ধারণার দেবতা, সরলতা শান্তি এ গৃহের বায়ুবেষ্টনী। জ্যোতিস্ময়ী তৃষাতুর প্রাণে এই পুণ্যধামের শান্তি-সলিল পান করিতে করিতে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিতেন,—যদি সমগ্র বিশ্বজীবনের ধারা এইরূপ শান্তিময় হইত! বালিকা এই ভবনের নাম রাখিলেন 'আনন্দধাম'।

এখানে আসিয়া এক দিন সে দিদিমা'র বারান্দায় তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া হাসির সহিত নাচে-তলার একটি ঘরে আসিয়া দেখিল, এক জন সইস্ ছোকরার তক্তাপোষের উপর জগদ্ধাত্রীর মত বসিয়া তিনি তাহার সেবা করিতেছেন। দিদিমা'কে প্রণাম করিতে ভুলিয়া গিয়া জ্যোতিস্ময়ী অবাক্ হইয়া পাশে দাঁড়াইয়া রহিলেন। দিদিমা একটু হাসিয়া বলিলেন, "আমার মনে ভাই শুচিবাই অতটা নেই। এদের ত আপনার জন এখানে কেউ নেই, দিদি, দেশ ফেলে পরদেশকেই ওরা আপন করেছে—আমরা যদি রোগে-শোকে ওদের না দেখি —তা হ'লে কে দেখবে বল? তবে হিন্দুর ঘরে জন্মেছি—হিন্দুর আচার-বিচার ভুলতে পারি নে, গিয়ে কাপড় ছেড়ে স্নানাহ্নিক ক'রে ঘরে ঢুকব,—যদিও মনে বুঝি সেটা ভ্রান্তি।"

হায় রে! কোন্ দিন সমস্ত হিন্দুস্থান এইরূপ করিয়া ভাবিতে শিখিবে!

খেলা-ধুলার মধ্যে, হাসি-গল্পের মধ্যে বালিকা এক একবার সহসা গম্ভীর বিষণ্ণ হইয়া পড়েন।

তাঁহার মনে পড়িয়া যায়—সেই কথা—সেই শবসাধন মন্ত্র,—তিনি শিহরিয়া উঠেন;—গল্প-গুজবের মধ্যেও অন্তঃসলিলভাবে তাঁহার মন বলিয়া উঠে—কখনো না—কখনো না—এরূপ ঘাতকের কার্য্যে মুক্তি নাই—নাই। নির্জ্জনতার মধ্যে তিনি যখন চিন্তামগ্ন হইবার অবসর লাভ করেন—তখন এই কথাতেই তাঁহার মনঃপ্রাণ ভরপূর হইয়া ওঠে—তিনি নিবিষ্ট-চিত্তে ভাবেন, কখনো না—কখনো না, প্রতিহিংসা ভারতের মুক্তির পথ নহে, মিলন-মন্ত্রেই নষ্ট ভারত পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিবে। কিন্তু কে শিখাইবে সে মন্ত্র, কোথায় পাইব তাহার সাধন-দীক্ষা! ভগবান, কবে তুমি আমাদের মহানিদ্রা ভঙ্গ করিবে!

* • • * •

এক দিন আহারান্তে দুই সখ তে পালঙ্কে বিশ্রাম শয়নকালে, হাসি রাজকন্যার হাতখানি ধরিয়া বলিল, "এস ভাই, আমরা সই পাতাই।" যেমন বিনা ফুলে সাজ-সজ্জা সম্পূর্ণ হয় না—সেইরূপ হাসির মনে হই-তেছিল একটা কিছু না পাতাইলে তাহাদের বন্ধুত্ব ঠিক পূর্ণশ্রী লাভ করিতেছে না।

রাজকন্যা আদর করিয়া ডাকিলেন,—"সই, সই, ওগো সই"—তাহার পরই হাসিয়া বলিলেন,—"না ভাই, এ ডাকটা বড় নভেলি রকম শোনাচ্ছে। তা ছাড়া সই হ'লেই ত মনের কথা বল্‌তে হয়, কি বল্‌ব তোকে, ভাই? আমার মনে ত কোন লুকান কথা নেই।"

হাসি সখীর গাল টিপিয়া বলিল,—"বটে! নেই বই কি! আমি বেশ জানি আছে, আমাকে শুধু ফাঁকি দেবার চেষ্টা।" বলিতে বলিতে হাসির 'শরদার' কথা মনে পড়িয়া গেল; বলিল,—"শরদাকে ত তোমাদের ওখানে দেখতে পাইনে আজকাল, তাঁর খবর কি?"

জ্যোতির্ম্ময়ীর মনের ভাব গোপন করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল; রাঙ্গা মুখ একেবারেই রাঙ্গা হইয়া উঠিল। হাসি হাসিয়া বলিল,—"এই না বল্‌ছিলে, কোনো মনের কথা তোমার বলার নেই!"

জ্যোতির্ম্ময়ী সংযত হইয়া বলিলেন,—"তুই যে রকম কথা ভাবছিলি, তা মোটেই না—আমি দেশকে বরণ করেছি, আমার কি ও সব ভাবনা ভাববার অবসর আছে, ও সব বাজে কথা রাখ।" রাজ-কন্যার এ ছলনার কথা নহে, তিনি নিজের মনের সহিত এই ভাবে বোঝাপড়া করিয়া লইয়াছিলেন।

"আচ্ছা দেখা যাবে—দেখা যাবে!"

"বেশ, যখন দেখবি—তখন বলিস। এখন আমার মনেও যে তোর মতন একটা সখ জেগেছে।"

"কি সখ?"

"পাতাবার সখ—পূর্ণ করবি সে সাধ! বল্ আগে।"

"নিশ্চয় নিশ্চয়—!"

"আমার ভাই তোর সঙ্গে মা পাতাতে সখ যায়।"

এবার হাসির মুখ লাল হইয়া উঠিল, বলিল,—"কি যে বলিস্, ভাই!"

"সত্যি বল্‌ছি! এবার থেকে তোকে আমি মা ব'লে ডাকব,—হ'তেই হবে তোকে আমার মা। অনেক দিন থেকে এই সাধ আমার মনে জেগেছে। পূর্ণ কর, ভাই!"

"আমার মা ত ভাই তোমার সে সাধ পূর্ণ কর্‌-ছেন। তুমি আমার সখী—প্রাণের সখী।—"

"মা হ'লে কি সখী হ'তে পারা যায় না—না কি? আমি এমন মা চাই—যার একমাত্র মেয়ে হব আমি—আমি বড় স্বার্থপর। তাকে আর কেউ মা বলতে পার্‌বে না,—বুঝলি, তুই?"

এই সময় দিদিমা'র আবির্ভাবে জ্যোতির্ম্ময়ী উঠিয়া আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া তাঁহাকে বিছা-নায় টানিয়া বসাইয়া বলিলেন,—"দিদিমা, আপনি বলুন; আমি হাসির সঙ্গে মা পাতাতে চাই, পচা মামুলি সই পাতানোর চেয়ে এটা লক্ষ গুণে ভাল কি না?"

দিদিমা মনে মনে জ্যোতিম্ময়ীর শুভ বুদ্ধির প্রশংসা করিয়া মুখে বলিলেন,—"তাতে দোষ কি রূপসী নাৎনী, তোর ত ভাগ্য ভাল, বিনা কষ্টে মেয়ে পাচ্ছিস্,—আর অমন গুণের মেয়ে—ভাগ্যবতী তুই!"

কিন্তু হাসির মন প্রসন্ন হইল না, সে বলিল,—"না, ভাই, আমি তোমাকে কিছুতেই মেয়ে বল্‌তে পার্‌ব না।"

রাজকন্যা দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন,—"তুই মেয়ে না বলিস, আমি তোকে বল্‌ব মা।" বলিয়া তিনি তাহাকে প্রণাম করিয়া, তাহার পায়ে হাত ঠেকাই-লেন। হাসি হাসিয়া হাতটা চাপিয়া ধরিয়া ব্যতি-ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল,—"করিস্ কি, ভাই, করিস্ কি?" রাজকন্যা তখন দুই হাতে হাসির গলা জড়া-ইয়া ধরিয়া বলিলেন,—"মা আমার, প্রাণের মা, আমার প্রিয়সখী মা। অনেক দিন কাউকে মা ব'লে ডাকি নি। তোকে আজ মা ব'লে ডেকে আমার প্রাণ যেন ভরপুর হয়ে উঠলো।"

দিদিমা'র দুই চক্ষু আহ্লাদে জলে ভরিয়া আসিল। হাসি কিন্তু রাগ করিয়া বলিল, "কি যে করিস্, ভাই, তুই! ফের যদি ও কথা বল্‌বি ত কথা বন্ধ—চির জন্মের আড়ি।" বলিয়া হাসিয়া ফেলিল।

বৈকালে বাড়ী যাইবার সময় জ্যোতির্ম্ময়ী হাসিকে সঙ্গে লইলেন। মোটরে চড়িয়া হাসি বলিল, —"অণুভাদি গিয়ে পর্য্যন্ত হ্রদে আর বেড়ান হয় নি, আজ জলকে যাবি, ভাই?"

"বেশ ত, বাবাকে সঙ্গে নেব এখন। তোর শরদা বা অনাদিদা কেউ ত এখানে নেই, বাবাকেই হালে বসানো যাবে।"

হাসি মাথা নাড়িয়া বলিল,—"না ভাই, আমি আর কাউকে চাইনে, আমরা থাকব নৌকার উপর শুধু দু'জনে -তোমাতে ও আমাতে—"

জ্যোতির্ম্ময়ী সকৌতুকে বলিলেন,—"আমি ত ভাই, হাল ধরতে জানিনে, তোর নেয়ে হ'তে পারব না ত।"

"তরী না হয় অকূলেই ভাসবে; আমি তোকেই চাই। আমি না হয় হাল ধরব, তুই দাঁড় টানিস, তা ত পারবি?"

"আচ্ছা, বেশ। মাতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করতে নেই, রাজি আছি,—"

হাসি মুখ ভারী করিয়া বলিল,—"আবার ঐ কথা! তবে আমি নৌকায় চড়ব না—"

"সে ভাল কথা! আমার ভয় হচ্ছিল, পাছে কাঁচা দাঁড়ির হাতে তরীখানা উল্টে গিয়ে তোর অমন সুন্দর কাপড়খানার রংটা বেরং ক'রে তোলে?" তাঁহাদের বাক্য-মীমাংসা শেষ হইতে না হইতে মোটরখানা গাড়ীবারান্দায় ঢুকিল, পণ্ডিত মহাশয় আগে হইতেই রাজকন্যার অপেক্ষায় সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। নামিতে না নামিতে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া তিনি কহিলেন,—"মা, একটা কথা আছে।"

রাজকন্যা হাস্যমুখে বলিলেন,—"কালকের জন্য কথাটা রেখে দিলে চলে না, পণ্ডিত মশায়?"

"না, বড় জরুরি কথা, বেশী সময় নেব না। ঐ গাছতলাটায় একবার এসে যদি দাঁড়াও, মা—"

রাজকুমারী হাসিকে কহিলেন,—"হাসি, তা হ'লে, ভাই, তুমি উপরে গিয়ে ব'স—আমি পণ্ডিত মহাশয়ের কথাটা শুনে নিই।"

হাসি বলিল,—"তোমরা কথা ক'য়ে নেও না, আমি ততক্ষণ বাগানেই একটু বেড়াই।"

ভাগ্যের নির্ব্বন্ধ, এই সময় রাজাবাহাদুর এইখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন।—কন্যা অনুরোধবাক্যে কহিলেন,—"বাবা, হাসি কিন্নর হ্রদে বেড়াতে চান, তুমি নিয়ে যাও না, বাবা! পণ্ডিত মশায়ের কি কথা আছে, শুনে আমিও এখনি আসছি।"

রাজা বলিলেন,—"বেশ ত! এস হাসি, তোমাকে নৌকায় বেড়িয়ে আনি!"

হাসি আর তখন কোন আপত্তির কথা খুঁজিয়া পাইল না।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সুখের তরঙ্গ উঠিতেছিল—হ্রদের জলে এবং রাজার মনে—সম্ভবতঃ হাসিরও মনে—কিন্তু ম্লান হাসির মধ্যে সে তাহা প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছিল।

শীতকালের অপরাহ্ণ; সূর্য্যদেব অস্তপারে লুকাইয়া অপ্রকাশ্যভাবে দিগ্‌দিগন্তে তাঁহার অঙ্গচ্ছটা বিকীর্ণ করিতেছেন—আর প্রকাশ্য দিব্যরূপে গগন-অঙ্গন শোভিত করিয়া ষষ্ঠীর শশিকলা রবির কনক-কিরণে মধুরতর সান্ধ্য-মহিমা ঢালিয়া দিয়াছে।

দাঁড়ে আহত হ্রদ-বারির উচ্ছ্বাসগীতি তালে তালে উজ্জ্বল লহরীতে নাচিয়া নাচিয়া বাস্তব জগতে যে কুহক স্বপ্নভাব রচনা করিতেছিল, নীর-সম্ভবা মোহিনী-মূর্ত্তিরূপা হাসি, কর্ণধারবেশে তরীমূলে বসিয়া সেই স্বপ্নভাব বাস্তবে পরিণত করিয়া তুলিয়াছিল।

অগ্রহায়ণ মাস—কিন্তু হাসির সাজসজ্জায় বাসন্তীর শোভা। তাহার রেশমী সাড়ী পীতবর্ণ, জ্যাকেট নীল এবং মাথায় পাতলা শালের ধানী রঙ্গের ক্ষুদ্র ওড়না। মোটরে চলিবার সময় বায়ুর দৌরাত্ম্য হইতে কপালের চুলগুলাকে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে ওড়নাখানা মাথার উপর হইতে জিপ্‌সি ফ্যাসানে গলা বেড়িয়া পিঠের দিকে বাঁধা। কিন্তু এত সতর্কতা সত্ত্বেও বায়ুচুম্বিত চূর্ণকুন্তলরাশি ওড়না-স্খলিত হইয়া মাঝে মাঝে তাহার মুখের উপর আসিয়া পড়িতেছিল। হাসি এক হাতে হাল ধরিয়া রাখিয়া সচকিতভাবে মুখ তুলিয়া অন্য হাতে সেই বিদ্রোহী চুলগুলাকে পুনরায় ওড়না-বন্ধ করিতেছিল।

কি সুন্দর তাহার গ্রীবাভঙ্গী! এমনই শোভাতেই বুঝি বিশ্বের রূপকমল একদিন মৃণালবৃন্তে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। রাজা কবি-পুরুষ, মানসকমলের সেই চিত্রশোভা দেখিতে দেখিতে তাঁহার মোহমুগ্ধ মনে প্রশ্ন উঠিল—না জানি কাহার অদৃষ্টপরিচালনায়

নিয়োজিত এই অপরূপ-রূপা রূপরাণীর হস্তধৃত ভাগ্য-দণ্ড? এ দণ্ডস্পর্শে তাঁহার ভাগ্যও যে এক দিন ঘুরিয়া যাইতে পারে—এ কথা কিন্তু রাজার মনে উদিত হইল না।

রাজা দাঁড় টানিতে ভুলিয়া গেলেন. তাহার হাতে স্তব্ধমুগ্ধ অনাহত দাঁড়ের উপর দিয়া হ্রদের রজতধারা ছলকিয়া যাইতে লাগিল। অদূর হইতে সহসা সঙ্গীতধ্বনি উঠিল,—

"আমি বাঁধলাম গান—
হোলো না ত গান গাওয়া।"

হাসি এতক্ষণ হাল ধরিয়া নীরবে আকাশের উজ্জ্বল ছবিখানির দিকে চাহিয়াছিল, গান শুনিয়া উৎকর্ণ হইয়া বলিয়া উঠিল,—"কে গান গাচ্ছে? বেশ ত গলা!"

রাজা সচকিতভাবে জলে দাঁড় ফেলিয়া বলিলেন, —"কেউ গাচ্ছে না কি? আমি ত শুন্‌তে পাচ্ছিনে।"

হাসি বলিল,—"না আমিও আর শুন্‌তে পাচ্ছিনে, গান বন্ধ হয়ে গেছে।"

রাজা সজোরে দুই এক বার দাঁড় ফেলিয়া বলিলেন, "হাসি, তুমি একটি গান গাও না—"

হাসি হালটা দোলাইয়া কহিল,—"কি যে আপনি বলেন? আপনি একটি গান্।"

রাজা একবার আকাশের চন্দ্রকলার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া পুনরায় মর্ত্ত্য-চন্দ্রের দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন,—"কেন, মন্দ ত কিছু বলি নি, তুমি এক দিন এই হ্রদে নৌকা চালাতে চালাতে যে গানটি গেয়েছিলে, গাও না সেই গানটি হাসি—"

হাসি সাফ জবাব দিল—"মনে পড়ছে না—সে গান। আপনি একটি গান্।"

রাজা হাসিয়া বলিলেন,—"তোমার আদেশ অবশ্যই পালনীয়,—কিন্তু আনন্দ-সঙ্গীত আমার ত কিছু মনে আসছে না।"

হাসি বলিল—"না-ই আসুক—যে গান আপনার মনে আস্‌ছে, তাই গান।"

দিবালোকের শেষ কণাটুকুও সহসা স্তিমিত হইয়া পড়িল। শীতসন্ধ্যাকে বসন্ত আকুল করিয়া, আকাশের শশিকলা তাহার কোমল মধুর ছটা সকৌতুকে হাসির অঙ্গে ছিটাইয়া দিল। কি যেন একটা বিস্মৃত স্মৃতি রাজার মনকে কুয়াসাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, সহসা তিনি কেমন যেন উন্মনা হইয়া পড়িলেন—হাসির দিকে আর না চাহিয়াই আনমনে মৃদুস্বরে গান ধরিলেন—

"ভেসেছি স্রোতের টানে
কূলে কি অকূলে কে জানে?
তরঙ্গ-ছন্দে কুহক আনন্দে
মনতরী চলে বেগে বাধা না মানে।"

সহসা তাঁহার হাতের দাঁড় হ্রদ-পার্শ্বের কূলভূমিতে লাগিয়া নৌকাখানাকে একটু সরাইয়া দিল। হাসি কিন্তু বেশ প্রকৃতিস্থভাবে হালটা টানিয়া রাখিল। রাজা অপ্রস্তুতভাবে দাঁড় ঠেলিয়া নৌকা ফিরাইয়া লইলেন। তাঁহার গান জমিতে না জমিতে তাহা বন্ধ হইয়া গেল। হাসি একটু হাসিয়া লইয়া কহিল, —"থামলেন কেন? গান্ না—বেশ চমৎকার গানটি।"

রাজাও হাসিয়া হাসির অনুকরণে কহিলেন,—"মনে পড়ছে না।"

হাসি কহিল,—"আমি মনে করিয়ে দিচ্ছি—

"দাঁড়ে দাঁড়ে বাজে চঞ্চল সুর,
গতির নেশায় মতি ভরপুর;
কে জানিতে চায় চলেছি কোথায়—
পাতালতলে বা বিমানে—?"

রাজা কুতূহলী হইয়া কহিলেন,—"তার পর?"

হাসি কহিল,—"আর আমার মনে নেই, এবার আপনি—গান্—"

রাজা গাহিলেন—

ঐ ডাকে নিশীথের বাঁশী!
আসি আসি আসি—এই আমি আসি।
চল চল নেয়ে, আরো বেগে ধেয়ে,
ঐ যে আলোক ঝলক হানে—
কোন অজানায় কে জানে!

রাজার উচ্ছ্বসিত গানের সুরে আকাশের চাঁদ যেন নেশায় বিহ্বল হইয়া হ্রদের বুকের মধ্যে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিল। হাসি কিন্তু গানটা শেষ হইলে, বেশ অটল স্থির সংযতভাবেই ধীরে ধীরে কহিল,—"গানটি আমি রাজকুমারীর মুখে অনেকবার শুনেছি; আপনারই রচনা না?"

রাজা বলিলেন,—"কই, আমি ত রাণীর মুখে এ গান কোনো দিন শুনি নি?"

তখন নৌকাখানা হ্রদের এক প্রান্তে আসিয়া পড়িয়াছিল হাসি হালের মুখ ফিরাইতে ফিরাইতে কহিল,—"আচ্ছা, আপনি রাজকুমারীকে রাণী বলেন —কিন্তু—কিন্তু—"

রাজা উজানে দাঁড় পশ্চাতে টানিয়া তরীখানা ফিরাইয়া লইয়া সকৌতুকে কহিলেন,—"কিন্তু কি? ব'লে ফেলো, শোনাই যাক।"

অতুলেশ্বরের কথাবার্ত্তায় আজ গাম্ভীর্য্য ছিল না, হাস্যকৌতুকপূর্ণ প্রীতিভাবে তিনি বালিকা হাসিরও মনে সখ্যভাব ফুটাইয়া তুলিতেছিলেন। হাসি রমণীসুলভ প্রগলভভাবেই পরুষের মনোমোহন বেশ একটু চপল হাসি হাসিয়া কহিল,—"কিন্তু আপনার রাণী যখন আসবেন—"

রাজা সহসা উচ্চ হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"ভাববার কথা বটে। এ কথাটা আগে মনে হয় নি! কি বলা যাবে—তাই ত! তুমিই একটা নাম ঠিক কর না?"

হাসি বলিল,—"তাঁকে বউরাণী বলবেন।"

"বেশ! তোমার যদি ঐ নাম পসন্দ হয় ত তাই হবে।"

রাজার দৃষ্টিতে, রাজার স্বরে সহসা হাসি এই কথার মধ্যে একটা যেন লুকান অর্থ দেখিতে পাইল। এতক্ষণ সে না ভাবিয়া না চিন্তিয়া বেশ সহজ ভাবেই কথা কহিয়া যাইতেছিল—সহসা লজ্জিত হইয়া পড়িল। সে ভাব ঢাকিতে গিয়া পূর্ব্বের কথারই আবৃত্তি করিয়া কহিল,—"কি যে বলেন আপনি—"

"কিছু কি দোষের কথা বলেছি, হাসি?—"

"আপনি যে রাজা—"

"এই আমার অপরাধ? যদি ভিখারী হই—"

দূরে গান উঠিল—

"ভিখারীর শঙ্খ ঝোলা,—রইল তোলা
হলো না—পারে যাওয়া"

উভয়ে চমকিয়া উঠিলেন।

রাজা বলিলেন,—"গলাটা যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে।"

হাসি বলিল,—"ঠিক যেন কোন অপরিচিত পাখীর পরিচিত শিস্।"

তীর হইতে রাজকুমারী ডাকিলেন,—"বাবা!"

হাসি আনন্দের স্বরে কহিল,—রাজকুমারী যাচ্ছিলেন না কি?—আর আমরা কেউই বুঝতে পারলুম না কি আশ্চর্য্য!"

অল্পক্ষণের মধ্যেই নৌকা তীরে লাগিল। রাজা বলিলেন,—"আসবে, রাণী, নৌকায়? আমরা তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি।"

কথাটা কি পূর্ণ সত্য!

শ্যামাচরণ এই সময় হাসির পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,—"রাজাবাহাদুর, শরৎ এসেছে এইমাত্র প্রসাদপুর থেকে। আপনাকে একবার আসতে হবে, অনেক কথা আছে।"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

হাসি ডাকিল, "শরদা—"

হাসি বাড়ী যাইবার সময় রাজকুমারীর আদেশে আজ শরৎকুমার তাহার সহযাত্রিরূপে মোটরের সম্মুখ-সিট গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মোটর চলিতেছিল নদীর ধার দিয়া—অপেক্ষাকৃত ধীর গতিতে। জলের উপর ছোট-বড় জাহাজের এলো-মেলো বিশৃঙ্খল আলোকরাশি, আর তীরদেশে সমসজ্জিত স্তম্ভাবলীর সুবিন্যস্ত আলোকগুচ্ছ নক্ষত্র-জ্যোতিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করিয়া সগর্ব্বে বিদ্যুদ্দীপ্ত বিকীর্ণ করিতেছিল। কিন্তু হায় রে! কোন্ দর্প এমন ছিদ্রহীন, যাহার মধ্যে দর্পহারীর প্রবেশপথ রুদ্ধ? আকাশের ক্ষীণ চন্দ্র সে আহ্বানে মৃদুমন্দ হাসিয়া মেঘের মধ্যে টলিতে টলিতে সম্মোহন-বাণ নিক্ষেপ করিয়াছেন, মর্ত্ত্যের অত্যুজ্জ্বল আলোকপুঞ্জ সেই মানাভ আলোকে মুগ্ধ স্তম্ভিত, তাহাদের অণু-পরমাণুতে আত্মলোপের বিনীত মধুরতা! জলে-স্থলে কি অপূর্ব্ব শোভা! দর্শক শরৎকুমারের মনে জ্যোৎস্নামিলিত এই তাড়িদ্দীপাবলীর শোভা ভক্তিমণ্ডিত শক্তির মহিমা ব্যক্ত করিতেছিল। হাসির ডাকে তিনি জানালা হইতে মুখ ফিরাইলেন। তাঁহার দিকে সহাস্য দৃষ্টিপাত করিয়া হাসি কহিল,—"শরদা, বড় আহ্লাদ হচ্ছে।" শরৎকুমারের ইচ্ছা হইল, জিজ্ঞাসা করেন—"কেন?" কিন্তু তাঁহার মুখে আজ কোন কথা ফুটিতেছিল না,—আবশ্যকও হইল না; তাঁহার নীরব কৌতূহল নিবৃত্তি করিয়া বিনাপ্রশ্নেই হাসি আপন বক্তব্যের অবতারণা করিয়া কহিল,—"শরদা, আমি ত প্রায় রোজই আপনাদের অঞ্চলে যাই, এতদিন পরে আপনার দেখা পেলুম। আপনি দেখছি, একেবারেই ভুলে গেছেন।"

রাজকুমারীর সহিত গুরুগম্ভীর তত্ত্বালোচনা সহজ, কিন্তু হাসির হাসিমাখা সরলতাপূর্ণ মনটানা প্রশ্নে শরৎকুমার বরাবরই বালকের ন্যায় কুণ্ঠিত হইয়া পড়েন। আজ তিনি একেবারেই নির্ব্বাক্ হইয়া গেলেন। যাহাকে এক সময় পরিপূর্ণ প্রাণে

ভালবাসিয়াছেন, যাহার প্রত্যাখ্যান তাঁহাকে মৃত্যু-দণ্ড দান করিয়াছিল – আজ বাস্তবিকই সে তাঁহার কে? তাহার বিস্মৃতিতেই ত তিনি নব-জীবন লাভ করিয়াছেন,—ইহা যে সত্য কথা। তবু কেন সেই অতীত প্রেমরূপার সান্নিধ্য তাঁহাকে এমন অভিভূত করিয়া তুলিল! প্রাক্তনসংস্কার-মোহে নব-জীবনের প্রকৃত সহজ ভাব এমন ভারগ্রস্ত, অপ্রকৃত, অবনত হইয়া পড়িল!

কিন্তু হাসির অনর্গল উচ্ছ্বসিত বাক্যে তাঁহার মনের এ ভারও ক্রমশঃ কমিয়া আসিতে লাগিল। সে আবার বলিল,—"বল না, শরদা?"

তখন তিনি প্রকৃতিস্থ ভাবেই মৃদু হাস্যে উত্তর করিলেন, "কি বল্‌ব?"

"এতদিন ধ'রে একটি দিনও কি দেখা দিতে নেই?"

"তুমি যে দেখা করতে চাও, তা ত মনে হয় নি?"

"বটে! বেশ যা হ'ক্! আপনি ভুলেছেন ব'লে কি সবাই ভুল্‌বে না কি?—কিন্তু আমি ত চাইনে,—যে—"

হাসি থামিয়া গেল, শরৎকুমার একটু হাসিয়া বলিলেন,—"কি চাও না তুমি, হাসি?"

"আপনি যে আমাকে ভুলে যাবেন – এটা আমি মোটেই চাইনে,—বুঝলেন ত? আমাকে বোন্ ব'লে – বাল্যসখী ব'লে চিরদিনই আপনার মনে রাখতে হবে।"

শরৎকুমারের হাসি ঠোঁটে মিলাইয়া গেল, একটু থামিয়া থামিয়া বলিলেন, "তা কি নেই মনে কর?"

হাসির সাফ্ জবাব—"করি বই কি,– খুবই করি। বলুন, শরদা—কথা দিন্—এই অধিকার থেকে আমাকে বঞ্চিত করবেন না?"

"আমি ত মনে করি, এ কথার উত্তর দেবার কোনো দরকার নেই।"

"আছে,—বলুন তবুও, শরদা, আমাকে আপনার সুখ-দুঃখের সব কথা মন খুলে বল্‌বেন; কথা দিন,—বলুন।"

শরৎকুমার বাহিরের দিকে মুখ ফিরাইয়া একটু গম্ভীর স্বরেই এ কথার উত্তরে কহিলেন,—"আমার সুখ-দুঃখ কিছু নেই ত হাসি।"

হাসি এবার রাগ করিয়া কহিল,– "দু'জনেই সমান, কেউ কিচ্ছু বল্‌তে চায় না,—আচ্ছা, বেশ, নাই বল্লেন। আমি সব জানি " বলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

শরৎকুমার একটু হাসিয়া তাহার দিকে চাহিলেন। হাসি যখন দেখিল—তাহার অভিমান নিষ্ফল, তখন আবার মিনতি করিয়া বলিয়া উঠিল—"শরদা, লক্ষ্মীটি, বলুন না, আপনার মুখে শুনলে কতটা আহ্লাদ হবে, বলুন দেখি!"

শরতের ইচ্ছা হইল, তাহাকে তাঁহার নব-জীবনের কথা আদ্যোপান্ত খুলিয়া বলেন হাসির অনুরোধ তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তল ভেদ করিল,—তথাপি তিনি তাহা পারিলেন না, নীরব হইয়া রহিলেন,—কিছুক্ষণ পরে কহিলেন, - "হাসি, ও কথা থাক্।"

হাসি মনে মনে একটা গুরু বেদনা উপলব্ধি করিয়া রহিল, তবে কি সে ভুল বুঝিয়াছে? এখনও কি শরৎকুমার তাহাকে ভোলেন নাই! শরৎকুমার যদি বলিতেন, তিনি রাজকুমারীকে ভালবাসেন, তাহা হইলে হাসি কতটা না শান্তি লাভ করিত! ধীরে ধীরে সে চাপা-কষ্টে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল,—শরৎকুমার তাহাকে ব্যথিত দেখিয়া কহিলেন,—"তুমি যে আমাকে ভাইয়ের অধিকার দান করলে—এতে সত্যই আমি বড় সুখী।"—

হাসি বিদ্রূপের স্বরে কহিল, "শুনে আনন্দিত হলুম।"

শরৎকুমার হাসিয়া কহিলেন,—"কিন্তু স্বরে ত আনন্দভাব প্রকাশ পাচ্ছে না।"

"আপনি যে আমার দান বেশ স্বচ্ছন্দ মনে গ্রহণ করেছেন, তারও ত প্রমাণ আমি পাচ্ছিনে।—আচ্ছা, বলুন না শরদা,—আমি জানি, আপনি রাজকুমারীকে ভালবাসেন কেন আমাকে সে কথা আপনি খুলে বল্‌তে সঙ্কোচ করছেন? সত্যই আমার বড় দুঃখ হচ্ছে। বলুন, শরদা বলুন।"

শরৎকুমার একটু দম লইয়া বলিলেন,—"না হাসি, রাজকুমারীকে আমি ভালবাসি,—এ কথা আমি বল্‌তে পারিনে। তিনি ক্ষণজন্মা,—রূপে-গুণে তিনি মহীয়সী তাঁর উচ্চ হৃদয়ভাবে কে না মুগ্ধ হয়? আমিও মুগ্ধ। আমি তাঁকে মনে মনে পূজা করি। এ শুধু গুণের প্রতি, উচ্চ ভাবের প্রতি পূজা, কিন্তু, একে ত ভালবাসা বলা যায় না,—ভালবাসায় যে প্রত্যাশা থাকে, এতে তা ত নেই।—তারাকে, চাঁদকে কে না ভালবাসে,—কিন্তু তাতে কি কোন প্রত্যাশা থাকে? আমার এই প্রত্যাশাহীন পূজাকে ভালবাসা বলা যায় না।"

শরৎকুমারের মনের রুদ্ধ উৎস মুক্ত আবেগে সহসা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তিনি থামিলে হাসি আনন্দে হাসিয়া বলিল,—"বড় আহ্লাদ—বড় আনন্দ

হচ্ছে, শরদা। প্রত্যাশাহীন ভালবাসা বুঝি ভালবাসা নয়? ওই হচ্ছে আসল প্রেম। নিরাশ হবারও কোন ত কারণ দেখিনে শরদা। প্রত্যাশাগুলোই বরঞ্চ প্রায়ই বিফল হয় আর অপ্রত্যাশিত আশাই বেশীর ভাগ সফলতা লাভ করে,—এই ত সংসারের মজা! বুঝলেন ত? রাজকুমারী যে আপনাকে ভালবাসেন—সে বিষয়ে আমার মনে সন্দেহমাত্র নেই। ঘটকালীটার মাত্র অভাব। আচ্ছা, আমি এখন সে ভার নিচ্ছি; দিন স্থির ক'রে ফেলি! কি বলেন?"

শরৎকুমার হাসির এই কথায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন; মর্ম্মান্তিক অনুরোধ সহকারে কহিলেন, "হাসি, আমার ইচ্ছা নয়—এ বিষয় নিয়ে তুমি কারও সঙ্গে আলোচনা করো। আমি তোমাকে এখন যা বল্লুম, এ আমার নিভৃত প্রাণের কথা। তুমি কথা দাও, হাসি এ কথা নিয়ে আর নাড়াচাড়া করবে না?"

"বেশ, আচ্ছা, কথা দিলুম আমি রাজকুমারীকে বলব না,—যে, এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে আমার কোন কথা হয়েছে; কিন্তু আমি শুধু বিয়ের প্রস্তাবটি—"

"না, হাসি, না তোমাকে এ সম্বন্ধে একেবারেই মৌন থাকতে হবে,—তুমি কিছু বলতে পাবে না—আমি বিয়ে করবই না।"

"যদি রাজকুমারী ইচ্ছা করেন?—তবুও না?"

"তবুও না, এ বিয়ে হ'তেই পারে না।"

অবশ্য হাসিকে নিরস্ত করিবার জন্য শরৎকুমার যেন-তেন-প্রকারেণ এ কথাটা উড়াইবার চেষ্টা করিলেন। হাসিকে নীরব করিবার তিনি অন্য উপায় দেখিলেন না। কিন্তু ফল তাঁহার মনের মত হইল না।

হাসি গম্ভীর হইয়া কহিল, "বেশ, আপনি যদি বিয়ে না করেন তবে আমিও করব না।"

হাসির স্বর দৃঢ় প্রতিজ্ঞাব্যঞ্জক! এ প্রতিজ্ঞা যে যথাসময়ে শিথিল হইবে—তাহা শরৎকুমার জানিতেন, কিন্তু তবুও ত বলিতে পারিলেন না "আচ্ছা বেশ, সেই ভাল—"

তিনি সস্নেহ ভৎসনায় কহিলেন—"কি যে বল, হাসি!"

"হ্যা, আমি ঠিকই বলছি—আপনি যদি না বিয়ে করেন, তবে আমিও করব না।"

তিনি একটু রহস্যের ভাবে কহিলেন,—"কেন, আমাকে জব্দ করার জন্য?"

"বেশ তাই—"

"আমাকে অসুখী ক'রে তুমি সুখী হবে?"

"আপনিও ত আমাকে অসুখী ক'রে সুখী হচ্ছেন?"

"বাজে তর্ক রাখ, হাসি, তুমি বেশ জান—তোমার সুখ আমার সাধনার একটি বিষয়।"

হাসি চুপ করিয়া গেল—সে ত প্রত্যুত্তরে বলিতে পারিল না—আপনার সুখও আমার জীবনের সাধনা। অন্ততঃ এ কথা ত সে অসঙ্কোচে বলিতে পারিত যে, "আপনার সুখেও আমি একান্ত সুখী"—কিন্তু শরৎকুমারের ঐ গুরুগম্ভীর সজোর কথার পর তাহার মনের সমস্ত ভাবই কেমন লঘু বলিয়া মনে হইতে লাগিল, সে চুপ করিয়া রহিল। শরৎকুমার বলিলেন, "আমি যদিও বেশ জানি যে, আমাকে ব্যথা দেবার জন্যই তুমি ও রকম কথা বলছ, কিন্তু কোনো ভাবেই বা ক্ষণিকের জন্যও ও কথাটা তোমার মনে আনা ঠিক হয় নি।"

"ক্ষণিকের জন্য?"

"নিশ্চয়ই! রাজা বাহাদুর তোমাকে মনোনীত করেছেন, আর তুমিও মনে মনে যে তাঁকে বরণ ক'রে নিয়েছ—তা—"

হাসি লজ্জিত হইল, কিন্তু বেশ জোর করিয়াই বলিল,—"আপনি সবজান্তা। ভুল ভুল—সব ভুল—দেখে নেবেন।—"

"কি বলছ হাসি? তোমার এ কথা শুনলে রাজকুমারীর মনে কত দুঃখ হবে ভাব দেখি।"

"তা কি করব।"

"তুমি বেশ জান, তোমার বাপ-মা এ বিবাহের জন্য কত উৎসুক, তোমার মুখে এ কথা শুনলে তাঁরা কত ব্যথিত হবেন।"

"তা কি করব।"

"না, হাসি, অমন ক'রে বলো না তুমি। বুঝছ না কি এতে আমারও মনে কিরূপ কষ্ট দিচ্ছ? জানি, হাসি, এটা তোমার মনের ভাব নয়, মুখের কথা, তবুও বল, হাসি, বল, ওরূপ কথা কখনও আর মুখেও আনবে না?"

হাসি চুপ করিয়া রহিল—বিদ্রূপ করিয়া কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাঁহার দুঃখম্লান গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া সে কথা বলিতে পারিল না।

শরৎকুমার আবার বলিলেন,—"জান না, হাসি, যে দিন থেকে শুনেছি আমি, রাজা বাহাদুরের সঙ্গে তোমার বিবাহ ঠিক হয়েছে, সে দিন থেকে আমার মনের খুব বড় একটা অন্ধকার কেটে গেছে।

কতবার তখন থেকে মনে হয়েছে, ভাগ্যিস্ তুমি, আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলে! বিধাতাকে মনে মনে কত না ধন্যবাদ দিয়েছি। তুমি ভাগ্যবতী, হাসি, রাজা ক্ষণজন্মা পুরুষ, এমন স্বামী লাভ ক'রে তুমি ধন্য হও—ধন্য হও, হাসি।"

মোটর বাড়ীর কম্পাউণ্ডে ঢুকিল, শরৎকুমার ব্যাকুল স্বরে বলিলেন—"আর সময় নেই, হাসি সময় নেই—এক দিন আমার আকুল প্রার্থনার উত্তরে —'না' ব'লে আমার জীবন আনন্দহীন ক'রে দিয়েছিলে, আজ আমার অনুরোধ, প্রার্থনা সফল কর, হাসি,—বল হ্যাঁ—রাজা বাহাদুরকেই তুমি –"

তাহার কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে বারান্দার ভিতর গাড়ী আসিয়া পড়িল—হাসি আস্তে আস্তে বলিল—"আপনি আগে আমাকে কথা দিন যে –"

আর বোঝাপড়া চলিল না, দু'জনের মুখ বন্ধ হইয়া গেল; শচীন্দ্র ছুটিয়া আসিয়া গাড়ীর দরোজাটা খুলিয়া ধরিয়া বলিল—"এই যে শরদা! আসবেন না একবার ভিতরে?"

"না ভাই—হাতে অনেক কায আছে।"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

ব্যাঙ্ক ফেল হওয়াতে সুজন রায় যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, রাণীগঞ্জের সম্পত্তি হইতে সে ক্ষতি পূরণ করিয়া লইবেন, এই আশায় তিনি বুক বাঁধিয়াছিলেন, —কিন্তু চিরশত্রু অতুল রায় সে আশাতেও তাঁহাকে নিরাশ করিলেন।

এখন তাঁহাদের সুদশা লাভের একটিমাত্র উপায়; যদি বিজনকুমারের সহিত রাজকন্যার বিবাহ ঘটাইতে পারেন,—তবেই তাঁহার সকল দিক বজায় থাকে; ধনসম্পত্তি, মান মর্য্যাদা সকলই রক্ষা পায়। কিন্তু ইহা ত একান্ত ভাবেই অতুলের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতেছে। পূর্ব্বেই ত সুজন রায়ের এ প্রস্তাব অতুলেশ্বর অগ্রাহ্য করিয়াছেন, আর এখন এ কথা তুলিলে তিনি ত তাঁহাকে লাঠি দিয়া বিদায় করিবেন।—তবুও সুজন রায় এ সঙ্কল্প মন হইতে তাড়াইতে পারিলেন না—ছলে বলে কৌশলে ইহা সিদ্ধ করিবার মতলব আঁটিতে লাগিলেন।

সুজন রায়ের ধর্ম্মে কোন দিনই মতি ছিল না—মঙ্গলশক্তির আরাধনা তিনি কখনও ভুলিয়াও করেন নাই—কিন্তু সংহারিনী দৈবশক্তির প্রতি চিরদিনই তাঁহার অটল বিশ্বাস। বিপদে আপদে পড়িলেই করালী কালীর মাননা করিয়া থাকেন। আজও করিলেন, কালীঘাটে দেবীপদতলে শত পাঁঠা বলি পড়িল,—গৃহস্থাপিত চামুণ্ডামূর্ত্তি মহিষ-বলিদানে পূজিত হইলেন। উপরন্তু ইতিপূর্ব্বে কখনও যাহা করেন নাই চামুণ্ডামূর্ত্তির পদতলে এক দিন সন্ধ্যা-পূজার সময় অনেকক্ষণ ধরিয়া হত্যা দিয়া পড়িয়া রহিলেন। উঠিয়া দেখিলেন—চামুণ্ডাকণ্ঠের প্রেত-মুণ্ডগণের কাঁধের উপর দুইটা করিয়া হাত বাহির হইয়াছে। সেই হাতে ধনুর্ব্বাণ ধরিয়া জনে জনে তাঁহার প্রতি ভ্রূভঙ্গী করিয়া হাসিতেছে।

সুজন রায়ের মনে দেবীর ইঙ্গিত ব্যক্ত হইল। রায়-বংশের সৌভাগ্যসূচনা যে ধনুকের প্রসাদে, সেই ধনুক লাভে যে তাঁহাদের ভাগ্যেও রাজ্য ও রাজকন্যা লাভ ঘটিবে, তাঁহার সংস্কারবদ্ধ মন এই কথাই বার-বার করিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিল।

বিজনকুমার আজ প্রাতঃকালে কলিকাতাযাত্রার পূর্ব্বে যখন পিতৃপ্রণাম করিতে আসিল তখন তিনি চামুণ্ডাদেবীর জপমালা হস্তে বৈঠকখানার বারান্দায় বিচরণ করিতেছিলেন, আর মাঝে মাঝে রেলিঙ্গের উপর ঝুঁকিয়া নিড়নীধারী মালী দুইজনের চতুর্দ্দশ পুরুষের প্রতি মিষ্ট ভাষা প্রয়োগে তাহাদিগের অন্তরাত্মাকে কৃতার্থ করিয়া তুলিতেছিলেন। ব্যাঙ্ক ফেল হওয়া পর্য্যন্ত সকাল বেলাটা তাঁহার জপের মালা হাতেই কাটে, তবে এ জন্য সাংসারিক কোন কর্ম্মেই তাঁহার বাধা পড়ে না। মালা ফিরাইবার সময় যেমন উৎসাহে মাঝে মাঝে দশমহাবিদ্যার স্তুতি পাঠ চলে, ততোহধিক উৎসাহে ভৃত্যগণ যথাসময়ে অভ্যর্থিত হয়। পুত্র প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবার পর তিনি তাহার ইংরাজী বেশভূষাসম্পন্ন আপাদমস্তক বিরক্তকটাক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া বারান্দার একখানা চৌকী দখল করিয়া লইয়া বলিলেন, "আজ আবার যাওয়া হচ্ছে কোথা?"

পুত্র বেশ সপ্রতিভ ভাবেই উত্তর করিল,—"আজ্ঞে কল্‌কাতায়।"

পিতা চামুণ্ডামূর্ত্তির স্তোত্র একবার আবৃত্তি করিয়া লইয়া জপমালা মস্তকে ঠেকাইবার পর তাহা গলদেশে তুলিয়া লইয়া বলিলেন,—"যখন তখন কল্‌কাতা আর কল্‌কাতা। খরচ যোগায় কে?"

"কেন আপনার আদেশেই ত যাচ্ছি, মোকদ্দমা রুজু করাতে হবে না?"

সুজন রায় পূর্ব্বেই কৌন্সিলের মত লইয়া বুঝিয়াছিলেন, মোকদ্দমায় তাঁহার জয়লাভের সম্ভাবনা

কম—তথাপি জেদের দোহাই অমান্য করিতে পারিতেছিলেন না—কিন্তু তহবিলের খাঁকতির দায়ে অবশেষে মনের পরাপ্রবৃত্তিটাকেও আপাততঃ কোণঠাসা করিয়া রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন।

"মোকর্দ্দমা করা অমনি সোজা কথা কি না? রেস্ত ত চাই। ব্যারিষ্টারদের মত জানতেই অনর্থক কত খরচ হোল। দুই-ও ত একটা অকালকুষ্মাণ্ড—পাশটাশ একটাও ত দিতে পারলিনে। তোর উপরে যে এতটুকু আশাভরসা বাঁধব তারও ত উপায় রাখিস্ নি।"

বিজন রায় চুপ করিয়া রহিল। পিতা বলিতে লাগিলেন, "এখন একটি মাত্র উপায় আছে—এই বৈতরণী পার হবার একখানি ডিঙ্গি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি বাইতে পারিস্ যদি, তবেই কূলে উঠতে পারবি,—পারবি কি না বল্—"

"আজ্ঞে বলুন, সে উপায়টা কি? তার পর বুঝব—পারব কি না।"

"অনেকবার ত বলেছি—যদি প্রসাদপুরের ধনুকটা কোন রকমে দখল করতে পারিস্ তবে রায়-রাজ্য তোর হস্তগত হবে—নিশ্চয়ই; বুঝলি ত?"

এ সম্বন্ধে বিজনকুমার আবাল্য অনেক কথাই শুনিতেছে। এই ধনুক-বাসুকির মাথার উপর যে রায়-রাজ্যের স্থাপনা—ইহাকে ঘরে আনিতে পারিলে জজেরা যে তাহাদের ন্যায্য অধিকার গ্রাহ্য করিবেন—এই সংস্কার তাহারও মনে বিশ্বাসরূপে বদ্ধমূল হইয়াছে।

পিতার কথার উত্তরে পুত্র কহিল,—"আজ্ঞে বুঝেছি।"

"বুঝেছি বল্লেই ত হবে না, পারবি কি না?"

"আজ্ঞে পারব"

"আজ্ঞে পারব! অমন বাজে কথা আমি শুনতে চাইনে,—কি ক'রে পারবি, তাই বল্।"

"রাজ-দপ্তরে আমার এক জন অন্তরঙ্গ বন্ধু আছে, সে আমার জন্য সব কায করতে পারে।"

সুজন রায়ের চক্ষু লোভে জ্বলিয়া উঠিল। তিনি চামুণ্ডাদেবীর বলিদানে শত মুদ্রা মানৎ করিয়াছিলেন—মনে মনে আরও একশত বাড়াইয়া দিয়া এতক্ষণ পরে প্রসন্নভাবে বলিলেন—"আচ্ছা বেশ, তবে তাকে দিয়ে কার্য্যোদ্ধার কর্।"

"কিন্তু খাওয়াতে হবে কিছু তাকে?"

সুজন রায় ধনুখনে হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"অন্তরঙ্গ বন্ধুই বটে!"

"যে বন্ধু আমাকে খাতির করে, আমারও ত তার খাতির রাখা চাই, এক তরফা বন্ধুত্ব ত আর জগতে মেলে না।"

"বেশ, কি দিতে হবে বল্? এ সংসারে আগে থাকতে বিশ্বাস কাউকেই করতে নেই। অতিরিক্ত বিশ্বাসের ফল হাতে হাতে পেয়েছি। তবে যদি কাযটা হাসিল্ ক'রে দেয়, তখন তাকে তার আশ মিটিয়েই খাওয়াব, এইটে বেশ ক'রে বুঝিয়ে বল্‌বি বুঝলি ত?"

"না, তেমন বেশী কিছু দিতে হবে না, তাদের একটা সভাসমিতি আছে, তাতে অল্পবিস্তর কিছু দিলেই চল্‌বে।"

"তবু আঁচটা কি তার?"

"এই শ পাঁচেক।"

"বাস্ রে" বলিয়া সুজন রায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন কিন্তু তবুও ত ধনুকের আশা ত্যাগ করা যায় না; পকেট হইতে দশ টাকার নোট দশ খানা বাহির করিয়া পুত্রের হস্তে দিয়া বলিলেন "এই নাও বাপু, চামুণ্ডার এ মানৎ অর্থ তোমাকেই দিলাম, এ টাকা বায়না স্বরূপ দিয়ে এখন তাকে প্রসন্ন কর, বুঝলে ত? তার পর ধনুকটা এনে যে দিন সে হাজির করবে, সেই দিন থেকে সভা-সমিতির জন্য তার আর কোন ভাবনাই থাকবে না।"

বিজনকুমার অতঃপর আর কোন কথাই না কহিয়া তাহাই পকেটে পুরিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। সকালবেলা সে দিন আর তাহার কলিকাতা যাত্রা হইল না। এ কাযটা ত আগে করা চাই। কিন্তু আজ ত মাতৃ-মন্দিরে মিলনের দিন নহে, সন্তোষের সহিত দেখা হইবার উপায় কি? নিজে রাজবাড়ীতে যাইতে পারে না, চাকরের দ্বারা চিঠি পাঠান ঠিক নহে, লোকের মনে তাহাতে সন্দেহ জন্মিতে পারে! আর যদি সন্তোষের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য আরও দুই দিন অপেক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে ঠিক সময়ে শনিবার সে কলিকাতায় পৌছিতে পারিবে কি না সন্দেহ, অথচ আগামী দিনের জমকালো রেসটার জন্য অনেক দিন হইতে সে প্রতীক্ষায় আছে! "কি বিপদ্!" এই বলিয়া সে ঘরে গিয়াই টাইম-টেবিল দেখিতে বসিল। কিছুক্ষণ পরে জুতার শব্দ পাইয়া সে দ্বারদেশে দৃষ্টিপাত করিল। এ কি, এক জন সেবাধারীকে সঙ্গে লইয়া সন্তোষ যে স্বয়ং এখানে উপস্থিত!

বিজনকুমার 'হ্যাল্লো' নাদে সোল্লাসে উঠিয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ পরস্পরে আহ্লাদসূচক বাক্যবিনিময় চলিল, তাহার পর তিন জনই কেদারা

গ্রহণ করিল। সন্তোষ বসিয়া একবার চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়া বলিল, "আশেপাশে কেউ নেই ত হে? তারণ, তুমি বরঞ্চ বারান্দায় গিয়ে বোসো,—চাকর-বাকর কেউ এ দিকে আস্‌ছে দেখলেই আমাদের সাবধান ক'রে দিও।" তারণ আদেশমাত্র বিনা বাক্যব্যয়ে বারান্দার বেঞ্চে গিয়া বসিল। সন্তোষ তখন বলিল "টাকার ত বিষম খাঁকতি, চাঁদার কিছু যোগাড় না করলেই নয়। রাজা বাহাদুর যদিও আগে একবার হাজার টাকা দিয়েছেন, তবুও চল, তাঁকে আর একবার ধরা যাক্; মোটা টাকা তাঁর কাছে ছাড়া আর কোথাও সহজে মিলবে না। এবার তোমাকেও আমাদের সঙ্গে কিন্তু যেতে হবে— তাই ধর্‌তে এসেছি হে।"

"ক্ষেপেছ! আমাদের মধ্যে কেমন সদ্ভাব, তা ত জান? তোমরা গেলে যদি হাজার টাকা মেলে—আমি গেলে হাজার পয়সা মিল্‌বে কি না সন্দেহ।—"

"কিন্তু রাজা বাহাদুর ত সে রকম ধরণের লোক নন; দেশ-হিতকর সভা-সমিতির সঙ্গে তোমার যোগ আছে, শুন্‌লে তিনি খুসীই হবেন।"

"না হে না, সে পাজি ডাক্তারটা থাকতে আমি আর সে মুখো হচ্ছিনে। আগে তাকে—"

"সে আয়োজন হচ্ছে,—বেশী দিন আর তিনি রাজপ্রসাদ ভোগের অবসর পাবেন না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেবাধারীগুলোও যে অন্নাভাবে মারা যাবে। সভা-সমিতি—দেশোদ্ধার যা কিছু বল—সবার মূল হচ্ছেন এই যাদুর কাঠি—" বলিয়া সে আঙ্গুল বাজাইয়া টাকার রূপ সঙ্কেত করিল;— সঙ্গে সঙ্গে বলিল,—"বুড়োর কাছেও কিছু আদায় কর, দাদা!"

উত্তর হইল,—"আমি কি নিশ্চেষ্ট ব'সে আছি না কি! কিছু পাওয়াও গেছে, আর একটা মস্ত দাঁওয়ের যোগাড় ফেঁদেছি।"

"সত্যি না কি? খুলে বল হে কথাটা, হাঁপ ফেলে বাঁচি।"

"তুমি ত রাজার হাতিয়ার-শালার কর্ত্তা, তুমি যদি সেখান থেকে কোন রকমে পুরাতন ধনুকটা সরিয়ে এনে বুড়োকে দিতে পার ত অনেক টাকা পাওয়া যায়। জান ত এই ধনুকটার প্রতি কর্ত্তার কিরূপ নেক্‌নজর।"

পাঠক, এখন বুঝিয়াছেন, অতুলেশ্বরের অনুমান ভিত্তিশূন্য নহে।

সন্তোষ এই কথা শুনিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর বেশ একটু সঙ্কোচের সহিত বলিল,—"কিন্তু বড়ই বিশ্বাসঘাতকের কায হয় সেটা। জানিস ত, ভাই, রাজা বাহাদুর কিরূপ ভাল লোক ও ভাল মনিব।"

বিজনকুমার ব্যঙ্গ-ভরা হাসি হাসিয়া বিদ্রূপের স্বরে বলিল,—"এ সব নীতির বুলি আওড়াতে শিখলি কবে থেকে তুই?"

সন্তোষ থতমত খাইয়া বলিল, "তা ছাড়া, দাদার এতে সর্ব্বনাশ ঘট্‌তে পারে।"

বিজনকুমার এবার গম্ভীর স্বরে বলিল, "দেখ, আমরা যে কাযে ব্রতী হয়েছি, তার মধ্যে ও সব মামুলি ভাবনার স্থান নেই। মাতৃভূমিই আমাদের পিতা-মাতা, পুত্র-কান্ত একাধারে সব,— আর গুরুর প্রতি বিশ্বাসস্থাপনই এখন আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। উপস্থিত এখন আমিই গুরুর প্রতিনিধি—"

সন্তোষ মনে মনে যেন কি কথা তোলাপাড়া করিয়া একটু পরে বলিল, "বল তবে তোমার হুকুম।"

"ধনুক চুরী ক'রে আন্‌তে হবে।" সন্তোষ সহসা উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিল, "দেখ, বিজু মিঞা, যদি ধনুকই চুরী করতে হয়, তবে অন্য হাতি-য়ারই বা চুরী কর্‌তে দোষ কি?"

বিজন রায় আহ্লাদে উঠিয়া দাড়াইল, তাহার পর চৌকী হইতে উঠিয়া আসিয়া তাহার কানের নিকট মুখ রাখিয়া মৃদু স্বরে বলিল, "কিচ্ছু না। পার্‌লে ত ভালই হয়; আমাদের অস্ত্র-ভাণ্ডার পূর্ণ হয়ে ওঠে।"

সন্তোষও উঠিয়া দাঁড়াইয়া মৃদু স্বরে বলিল, "দেখ ভাই বিজন-দা, আজ তবে মন খুলে বলি। রাজহাতিয়ারশালার অস্ত্রগুলা যখনই দেখি, আমার মনে যে কি আপশোষ জেগে উঠে, কি বল্‌ব! এতগুলা অস্ত্র এখানে নিরর্থক মাটী হচ্ছে! আমরা হাতে পেলে কত ভাল কাযে লাগাতে পার্‌তুম!"

"Bravo" বলিয়া বিজনকুমার তাহার পিঠ থাবড়াইয়া, ভগবদ্গীতার মামুলি শ্লোক দুই একটার আবৃত্তি দ্বারা তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া তুলিয়া কহিল, "এই নে, ভাই, ৫০৲ টাকা বাবা দিয়েছেন। তার পর কার্য্যসিদ্ধি হ'লে খুব বড় রকম একটা দান নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।"

বলা বাহুল্য, অপরার্দ্ধ রেসে ব্যয়ার্থ সে হাতে রাখিল। সন্তোষ নোট-ক'খানা পকেটজাত করিয়া কহিল,—"যথা লাভ। কিন্তু দেখো, দাদা, বুড়ো যেন শেষে ফাঁকি না দেয়। এমন একটা মোটা দান তার

কাছে চাই আমরা—যাতে আর 'ভুলক্রমে' যাবার দরকার না থাকে। সত্যি বলছি, বিদ্রোহ মিশন, পুলিস-খুন বা ইংরাজ-খুন করতে মনে বাধা পায় না, কিন্তু নিরীহ দেশের লোকের সর্ব্বস্ব অপহরণ করতে বেশ একটু কষ্ট পেতে হয়।"

"কষ্টের কথা এখন রাখ। যে কায আমরা ধরেছি, তা'তে এ রকম কষ্ট জলের মত হজম করতে হবে। রাজা বাহাদুরের কাছে এখন যা; গিয়ে মোটা রকম একটা চাঁদা আদায় ক'রে আন।"

এই কথাবার্ত্তার ফল কি হইল, পাঠক জানেন। হায় রে মানুষের সঙ্কোচ! অধিক স্থলেই ইহা ম্যাক্‌বেথের দুর্ব্বলতা মাত্র!

বিজন রায়ের উপদেশ সবল শক্তিরূপে তাহার কর্ম্মযোগের মূলে অধিষ্ঠিত হইবামাত্র সন্তোষের মনের সমস্ত বাধা-সঙ্কোচ দূর হইল। তখন রাজার চেক-ফর্ম্মে জাল সহি করিতে সে বরঞ্চ বেশ একটা আত্ম-প্রসাদই অনুভব করিল।

* * * * *

পরদিনই সন্তোষ জাল চেকখানা বিজনকে ভাঙ্গাইবার জন্য দিতে আসিয়া শুনিল, বিজন কলিকাতায় গিয়াছে। কিন্তু ফিরিয়া আসিয়াও সুজন-পুত্র সে চেক গ্রহণ করিল না। অস্যার্থ- ধরি মাছ না ছুঁই পানি। কোনো এক দিন যে এই চেক-রহস্যের তদন্তে সহর গুল্‌জার হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব চেক ভাঙ্গাইবার ভারও পড়িল সন্তোষের উপর। সন্তোষ সে ভার ঘাড় পাতিয়া লইয়া আপাততঃ লাইব্রেরী ঘরের গুপ্ত দেরাজের মধ্যে চেকখানাকে আশ্রয় দান করিল। অতুলেশ্বর কলিকাতা যাইবার পর কোন ওজরে দাদার নিকট হইতে ছুটী আদায় করিয়া কলিকাতায় যাইয়া চেক ভাঙ্গাইয়া লইবে, এই রহিল তাহার মৎলব। কিন্তু রাজা চলিয়া যাইবার পরেই সে অস্ত্রচূরীর কাযে হাত দিয়া, সফলতার আনন্দে একরূপ উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিল। প্রতিদিন শনৈঃ শনৈঃ অস্ত্রাগার মথিত হইতেছে,অথচ তাহাকে বাধা দিবার কেহ নাই- এই অপ্রতিহত বিজয়লাভের নেশায় পড়িয়া কলিকাতাযাত্রার দিনটাকে সে ক্রমাগতই পরদিনের কোটায় ফেলিতে লাগিল।

কিন্তু নেশায় মাতিয়াও সে বন্ধুর উপরোধ ভুলে নাই। অন্য কোন অস্ত্রে হাত দিবার পূর্ব্বে প্রতিদিনই সে প্রথমে একবার ধনুকটা নাড়াচাড়া করিয়া দেখে, কিন্তু উঃ, কি ভারী! অন্য কাহারও সাহায্য না পাইলে ইহাকে নড়ান সরান যে একরূপ অসম্ভব, —কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে গিয়া তাহা সে বেশ বুঝিল। অথচ বিজন এ কার্য্যে তাহার দোসর হইতে চাহে না; অন্য একটিমাত্র সেবাধারীকে সে জানে, যাহার সাহসের উপর একান্তভাবে সে নির্ভর করিতে পারিত—কিন্তু সে এখন এখানে নাই, গুরুর আহ্বানে অন্যত্র সমিতিগঠনে গিয়াছে। তাহার প্রত্যাগমনের অপেক্ষায় সুজন রায়ের আদিষ্ট স্বর্গ-সিঁড়ি নির্ম্মাণে অতিরিক্ত বিলম্ব হইয়া পড়িতে লাগিল। সবুরে মেওয়া ফলে—এই প্রবচন যে অনার্য্য-বিধান ভাষা ভাষ্যেই তাহার প্রমাণ। আমাদের আর্য্যশাস্ত্রসম্মত 'শুভস্য শীঘ্রং' এ ব্যবস্থার লঙ্ঘনে সন্তোষের অদৃষ্টে অনার্য্যের সেই মেওয়া ফলটি ফলিল না। হঠাৎ এক দিন দলপতির আজ্ঞাপত্র আসিল, "তোমার হাতের কায সত্বর শেষ করিয়া লইয়া অবিলম্বে এখানে আসিয়া হাজির হও।"

সে পত্র বিজনকুমারের মারফৎই সন্তোষ পাইল। এখন অতুলেশ্বর এখানে নাই, রাত্রির অন্ধকারে সন্তোষের আড্ডায় আসিয়া পত্র দিতে বিজন কোন আপত্তির কারণ দেখিল না। গুরুর চিঠি পাইয়া খুব একটা নৈরাশ্যের ভাবে সন্তোষের মন ভরিয়া উঠিল, কিন্তু এ ভাবের প্রশ্রয় দেওয়া অনুচিত; সে শূন্য হাসি হাসিয়া কহিল, "যে কাযটা শেষ করতে গুরুদেব ইঙ্গিত করেছেন, সেটা প্রায় শেষ হয়ে গেছে—আজই রাতারাতি বাকীটুকু শেষ ক'রে ফেলে—কালই আমি এখান থেকে তা হ'লে চ'লে যাই।" বলিয়া আলমারির আঁড়ালে যে কোণে বসিয়া সে বোমা প্রস্তুত করিতেছিল, সেইখানেই বন্দুক আনিয়া, অর্দ্ধ-প্রস্তুত বোমাটার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দিষ্ট করিয়া কহিল—"ঐ দেখ।"

বিজন বলিল—"রাতের মধ্যে কাযটা কি শেষ হবে?"

"হ'তেই হবে, গুরুর আজ্ঞা। এখন এস, তোমাকে চেকখানা দিই।" বলিয়া দেরাজ খুলিয়া সে চেকটা বাহির করিল। বিজন আপত্তি করিয়া বলিল,—"না না, আমি নিতে পারব না—তুমি রাখ। তুমি ত কলিকাতা হয়েই যাবে, অমনি ভাঙ্গিয়ে নিও।"

"না, ভাই, ও সব কাযে বিলম্ব হ'তে পারে—গুরু শীঘ্র আমাকে যেতে বলেছেন। তুমি সেক্রেটারী তোমার কাছেই এখানা থাকা উচিত। ভাঙ্গাতে পার ভাঙ্গিয়ে নিয়ো, নইলে আমার ফিরে আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা ক'রো। ইত্যবসরে গুরুদেব এ সম্বন্ধে কি বলেন—তা-ও জেনে রাখব।"

অগত্যা চেকখানা বিজন রায় গ্রহণ করিল।

তাহা পকেটে পুরিয়া কহিল—"কিন্তু ধনুকের ত, ভাই, কিছু হোল না—বুড়ো ত' আমাকে অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছে।"

সন্তোষ দেরাজটা বন্ধ করিয়া বলিল—"এখনি ত সে কাযটাও আমরা দুই জনে সেরে ফেল্‌তে পারি,—এস একবার চেষ্টা দেখা যাক্।

লাইব্রেরী হইতে অস্ত্রাগারে যাইবার দ্বার বন্ধ ছিল, কিন্তু চাবিটা থাকিত সন্তোষেরই কাছে, দ্বার খুলিয়া উভয়ে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

কিন্তু সেই বৃহদাকার ধনুক দেখিয়া ত বিজনের চক্ষু স্থির। সে বলিল—"এ ধনুক নিয়ে আমরা পালাব কি ক'রে?"

"সে ভাবনা তোমার নেই—ওই দেখ ক্লোরো-ফর্ম্ম। পাহারাওয়ালাদের ঘুম পাড়িয়ে রেখেই আমি কার্য্যোদ্ধার করি।"

প্রশংসা-বিস্ময়ে বিজন অবাক্ হইয়া রহিল।

সন্তোষ বলিল "আমার রাজত্বে সুখে আছে সব চেয়ে রাজার পাহারাওয়ালার দল। তাদের আশীর্ব্বাদে স্বর্গদ্বার যে আমার জন্য প্রতিদিন একটু বেশী ক'রে খুলছে, তাতে সন্দেহ নেই। আজকাল প্রতি রাত্রিতে আমি লাইব্রেরী-ঘরে এসে বসি। ১০টার সময় যে পাহারা বদল হয়, তারা বেশ সাধু-সজ্জন, তাদের প্রতি আমার হুকুম দেওয়া আছে যে, যতক্ষণ আমি এখানে থাকি, ততক্ষণ জেগে পাহারা দেবার তাদের দরকার নেই, ততক্ষণ তারা নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত মনে আরাম করুক। আমি যাবার সময় তাদের ডেকে দিয়ে যাব।"

বিজন হাসিয়া বলিল—"পাহারাওয়ালা ভায়াদের বিধাতা দেখছি একইরূপ ধাতুতে নির্ম্মাণ করেছেন, আমি ভাবতুম, আমাদের দরোয়ানরাই বুঝি ঘুম-রাজ্যের উল্কাপিণ্ড,—ছট্‌কে বিষাদপুরে এসে পড়েছে।"

সন্তোষ বলিল—"শোন আগে, তার পর টীকা কোরো। এ বন্দোবস্তে আমার বিলক্ষণ সুবিধা হয়েছে। যখন তাদের নাসিকাধ্বনি প্রবল হয়ে ওঠে, তখন দরকার বুঝি যদি তা হ'লে সেখানে গিয়ে তাদের ঘুমের উপর মোহনিদ্রা রচনা ক'রে আসি। এক জায়গায় আমি কেবল কাবু—এই হরিরামের নিকট।"

"তা হ'লে—"

"কিন্তু সে আসে দুপুরের সময়—তার আগেই আমার কায শেষ করতে হয়।"

বিজন ঘড়ি দেখিয়া বলিল—"কিন্তু দুপুরের ত বড় বেশী দেরী নেই।"

"এখনো আধঘণ্টার উপর দেরী আছে। এ সময়ের মধ্যে সূর্য্য-চন্দ্র কত পথ প্রদক্ষিণ করেন, বল ত হে? এস—আর বিলম্ব নয়—লোকাভাবে এ কাযটা এতদিন ফেলে রাখাই হয়েছে।"

"আমার কিন্তু বুকটা কাঁপছে।"

"কিচ্ছু ভয় নেই; এস দেখি, হাতাহাতি ক'রে ওটাকে আগে নামিয়ে ফেলি; নামানটাই হচ্ছে—আসল কায।"

"কিন্তু তার পর মড়ার মত ওটাকে দুজনে ঘাড়ে ক'রে পালাতে হবে ত? তখন নিশ্চয়ই ধরা পড়বে—"

"না হে না; এস না, আগে নামিয়ে ফেলি—তার পর তোমার কিছু করতে হবে না—তুমি শুধু ওটাকে আমার কাঁধে তুলে দিয়েই সট্‌কে প'ড়ো,—তা হ'লেই আমি স্বচ্ছন্দে পালাতে পারব।"

"যে কাণ্ড করছ, এক দিন দেখছি আমাদের তুমি ফাঁসাবে।"

"আরে অত ভয় করলে কি চলে, দেখছ ত শীত-রাতেও জানালাটা খোলা, ঐটি হচ্ছে—আমার মুক্তির পথ। চুরীটা এক দিন ত ধরা পড়বেই; তখন সহজেই প্রমাণ ক'রে দেব যে, স্বদেশী দস্যু-নন্দনরা ঐ পথে ঢুকে ঐ পথে চ'লে গিয়েছে।"

"আর এখন কি সত্যই তুমি সদর রাস্তা দিয়ে ধনুক ঘাড়ে ক'রে বেরোবে না কি? daring তুমি!"

"তা নয় ত কি—এস, আর কালবিলম্ব করা নয়—"

অতঃপর একটা ছোট টেবিল দেওয়ালের নীচে আনিয়া ফেলিয়া, তাহার উপরে চড়িয়া উভয়ে ধনুক নামাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু প্রসাদপুরের ধনুর্দ্দেবতা বিষাদপুরের হস্তে আত্মসমর্পণে অনিচ্ছুক হইয়া তাহাদিগকে ব্যর্থমনোরথ করিয়া সশব্দে মাটীতে পড়িয়া গেলেন; ভয়কাতর বিজন রায় ক্ষণ-বিলম্ব না করিয়া দ্রুতচরণে পলায়ন করিল।

সন্তোষের পলাইবার কোন প্রয়োজন ছিল না—শব্দ পাইয়া হরিরাম যদি আসে ত দেখিবে, ধনুকটা দেয়াল হইতে খসিয়া নীচে পড়িয়াছে; বাঁধন আল্‌গা হইলে এরূপ ঘটনা কিছুই অসম্ভব নহে। সন্তোষের আসল বিপদ ঘটিল—বোমা সরাইতে গিয়া।

বোমাটা তাড়াতাড়ি হাতে তুলিবামাত্র তাহা ফাটিয়া গিয়া সন্তোষকে ধরাশায়ী করিল। এ খবর কিন্তু বিজন জানিল না। পরদিন তাহার দেখা

না পাইয়া সে ভাবিল- সে গুরুদর্শনে যাত্রা করিয়াছে।

ইহাই অস্ত্র-চুরীর আদি ইতিহাস। উপাস্ত্য ভাগের সহিত ইহার কিরূপ যোগাযোগ আছে, পাঠক তাহা পরে বুঝিতে পারিবেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

পুত্রকে এক শত টাকা দণ্ড দিয়া পর্য্যন্ত সুজন রায় মাংসখণ্ডলুব্ধ কুক্কুরের ন্যায় বন্দুকের প্রত্যাশায় আছেন। কিন্তু দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটিল—মাসের পর মাস চলিয়া যায়—সে বন্দুক ত কই ঘরে আসে না। নৈরাশ্যদগ্ধ হইয়া দর্শনে-অদর্শনে তিনি পুত্রকে গালি পাড়েন—আর দুই সন্ধ্যা চামুণ্ডা-চরণে অর্ঘ্যদান করিয়া তাঁহার কৃপাভিক্ষা করেন। আজ সকালে মন্দির হইতে গৃহে ফিরিয়া জপমালা ফিরাইতে ফিরাইতে দশ এগার বৎসর আগেকার একটি ঘটনা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। তাঁহার জমীদারীর ঠিক সীমানার পার্শ্বে অতুলেশ্বরের জমীর উপর একটি ক্ষুদ্র কালীমন্দির ছিল। এই ইষ্টকমন্দির রাতারাতি এক দিন তিনি ভাঙ্গিয়া দেন। পরে এই মন্দিরস্থান লইয়া বহু দিন উভয়পক্ষে মামলা-মোকদ্দমা চলে—এবং বিচার-ভ্রান্তি-ফলে এই অংশ সুজন রায়ের জমীদারীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু নিজের অধিকারে পাইয়া পর্য্যন্ত তিনি এত দিন এ মন্দিরের পুনঃসংস্কার করেন নাই। সেই অপরাধেই যে দেবী তাঁহার প্রতি অপ্রসন্ন, আজ সহসা তিনি সুস্পষ্ট বুঝিলেন। সেই দিনই আহারান্তে অশ্বযানে তিনি সেই মন্দিরের খোঁজে চলিলেন। মন্দির-স্থান অধিকার করিবার সময় যে সকল লাঠিয়াল নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহাদেরই এক জন এখনও তাঁহার বরকন্দাজ—তাহাকে তিনি সঙ্গে লইলেন। তীরপথে অনেক দূর আসিয়া গাড়ীয়া এক স্থানে বরকন্দাজ অশ্বযান থামাইয়া কোচমানের পার্শ্বদেশ হইতে নামিয়া অঙ্গুলিনির্দ্দেশে প্রভুকে দেখাইয়া বলিল,—"ঐ যে জঙ্গল দেখা যায় ওর মধ্যে দেবীর ছিল—অধিষ্ঠান।"

বহুক্রোশব্যাপী সেই ভীষণ জঙ্গলের দিকে চাহিয়া সুজন রায়ের মাথা ঘুরিয়া গেল, তিনি নয়নে অন্ধকার দেখিলেন, তাঁহারই কর্তৃক এরূপে অবমানিত হইয়া দেবী এই তমসাবৃত জঙ্গলে পড়িয়া আছেন! কালীর ক্রোধের কারণ মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়া তিনি ভয়কম্পিত কণ্ঠে জোড় হস্তে মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়া কহিলেন, "সন্তানের দোষ গ্রহণ করিও না দেবি, দয়া কর, রক্ষা কর এ অধম সন্তানকে কৃপা-কটাক্ষ দান কর এই জঙ্গল নাশ করিয়া তোমার করালী মূর্ত্তিকে আমি সপ্ত মন্দিরের ভিত্তিতে স্থাপন করিব।"

এ জঙ্গল পদব্রজে আজ ভেদ করা তিনি সম্ভব জ্ঞান করিলেন না; পরে হাতীর পিঠে চড়িয়া এখানে আসিবেন, এই সঙ্কল্পে গৃহে ফিরিলেন।

গাড়ী আসিয়াছিল তীরপথে; ফিরিল মাঠের পথ ধরিয়া। অপরাহ্নের রক্তিম-ছটা ক্রমশঃ জঙ্গলের মাথা লাল করিয়া, নদীর জলে ঝিকিমিকি স্রোত তুলিয়া,—আকাশের বিশালতা ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া তুলিয়া তাহার নানা স্তরে নানাবর্ণ আঁকিয়া সন্ধ্যার রঙ্গশালা নির্ম্মাণ করিতে লাগিল, দিকে দিকে পাখীর আগমনী সঙ্গীত ধ্বনিত হইয়া উঠিল। সুজন রায় গাড়ীর ভিতর হইতে জঙ্গলের দিকে চাহিয়া দেবীকে প্রণাম করিলেন,—সহসা তাঁহার গাড়ীর ঘোড়া দুইটা উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল,—কোচমানের দারুণ কশাঘাতে একবার গা-নাড়া দিয়া গাড়ী উল্টাইয়া ফেলিবার যোগাড় করিল—কিন্তু চলিল না। সুজন রায় সভয়ে গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলেন; তাঁহার কানে বন্দুকের আওয়াজ আসিয়া লাগিল। এ কি। বনভূমিতে বন্দুকের শব্দ! মুহুর্ম্মুহু দুই চারিটা বন্দুক একের পর একে ধ্বনিত হইয়া উঠিল, ঠিক যেন আওয়াজের ধ্বনি। তিনি বিস্ময়ে কান পাতিয়া রহিলেন কিন্তু অতঃপর আর কোনও শব্দ শুনিতে পাইলেন না; ঘোড়া দুইটাও এবার ভালমানুষী-লক্ষণ প্রকাশ করিল; কোচমান বলিল, "হুজুর, গাড়ীতে উঠুন।" তিনি গাড়ীতে উঠিয়া বসিলে অশ্বদ্বয় বেশ সহজভাবেই গাড়ী বহন করিয়া পৌঁছিয়া দিল।

গাড়ীতে বসিয়াও এই বন্দুকের শব্দ সুজন রায়ের কানে বাজিতে লাগিল আর মাথার মধ্যে কত মৎলব ঘুরপাক খাইতে লাগিল। মাণিকতলার অ্যানার্কিষ্ট দল এখানেও একটা আড্ডা করিয়াছে না কি? তাঁহার মনে একটা মস্ত আশা জাগিয়া উঠিল,—বুঝিলেন, কালিকাদেবী তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট।

বাড়ী ফিরিয়া তিনি আর তখন উপরে উঠিলেন না সন্ধ্যা-আরতির সময় মন্দিরেও গেলেন না।

আজকাল বিজনকুমার তাঁহার পথ মাড়ায় না,—তাহাকে ডাকিলেই তিনি শোনেন—সে বাড়ী নাই। তাই তাহাকে ধরিবার জন্য ফাঁদ পাতিয়া—নীচে

সিঁড়ির ঘরে বসিয়াই মালা জপিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার মৎলব সিদ্ধ হইল।

বিজন ঘোড়ায় চড়িয়া কোথায় বেড়াইতে গিয়াছিল, বাড়ী ফিরিয়া সিঁড়ির ঘরে ঢুকিবামাত্র কর্ত্তা হাঁকিলেন—"হতভাগা—যাওয়া হয়েছিল কোথায়?"

বিজন চমকিয়া উঠিল—পিতা যে ঘরের কোণে আসন পাতিয়া বসিয়া আছেন, সে প্রথমে তাহা দেখে নাই। থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"একটু বেড়াতে গিয়েছিলাম।"

"দিন নেই, রাত নেই, বেড়াতেই যাওয়া হচ্ছে—কোন্ বাপের শ্রাদ্ধ করতে—সেইটে নি। জুয়াচোর, লক্ষ্মীছাড়া—দে—আমার টাকা ফিরিয়ে—ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে তুমি ঘাস খাবে ভেবেছ—সেটি হচ্ছে না।"

বিজনের মেজাজটা আজ আগে থাকিতেই খারাপ আছে, আজ মাতৃমন্দিরের স্ফূর্ত্তিতে একটা খুনের ভার তাহার উপরেই পড়িয়াছে। এক দিন সে ভাবিয়াছিল, পরের জীবন লইয়াই এই স্বদেশী-ব্রতের খেলা সে খেলিবে, নিজের জীবনও যে এ খেলার পণ্য স্বরূপ দিতে হইতেও পারে—এ কথা ইতিপূর্ব্বে তাহার কোন দিন মনেই হয় নাই।

পিতার গালিগালাজ অন্য দিনের ন্যায় সে ধীর চিত্তে সহ্য করিল না, উত্তরে অসহিষ্ণুভাব প্রকাশ করিয়া কহিল,—'বেশ আপনি যখন চাচ্ছেন—আমি সে টাকা ফেরত এনে দেব, কিন্তু ধনুকের আশা তা হ'লে ত্যাগ করুন।"

সুজন রায় এরূপ উত্তর আশা করেন নাই, তিনি একটু নরম হইয়া বলিলেন,—"দেখ বেটা অকৃতজ্ঞ,—ধনসম্পদ আমি যে চাই—সে আমার জন্য—না তোর জন্য? প্রসাদপুর রাজত্ব পেলে গদিতে বসবে কে, তুই না আমি? সেইটে বল্ দেখি?"

কিন্তু আপনার অবিশ্বাসেই ত আমার মন খারাপ হয়ে যায়, বন্ধুকে আমি রোজই তাড়া দিচ্ছি—সে-ও নিশ্চেষ্ট ব'সে নেই, যদি প্রমাণ চান—তাও দেখাতে পারি।"

"আচ্ছা, তাই দেখা, চেষ্টা যে চলেছে, এটা বুঝলেও ত নিশ্চিন্ত হ'তে পারি।"

"আচ্ছা, আসুন তবে আমার ঘরে—"

আবেগভরে এ কথা বলিয়া ফেলিয়াই বিজন অনুতপ্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু একবার বাঁকা পথে পা ফেলিলে সহজে আর সোজা পথ মেলে না।

সুজন রায় কৌতূহলাক্রান্তচিত্তে তাহার সঙ্গ গ্রহণ করিলেন।

গৃহে আসিয়া সে আলমারী খুলিয়া একটা বন্দুক বাহির করিল, সবিস্ময়ে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি কহিলেন,—"এ কি ব্যাপার।"

"প্রসাদপুরের অস্ত্রশালার বন্দুক!"

সুজন রায় ভীত-কণ্ঠে বলিলেন, "বন্দুক চুরী করতে বলেছে কে তাকে?—সর্ব্বনাশ! ধরা পড়লে যে আমাদের জেলে যেতে হবে।"

"আপনার তাড়া খেয়ে আমিই বলেছিলুম তাকে, চুরীবিদ্যাতে এমন ক'রে হাত পাকাও, যাতে ক'রে ধনুকটা পরে সহজেই হাতাতে পার।"

সুজন রায় মালা মাথায় ঠেকাইয়া বলিলেন,—"দেখ, আমার মনে হচ্ছে, তোর বন্ধুটিও মাণিকতলার লোক। ঠিক ক'রে বল্ দেখি, তুই এ দলে আছিস্ কি না? বড় যে ভয় ধরিয়ে দিলি!"

জোরের সহিত মিথ্যা বলা বিজনের খুব অভ্যাস হইয়া গিয়াছে—এই কাযটি এ দলের লোকের সর্ব্ব প্রথম শিক্ষা; সে দৃঢ় স্বরে বলিল,—"কি যে বলেন, আপনি? আমার কি প্রাণের ভয় নেই না কি?"

তথাপি তাঁহার সন্দেহ মিটিল না,—তিনি বলিলেন, "লুকোস্‌নে আমার কাছে, ঠিক ক'রে বল্। যদি বা তাদের পাক-চক্রে ফাঁদে প'ড়ে থাকিস্, আমি তোকে রাজ-সাক্ষী দাঁড় করিয়ে সে ফাঁদ থেকে উদ্ধার করব, বল্, বিজন, বল্।"

বিজন অসঙ্কোচে বলিল,—"বৃথা ভয় পাচ্ছেন,—আপনার ছেলে হয়ে আমি রাজবিদ্রোহী হ'তে যাব, এ কথনো সম্ভবপর হয়?"

সুজনের মনের সন্দেহ তথাপি মিটিল না; কিছু না বলিয়া কহিয়া ছেলের লেখার টেবিলের নিকট আসিয়া দেরাজটা টানিয়া খুলিয়া ফেলিলেন এবং কাগজপত্রগুলা টানিয়া বাহির করিতে লাগিলেন। বিজন হাসিতে লাগিল। গুপ্ত চিঠিপত্র সে রাখিত না, পড়িয়াই তৎক্ষণাৎ ছিঁড়িয়া ফেলিত, নোট বহিতেও সন্দেহজনক কোন কথাই তাহার লেখা থাকিত না। কিন্তু হঠাৎ যখন দেরাজের মধ্য হইতে পিতা অতুলেশ্বরের চেকখানা বাহির করিয়া ফেলিলেন—তখন সে অবাক হইয়া পড়িল। চেকখানা যে এই দেরাজে রাখিয়াছে, তাহা সে একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল।—চেকখানা লইয়া সুজন রায় বাতির নিকট ধরিয়া ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, দশ হাজার টাকার Bearer চেক ভাঙ্গান হয়

নাই এবং তিন দিন পূর্ব্বে তাহার মেয়াদ ফুরাইয়াছে। তিনি সবিস্ময়ে বলিলেন,—"এ কি ব্যাপার!"

বিজন এইবার কুণ্ঠিতভাবে কহিল, "রাজা বাহাদুরের কাছ থেকে আমার এক জন বন্ধু সভার জন্য চাঁদা এনেছিল।"

"কিন্তু, ভাঙ্গান হয় নি কেন?"

"আমাকে ভাঙ্গাবার জন্য দিয়ে, সে ঢাকায় চ'লে গেল; আমিও কথাটা একেবারেই ভুলে গেছি।"

"এত টাকা অতুল সমিতির জন্য দেবে বিশ্বাস হয় না। হয় ত বা এ জাল চেক, তাই ভাঙ্গাতে সাহস করে নি।"

বলিয়া তিনি সেখানা পকেটে পুরিয়া পুত্রকে বলিলেন—"আমি কিন্তু কালই ম্যাজিষ্ট্রেটকে বিদ্রোহী-দলের খবর দেব। আর অতুলেশ্বর যে ঐ দলের নেতা, তাও বলব। এ চেকটা বা বন্দুকটা তাঁকে অবশ্য দেব না—তাতে তোর উপর দোষ আসতে পারে। এগুলো এখন হাতে থাক, পরে সময় বুঝে কাযে লাগালে চলবে। কিন্তু বিদ্রোহীদের সন্ধানে তোরও আমাকে সাহায্য করতে হবে। যদি বা এদের সঙ্গে তোর কোন গুপ্তযোগ থাকে, তবে একমাত্র এই উপায়ে রক্ষা পাবি - বুঝলি!"

পরদিনই যে ম্যাজিষ্ট্রেট এই সংবাদ লাভ করিলেন, তাহা বলা বাহুল্য।

ম্যাজিষ্ট্রেট প্রসাদপুরে আসিয়া অবধি অতুলেশ্বরের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট। তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত দেখা করিতে আসিয়া যেরূপ সমতুল্যভাব দেখাইয়াছিলেন,—তাহা "সাহেবের" মনঃপুত হয় নাই, সুজন রায়ের অবনত সেলামই তাঁহার মনে নেটিব লোকের আদর্শ ভদ্রতা। উপরন্তু রাজকন্যা যে ক্লাউডেন সাহেবের বাড়ী যাতায়াত করিতেন, সে খবর তিনি জানিতেন, কিন্তু নবাগত ম্যাজিষ্ট্রেট পত্নীর সহিত তিনি ত কই দেখা করিতে আসিলেন না? ইচ্ছাকৃত অবমাননা বলিয়াই ম্যাজিষ্ট্রেট "সাহেব" ইহা ধরিয়া লইলেন। আসল কথা অবশ্য অন্যরূপ; মিসেস্ ক্লাউডেনকে রাজকন্যা এতই ভালবাসিতেন যে, এত শীঘ্র সেই স্থানে গিয়া তাঁহারই স্থলভুক্ত মেমের সহিত হাস্যালাপ করিতে তাঁহার মন কুণ্ঠিত হইয়া উঠিল, এই কষ্টকর ভদ্রতার কার্য্য আজ নয় কাল হইবে—বলিয়া স্থগিত রাখিতে রাখিতে কনফারেন্স আসিয়া পড়িল। তাহার পর হইতে উভয় পক্ষে মনোমালিন্য ঘটিল। "সাহেব" রাজার এই স্বদেশানুরাগ অতি ঘৃণ্য অপরাধ বলিয়া গণ্য করিলেন, আর রাজাও "সাহেবের" অন্যায় ব্যবহারে তাঁহার প্রতি একান্ত বিমুখ হইয়া পড়িলেন। কন্যাকে সেখানে পাঠান দূরে থাকুক, নিজেও তাঁহাদের সহিত দেখাশুনা বন্ধ করিলেন।

এইরূপ ঘটনা হইতে ম্যাজিষ্ট্রেটের মন পূর্ব্ব হইতেই রাজ-বিরুদ্ধে প্রস্তুত ছিল; এই কাঠ-খড়ের উপর সুজন রায়ের বাক্যাগ্নি পড়িবামাত্র সহজেই তাহা জ্বলিয়া উঠিল; অতুল যে বিদ্রোহীদলের এক জন নেতা—ইহা তিনি বিশ্বাস করিলেন। সুজনের নির্দ্দেশে এবং সহযোগে পুলিসদল বন-জঙ্গল ভেদ করিয়া বিদ্রোহীদিগের গুপ্ত আড্ডা আবিষ্কার করিবার অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

এবার যেন মহারাণী শরৎকুমারকে অতিরিক্ত সুনজরে দেখিয়াছেন। জ্যোতির্ম্ময়ী কলিকাতায় আসিয়া নানা মাসিক পত্রিকা হইতে নানা পৌরাণিক ছবি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল, ডাক্তার প্রসাদপুর যাইবার সময় তাঁহার হাতে সেই সকল ছবি ঠাকুরমাকে সে উপহার পাঠায়। শরৎকুমার চিকিৎসার অবসরে প্রায়ই প্রতিদিন একবার করিয়া মহারাণীর চরণদর্শনে আসিতেন এবং সেই ছবিগুলির সম্বন্ধে অবতারিত প্রশ্নের উত্তর ব্যাখ্যায় তাঁহার কৌতূহল নিবারণ করিতেন। ডাক্তার চলিয়া যাইবার পর মহারাণী পরিতৃপ্তচিত্তে ভাবিতেন, "মরি মরি! দেখতে যেমন সুশ্রী, পেটে তেমনি গুণ। চেহারায়, কথাবার্ত্তায়, ব্যবহারে বিদ্যাবুদ্ধি, বিনয়, সৌজন্য যেন ফেটে পড়ছে! মেয়েরও যে ছেলেকে মনে ধরেছে—তা ত বোঝাই গেছে। অমন ছেলে মনে ধরবে না ত, ধরবে কাকে? অতুলেরও ত এর প্রতি যথেষ্ট টান। তবুও যে বিয়েতে দেরী হচ্ছে কেন, সেইটেই আশ্চর্য্য। কে জানে বাবু, অতুলের মনের নাগাল যদি কিছুতে পাওয়া যায়!"

শ্যামাচরণের মধ্যবর্ত্তিতায় এ বিবাহ যাহাতে সত্বর সম্পন্ন হয়, এই অভিপ্রায়ে মহারাণী তাঁহাকে একবার পাঠাইলেন। তাঁহার বিশ্বাস, শ্যামাচরণ বুঝাইয়া বলিলেই এ সম্বন্ধে রাজার কর্ত্তব্য সজাগ হইবে। মহারাণীর কথা ত তিনি ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আনেন না; মায়ের মুখে এ কথা শুনিলেই রাজা তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দেন। শরৎকুমারের হাত

দিয়াই দেওয়ান মহারাণীর সে আদেশ-পত্র শ্যামাচরণকে পাঠাইয়া দিলেন।

শ্যামাচরণের হাতে জ্যোতির্ম্ময়ী ঠাকুরমাকে এইরূপ একখানি পত্র দিল :—

শ্রীচরণকমলেষু,

শত শত প্রণামপূর্ব্বক নিবেদন,—

ঠাকুর-মা, সু-খবর জানিবেন। আমি নূতন মায়ের স্নেহে আমার হারা-মাকে ফিরিয়া পাইয়াছি। বাবারও মনোনীত হইয়াছে। ইহা আমার অনুমান মাত্র নহে, যথেষ্ট প্রমাণ পাইতেছি। এখন আপনি আসিয়া শুভদিন নির্দ্ধারণ করিবেন। সবিশেষ খবর শ্যামাচরণ-কাকার নিকট পাইবেন। অলমতিবিস্তরেণ।

আপনার চিরস্নেহের—প্রণতা—রাণী।

চিঠিখানি পড়িয়া ঠাকুর-মার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তাহা রাহুগ্রস্ত ভাব ধারণ করিল। তিনি বিষণ্ণভাবে শ্যামাচরণকে কহিলেন, "খবর ত শুভ বটে, কিন্তু মেয়েটিও বড় হয়ে উঠেছে, তার একটা গতি না ক'রেও ত এ কাযে মন দিতে পারছিনে। যখন অতুলকে বিয়ের জন্য জেদ করেছিলুম তখন মেয়ে ছোট ছিল—এখন আগে ভাগে বাপের বিয়েই বা দি কি ক'রে? কি বল তুমি বাবা?"

শ্যামাচরণ মাথা চুলকাইয়া বলিলেন, "যা বলেছেন, তা ঠিক বই কি? তবে দেরী হ'লে আবার এ দিকে রাজার মতিগতি না ফিরে যায়।"

"দেরী কেন হবে? চার হাতে একই সময়ে বাঁধন পড়ুক না? এখানে ত বরকর্ত্তা তুমি,—তোমার ইচ্ছাতেই ত কর্ম্ম।"

শ্যামাচরণ কথার অর্থ বুঝিয়াও বোকা বনিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। মহারাণী তখন একটু হাসিয়া অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া কহিলেন—"বর ত আমাদের সকলেরই মনে এক রকম ঠিকই হয়ে আছে—তবে সাত কথা না হ'লে বিয়ে হয় না—এই যা! তুমি এবার তোমাদের দিক থেকে প্রস্তাবটা পাকা ক'রে ফেলো, শ্যামাচরণ।"

শ্যামাচরণ মহারাণীর চরণে দৃষ্টি রাখিয়া বলিলেন—"আপনি কি শরতের কথা বলছেন?"

"এতক্ষণে কি সেটা বুঝলে বাবা! রাজারই অনুরূপ মন্ত্রীও বটে!

তখন মুখ তুলিয়া চাহিয়া সহাস্যভাবে শ্যামাচরণ কহিলেন, "মাপ করবেন মহারাণি, আমার দ্বারা ঘট্‌কালী-টট্‌কালী হবে না। আমি বরকর্ত্তা হ'তে চাইনে, আপনি, বরকর্ত্তা কন্যাকর্ত্তা উভয় কর্ত্তাই হয়ে এ সম্বন্ধটা পাকা ক'রে ফেলুন। জানেন ত আজকালকার ছেলেরা মা-বাপ মানে না, তা আমি ত মামা। কিন্তু আপনাকে সে ঠিকই মানবে।"

মহারাণী বলিলেন—"কথাটা কি জান শ্যামাচরণ, শ্যামসুন্দরকে ছেড়ে আমার ঘরের বাইরে আর কোথাও যেতে ইচ্ছা করে না। সব হারিয়ে একটি অতুলে ঠেকেছে আমার, দুবেলা দেবতার দোরে তাঁর মঙ্গল কামনা না করলে আমার দিন বৃথা যায়।"

কিন্তু শ্যামসুন্দরীর কথা ভুল্লেও ত চল্‌বে না, মা!

"না; তাই বা ভুল্‌তে পারি কই? যাব কল্‌কাতায়, কিন্তু বেশী দিন যেন থাক্‌তে না হয় বাবা, সে ভার তোমার উপর। তুমি গিয়ে সব আয়োজন ক'রে ফেলো, আমি শেষ মুহূর্ত্তে সেখানে পৌছে, আমার কর্ত্তব্য শেষ ক'রে ঘরে বৌ-জামাই একসঙ্গে যেন নিয়ে আস্‌তে পারি;—সেখানে পৌছেই এই চিঠিখানি রাণীর হাতে দিও।"

শুভাশীর্ব্বাদ দীর্ঘায়ুরস্তু,

রাণিজি, তোমার পত্র পাইয়া বড়ই সন্তোষলাভ করিলাম। কিন্তু আমারও তোমাকে একটি সুসংবাদ দিবার আছে। আজ প্রাতঃকালে মন্দিরে যাইবার সময় দেখিলাম—তোমার নব-মল্লিকার গাছটিতে অসময়ে একটি কুঁড়ি ধরিয়াছে, আর একটি প্রজাপতি তাহার উপর বসিয়া আছে। আমি ইহার যে অর্থবোধ করিলাম, তাহাতে মনটা বড়ই প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তোমার নিকট হইতেও ইহার অর্থব্যাখ্যা চাই।

রাণীর যখন জোর তলপ, তখন গৃহদেবতাকে ছাড়িয়াও শীঘ্র হুকুম তামিল করিব এবং একেবারে জোড়ামাণিক লইয়া ঘরে ফিরিব। ইহার ব্যবস্থা করিতে শ্যামাচরণকে বলিলাম তুমিও প্রস্তুত থাকিও।

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষিণী ঠাকুর-মা।

রাণী চিঠিখানি পড়িয়া, হাসিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, "ঠাকুর-মার যেমন কথা।" তাহার পর আর একবার চিঠি পড়িতে গিয়া—উপরের কোণে ছোট অক্ষরে লেখা কথাগুলির দিকে নজর পড়িল—"মনে রেখো রাণিজি, তুমি বিয়ে না করলে তোমার বাবা কখনই বিয়ে করবেন না।"

তখন রাত্রিকাল—দাসী আহারের খবর দিয়া গিয়াছে, বালিকা তাড়াতাড়ি চিঠিখানি মুড়িয়া দেরাজের মধ্যে রাখিয়া চলিয়া গেল। আহারান্তে গৃহে ফিরিয়া চিঠিখানা আর একবার তাহার পড়িতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু সে ইচ্ছা অপূর্ণ রাখিয়াই সে শুইয়া পড়িল। তখন তাহাকে চিঠি পড়িতে দেখিলে কুন্দ কি ভাবিবে? যদি এ সম্বন্ধে কোন কথা কুন্দ জিজ্ঞাসাই করে— তবে কি উত্তর দিবে সে?

পরদিন প্রভাতে কুন্দ শয্যা ত্যাগ করিয়া যাইবার পর জ্যোতির্ম্ময়ী আর একবার চিঠিখানি পড়িয়া লইয়া তেতালার ছাতের উপর উঠিল। প্রায় প্রতিদিনই সে উদয়-শোভা দেখিতে এখানে আসে! আজ কিন্তু আধ ঘণ্টা দেরীতে আসিয়াও পূর্ব্বদিগন্তে কোথাও একটু উজ্জ্বল রাগ দেখিতে পাইল না। রাত্রিকালে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, ভিজা গাছপালার মাথার উপর কুয়াশার কালো পাতে ঢাকা সূর্য্যের আলো প্রভাতে সন্ধ্যার ভাব ধারণ করিয়াছে। মাঝে মাঝে সজল চঞ্চল বাতাস উঠিয়া ঝাউ, দেবদারু, শাল, তাল প্রভৃতির শাখা দুলাইয়া দিয়া সেই কৃষ্ণ নিবিড় পটে যে ছিদ্র রচনা করিয়া দিতেছে, একটু অরুণ-জ্যোতির দর্শনব্যাকুল জ্যোতির্ম্ময়ী তন্মধ্যে নয়ন প্রবিষ্ট করিয়া দিতে না দিতে সেই ছিদ্রপথ—মুহূর্ত্তে মেঘ জমাট হইয়া পড়িতেছে। জ্যোতির্ম্ময়ী আজ ক্ষুণ্ণচিত্তে অন্ধকার আকাশের দিকেই করযোড়ে চাহিয়া অন্তর্দ্দেবতার ধ্যান সমাপন করিল। অতঃপর নীচে যাইবার উদ্দেশ্যে পশ্চিমে ফিরিয়া, সহসা স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। এ কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! পূর্ব্বদিকে এক বিন্দু রক্তিম রাগ নাই, আর পশ্চিম আকাশের স্তরে স্তরে ঊষার নানাবর্ণ অলিম্পন চিত্রিত। এখনই যেন সূর্য্যদেব ইহার মধ্য দিয়া পূর্ণ মহিমায় আপনাকে ব্যক্ত করিয়া দিবেন! রাজকুমারী বিস্ময়-স্তিমিত দৃষ্টিতে এ চিত্র অবলোকন করিয়া মনে মনে কহিলেন, "হে অন্তর্দ্দেবতা! এ কি ইঙ্গিত করিতেছ তুমি? তোমার উদ্দেশ্যপথে অসম্ভবও কি সম্ভবরূপে মূর্ত্তি-পরিগ্রহ করে? তবে তাহাই হউক, তোমার ইচ্ছা দ্বারাই আমাকে ইচ্ছাযুক্ত কর হে প্রভু, অনন্তশক্তিধারী বিধাতৃপুরুষ।"

একবিংশ পরিচ্ছেদ

বসন্ত এবং অনাদি এই দুই জনে যে একবার বিদ্রোহী দলের সংস্রবে আসিয়াছিল, তাহা পাঠক অবগত আছেন। বসন্ত এখন রাজ-কোতোয়ালির নায়ক। কনফারেন্সের সময় ইহার কার্য্যপটুতায় সন্তুষ্ট হইয়া রাজা বাহাদুর ইহাকে এই পদে নিযুক্ত করিয়াছেন।

শরৎকুমার আজ প্রাতঃকালে কলিকাতা যাত্রা করিয়াছেন, মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর হইতে ইহারা উভয়ে কোতোয়ালির বহির্দ্দিকের একটি ঘরে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে সন্তোষের নোটবহিখানার অর্থভেদ করিতে চেষ্টা করিতেছিল। নামের সঙ্কেত, বাক্যের সঙ্কেত মোটামুটি তাহারা এক রকম বুঝিয়া লইয়াছে, নম্বরের সঙ্কেতও অনেকটা বুঝিয়াছে। বুঝিতে পারিতেছিল না কেবল নম্বরগুলার সহিত বাক্যশব্দগুলার ঠিক যোগাযোগ। ইহা মিলাইতেই তাহাদের প্রাণান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। যেমন—একটা চন্দ্রবিন্দুর পর ২×৫ নম্বর ইহার পর একটা বাণফলক ও চতুষ্কোণ চিহ্নের নীচে লেখা পিংপং। পিংপং অর্থাৎ প্রাণপণে শপথবদ্ধ লোক ইহা তাহারা শব্দসঙ্কেত হইতে আগে বুঝিয়াছিল, অতএব মোটামুটি তাহারা এই বুঝিল, পিংপং দল কোন রেলগাড়ীকে ডিরেল করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। চতুষ্কোণ গাড়ী এবং বাণফলক ধ্বংসের চিহ্ন-সঙ্কেত বলিয়া তাহারা গ্রহণ করিল। কিন্তু ২×৫ এই নম্বরের সহিত উক্ত সঙ্কেতের কি যোগ, তাহা ত বুঝা গেল না। অনাদি বলিল,—"খুব সম্ভব—এটা লোকসংখ্যা। দুজন থেকে ৫ জন লোক এ কাযে জোটার অর্ডার পেয়েছিল।"

বসন্ত বলিল,—"না হে, তা নয়। ও নম্বর হচ্ছে সময়ের সঙ্কেত। দেখছ না, প্রথমেই চন্দ্রবিন্দু অর্থাৎ তিথির তারিখ—তার পর এল মাস দিন।"

"তা যদি হয়—তা হ'লে কাযের কাল প'ড়ে যায় ভবিষ্যতে আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের ৫ তারিখে। সে দিন ভোরবেলা কোন হুমড়োচুমড়োর কলকাতায় আসার কথা আছে না কি হে?"

"কই, তা ত শুনি নি।"

"তা যখন শোন নি, তখন তোমার ব্যাখ্যাটা নিরর্থক ব'লেই শেষ করা গেল; ও নম্বরগুলা কথনই Future tense নয়, Past। কিছুদিন আগেই একটা ট্রেণ ডিরেল হয়েছিল—মনে নেই? খুব সম্ভব, এই কর্ত্তারাই তা করেছিলেন। যা হ'ক, এ সঙ্কেতটার সঙ্গে বোঝাপড়া এক রকম হয়ে গেল, এবার আর একটা ধর দাদা?" কিন্তু দ্বিতীয় সঙ্কেতটাও ঐরূপ যথাসম্ভবভাবে মীমাংসিত হইতে না হইতে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া নোটবহির

অক্ষরগুলাকে একেবারেই অস্পষ্ট করিয়া তুলিল। বাঙ্গালা দেশের সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য কে জানে, আমাদের নবীন সঙ্কেত-পাঠক বসন্ত প্রত্নতাত্ত্বিকের উচ্চাসন-লাভ আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া তখন বইখানা মুড়িয়া ফেলিল এবং সিগারেটের উদ্দেশ্যে পকেটে হস্তপ্রদান করিয়া কহিল,—"বুঝে নিয়েছি সব, এইবার ইতি দেওয়া যাক্।"

অনাদি কিন্তু নাছোড়বান্দা, সে তাহার নয়ন-জ্যোতিতে অন্ধকার ঘরখানাও উজ্জ্বল করিয়া বসন্তকে কহিল,—"এরই মধ্যে ইতি কি হে? ঐ ত আমাদের জাতের দোষ! কিছুরি ভিতরে প্রবেশ করতে চাইনে। দাও দাও দেশলাইটা আমাকে, আগে তোমার তমোটা আমি নাশ করি, মুখাগ্নি পরে ক'রো।" বলিতে বলিতে দেশলাইটা বসন্তের হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া টেবিলের কেরোসিন ল্যাম্পটা জ্বালাইয়া লইল, হেনকালে ভৃত্যবাবু গৃহপ্রবেশ করিয়া দীপ প্রজ্বলিত দেখিয়া হাস্যমুখে চলিয়া গেলেন। বসন্ত অতঃপর চুরুট ধরাইয়া লইয়া বলিল, —"অত রাগতে হবে না হে, যা বুঝেছি, তাতেই কায চালিয়ে নিতে পারব।"

"বইখানার ছোঁয়াচে লাগলো না কি দাদা? হঠাৎ তুমিও যে দেখছি, সাঙ্কেতিক হয়ে উঠলে। কি কায চালাতে পারবে?"

"অস্ত্রগুলা উদ্ধার করতে পারব—এমন আশা হচ্ছে।"

"আশা—না বাসনা? সর্প—না রজ্জু?"

"না হে না, আশাই ঠিক, আমি ভুল বলি নি। দলপতির সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবার জন্য সন্তোষ যে জঙ্গলের মধ্যে আমাদের নিয়ে গিয়েছিল—সেখানে ভাঙ্গা মন্দিরের মধ্যে ওরা যে কায়েমি একটা বাসা বানিয়েছে এই নোটবই থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে—"

"তা ত যাচ্ছেই।"

"আর সে দিন সন্তোষ কি বলেছিল, মনে আছে ত? বাধাহীন মিলনের জন্যই অনেক ঢুড়ে আমাদের জন্য ঐ প্রেমিককোটর সে আবিষ্কার করেছে।"

দুই জনে খানিকটা হাসিল, তার পর অনাদি বলিল—"হ্যাঁ, আর একটু হ'লেই তাদের প্রেমের ফাঁসটানে মহামিলনের পথেই আমরা গিয়ে পড়তুম! সে যাত্রা কি রক্ষাই পাওয়া গিয়েছিল!"

"সে ম'রে গিয়েও আমাদের বড় বাঁচানটা বাঁচিয়েছে। নইলে এত দিন যে আরো কত কি কাণ্ড করত', সে তার ঠিক নাই।"

"তা ঠিক। এখন তোমার আশার কথা বল হে।"

"অস্ত্রগুলা যদি তারা এই আড্ডাতেই রেখে থাকে, তা হ'লে উদ্ধার করতে পারব ব'লে মনে করি।"

"চোরের উপর বাটপাড়ী? কি মজাই হয় তা হ'লে?"

"অত লাফাস্‌নে! তুই যে এখনি কায করতে চল্লি? কাযটা কিন্তু খুব সহজ নয়। ওদের আস্তানার মধ্যে ঢুকব কি ক'রে, সেখান থেকে নির্ব্বিঘ্নে বেরোব কি ক'রে, কখন্ সেখানে লোক জমে, কখন্ যাওয়া নিরাপদ, সে সব ত আগে সন্ধান নিতে হবে—জঙ্গলে প্রবেশের পথ ছাড়া আমরা আর ত কিছুই জানিনে।"

"তোমার হাতে ত চতুর লোক অনেক আছে।"

"আরে অপোগণ্ড! অনেক লোকে কায সিদ্ধ হয় না—নষ্টই হয়। আমার ভরসা একটি ছোট্ট মর্কটের উপর,—এ হেন লঙ্কাপুরী ত মর্কটদূতেই জ্বালিয়ে দিয়েছিল।"

অনাদি কৌতূহলপরবশ হইয়া কহিল,—"কে তোমার সে মর্কটরূপী ভগবান্—বল দাদা—"

"দীনেশকে জানিস? আমাদেরই ব্যায়াম-সমিতির সে এক জন মেম্বর ছিল—সব চেয়ে ছোটখাট লোকটি, কিন্তু সব চেয়ে সে ছিল উৎসাহী। অথচ রাজকুমারীর ভাইফোঁটার দিন,—একটি কথা সে কইলে না, সমস্ত দিনই গোমসা হয়ে রইলো,—মনে আছে ত?"

"না, মনে নেই, সম্ভবতঃ সেই বেঙ্কুটেরামের দিকে আমার নজরই পড়ে নি।"

"সে যে রাজকুমারীর সম্ভাষণে আহ্লাদ প্রকাশ করে নি—তার কারণ—সে তখন বিদ্রোহী-দলে ঢুকেছিল।"

"তাকে তুমি হাতে পেয়েছ না কি? সে কি এখন তার ভুলটা বুঝেছে?"

"জানিনে তা। কিন্তু বুঝলেই বা কি ফল? সে ত আর গোয়েন্দাগিরি ক'রে দলের লোককে ধরিয়ে দিতে যাচ্ছে না।"

"তবে?"

"বড় মজাই হয়েছে কাল সোনারগাঁয়ের পথে তার সঙ্গে দেখা, সে ভেবে নিলে, আমি তাদেরই দলের এক জন। জঙ্গলে প্রবেশের সময় বোধ হয়, সে আমাদের দেখেছিল।"

"তার পর?"

"আমাকে দেখেই সে ব'লে উঠলো- 'গুরু গুরু।' বুঝে নিলুম—ওটা হচ্ছে তাদের সাঙ্কেতিক সম্ভাষণবাক্য। তখন ত নোটবই পড়ি নি, আমার বলা উচিত ছিল—চরণ-শরণ ’

"এই যাঃ, কি বল্লে তুমি?"

"আমিও আস্তে আস্তে বল্লুম গুরু গুরু।"

"ধরা প'ড়ে গেলে?"

"না ভাই, জান ত লোকটা তেমন চালাকচতুর নয়—একটু বরঞ্চ বোকাটে ধরণের- সে হয় ত ভাবলে—আমি এখনও তাদের অন্তঃকুটীরে ঢুকি নি। সে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলো, মনে হোল, যেন কিছু বলতে চায়—আমি দেখলুম বেগতিক, বেশী কথা কইলেই ধরা পড়ব- অথচ তার কাছে থেকে চোরাই মালের খবরটা যদি কোন গতিকে আদায় করতে পারি, এই ভেবে—তখন কথা কবার সময় নেই এই ওজরে আজ তাকে এখানে আসতে বলেছি, ইতিমধ্যে আমরা রিহার্সেল দিতে পারব- এই ছিল আমার মৎলব। তার পর এখন ত নোটবইখানা প'ড়ে বড়ই সুবিধা হয়েছে। আমার পুরো বিশ্বাস যে, তাকে আমি হাত ক'রে কায সিদ্ধ করতে পারব। ঐ পায়ের শব্দ- তুই ও ঘরে গিয়ে বোস্‌। তোকে দেখ্‌লে লোকটার মনে যদি কোন রকম সন্দেহ জন্মে যায় ত সব পণ্ড হয়ে যাবে।"

"সন্দেহ করার ত কোন কারণ নেই, তোকে যদি দলপতির কাছে দেখে থাকে ত আমাকেও দেখেছে, তোর কিছু ভাবনা নেই—আমি তার বিশ্বাসী হ'তে পারব।"

দীনেশ আসিয়া অনাদিকে দেখিয়া প্রথমটা একটু ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেল- 'কন্তু উভয়েই যখন গুরু গুরু মিথ্যাদীন বলিয়া অভ্যর্থনা করিল- তখন সে আশ্বস্ত হইয়া গুরু গুরু চরণ-শরণ সম্ভাষণে নিকটে আসিয়া প্রথমে অনাদির সহিত কোলাকুলি করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তোমার ভাই নাম?"

অনাদি বলিল, "২৫ নম্বর" তাহারা নোটবুকে দেখিয়াছিল, ২৪ নম্বরের পর আর নামের নম্বর নাই।

দীনেশ বলিল "এখনও তা হ'লে তুমি প্রথম কুঠরীর লোক, দ্বিতীয় কুঠরীতে ঢোকা হচ্ছে কবে?"

"গুরুর অনুজ্ঞা যখন হয়- পরীক্ষায় পাশের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি।"

দীনেশ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, কিরূপ অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়া দ্বিতীয় কুঠরীতে সে উঠিয়াছিল—বোধ হয় সে কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। এইবার বসন্তের নিকট আসিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল- "নাম সেবাধারী?"

"বসুমিত্রা মোক্ষানন্দ।" প্রথম কথাটা আপনার নাম হইতে বসন্ত বানাইয়া বলিল,—দ্বিতীয় শব্দ তাহারা নোটবুকে দেখিয়াছিল।

দীনেশ "নমো নমো" বলিয়া তাহাকে নমস্কার করিয়া বলিল—"এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমিও এক দিন মনে ধ'রে রেখেছিলুম—কিন্তু—"

বসন্ত বলিল, "কিন্তু নিরাশার ত কোন কারণ নেই।"

"তুমি ভাইয়া কি তা হ'লে জান না—যে—"

"অনেক কথাই জানিনে আমি,—কিছুদিন থেকে মোক্ষলাভের আয়োজনে বড়ই ব্যস্ত ছিলাম, মন্দিরে যাবার সময় ক'রে উঠতে পারি নি ভাইয়া।"

অবনত মুখে দীনেশ বলিল—"আমি দাগী হয়েছি।"

"তুমি দাগী! বড়ই দুঃখের বিষয়,—এমন উৎসাহী সেবাধারী তুমি? অপরাধ?"

পারি নি তা, পারি নি আমি। গুরুর আদেশ অমান্য করেছি।"

বসন্ত ও অনাদি দুই জনে মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিয়া চুপ করিয়া রহিল। কি জানি কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিবে,—নিজেরা নীরব থাকিয়া উহাকে কথা কহিতে দেওয়াই শ্রেয়ঃ। তাহারা বুদ্ধিমানের কাযই করিল, আপনা হইতেই অতঃপর সে বলিল, —"ডাক্তার এখন কোথায়?"

অনাদি তখন সহাস্যে বলিল,—"আমাদের দলে!"

"আমাদেরই দলে! তিনি তবে সেবাধারী হয়েছেন! গুরু প্রসন্ন হউন। বন্দুক ছুড়তে গিয়ে এ হাতটা ভেঙ্গে গিয়েছিল, তিনিই আমার ভাঙ্গা হাত জোড়া দিয়েছেন, তা ত জান?"

"জানি বই কি।"

"গুরুর আজ্ঞা পেয়েও এ হাত তাই তাঁর বিরুদ্ধে তুলতে পারি নি! বসুমিত্রা, আমি দাগী হয়েছি।"

অনাদি আর আত্ম-সংবরণ করিতে পারিল না, ক্রোধ প্রকাশ করিয়া কহিল, "আমার প্রতি এরূপ আদেশ হ'লে আমিও অমান্য করতুম,—তুমি ঠিক কাযই করেছ ভাইয়া।"

দীনেশের ম্রিয়মান মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; কিন্তু মুহূর্ত্তকাল পরেই আবার ম্লানভাবে সে উত্তর করিল,—কিন্তু আমি যে গুরুর আদেশ লঙ্ঘন

করেছি,—ডাক্তার যে দেশশত্রু। তুমি কি বল বসুমিঞা ?"

বসন্ত আশ্বাসবাক্যে বলিল,—"না মিঞাদীন, ডাক্তার দেশশত্রু নন্; দেশসেবক তিনি, গুরু ভুল বুঝেছিলেন।"

অনেক দিন পরে দীনেশের বুকের চাপা পাতরখানা কে যেন উঠাইয়া ধরিল, সে আরামে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, "আঃ, আমি সুখে মরতে পারব তা হ'লে, আর আমার কোন কষ্ট নেই।"

উভয় শ্রোতার মনের মধ্যে জ্বলন্ত সহানুভূতি উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল; অনাদি তাহার অনুতাপবেদনা হৃদয়ে অনুভব করিয়া নীরব হইয়া পড়িল। বসন্ত সান্ত্বনা বাক্যে কহিল,—"মর্‌বি কেন ভাইয়া ? দেশমাতা যে এখনও ভুখাঁ, তাঁর অন্নের যোগাড় কর্‌তে হবে যে আমাদের।"

"কিন্তু আমি যে দাগী, আমার কায ফুরিয়েছে বসুমিঞা। ঠিক দিনটিতে আত্ম-সমর্পণ করার জন্য আমি কেবল অপেক্ষায় আছি।"

ইঁহাকে যে তাহারা মরিতে দিবে না এবং ক্রমশঃ বুঝাইয়া নিজেদের পক্ষে তাহাকে টানিয়া লইবে, সঙ্কল্পে মনে মনে সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কোথায় ? কোন্ দিন ?"

"কাল জেনে এসেছি, মন্দিরের শাল-জঙ্গলে, অমাবস্যার দিনে। সে দিন গুরুদেবেরও আগমন হবে।"

এই কুণ্ঠিত ভক্তি-নিষ্ঠায় বসন্তের হৃদয় অভিভূত হইয়া পড়িল। হায় রে! মঙ্গল-কার্য্যে ত এরূপ বিশ্বাসী লোক পাওয়া যায় না। দেশ-মাতার এ কি দুর্ভাগ্য! বসন্ত সংযত হইয়া একটু পরে কহিল, —"ওঃ, সে ঢের দেরীর কথা। তার মধ্যে বিশ্ব উল্টে যেতে পারে। গুরুদেব ভুল বুদ্ধিতে তোমাকে দাগী করেছেন, সে ভুল তাঁর ভাঙ্গবেই, তখন নিশ্চয়ই তুমি তাঁর ক্ষমা পাবে।"

অনাদি এতক্ষণ পরে তাহার নীরবতা ভঙ্গ করিয়া কহিল,—"কায কর মিঞাদীন, কায বন্ধ কর্‌লে চল্‌বে না। মঙ্গল কাযে মঙ্গল আছেই, গুরুর আদেশ ভ্রান্ত হ'তে পারে, কিন্তু এ সত্য অভ্রান্ত।"

বসন্ত অনাদির ন্যায় সরল-নৈতিক নহে। কোতোয়ালিতে কায করিয়া সে বুঝিয়াছে, কায লইতে হইলে সময়বিশেষে কূটনীতির শরণাপন্ন না হইলে চলে না। অনাদির কথা অন্য অর্থে ঘুরাইয়া লইয়া সে কহিল,—"কায দেখিয়ে গুরুকে প্রসন্ন কর মিঞাদীন।"

উদাসভাবে দীনেশ উত্তরে কহিল,—"কি কায করতে বল ?"

"পুলিসের মনে একটা সন্দেহ জেগেছে এইরূপ শুন্‌ছি। শীঘ্রই বনজঙ্গলে তারা খানাতল্লাসী চালাবে।

এখন আমাদের কর্ত্তব্য হয়েছে, শীঘ্র আস্তানা থেকে হাতিয়ারগুলো সরানো।"

অবশ্য পুলিসে এ খবর সত্যই উঠিয়াছে, বা উঠিবার সম্ভবনা আছে—এ ভাবনা তখন তাহার মনে আদৌ ছিল না। দীনেশকে এ কার্য্যে ভিড়াইবার অভিপ্রায়েই বসন্ত এইরূপ করিয়া বলিল। হিতে বিপরীত ঘটিল। দীনেশ ভীতভাবে বলিল,—"কাল ত সেখানে এ কথা কারো মুখে শুনি নি, এ খবরটা তা হ'লে কেউ এখনো জানে না; জানানো ত উচিত।"

অনাদি এই কথায় প্রমাদ গণিল, কি জানি, যদি দীনেশ সেখানে গিয়া সব কথা প্রকাশ করিয়ে দেয়। কিন্তু অনাদি হইতে বসন্ত পাকা লোক; যখন হইতে বসন্ত শুনিয়াছে যে, দীনেশ দাগী, তখন হইতে সে আশ্বস্ত। দীনেশের উত্তরে সে কহিল,—"হ্যাঁ, জানাতে হবে বই কি! মিটিং কবে আবার ?"

"পরশু। খবর জান না, ভাইয়া ?"

"আমরা যে এখানে ছিলুম না।"

"তার পর আবার ৭ দিন সব বন্ধ থাক্‌বে,—এই ত কাল স্থির হয়েছে। পরশুই তোমরা গিয়ে এ খবরটা জানিয়ে এস। আমার দিনের আগে আমি ত আর সেখানে যেতে পার্‌ব না।"

দীনেশের এই কথায় বসন্ত ও অনাদি উভয়েই অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করিল। বসন্ত বলিল,— "বেশ, আমিই সবাইকে খবর জানিয়ে আস্‌ব, আর, অস্ত্র-উদ্ধার সম্বন্ধে যা পরামর্শ হয়—তা-ও তোমাকে এসে খবর দেব। তুমি এখন ভাইয়া তোমার দিনটা আসা পর্য্যন্ত এইখানেই থাকো। ডাক্তারও এখানে শীঘ্র আস্‌বেন, তাঁর সঙ্গেও দেখা হবে। তিনি নিঃসন্দেহ তোমাকে মুক্তি পাইয়ে দেবেন।"

গুরুহারা, গৃহহারা, মৃত্যুদণ্ড-সম্মুখীন হতভাগ্য দীনেশ ইহাদিগকে বন্ধু পাইয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিল।

সেই রাত্রে অনাদি বাড়ী যাইবার সময় গোপনে বসন্তকে কহিল,—"আমার কিন্তু ভাই মনটা বড়ই খারাপ হ'য়ে গেছে।"

"কেন হে ভায়া! মন ভাল হবারই ত কথা! এমন আশাতীত সহজ ভাবে হাতিয়ারগুলোর উদ্ধারের পথ খোলোসা হয়ে এল!"

"যা বল ভাই, আমাদের মত ল্যাজধরা জাত বিধাতার সৃষ্টিতে আর কুত্রাপি মেলে না। বুদ্ধির মাথা একেবারেই খেয়ে ব'সে আমরা দেশোদ্ধারে মেতেছি। ইচ্ছা আমাদের একান্ত প্রবল যে, আমরা স্বর্গে চড়ি। য়ুরোপীয় কেউ হ'লে ইচ্ছামাত্র এরোপ্লেনের পাখনাসৃষ্টির আয়োজনে উঠে প'ড়ে সে লাগতো। কিন্তু আমরা গাঁজায় দম ক'ষে হনুমানের ল্যাজটাকেই সেই উদ্দেশ্যে সবে মিলে হাৎড়াচ্ছি।"

"আমরা যে বুদ্ধিমান জাত, এতে ক'রে তারি পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। বোঝ না হে! কষ্ট নেই, শ্রম নেই, ল্যাজটা ধ'রেই উড়ে চল্‌বে, কতটা সুবিধা বল দেখি?"

"তেত্রিশ কোটি হাতের টানে হনুমান মশায়ের ল্যাজটি অচিরে ছিঁড়ে যায় যদি?"

"বল কি হে? ত্রেতাযুগে হনুমান্‌জী গন্ধমাদন ল্যাজে উঠিয়েছিলেন। আর এ যুগের ক্ষীণজীবী লোকগুলার ভারে গবর্ণমেণ্টের তর্জ্জনীটাও যে নোয় না। গুরু গরুড় আর তাদের বইতে পার্‌বেন না? না পারেন, মৃত্যুতেই আমাদের স্বর্গপ্রাপ্তি।"

"নিশ্চয়ই না। পতনে আমরা প্রেতত্বই লাভ কর্‌ব। না ভাই রহস্য নয়।—আমরা দেশকে অধীনতা মুক্ত কর্‌তে গিয়ে নিজেদের বুদ্ধি, চিন্তা, ধর্ম্মজ্ঞান সমস্তই কি শোচনীয় ভাবে পরাধীন ক'রে ফেল্‌ছি! এমন কিছু পাপ নেই, নিষ্ঠুরতা নেই, দেশের নামে গুরুর আদেশে, আমরা কর্‌তে কুণ্ঠিত। মনের এই দাসত্বের চেয়ে ইংরাজের দাসত্বও আমি ভাল মনে করি। দীনেশের কথা শুনে আমার মন থেকে আশার আলোক নিবে গেছে—"

"আরে গুরু চাই বই কি—সেনাপতি না হ'লে কি যুদ্ধ চলে? এ যে যুদ্ধের কাল; এ সময় ব্যক্তি-গত বুদ্ধি-বিবেককে এক জনের অনুগত ক'রে না চল্‌লে ত হয় না।"

"স্বাধীন বুদ্ধি-চিন্তাকেই আমরা যদি মেরে ফেলি, তবে গুরু নির্ব্বাচনই বা করব কি ক'রে? ক্ষমতার লোভ বা বাহবার লোভ বা স্বার্থসিদ্ধির লোভ যাঁদের আছে, তাঁরা ত গুরু হ'তে পারেন না। এই ভণ্ডামীর আশ্রয়ে অপূর্ণবুদ্ধি নিঃস্বার্থ বালকেরা প্রতিদিন পাপ-মত্ততার মধ্যে সর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দিচ্ছে! এ ভয়ানক কষ্ট!"

"হবে, হবে, ভাল গুরুর অভ্যুদয় হবে—এ শুধু আরম্ভের কাল। অত নিরাশ হবার কারণ নেই। আপাততঃ আমাদের সেনাপতিকে নিয়ে এস। পরশু পর্য্যন্ত আমাদের অপেক্ষা কর্‌তেই হবে। তুমি তাঁকে আন্‌তে কালই যাও! এ দিকে দীনেশের সঙ্গে আমি বোঝাপড়া ক'রে ফেলি।"

"যে আজ্ঞে, তাই হবে। কিন্তু একটা কথা বলি ভাই, আমার মনে বড় অনুতাপ হচ্ছে।"

"কেন?"

"রাজকুমারীর সহিত দলপতিটার দেখা করিয়ে দিলুম কেন?"

"গতস্য শোচনা নাস্তি।"

"আছে বই কি? ডাক্তারদাকে দেখ ওরা কি রকম প্যাঁচে ফেলার চেষ্টায় আছে। হার মেনে শেষে যদি রাজকন্যার প্রতি শুভদৃষ্টি দেয়? বড় ভাবনা ধরিয়ে দিয়েছে।"

কিছু ভাবনা নেই, এখন শীঘ্র ডাক্তারদাকে এনে ফেলো।"

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া রাজা ও শরৎ-কুমারকে অনাদি প্রায় সব কথাই বলিল; বলিল না কেবল ইতিপূর্ব্বে তাহারা যে সেই দলে একবার মিশিতে গিয়াছিল, সেই কথা। এই ঘটনা-সংশ্লিষ্ট বিবরণ যতটুকু, তাহাই মাত্র অপ্রকাশ রাখিল। রাজা তাহাদের মৎলব শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, "তোমাদের adventurous spirit আমি দমাতে চাইনে; তবে চোর-ডাকাতের আস্তানায় যাচ্ছ—বিশেষ সাবধানে চ'লো, ফাঁদ এড়িয়ে পা ফেলো।—একটুও বিপদের সম্ভাবনা বুঝলে পিছু হঠতে সঙ্কোচ ক'রো না; একান্ত বাধ্য না হ'লে দুঃসাহসী হ'তে যেয়ো না, এই আমার উপদেশ।"

অনাদি প্রফুল্লভাবে উত্তর করিল—"আজ্ঞে আপনি নিশ্চিন্ত থাকৃতে পারেন, বসন্‌-দা খুব জাঁদরেল বুদ্ধির লোক।"

রাজা হাসিলেন, হাসিয়া বলিলেন,—"তোমার বসন্‌-দা খুব পাকা জেনারেল হ'তে পারে—কিন্তু আমার নির্ভর ডাক্তারের বুদ্ধির উপরেই বেশী। ভগবান্ তোমাদের নিরাপদ করুন, এই আমার প্রার্থনা ও আশীর্ব্বাদ।"

শুভ রণযাত্রায় রাজার অনুজ্ঞালাভে অনাদি

অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া উঠিল; স্বরে বালকের হর্ষ-অধীরতা প্রকাশ করিয়া সে শরৎকুমারকে কহিল,—"তবে চলুন ডাক্তার-দা, রাজকুমারীর নিকট বিদায় নিয়ে আসি।"

রাজা শরৎকুমারের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"কিন্তু এ সব কথা রাণীকে না বলাই ভাল, তাকে ভাবিত ক'রে ত কোনো লাভ নেই। বুঝলে হে, ডাক্তার?"

ডাক্তার মৃদুস্বরে বলিলেন,—"যে আজ্ঞে।"

বাহিরে আসিয়া উচ্ছ্বাসভরে অনাদি নৃত্য আরম্ভ করিল। ডাক্তারের হাতটা ইংরাজের অনুকরণে বাহুর মধ্যে পুরিয়া বলিল,—"চলুন শর-দা, এবার রাজকুমারীর কাছে।"

হাসির অনুকরণে অনাদি কখনো কখনো আজকাল ডাক্তারকে শরদাও বলে।

রাজার শেষ কথা মনের মধ্যে তোলাপাড়া করিতে করিতে শরৎকুমার বলিলেন, "রাত হয়ে পড়েছে, অনাদি, ৮টা বাজে, এখন তাঁর কাছে যাব? কি ভাববেন তিনি?"

"কি আবার ভাববেন? নইলে আর ত সময় নেই। কাল ভোরেই ত আমরা পলাতক, কে জানে, আর ফিরি কি না? যদি শত্রুর একটা গুলীই বুকে এসে লাগে, তা হ'লে আর ত রাণীদিদিকে দেখতে পাব না। চলুন ডাক্তার, সঙ্কোচের এ সময় নয়।" রহস্যচ্ছলে সে এ কথা বলিল, তাহার পর এক রকম টানিয়াই ডাক্তারকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিল। উভয়ে রাজকুমারীর মহলে আসিয়া শুনিলেন, তিনি তখনও বাগান হইতে গৃহে ফিরেন নাই। শরৎকুমারের বুকে কে যেন জোরে একটা ধাক্কা মারিল। প্রেমিকের মনশ্চক্ষু সাধারণতঃ দিব্যদর্শক;—আজও কি তবে তিনি সেই ভণ্ডটার সহিত কথা কহিতেছেন না কি? তাঁহার অনুমান মিথ্যা নহে। কিছুদিন যাবৎ সন্তোষের খবর না পাইয়া তথা-কথিত গুরুদেব কুন্দর নিকট আজ তাহার খবর জানিতে আসিয়া রাজকুমারীর দর্শন প্রার্থনা করেন—তাহার প্রার্থনা রাজকুমারী অগ্রাহ্য করেন নাই।

প্রায় দুই ঘণ্টা কাল নানারূপ তর্কযুক্তিতেও রাজকুমারীকে স্বপক্ষে আনিতে না পারিয়া দলপতি অবশেষে ক্ষুণ্ণস্বরে বলিলেন, "এত অত্যাচার পীড়ন অহরহঃ দেখছেন, তবু যখন আপনি পাষাণ, তখন আর বেশী কিছু বলা নিষ্ফল। কনফারেন্সের দিনের অন্যায় অবিচারও যে আপনাকে জাগিয়ে তুলতে পারে নি, এইটেই সব চেয়ে আশ্চর্য্য মনে হয়।"

শীতবায়ুতে সহসা হিল্লোল-কম্পন উঠিল, স্তব্ধ রজনী মুখরিত করিয়া বৃক্ষপত্রদল ঝর্ ঝর্ করিয়া পড়িতে লাগিল। লতা-মণ্ডপের কাঠের ছাত হইতে টাঙ্গান দোদুল্যমান কেরোসিন ল্যাম্পের আলোটা নিব-নিব হইয়া আবার জ্বলিয়া উঠিল। জ্যোতির্ম্ময়ী অকম্পিতকণ্ঠে বলিলেন,—"কি কর্‌ব বলুন,—কিছুতেই আমি মনে কর্‌তে পার্‌ছিনে যে, গোপন নিরস্ত্র প্রতিশোধের উপরেই আমাদের দেশের মঙ্গল নির্ভর কর্‌ছে।"

দলপতি বলিলেন, "ওটা কি জানেন—যুদ্ধনীতির একটা কৌশল! সম্মুখ-সমরে যখন জয়লাভের সম্ভাবনা নেই, তখন ছদ্মকৌশলই আমাদের অবলম্বন-পথ।"

জ্যোতির্ম্ময়ীর সরলতাপূর্ণ ধর্ম্মনীতি এ তত্ত্ব গ্রহণে অসমর্থ হইল; উত্তেজিত স্বরে বালিকা উত্তরে কহিল,—"আপনি যে কি ক'রে ভাবছেন—এই উপায়ে আমরা জয়লাভ কর্‌ব, এইটেই আশ্চর্য্যের কথা? না না না—কখনও না, এইরূপ হিংস্র পশুর আচরণে আমাদের জাতীয় মহত্ত্ব বাড়বে না, আমরা বড় হব না, বরঞ্চ উন্নতির চক্রে নেমেই পড়ব।"

দলপতি বিস্ফারিত নয়নের তেজোজ্যোতিঃ জ্যোতির্ম্ময়ীর উপর নিক্ষেপ করিয়া, কহিলেন,—"কার্য্যসাধনের জন্য মাত্র এখন কিছুক্ষণ আমাদের হীন কায কর্‌তে হচ্ছে, কিন্তু এর মধ্যে কি আত্মত্যাগের মহিমা আপনি দেখতে পাচ্ছেন না? ত্যাগের এই উজ্জ্বল মহত্ত্বে একদিন এই ছোট আমরাই যে খুব বড় হয়ে উঠবো, তাতে সন্দেহমাত্র নেই। একবার প্রকৃতির দিকে চেয়ে দেখুন দেখি? ঝড়-ঝঞ্ঝার মূলে শান্তি, বন্যার ফলে উর্ব্বরতা আপনি দেখতে পাবেন।"

"কিন্তু প্রকৃতি দেবী নিজের মধ্যে যে প্রেরণার ইঙ্গিতে মঙ্গলের দাবীতে অমঙ্গল ঘটান—আমার মধ্যে ত সে ইঙ্গিত তিনি পাঠাচ্ছেন না!"

"সূর্য্য স্বভাবতই স্বপ্রকাশ, কিন্তু তবুও স্থানভেদে কোথাও তিনি আলোক, কোথাও তিনি ছায়া রচনা করেন। প্রকৃতি দেবীর ইঙ্গিত যে সকলের মনে ব্যক্ত হয় না, এ সত্য ত এক দিন আপনিই স্বীকার করেছেন। অতএব আরও একবার বল্‌ছি, রাজকুমারি! যাঁরা সে ইঙ্গিত বুঝেছেন, তাঁদের উপরই বিশ্বাসস্থাপন কর্‌তে হবে। একলব্য ভক্তিবলেই সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, তা ত জানেন।"

"দেখুন, মাপ করবেন! একলব্য আদর্শ ভক্ত, সে বিষয়ে দ্বিবাক্য নেই. কিন্তু এই ভক্তিনিষ্ঠার বিনিময়ে গুরুর নিকট তিনি কি দান পেয়েছিলেন, তাই বলুন ত?"

দলপতি কি বলিবেন, যেন ভাবিয়া পাইলেন না।

রাজকুমারী ঘৃণা-কুঞ্চিত স্বরে কহিলেন.—"প্রতারণা, স্বার্থ উদ্দেশ্যপূর্ণ প্রতারণা ছাড়া গুরুর কাছে তিনি আর কিছু পান নি। এই কথাটা মনে করলেই আচার্য্য দ্রোণের বিরুদ্ধে আমার সমস্ত মন বিদ্রোহী হয়ে উঠে এবং এ থেকে কি শিক্ষা পাই জানেন? মনের স্বাধীনতা-খোয়ান ভক্তি বা মুক্তি কিছুই নিরাপদ নয়।"

বলিয়া রাজকুমারী একটু হাসিলেন. কিন্তু গুরুর দিকে চাহিয়া বুঝিলেন, তাঁহার এ বাক্য গুরু তৎপ্রতি প্রেম বুঝিয়া যেন পীড়িত হইয়াছেন। আপনাকে অপরাধী জ্ঞান করিয়া রাজকন্যা বিনীতস্বরে কহিলেন,—আপনাকে আবার বলছি, আমার আশা আপনি ত্যাগ করুন; আপনার পথ আমার পথ এক নয়,—অবিচলিত ভক্তিভাব আমাতে নেই। আমার কর্ত্তব্য আমাকে স্বতন্ত্র পথে টানে।"

কি অর্থে রাজকুমারী এই কর্ত্তব্য শব্দ ব্যবহার করিলেন, তাহা ঠিক না বুঝিয়া দলপতি কহিলেন, "কিন্তু দেশাত্মবোধ যার জন্মেছে. তার কাছে দেশকর্ত্তব্য সব চেয়ে বড়। এই কর্ত্তব্যবোধ থেকেই রামচন্দ্র সীতাকেও বিসর্জ্জন করেছিলেন।"

"আমার কিন্তু মনে হয় রামচন্দ্রের পত্নীত্যাগ বিশ্ব-প্রেমিকের কর্ত্তব্যবোধ। এই সুরের গানই অহরহঃ আমি শুনতে পাই।"

শত লোকের মন্ত্রদাতা গুরু আজ বালিকার কথায় নির্ব্বাক হইয়া গেলেন, তাঁহার ইচ্ছা হইল, এই দেব-প্রতিমার পদতলে তিনি লুণ্ঠিত হইয়া পড়েন। উচ্ছ্বসিত আবেগে বহুদিন পরে তাঁহার কণ্ঠ হইতে সহসা ধ্বনিত হইল, "ওঁ সৎ গুরু"। এই মন্ত্র বহু পূর্ব্বে এক দিন এক জন ব্রহ্মচারীর মুখে তিনি শুনিয়াছিলেন, পরে ব্রহ্মাচারী দেশসেবক হইয়া এই বাক্য তিনি একেবারেই ভুলিয়া যান। আজ আবার সহসা এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক উঠিয়া দাঁড়াইয়া মাথা নোয়াইয়া তিনি রাজকুমারীকে বলিলেন. পদধূলি দিন, দেবি, আপনার উপদেশই আমার শিরোধার্য্য।"

এ কি অপরূপ কথা! কি বলেন ইনি! জ্যোতির্ম্ময়ী সচকিতে উঠিয়া সমস্ত লজ্জিতভাবে একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "ছি ছি, আমাকে লজ্জা দেবেন না। আপনিই আমার প্রণম্য।"

গুরুদেবের অবনত মস্তক আবার উন্নত হইল, মোহ-মুক্তভাবে তিনি আবার আসন গ্রহণ করিলেন।

কিছু পরে কুন্দ নিকটে আসিয়া বলিল,—"সময় হয়েছে, গুরুদেব!" অন্য লোকের আগমনবার্ত্তা-বিজ্ঞাপক এই সঙ্কেতবাক্যে একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও কানন-মন্দির ত্যাগ করিয়া, কুন্দের অনুবর্ত্তী হইতে তিনি বাধ্য হইলেন। কিন্তু দুইজনে নিভৃত-পথে চলিয়াও নবাগত দলের লক্ষ্য এড়াইতে পারিলেন না। পথিমধ্যে দূরে দূরে এক দলের ছায়া-মূর্ত্তি অন্য দল দেখিতে পাইল। অন্ধকারের মধ্যেও দলপতি শরৎকুমারকে চিনিলেন। চিনিবামাত্র মুহূর্ত্ত পূর্ব্বের নির্ব্বিকার শুদ্ধ কল্পনা তাঁহাকে ত্যাগ করিল। ঈর্ষ্যাবিষাক্ত দৃষ্টিবাণ তাঁহার দিকে নিক্ষেপ করিয়া দ্রুতচরণে তিনি চলিয়া গেলেন। কুন্দ তখন কাননে না ফিরিয়া গৃহাভিমুখী হইল। অনাদি ও ডাক্তার লতা-মণ্ডপের দিকে অগ্রসর হইলেন। লতা-মণ্ডপের কাছাকাছি আসিয়া অনাদি কহিল, "আপনি এগোন্, ডাক্তার-দা, আমি কুন্দকে একটু বকুনি দিয়ে এখনি আসছি। যাকে তাকে সে রাজকন্যার কাছে আনে কেন?"

দলপতিকে দেখিয়া অনাদির বড়ই মন খারাপ হইয়া গিয়াছিল।

শরৎকুমার লতা-মণ্ডপের বাহিরে ক্ষণকাল নিস্তব্ধে দাঁড়াইয়া রহিলেন। এখনও মাঘ মাস পড়ে নাই, শ্রীপঞ্চমীর এখনও অনেক বিলম্ব আছে, অথচ শীত নাই, হঠাৎ অসময়ে দক্ষিণ বাতাস বহিয়া উঠিয়াছে, লতা-মণ্ডপের মাথায় কঠোর আচ্ছাদনের উপরে, থামগুলির গায়ে গায়ে ফুলে ভরা—গোলাপ এবং যূথিকার লতা এবং মণ্ডপবাহিরে বাগানের কেয়ারীতে রজনীগন্ধা, হাস্নুহানা এবং চন্দ্রমল্লিকা প্রভৃতি ঋতুপুষ্পের ঝাড়, প্রমত্ত আনন্দে কাঁপিয়া কাঁপিয়া গন্ধে দিক ভরাইয়া তুলিয়াছে। শরৎকুমার বাগানের এই শোভাদৃশ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ভাবিলেন, এ মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী যিনি, তিনি আরও কত সুন্দর। আজ কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া, পূর্ব্ব দিকে গাছ-পালার মধ্যে আগুন ধরিয়া উঠিয়াছিল, এখনই চাঁদ উঠিবে; কিন্তু শরৎকুমার চন্দ্রোদয় দেখিবার জন্য অপেক্ষা না করিয়া মণ্ডপমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অন্যদিন যখন রাজকুমারীকে তিনি দেখিতে আইসেন, কত না আনন্দ হর্ষ তাঁহার সমগ্র মূর্ত্তি হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, আজ ছায়ার ন্যায় ম্লানমুখে তিনি রাজকন্যার নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। রাজকন্যা বুঝিলেন, দলপতিকে এখানে

দেখিয়া ডাক্তার ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন। আজ ত রাজকুমারী মনে মনেও বলিতে পারিলেন না, "আমি তাঁহার সহিত দেখা করিয়াছি, ইহাতে তোমার কি ?" তিনিও নিজেকে কেমন যেন অপরাধী মনে করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। চাঁদখানা গাছপালার উপরে উঠিয়া লতা-মণ্ডপের পাশ দিয়া উভয়ের মুখে জ্যোৎস্না ঢালিয়া দিল, উভয় হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন প্রেম-তরঙ্গ সে জ্যোৎস্নাকে আকুল করিয়া তুলিল। কিছু পরে শরৎকুমার বিষণ্ণ স্বরে বলিলেন, "রাজকুমারি, বিদায় নিতে এসেছি।" এমন বিষাদার্দ্র স্বর ত ডাক্তারের মুখে আর কোনও দিন রাজকুমারী শুনেন নাই। তাঁহার হৃদয় বেদনা-বিগলিত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "বিদায় ? কেন, কোথায় যাচ্ছেন ? বিলাত যাওয়া কি ঠিক হয়ে গেছে ?"

ডাক্তার বলিলেন, "বিলাত যাবার এখনো কিছু বিলম্ব আছে, মার্চ্চের এদিকে আর বিলাত যাওয়া হবে না। রাজা বাহাদুরও সে সময় আপনাকে নিয়ে বিলাতে যাবেন বলেছেন। তাই আমি অপেক্ষা ক'রে আছি।"

রাজকন্যা একটু আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, "তবে কোথায় যাবেন এখন ?"

রাজা বাহাদুর বারণ করিয়াছেন, তাই প্রসাদপুরের উল্লেখ না করিয়া তিনি বলিলেন—

"মফঃস্বলে।"

"কেন যাচ্ছেন ?"

"একটু কায পড়েছে।"

"কাউকে বুঝি অস্ত্র করতে হবে ?"

"আমার আর অন্য কি কায ?"

"কবে যাবেন ?"

"কাল ভোরেই যেতে হবে ?"

"ফিরবেন কবে আবার ?"

"দেরী হবে খুব সম্ভবতঃ।"

শরৎকুমার চিকিৎসা করিতে যাইতেছেন, ফিরিতে দেরী হইতে পারে, ইহাতে দুঃখ হইবার কি আছে ? এমন ত প্রায়ই যান। কিন্তু তবুও রাজকুমারীর মনের মধ্যে দুঃখ জমাট বাঁধিয়া উঠিল। সহজ উচ্ছ্বাস রুদ্ধ করিলেই তাহার চাঞ্চল্য প্রবল হইয়া উঠে। এত দিন রাজকুমারী শরৎকুমারের প্রতি তাঁহার প্রেমভাবকে মনে মনে বন্ধুত্ব বলিয়াই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। দিদিমা'র চিঠি পড়িয়া পর্য্যন্ত তিনি যেন নিজের কাছে নিজে সহসা ধরা পড়িয়া গিয়াছেন।

শরৎকুমার আবার বলিলেন, "অনেক অসন্তোষের কারণ দিয়েছি, ক্ষমা করবেন।"

কি মনে করিয়া এ কথা শরৎকুমার বলিলেন, তাহা রাজকুমারী বুঝিলেন, কিন্তু সে প্রসঙ্গে কোন কথা উত্থাপন না করিয়া মনের ব্যথা ক্ষীণ হাসিতে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া বলিলেন, "আমাকেও ক্ষমা করবেন ডাক্তার-দা। অনেক সময় অনিচ্ছাতেও রূঢ়কথা বলেছি হয় ত। যদি সুবিধা হয়—মাঝে মাঝে চিঠি লিখবেন—একটু আধটু"

বহুপূর্ব্বের বিদায়দিনের কথা মনে পড়িল,— সেদিনও হাসি তাঁহাকে চিঠি লিখিবার অনুরোধ করিয়াছিল, কিন্তু সে অনুরোধে এরূপ করুণ কাতরতা ছিল না ত! ডাক্তার বলিলেন, "আপনার যখন আদেশ, তখন লিখব, রাজকন্যা ; কিন্তু আপনি ?"—

"আমি বল্‌তে পারিনে, ডাক্তার-দা। কি আর লিখব ?"

মাটীতে ঝরা গাছের পাতার উপর জুতার শব্দ কানে আসিল। এখনই অনাদি আসিয়া পড়িবে। শরৎকুমার তাড়াতাড়ি হাত বাড়াইয়া দিয়া আগ্রহ-ব্যাকুল কণ্ঠে বলিলেন,—"বিদায় দিন, আজ, রাজকন্যা!"

এ পর্য্যন্ত তাঁহারা কখনও 'সেকহ্যাণ্ড' করেন নাই। আজ জ্যোতির্ম্ময়ী তাঁহার দাবী অগ্রাহ্য করিলেন না, শরৎকুমার সবল হস্তে রাজকুমারীর ঘর্ম্মাক্ত কোমল হাতখানি ধরিয়া, দুইজনে নয়নে নয়নে চাহিলেন। তাঁহাদের মিলিত হস্তের অণু-পরমাণু হইতে আবেগ তরঙ্গ উথলিয়া উঠিয়া নয়ন-তারকায় কেন্দ্রীভূত হইল। এতদিন ধরিয়া তাঁহারা উভয়ে যে—ভাব যে কথা অন্তর্নিভৃতে চাপিয়া রাখিয়াছেন, এই ক্ষুদ্র মুহূর্ত্তে স্পর্শের মধ্য দিয়া তাঁহাদের অবিশ্বাসী নয়ন তাহা ব্যক্ত করিয়া দিল; তাহারা যেন কথা কহিয়া উঠিল। জ্যোতির্ম্ময়ী ডাক্তারের হাত হইতে হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিলেন না, কিন্তু নয়ন অবনত করিলেন। দুই বিন্দু তপ্ত অশ্রু নেত্রচ্যুত হইয়া শরৎকুমারের হাতে আসিয়া পড়িল। অনাদি আসিয়া তাঁহাদের গাত বাধা দেখিয়া মনে মনে বেশ আনন্দ অনুভব করিল। সেই মুহূর্ত্তে একটা কোকিল কুহু কুহু করিয়া ডাকিয়া উঠিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণপক্ষ রাত্রি, কিন্তু চন্দ্ররাজের অনুপস্থিতিকালে আজ তারকারাজি তাঁহার সভাঙ্গনতলে আসর

জমাইবার সুবিধা পায় নাই। সন্ধ্যার পর পূর্ব্বদিগন্ত-কোণে যে কয়েকখানি তরল কালো মেঘ ভাসিয়া উঠিয়াছিল—তাহাই ক্রমশঃ দলপুষ্ট আকারে সারা আকাশখানা ছাইয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছে। তবুও দুই চারিটি দুঃসাহসী নক্ষত্র, শত্রু চলাচলির অবসর-ফাঁকে তাহাদের কালো পোষাকের স্থানে স্থানে আগুন লাগাইয়া দিয়া আবার সন্তর্পণে লুকাইয়া পড়িতেছিল।

তাহাদের মতই দুঃসাহসী চারিটি প্রাণী, মেঘের অন্ধকারে ঘনীভূত জঙ্গল-পথের অন্ধকার, বাধা-বিঘ্ন অগ্রাহ্য করিয়া, ক্ষুদ্র লণ্ঠনের সহায়তায় পূর্ব্বকথিত ভগ্ন মন্দির-সংলগ্ন অশ্বত্থবৃক্ষতলে যখন আসিয়া দাঁড়াইল, তখন প্রসাদপুরের সীমান্ত পাহারায় দ্বিপ্রহরের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। পথিমধ্যেই মাঝে মাঝে মৃদু পাখোয়াজের স্বরে মেঘ ডাকিতেছিল, পথিকদল এখানে আসিয়া দাঁড়াইতে না দাঁড়াইতে মেঘ কড়্ কড়্ শব্দেই সাড়া দিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে দিগ্‌-দিগন্তপ্রসারিত তড়িৎকম্পনে তাহাদের মূর্ত্তিতে এমন একটা রূপান্তরিত ছায়ালোক প্রতিফলিত হইয়া উঠিল যে, পরস্পরের মুখের দিকে চাওয়া চাওয়ি করিয়া তাহাদের বিভ্রম জন্মিতে লাগিল; তাহারা অস্তি বা নাস্তি? এই পৃথিবীরই চিরপরিচিত লোক তাহারা—অথবা অন্য কোন জগতের সদ্যঃ কেন্দ্রভ্রষ্ট জীব? নিজেদের সেই অপ্রকৃত অদ্ভুতমূর্ত্তি দেখিয়া অনাদির বড়ই আমোদ বোধ হইল,—সে বিদ্যুতের প্রতি বিদ্রূপভঙ্গীতে মুখভঙ্গী করিয়া—একবার সার্কাসের ক্লাউনের নাচ নাচিয়া লইল। তাহা দেখিয়া বসন্ত ও শরৎকুমারের হাস্যসংবরণ দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। তাঁহাদের মৃদু চাপা হাসিতে বিজন বনপ্রদেশের স্তব্ধতা সহসা ভাঙ্গিয়া গেল; নিদ্রিত পক্ষিগণ পাখা ঝাড়া দিয়া একবার ডাকিয়া উঠিল, একটা শৃগাল তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া পাশ ঘেঁসিয়া চলিয়া গেল,—পরক্ষণেই মেঘগর্জ্জনের সহিত কেক্কাহুয়া শব্দে জঙ্গলভূমি প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল, আবার কিছু পরেই রজনীর এই অকাল জীবন-চাঞ্চল্য নীরবতামগ্ন হইয়া পড়িল।

দীনেশ কিন্তু সঙ্গীদের আনন্দমত্ততার সহিত যোগ রাখিতে পারে নাই। সে যদিও প্রকাশ্যভাবেই এখন ইঁহাদের দলভুক্ত, দেশপীড়নে যে দেশসেবা হয় না, শরৎকুমারের এই উপদেশ যদিও একান্তভাবেই সে শিরোধার্য্য করিয়াছে, তথাপি নবগুরুর প্রতি এই অকুণ্ঠ আশ্রয়-নির্ভরতাও তাহার মন হইতে পূর্ব্বজীবনের বিভীষিকা মুছিয়া দিতে পারে নাই। পথিপ্রদর্শনে সঙ্গিগণকে এই অশ্বত্থবৃক্ষতলে আনিয়া ফেলিয়া, নিঃসঙ্গ নির্লিপ্ত ম্লানমুখেই সে শিকড়-বিজড়িত পাদপমূলের এক স্থানে বসিয়া পড়িল এবং লণ্ঠনটা পাশে রাখিয়া, মন্দির গুহামুখের ইষ্টক সরাইতে প্রবৃত্ত হইল।

আবার মেঘ ডাকিল, বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল—সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। কিন্তু বড় বড় ফোঁটায় অল্প বৃষ্টি পড়িয়া এমন সহসা তাহা আবার থামিয়া পড়িল যে, অশ্বত্থ-গাছের সব পাতাও তাহাতে ভিজিল না। বাটপাড়ীতে আগত মনুষ্য তিন জন আপন আপন অঙ্গবস্ত্রের সামান্য আর্দ্রতা হস্তদ্বারা ঝাড়িয়া ফেলিলেন। অস্ত্রভারবহন উদ্দেশ্যে ইঁহারা সকলেই সৈনিক বেশ ধরিয়াছিলেন, পরিধানে তাঁহাদের পশমী লঘু নিকার-বকার এবং মাথায় কানঢাকা লোম-টুপী। খুব বেশী বৃষ্টি না হইলে এই বর্ম্মপরিচ্ছদ ভেদ করিয়া তাঁহাদের অঙ্গে জল-প্রবেশের সম্ভাবনা ছিল না।

দীনেশ প্রবেশপথ মুক্ত করিয়া লণ্ঠন ধারণ করিল,—অন্য সকলে তাহার অনুবর্ত্তী হইলেন। দুই তিনটা সোপানধাপ অতিক্রম করিয়া মন্দিরের ভগ্ন চাতালে তাঁহারা আসিয়া পড়িলেন, এখানে আসিয়া শরৎকুমার দীনেশের হাত হইতে লণ্ঠনটা স্বহস্তে লইয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া একবার চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন। দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, দুর্গের আকারেই এই ক্ষুদ্র স্থান সুরক্ষিত। ভাঙ্গা প্রাচীরের উপর সাজান ইটের স্তূপ জঙ্গলের ঝোপের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া পরিখার মতই দুর্ভেদ্য হইয়াছে। বেষ্টনীর চারিদিকে মাঝে মাঝে গোলাকার ছিদ্র, ইহার মধ্য হইতে শত্রুর গতিবিধিও নজরে পড়ে এবং বন্দুকও চালান যায়। ইহা যেন 'আনন্দমঠেরই' ক্ষুদ্রতর পরিকল্পনা। চাতাল হইতে তাঁহারা প্রথম কক্ষে প্রবেশ করিলেন। মাতৃমন্দিরে মাতৃমূর্ত্তি দর্শনের আকাঙ্ক্ষাই সর্ব্বাগ্রে তিন জনের মনে জাগিয়া উঠিল—কিন্তু দেয়ালে কালিকাদেবীর একখানা সাধারণ পট ছাড়া অন্য কোন ছবি কিংবা অপহৃত অস্ত্ররাশিও সেখানে দেখিতে পাইলেন না। অতঃপর দীনেশের সহিত অন্য ক্ষুদ্রতর গুহাকার কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহারা দুইটি মাত্র বন্দুকের সন্ধান পাইলেন। এই কক্ষটি বিস্ফোরক-প্রস্তুতাগার, তাহা পাঠক জানেন। এই গৃহের এক কোণে বহু পূর্ব্বের পাষাণ-করালীমূর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ পাথর তিন চার টুক্‌রা পুঞ্জীকৃত হইয়া পড়িয়া ছিল,—সিন্দূরমণ্ডনে পাথরগুলার আকার

অবয়ব একেবারেই ঢাকা। দীনেশ এখানে আসিয়া প্রথমে ভক্তিভরে সেই প্রস্তরপুঞ্জকে নমস্কার করিয়া সেই কোণ হইতেই দুইটা বন্দুক টানিয়া বাহির করিল। তাহা ছাড়া এখানে আর কোন অস্ত্র না পাইয়া সকলেই মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িলেন। শরৎকুমারের হাতে লণ্ঠন ছিল, অনাদি ও বসন্তকে বন্দুক দুইটা দিয়া দীনেশ বলিল, "ও ঘরের মেঝেটা একবার খুঁড়ে দেখা যাক, মাটীর মধ্যেই হাতিয়ারগুলা রাখা হয়।"

একটা সাবল ও দুইখানা কোদাল সেই ঘর হইতেই সংগ্রহ করিয়া সে অতঃপর সঙ্গীদিগের সহিত পূর্ব্বকক্ষে প্রবেশ করিল। বসন্ত ও অনাদি বন্দুকের চওড়া দিকটা প্রথমে কোমরবন্ধে গুঁজিয়া লইল; পরে বন্দুক-নলীটা বগলের দুই পাশ দিয়া বুকের উপরিভাগে কষিয়া বাঁধিতে লাগিল। দড়ি প্রভৃতি সরঞ্জাম তাহারা পকেটে করিয়া সঙ্গে আনিয়াছিল। শরৎকুমার দীনেশের সহিত তন্নির্দ্দিষ্ট মেঝের জমীর উপর কোদালের কোপ বসাইতে লাগিলেন। ঝুরো-মাটী দুইচার কোপে সহজেই খুলিয়া আসিল, তখন তাঁহারা কোদাল রাখিয়া মাটী সরাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। সহসা মৃদু মৃদু ধ্বনিতে বাঁশি বাজিতে লাগিল। সকলে চমকিয়া উঠিলেন। দীনেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কান খাড়া করিয়া পাগলের মত বলিয়া উঠিল—"যাই যাই—চল্লুম আমি ডাক পড়েছে।"

বসন্ত কোমরবন্ধের চামড়াটা জোরে আঁটিতে আঁটিতে দীনেশকে প্রশ্ন করিল—"কোথায় যাবে?"

অনাদির বন্দুক বাঁধা তখন শেষ হইয়া গিয়াছিল, সে তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইয়া ছিদ্রপথে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক, দীনেশ কোন উত্তর করিবার পূর্ব্বেই বলিল—"এ কি ব্যাপার! আমরা ভুল করেছি, বসু-মিঞা, আজই দেখছি ওদের সেই ডাকাতীর দিন।"

দীনেশ বলিল, "হ্যাঁ তুলক্রামের ডাক এ; এখনি যেতে হবে আমার!"

শরৎকুমার দীনেশের সঙ্গে সঙ্গেই উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি তাহার পিঠে হাত দিয়া বলিলেন—"দীনেশ, নির্ভয় হও, ডাকাতীতে যাবে না তুমি,—ডাকাতী রক্ষা করব আমরা।"

এই বাক্যে দীনেশের মনের মোহ যেন চকিতে ভাঙ্গিয়া গেল—সে আশ্বস্তভাবে গুরুকে নমস্কার করিয়া দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, "আদেশ করুন—কি করব—"

"একটু অপেক্ষা কর, বল্‌ছি।" বলিয়া তিনি ছিদ্রপথে মুখ বাড়াইয়া দিলেন। সত্যই এ কি ব্যাপার! মনুষ্য না ইহারা প্রেতসৈন্য? হস্তের টর্চ্চলাইটে, অতি বীভৎস ভীষণরূপে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়া কখনও অগ্রে কখনও পশ্চাতে আনুষঙ্গিক, দীর্ঘকায় অদ্ভুত ছায়ামূর্ত্তি রচনা করিতে করিতে এই কিম্ভূতকিমাকারের দল ঘুরিয়া ফিরিয়া এই দিকেই আসিতেছিল। প্রেতযোনিতে বিশ্বাস না থাকিলেও এ দৃশ্যে শরৎকুমারপ্রমুখ সাহসী পুরুষদিগেরও অঙ্গে একবার কাঁটা দিয়া উঠিল। কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে সেই সন্ত্রস্তভাব মন হইতে সরাইয়া ফেলিয়া কি কর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য তিন জন একত্র হইয়া দাঁড়াইলেন। শরৎকুমার দীনেশকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এরা ডাকাতী করতে যাচ্ছে কোথায় জান কি?"

উত্তর হইল—"ঠিক জানি না। তবে মহাজন ধনপতি সিংহের টাকা-বোঝাই গাড়ী হয় ত বা এই পথে আজই যাবে—"

বসন্ত ও অনাদি এক সঙ্গে বলিয়া উঠিল—"ঠিক ঠিক, কি মূর্খ আমরা—এইটে সে দিন ধরতে পারিনি।"

শরৎকুমার বলিলেন—"তাতে ক্ষতি হয়নি। আমরা এ ডাকাতী নিবারণ করতেই আজ দৈব-প্রেরিত হয়ে এসেছি—বুঝলে ত? এস এস ঐ মুখোসগুলো নামিয়ে ফেলা যাক্।"

যেমন কথা—অমনিই কাজ,—তৎক্ষণাৎ মুখোস চারিটি হাতে হাতে নামিয়া আসিয়া তাঁহাদের চারি জনের মুখে উঠিল। সঙ্গীদিগের মুখোসপরা মুখের দিকে চাহিয়া শরৎকুমার হাসিয়া বলিলেন, "বদলিতে ভর্ত্তি হ'তে পারব—খুব আশা হচ্ছে—। বাঁশী বাজিয়ে দলের অনুপস্থিত লোকদেরই ত ডাকা হচ্ছে, না দীনুমিঞা?"

দীনেশ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—"হ্যাঁ।"

"সাড়া দাও তুমি—তোমার কাছে বাঁশী আছে নিশ্চয়ই?"

"আছে।"

"বাঁশীতে সাড়া দিয়ে আমরা চল বেরিয়ে পড়ি।"

দীনেশ বাঁশী না বাজাইয়া বলিল—"কিন্তু যদি নাম জিজ্ঞাসা করে?"

শরৎকুমার বুক ঠুকিয়া বলিলেন—"তার জন্য ভাবনা কি? আমি পরশুরামজি ৪নম্বর এই না ছিল, সন্তোষের নাম?"

সন্তোষের নোটবুক হইতে এইরূপ অনেক খবরই তাঁহারা জানিয়াছেন, দীনেশের মুখেও শরৎকুমার তাহা যাচাই করিয়া লইতে চাহেন।

অনাদি বলিল—"আপনি ত পরশুরাম, দীনেশ ত দীনু মিয়া আর আমরা দু'জন?"

উত্তর হইল, "তোমরা একটু দূরে দূরে থেকো, নাম কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে—তখন সময়োচিত একটা উত্তর যুগিয়ে যাবে। ক'টা গাড়ী আস্‌বে টাকা নিয়ে জান দীনেশ ?"

দীনেশের আগেই বসন্ত উত্তর দিল—"ধনপতির দু'ট গাড়ী আস্‌ছে বলেই আমি জানি।"

"বেশ, ঠিক হয়েছে। ডাকাতরা ত এখানেই আগে আস্‌ছে, না দীনেশ ?"

"হাঁ। তুলক্রামে যাবার আগে দেবীপ্রণাম করা আমাদের একটা নিয়ম। অস্ত্রের অনাটন হ'লে তাও এখান থেকে নিয়ে যাওয়া হয়।"

"বেশ, বেশ, বাঁশী বাজিয়ে দাও। আমরা বেরিয়ে পড়ি, ওদের এখানে পাঠিয়ে আমরা গাড়ীর হেপাজতে নিযুক্ত থাক্‌ব, বুঝলে ত ?"

বসন্ত ও অনাদি একবাক্যে বলিয়া উঠিল, "বুঝেছি। চলুন, চলুন।"

তাঁহারা বায়ুগতিতে যেন ধাবমান্ হইলেন, দীনেশও বাঁশী বাজাইয়া দিয়া তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইল।

সহসা পরশুরামজির দর্শনলাভে ডাকাতের দল অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিল। শরৎকুমার বলিলেন, "বিলম্ব বেশী নেই, তোমরা দেবীপ্রণাম ক'রে এস, আমরা পাহারায় থাকি, ইতিমধ্যে গাড়ী আটক করব।"

এক জন উত্তর করিল, "তোমার সঙ্গে আর ক'জন আছে সর্দ্দার ? আট্‌কাতে পার্‌বে ত ? নয় ত আমরাও দু-চার জন থেকে যাই।"

শরৎকুমার বলিলেন, "কিছু দরকার নেই, দেবী-প্রণাম না কর্‌লে কার্য্য সফল হয় না, আমাদের সকলেরই সঙ্গে অস্ত্র আছে।"

সর্দ্দার পরশুরামের উপর সকলেরই অগাধ ভক্তি, আজ গুরু আসেন নাই, বিজুমিশ্রও অনুপস্থিত, ইঁহাকেই সর্দ্দার মানিয়া লইয়া তাহারা সকলে মন্দির-মুখী হইল। শরৎকুমার সশস্ত্র সসৈন্য রাস্তার উপরে আসিয়া গাড়ীর অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। দৈব আজ সুপ্রসন্ন,—দুইটার সময় সাধারণতঃ ধনপতির গাড়ী এই পথ দিয়া যায়, আজ একটার অনতিক্ষণ পরেই গাড়ীর আওয়াজ পাওয়া গেল। তাঁহারা ছুটিয়া তদভিমুখী হইলেন। বসন্ত ও অনাদি প্রথম গাড়ীর এবং শরৎকুমার ও দীনেশ দ্বিতীয় গাড়ীর ঘোড়ার মুখের বল্‌গা ধরিয়া গাড়ী থামাইয়া দিলেন। খুব একটা হৈচৈ পড়িয়া গেল, কোচমান লোকজন 'ডাকু ডাকু' করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, গাড়ীর মাথার উপরে শায়িত ভোজপুরী পালোয়ান দুই জন সুখনিদ্রা ত্যাগ করিয়া বন্দুক ধরিল। কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে এই হৈচৈ শেষ হইয়া গেল। ইঁহারা চারিজনই মুখের খোলোষ ত্যাগ করিয়া আপনা-দিগকে পুলিস বলিয়া তাহাদের অভয় প্রদান করি-লেন, শুনিয়া তাহারা গোলাম বনিয়া গেল। দুই গাড়ীর কোচমানের পাশে অনাদি ও বসন্তকে চড়িতে বলিয়া দীনেশের সহিত শরৎকুমার সহিসের পার্শ্বের স্থান দখল করিলেন। বসন্তের গাড়ীখানা ছিল গোড়ার দিকে, আজ্ঞা পাইবামাত্র সে ঘোড়া হাঁকাইয়া চলিয়া গেল। অনাদি তাহার অনুবর্ত্তী হইবার ইচ্ছায় ঘোড়া দুইটাকে চাবুক কষাইবামাত্র পশ্চাৎদিক হইতে শরৎকুমার আজ্ঞা করিলেন—"এক মুহূর্ত্ত ঘোড়া থামাও, অনাদি, আর একটা গাড়ীর শব্দ যেন আস্‌ছে।" অনাদি রাশ কষিয়া ধরিল। উভয়েই কান খাড়া করিয়া দ্রুতগামী গাড়ীর আওয়াজ শুনিতে পাইলেন। কিন্তু আওয়াজ হইতে বুঝিলেন যে, গাড়ীখানা এখানে পৌঁছিতে অন্ততঃ ৫ মিনিট বিলম্ব হইবে। ততক্ষণ এ গাড়ী বিজন রাস্তা অতিক্রম করিতে পারিবে। তিনি নামিয়া দাঁড়াইয়া অনাদিকে গাড়ী হাঁকাইয়া চলিয়া যাইতে আজ্ঞা করিলেন। অনাদি মনে মনে অস্বস্তি বোধ করিল, কিন্তু তাঁহার আজ্ঞা পালনে ত বিরত হইতে পারে না। অনাদি একবার কেবল বলিল—"আপনার কাছে ত কোন অস্ত্র নেই, ডাকাতরা ত আপনাকে বিপদে ফেল্‌তে পারে।"

"আছে আছে, আমার কাছে পিস্তল আছে। আমার জন্য ভাবনা কোরো না। ডাকাতরা কিছু বোঝার আগেই ও গাড়ীখানাকে বাঁচিয়ে নিয়ে আমি পালাতে পার্‌ব।"

অনাদি অগত্যা গাড়ী চালাইয়া দিল।

শরৎকুমার রাস্তায় দাঁড়াইয়া না থাকিয়া গাড়ীর শব্দ লক্ষ্যে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তখন আকাশের কালো রং অনেকটা ধোলা হইয়া আসিয়াছিল। পূর্ব্বের অন্ধকার মেঘ দুই চারিখানা উত্তরে সরিয়া আসিয়া সে দিকটা বেশ সাফ্ করিয়া দিয়া গেল। পথ মুক্ত হইয়া শেষ রাত্রির দিশাহারা চাঁদ বনজঙ্গলের উপর অশ্রুময় ধোঁয়াটে আলোক ছড়াইয়া দিলেন। শরৎকুমার দূর হইতে দেখিলেন, একখানা নয়, দুইখানা গাড়ী রাস্তায় না আসিয়া, ঘুরিয়া জঙ্গলপথের কাছাকাছি গিয়া থামিল, তাহার পর পিপীলিকাসারির মত অস্ত্রধারী বহু মনুষ্য তাহা হইতে বাহির হইয়া পড়িল। শরৎকুমার বুঝিলেন,

ইহারা পুলিসের লোক। তিনি আত্মগোপন-মানসে একটা ঝোপের মধ্যে সরিয়া দাঁড়াইয়া সেখান হইতে উহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। এক জন মনুষ্য অঙ্গুলিসঙ্কেতে উহাদিগকে কি কথা বলিয়া সেখান হইতে চলিয়া আসিল। যে ঝোপের মধ্যে তিনি দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাহার কাছ দিয়াই সে সরিয়া পড়িল; তবুও স্পষ্টরূপে তাহাকে তিনি চিনিতে পারিলেন না; কিন্তু দেহগঠনে এবং চলিবার ভঙ্গীতে তাহাকে বিজনকুমার বলিয়াই তাঁহার মনে হইল। বিজু মিত্র গোয়েন্দাগিরি করিয়া তাঁহাদের দলবলকে ধরাইয়া দিল না কি! তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ঘৃণায় কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। এখন তিনি কি করিবেন? তাঁহার ত আর কোন কর্ত্তব্য এখানে নাই। অলক্ষ্যে তিনি ত স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইতে পারেন!

কিন্তু প্রতারিত সেবাধারীদিগের প্রতি তাঁহার কেমন একটা অনুকম্পা জাগিয়া উঠিল। হায় রে ভ্রান্ত বালকগণ! যাহাদের বিশ্বাস করিয়া পাপকে পুণ্যকার্য্য বলিয়া তোমরা বরণ করিয়াছ, তাহারাই তোমাদের গলায় ফাঁসী বাঁধিতেছে। হে দেশোদ্ধারী পুরোহিত, তোমাকে ধন্য! খৃষ্টান পাদরীর ন্যায় তাঁহার মনে হইল, তিনি যদি ইহাদের রক্ষা করিতে পারেন, তবে তাহারা ন্যায়পথে ফিরিবেই ফিরিবে। কিন্তু তাঁহার শুভ ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার অবসর কই? পুলিসদল যখন জঙ্গলপথে প্রবেশ করিল তখন সেবাধারী ডাকাতগণ মন্দির হইতে ফিরিয়া আসিতেছে।

তাহাদিগকে দেখিবামাত্র পুলিস বিক্ষিপ্তভাবে যত্র তত্র বন্দুক চালাইতে আরম্ভ করিল; সম্মুখসমরে স্বর্গারোহণের আশা দুরাশা জানিয়া ডাকাতরাও বন্দুক চালাইতে চালাইতে বনপথে অদৃশ্য হইয়া পড়িল, বনপথ পুলিসের অপেক্ষা তাহাদেরই জানা ছিল ভাল। পুলিস তাহাদের অনুসরণ করিল না। এই স্বল্পক্ষণস্থায়ী যুদ্ধবিপ্লবে দুই জন পুলিস আহত হইয়া ভূমি-শায়ী হইল। ডাকাতদিগের সম্ভবতঃ কেহই আহত হয় নাই; কারণ, তাহাদের কাহাকেও এখানে পাওয়া গেল না।

আহতের আর্ত্তনাদ শুনিয়া শরৎকুমার স্থির থাকিতে পারিলেন না। রাজাকে যে কথা দিয়াছিলেন, তাহা একেবারেই ভুলিয়া গেলেন, ডাক্তারের কর্ত্তব্যই একমাত্র তাঁহার মনে পরিপূর্ণভাবে জাগিয়া উঠিল, তিনি দ্রুতপদে তাহাদের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন।

দারোগা মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে তুমি?"

উত্তর হইল—"আমি ডাক্তার।"

পদোন্নতির আশায় পুলিস-সর্দ্দার আহ্লাদে আটখানা হইয়া উঠিলেন। এক জন বন্দীও ত ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হাজির করিতে পারিবেন।

তিনি মুখভরা হাসি হাসিয়া বলিলেন—"পথ ভুলে বুঝি এসে পড়েছ? বেশ বেশ! চল হে থানায় গিয়ে ডাক্তারী পরীক্ষা দেবে।"

শরৎকুমার বন্দীরূপে পুলিসদলের সহযাত্রী হইলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

অকূলের তরী দুইখানা ঈর্ষ্যাদ্বন্দ্বে মাতিয়া তরঙ্গে তরঙ্গে উঠিয়া পড়িয়া কূলের দিকে চলিয়াছে; কর্ণধার দুই জন বাচ্ খেলিতেছেন। উভয়েই সমান শক্তিশালী, তাঁহাদের সুদক্ষ চালনায় উভয় তরীই সমান বেগে ধাবিত। একখানা যদি বা ক্ষণতরে অগ্রসর হইয়া যায়, অন্যখানা তৎক্ষণাৎ তীরবেগে তাহার পার্শ্বদেশ অধিকার করিয়া লয়। রহস্যময় নিয়তির এ কি খেলা! এ খেলার শেষ কোথায়,—জয়-পরাজয় কখন্ এবং কিরূপে,—দর্শক আমি উচ্চ চূড়ায় বসিয়া কৌতূহলাক্রান্তচিত্তে নির্নিমেষ কৌতুকব্যগ্র দৃষ্টিতে তাহাই লক্ষ্য করিতেছি।

শরৎকুমার বন্দী হইয়াছেন, তাহা পাঠক জানেন এবং বিজন রায়ের কর্ম্মচক্রও যে তাহাকে কোথায় আনিয়া ফেলিয়াছে—তাহারও ইঙ্গিত তিনি পাইয়াছেন। বিজন সত্যই এখন গুপ্তদলের গোয়েন্দা। তবে এই সত্য হইতে পাঠক যদি সাব্যস্ত করিয়া বসেন যে, একান্ত স্বার্থসাধন উদ্দেশ্যই এই ঘটনামূলে নিহিত, তাহা হইলে শরৎকুমারের ন্যায় তিনিও ভুল করিবেন। প্রকৃতপক্ষে সে অতদূর হীনপ্রকৃতির লোক নহে। দেশব্রত যে গ্রহণ করে—তাহার মধ্যে উচ্চভাব যে কতক পরিমাণে থাকিবেই, ইহা ধরা কথা। কিন্তু অবস্থাচক্রে শেষ রক্ষা করিতে না পারিলেই এ ভাব ক্রমশঃ প্রকৃতিগত প্রবৃত্তি-পঙ্কিলতায় মিশিয়া যায়। মানুষ সাধারণতঃ ভালমন্দের মিশ্রণ। অসাধারণ যাহারা, তাহারাই মাত্র অবস্থার নিগ্রহ বা অনুগ্রহের উপর নির্ভর না করিয়া আপনি আপন ভাগ্য-রচনায়—দেব বা দানব-শক্তির প্রকাশে বিশ্ব-সংসারকে বিস্মিত, মুগ্ধ করিয়া তুলে।

পূর্ব্বকথিত ডাকাতীর কয়েক দিন পূর্ব্বে জঙ্গল-মধ্যে সেবাধারীদিগের কমিটী বসিয়াছিল। দলপতি আসেন নাই; সন্তোষও নাই—অন্য সকলে মিলিয়া বিজনকুমারের হাতে একটা বন্দুক তুলিয়া দিয়া এ কার্য্যে তাহাকেই সর্দ্দাররূপে নির্ব্বাচিত করিল। সহব্রতীদিগের জয়োল্লাস হুঙ্কারের মধ্যে অভিনন্দিত সমাদরে তাহার মনেও তখন জয়মত্ততা জাগিয়া উঠিল। পরে মন্দির ত্যাগ করিয়া সমিতির নিয়মানুসারে সতর্কতা অবলম্বনপূর্ব্বক যখন একাকী সে বিজন-পথ ধরিল—তখন চিন্তা করিবার অবসর লাভে এ কার্য্যের ভীষণতা তাহার মনের স্তরে স্তরে প্রবেশ লাভ করিয়া তাহাকে অবসাদগ্রস্ত করিয়া তুলিল।

মনের ইচ্ছা, আমরা স্বাধীন জাতি হইব; অসভ্য জাপান, চীন দস্যুর মত মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল—আর সুসভ্য আর্য্যজাতি আমরা এখনও পদানত আছি? হায় রে! কিন্তু এই মনুষ্যোচিত ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার পক্ষে অর্থাৎ আমাদের মুক্তির পথে যে অগ্নিপরীক্ষা—তাহাতে উত্তীর্ণ হইবার পক্ষে বলসঞ্চয়ের উদ্যম ও অধ্যবসায়শক্তি, আমাদের কয় জনের মনে এবং কতটুকু জাগিয়া উঠিয়াছে? উত্তরে শুনিতে পাই, জাগিয়া উঠিয়াছে বই কি; খুব বেশী পরিমাণেই জাগিয়া উঠিয়াছে; মোহনিদ্রা অবসানে ভারতের এ যে জাগরণের কাল!

এই বাক্যসুধাপানে হৃদয় যখন আনন্দমত্ত হইয়া উঠে, তখন ঈর্ষ্যা-কাতর দুর্ম্মুখ যুক্তিবাগীশ মহাশয় মনের দরজায় উঁকি মারিয়া ব্যঙ্গচ্ছলে বলিতে থাকেন,—"অত আনন্দ ভাল নয় গো, ভাল নয়।" ভারতের নিদ্রা যদি বা ভাঙ্গিয়া থাকে, বলিতে পারি না,—কিন্তু তাহার মোহের অবস্থা যে সমানই আছে, তাহাতে কিছুমাত্র ভুল নাই। আলস্য, মূর্খতা, বৃথা গর্ব্ব, স্বার্থদ্বন্দ্ব প্রভৃতি সাড়ে ষোল আনা মোহে ভারত এখনো ভরপুর আচ্ছন্ন, জাগরণ যদি তাহার হইয়া থাকে ত স্বপ্নের মধ্যেই হইয়াছে, প্রকৃত জাগরণ এ নয়। অতএব ইহাতে এত আনন্দ বা গর্ব্ব বোধ করিবার কারণ ত দেখিতেছি না।

মর্ম্মাহত হইয়াও দুর্ম্মুখ মহাশয়ের কথা ত অগ্রাহ্য করিতে পারি না। বস্তুতঃই আমাদের অবস্থা এমনই প্রতিকূল যে, দেশের বড় বড় সেনাপতি গুরুদিগের দৃঢ় আশা-সঙ্কল্পও যখন স্বপ্নের মধ্যে রচিত হইয়া স্বপ্নেই বিলীন হইয়া পড়িতেছে, তখন স্বল্পবুদ্ধি বালক চেলাদিগের কি কথা!

এই উপন্যাস যখনকার ইতিহাস, বিদেশী পণ্য-বর্জ্জনেই তখন স্বদেশী যুগের আরম্ভ। কর্জ্জন-নীতির বিরুদ্ধে লড়িবার পক্ষে দেশের মাতব্বর রাজনীতিকগণ ইহাই মহা অস্ত্র বলিয়া জ্ঞান করিলেন। কিন্তু দেশ-মঙ্গলকামী দুঃসাহসী বালকের দল ইহাতে সন্তুষ্ট হইল না। পক্ষপাতময় শাসননীতির মূল উৎপাটন সংকল্পে তাহারা গুপ্ত বিদ্রোহিতার আয়োজন আরম্ভ করিল। এ সময় মাথা ঠিক রাখিয়া কায করা নেতৃগণের পক্ষেও সম্ভব হইয়া উঠে নাই,—যুবকদল যে বিভ্রান্ত হইয়া উঠিবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি! কিন্তু ইহার ফলে বিপদ্‌গ্রস্ত হইল, - রাজ্যের লোকেই, রাজ-সিংহাসন যেমন অটল ছিল, তেমনই অটল রহিল। ছেলেরা এক পক্ষে বিলাতী দ্রব্যের নির্ব্বাসন সংকল্পে ক্ষুদ্রপ্রাণী দেশের দোকানদারদের উপর জুলুম আরম্ভ করিল; অন্য পক্ষে বিদ্রোহিগণ দেশকে জাগাইয়া তুলিবার অভিপ্রায়ে কোনরূপ অনাচার-অত্যাচারকেই অন্যায় বলিয়া জ্ঞান করিল না।

বিজন রায়ও প্রথমে বিলাতী জিনিষের ধ্বংস-সাধন করিয়া স্বদেশীজীবন আরম্ভ করে, তবে পিতার নিকট এ কথা গোপন রাখিবার উদ্দেশ্যে মুখোস পরিয়াই তাহাকে এ কার্য্য করিতে হইত। পরে এই সূত্রেই মাতৃমন্দিরের দলপতিকে সে গুরুরূপে লাভ করে এবং অজ্ঞানে ক্রমশঃ এমনই ফাঁদে জড়াইয়া পড়ে যে, তখন আর ইচ্ছা করিলেও তাহার সরিয়া পড়িবার উপায় রহিল না।

কিছুদিন পূর্ব্বে তাহার উপরই দীনেশকে গুলী করার ভার পড়িয়াছে। দীনেশ অবশ্য গুরুতর অপরাধী সন্দেহ নাই! শরৎকুমারকে মারিতে পারিবে না; এইরূপ স্পষ্ট জবাবে গুরুকে সে অপমানিত করিয়াছে। কি দুঃসাহস! ঠিকই শাস্তি তাহার হইয়াছে। কেন, ডাক্তারটাকে মারিতে ক্ষতি ছিল কি? সেটাকে মর্ত্ত্য ছাড়া করিতে পারিলেই ত সব বালাই চুকিয়া যায়!

বিজন শরৎকুমারকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিত, - কেন, তাহা পাঠক জানেন।

কিন্তু তবুও? সে তবুওটা কি? দীনেশ যে নিতান্ত বেচারা, তাহাকে গুলী করিতে বিজনের মন নিতান্ত নারাজ। যাহা হউক, সে কাযের এখনও বিলম্ব আছে,—তাহার পূর্ব্বে দীনেশের মন বা গুরুর মত বদলাইতেও পারে। কিংবা বিজনের স্থলে অন্য কেহ এ কার্য্যভার গ্রহণও করিতে পারে। কিন্তু আপাততঃ ডাকাতীর দিন যে সন্নিকট; আর সেই ত সর্দ্দাররূপে নির্ব্বাচিত! অথচ এ কার্য্যের পক্ষে সে একেবারেই কাঁচা—ডাকাতী লোকে কি

করিয়া করে, সে তাহার কিছুই জানে না। দ্বিতীয়তঃ ধনপতি সিং তাহার পরম বন্ধু—তাহার ধন স্বহস্তে লুঠপাট করিবে সে কি করিয়া?

আচ্ছা বেশ, দেশসেবার জন্য তাহাও যেন সে করিল, কিন্তু ইহার পরিণাম? বিজনের মন বার বার করিয়া বলিতে লাগিল, ইহার পরিণাম ভাল হইবে না; দেশের পক্ষেও নহে—তাহার নিজের পক্ষেও নহে। কার্য্যক্ষেত্রে জয়লাভ করিলেও—এ ঘটনা—এ চক্রান্ত কোন না কোন দিন প্রকাশ হইবেই—আর তখন একাকী ত এ কার্য্যের শাস্তি সে ভোগ করিবে না, তাহার পাপে পিতা-মাতাও বজ্রদণ্ডে আহত হইবেন।

এইরূপ দুশ্চিন্তাজর্জ্জরিত চিত্তে সে যখন জঙ্গল পার হইয়া মাঠের পথ ধরিল—তখন বেলা যেন সহসা নিভিয়া গেল, দিবসের শেষ রশ্মিটুকু গাছের মাথায় খেলিতে খেলিতে শ্রান্ত ছেলের ন্যায় নদীর পারে সহসা ঢলিয়া পড়িল। বিজন রায় হাতের বন্দুকটার উপর ভর দিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া একবার স্থির হইয়া দাঁড়াইল,—সহসা পিছন হইতে কে বলিয়া উঠিল, "Good evening Sir!" বিজন চমকিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল,—পুলিসসাহেব। হঠাৎ তাহার গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল, কিন্তু পুলিস তাহার চেনা লোক, ভয় পাইবার ত কোন কারণ নাই। অবিলম্বে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া হাস্যমুখেই সে বলিল, "Good evening Sir." পুলিস একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,—"মাপ করবেন, আপনার প্রতি আমার একটু unpleasnt duty আছে। হাতের বন্দুকটা যদি অনুগ্রহ ক'রে আমাকে দেন।"

বিজন সবিস্ময়ে কহিল, "আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন না? জানেন না কি, আমরা লাইসেন্সধারী?"

উত্তর হইল,—"জানি। কিন্তু আপনি অভিযুক্ত।"

"আমি অভিযুক্ত? আপনি ভুল করেছেন,—আমার পিতা বিষাদপুরের"

"আজ্ঞে হাঁ, আপনার পিতা স্বয়ং এখানে উপস্থিত আছেন, তাঁর নির্দ্দেশমতই আপনাকে ধরতে এসেছি; তাঁর কাছেই নিয়ে যাব।"

দারুণ অভিমানে, ক্রোধে বিজন রায়ের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল,—পিতা জ্ঞানশূন্য হইয়া তাহাকে ধরাইয়া দিলেন! বিনা বাক্যব্যয়ে সে তখন পুলিসসাহেবের সহবর্ত্তী হইল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে। বিদ্রোহী দলের অনুসন্ধান-অভিপ্রায়েই পুলিসসাহেবকে সঙ্গে লইয়া সুজন রায় তখন এ দিকে আসিয়াছিলেন। কপাল-জোরে জঙ্গল সীমানার কাছাকাছি রাস্তার উপর খোলা মোটর গাড়ী পৌঁছিবামাত্র তিনি দেখিতে পাইলেন, কে এক জন বন্দুক লইয়া জঙ্গল হইতে মাঠের উপর আসিয়া দাঁড়াইল। বমাল আসামী গ্রেপ্তারের আশায় তিনি উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। রায় বাহাদুর বিষাদপুরের এক জন অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট; পুলিসকে হুকুম দিবার তাঁহার অধিকার আছে; তাঁহার আজ্ঞায় পুলিসসাহেব বিজন রায়কে নিকটে আনিয়া হাজির করিল। বিজনকে দেখিয়া চক্ষু স্থির! এ কি সর্ব্বনাশ! কাহাকে ধরাইতে গিয়া এ কাহাকে ধরাইয়া দিলেন! তিনি একটু-খানি দম লইয়া কম্পিত শুষ্ককণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"তুই যে এখানে?"

মনে করিয়াছিলেন, উত্তরে সে কৈফিয়ৎস্বরূপ বলিবে, বেড়াতে এসেছিলুম—বা পাখী শীকারে এসেছিলুম—এই রকম একটা কিছু সাফাই বাক্য। কিন্তু যে ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া লোক অসঙ্কোচে খুন, আত্মহত্যা প্রভৃতি মহাকাণ্ড করিয়া বসে, সেই ভাবের আবেগে, বিজনের মন তখন হিতাহিতজ্ঞান-শূন্য বিকারগ্রস্ত। আর সমস্ত ভাবনা, চিন্তাকে চাপা দিয়া কেবল প্রতিশোধস্পৃহা—পিতাকে জব্দ করিবার ইচ্ছা তাহার মনকে যেন অধিকার করিয়া বসিয়াছে; সুজন রায়ের প্রশ্নের উত্তরে সে নিস্পরোয়া ভাবে সাফ জবাব দিল—

"এসেছিলুম—পরামর্শসভায়।"

সুজন রায়ের মাথা ঘুরিয়া উঠিল—তিনি কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "কি বলছিস্ তুই?"

উত্তর হইল—"ঠিক কথাই বলছি!"

সুজনের আর কোন কথা যোগাইল না—পুলিস-সাহেব একটু হাসিয়া বলিল—"কিসের পরামর্শসভা? ডাকাতীর পরামর্শ না কি? বনজঙ্গল ত ডাকাত-দেরই আড্ডা।"

বিজন বলিল—"আপনি কি মনে করেন, সে কাজ আমাদের পক্ষে এমনি অসম্ভব?"

"মোটেই তা মনে করিনে, আজকাল ভদ্রলোক ডাকাতদের জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠেছি আমরা। আপনি তা হ'লে এক জন বিদ্রোহী?"

বিজন গম্ভীরভাবে বলিল—"নিশ্চয়ই। চিরদিন

কি আমরা আপনাদের পদানত হয়ে থাকব না কি ? মনেও করবেন্ না তা।"

বিজনের মুখে এইরূপ স্বীকারোক্তি পুলিস-সাহেবের স্বপ্নেরও অগোচর, তাহার বিস্ময়নির্ব্বাক কণ্ঠ হইতে শুধু ধ্বনিত হইল, "হম্!"

সুজন রায় ব্যাকুলভাবে এতক্ষণ পরে বলিয়া উঠিলেন, "মিথ্যা কথা সাহেব, মিথ্যা বলছে ও! আমাকে জব্দ করার জন্য ও কথা বলছে।"

পুলিসসাহেব প্রকৃতিস্থভাবেই অতঃপর বলিলেন, "আপনাদের ঝগড়া ত আমরা মেটাতে পারব না, এই স্বীকারোক্তির পর এঁকে থানায় নিয়ে যেতে আমরা বাধ্য, সেখান থেকে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে এঁকে নিয়ে যেতে হবে।"

গাড়ীর উপর কোচমানের পার্শ্বে এক জন কনষ্টেবল বসিয়া ছিল, প্রভুর আজ্ঞায় সে নামিয়া দাড়াইবামাত্র বিজন বলিলেন, "জোরজবরদস্তি কিছুই করতে হবে না, চল আমি সঙ্গে যাচ্ছি।"

* * * * *

সুজন রায় ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট গিয়া দুঃখ নিবেদন করিলেন। বিদ্রোহী দলের নেতা অতুল রায়ই যে সুজনের সর্ব্বনাশ-সংকল্পে তাঁহার ইংরাজভক্ত সাধু সজ্জন ছেলেটিকে গুপ্ত উত্তেজনা প্ররোচনায় দ্বারাই দলে টানিয়া লইয়াছেন,—নানারূপ বাগ্‌বিন্যাসে এই কথা তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিলেন। ভক্তের স্তুতি-মিনতি এবং অশ্রুধারায় ম্যাজিষ্ট্রেটের মন গলিয়া গেল। তিনি বলিলেন, "মা ভৈঃ, বৎস, মা ভৈঃ! তোমার ছেলে রাজসাক্ষী হ'ক—আর কোন ভয় নাই।"

পিতা বলিলেন, "তাই বল সাহেব, তুমি তাকে বুঝিয়ে বল। তার মেজাজটা কিছু দিন থেকে আমার প্রতি চ'টে রয়েছে, আমি কিছু বলব না, তাতে উল্টো উৎপত্তি হবে।"

যথাসময়ে পুলিস বিজনকে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে আনিয়া হাজির করিল। তখন তাহার রাগ অনেকটা পড়িয়া আসিয়াছে—চিন্তা করিবার শক্তিও ফিরিয়াছে। সে বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, মুক্তকণ্ঠ হইয়া সে ভাল করে নাই। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি রাজসাক্ষী হবে?"

"উত্তর হইল "না।"

"তুমি বিদ্রোহী?"

"না।"

ম্যাজিষ্ট্রেট বুঝাইয়া বলিলেন—"আগেই তুমি স্বীকার করেছ, এখন এরূপ অস্বীকারে ত কোন ফল নেই। যদি মুক্তকণ্ঠে সব কথা এখন প্রকাশ কর—তবেই আমি তোমাকে রক্ষা করতে পারি।"

বিজনের মন কিন্তু এ কথা মানিল না, সমস্ত সহকর্ম্মীদিগকে বলিদান দিয়া আত্মরক্ষা করিতে তাহার সর্ব্বান্তঃকরণ কুণ্ঠিত হইয়া উঠিল, সে মৌন হইয়া রহিল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আরও কিছুক্ষণ বুঝাইয়া অবশেষে তাহাকে বলিলেন, "আচ্ছা, দুই দিন তোমাকে সময় দিলাম, এ বিষয়ে চিন্তা কর। দু'দিনে নিশ্চয়ই তোমার বুদ্ধি সাফ হয়ে যাবে।"

তাহার পর গোপনে পুলিসসাহেবকে কি বলিলেন, বিজনকে তিনি হাজতে লইয়া গেলেন।

বেশী কিছু বলা বাহুল্য—দুই দিনে তাহার মনের বল একেবারে তাহাকে ত্যাগ করিল, শরীরও ভাঙ্গিয়া পড়িল। তৃতীয় দিনে সে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট দোষ স্বীকার করিল, তবুও যথাসাধ্য দলের লোককে বাঁচাইয়া কবুল করিল। ডাকাতীর কথা আগেই বলিয়া ফেলিয়াছিল, তবুও স্বদলকে পলায়নে অবসর দিবার সংকল্পে পুলিসদলকে দিব্য ঘুরপাক দিয়া জঙ্গলের রাস্তায় যখন আনিয়া ফেলিল, তাহার পূর্ব্বেই ধনপতির গাড়ী দুইখানা চলিয়া গিয়াছে। পুলিসসাহেব কিন্তু গাড়ী হইতে নামিয়াই রাস্তায় গাড়ী চলিবার শব্দ শুনিয়া সন্দিহান হইয়া ভাবিলেন—হয় ত বা ডাকাতরাই লুঠপাট করিয়া চলিয়া যাইতেছে। তিনি তাহাদের অনুগমন করিবার ইচ্ছায় বিজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শব্দ কোন্ দিক্ হইতে আসিতেছে?" বিজন অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া তাঁহাকে দিক্ জানাইয়া দিল। তিনি দারোগাকে দলবল সহ সেইখানে রাখিয়া বিজনের সহিত গাড়ীতে উঠিয়া সেই শব্দলক্ষ্যে গাড়ী চালাইয়া দিলেন। গাড়ীতে উঠিবার সময় বিজনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কোন্ পথ ধরিলে শীঘ্র গাড়ী ধরিতে পারিবেন?" বিজন গাড়ীর দিকে আসিতে আসিতে অঙ্গুলিনির্দ্দেশে তাঁহাকে পথ দেখাইয়া দিল—শরৎকুমার তাহাই দেখিয়া ছিলেন। বিজন কিন্তু সোজা পথ দেখাইয়া দেয় নাই—তাই রাস্তার মধ্যে পুলিসসাহেব ধনপতির গাড়ী ধরিতে পারেন নাই। অবশেষে ঘুরিয়া ফিরিয়া আদালতের কাছে খাজনা জমা দিবার স্থানে আসিয়া ধনপতির গাড়ী দুইখানা এবং সঙ্গের লোকজনকে দেখিতে পাইলেন—অনাদি ও বসন্তের প্রসাদে তাহারা নিরাপদেই এখানে আসিয়া পৌছিয়াছিল। তাহাদের প্রশ্ন করিয়া শুনিলেন—

পুলিসকৃপাতেই ডাকাতের হাত হইতে তাহারা রক্ষা পাইয়াছে।

পুলিসই তাহাদের রক্ষা করিয়াছিল—শুনিয়া সাহেব আশ্চর্য্য হইলেন—জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথাকার পুলিস? কোতোয়ালির—না থানার?"

এই দুই পুলিসের পার্থক্য ধনপতির লোকজনের মাথায় প্রবেশ করিল না,—দরোয়ান বলিল, "হাঁ হাঁ হুজুর—কোতোয়ালিরই থানা ঠিক—বড়া হুঁসিয়ার দারোগা—ও লোক!"

সরকার বলিল, "হুজুর ত পুলিসেরই সাহেব! তারাও নিশ্চয়ই আপনারই তাবেদার—বড় বাঁচান বাঁচিয়েছে—হুজুর!"

পুলিসসাহেব আর কিছু না বলিয়া গাড়ী ফিরাইয়া লইয়া বিজনের সহিত পুনরায় জঙ্গলে বিদ্রোহীর আড্ডা দেখিতে চলিলেন।

পরদিন পুলিসসাহেবের সন্দেহভঞ্জন হইল। ধনপতির ধন্যবাদপত্রে নিশ্চয়রূপে তিনি জানিলেন যে, সশরীরে উপস্থিত না থাকিয়াও তিনিই তাহাকে ধনে-প্রাণে রক্ষা করিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, দুই এক দিনের মধ্যে নানা খবরের কাগজে প্রসাদপুর পুলিসের গৌরবকাহিনী বড় বর্ণে রঞ্জিত হইয়া প্রচারিত হইল। ইহার ফলেই যে অচিরাৎ সাহেবের পদোন্নতি হইয়াছিল—সে বিষয়েও কাহারও সন্দেহ করিবার কারণ দেখি না।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

ডাকাতদলের সহিত পুলিসের মারামারি, পুলিস-"সাহেব" দেখিয়া যান নাই। তিনি তৎপূর্ব্বেই গাড়ীর শব্দ লক্ষ্য করিয়া বিজনের সহিত আনুমানিক ডাকাতদলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন; আর এ দিকে শিকল ছিঁড়িল—দারোগা সাহেবের ভাগ্যে। ডাকাতদল এই পথে আসিয়া পড়ায় তাঁহার সহিত যুদ্ধ বাধিল। ফলে কি হইল, পাঠক জানেন। ডাকাতরা তাঁহার দল-বলকে হারাইয়া দিয়া স্বচ্ছন্দে পলাইয়া গেল, মাঝে হইতে ধরা পড়িলেন শরৎকুমার। দারোগা অতঃপর প্রধানতঃ আহত কনষ্টেবলদিগের শুশ্রূষার জন্যই সদলে থানায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কি জানি, পুলিসকর্ত্তা যদি এইখানে ফিরিয়াই আসেন, তাঁহাকে সমস্ত বার্ত্তা জানাইবার জন্য দুই জন কনষ্টেবলকে মাত্র এখানে হাজির রাখিয়া হুকুম দিয়া গেলেন—৭টা বেলা পর্য্যন্ত পুলিসসাহেবের জন্য অপেক্ষা করিয়া তাহার পর তাহারা যেন থানায় ফিরিয়া যায়।

থানায় ফিরিয়া প্রথমেই তিনি আহতগণকে হাসপাতালে আনিয়া ফেলিয়া শরৎকুমারের ডাক্তারী বিদ্যাটা কাজে লাগাইয়া লইলেন। এমন দক্ষতার সহিত বন্দী ডাক্তার তাহাদিগের ক্ষতস্থানে অস্ত্র-সঞ্চালন পূর্ব্বক ছিটাগুলী বাহির করিয়া লইয়া বাঁধন-ছাদন ঠিক করিয়া দিলেন যে, তাঁহার অস্ত্রনৈপুণ্যে সকলেই প্রশংসামুগ্ধ হইয়া গেল। দারোগা মহাশয় সম্প্রতি প্রসাদপুরে বদলিপদে আসিয়াছেন; সুতরাং তিনি শরৎকুমারকে ইতিপূর্ব্বে দেখেন নাই; কিন্তু হাসপাতালের ডাক্তার তাঁহাকে চিনিতেন। হইলে কি হয়! বিদ্রোহিতা অপরাধে তিনি এখন অভিযুক্ত—বাস্ রে! তাঁহার সহিত পরিচয়ের কথা কি এখন মুখে আনিতে আছে! কিন্তু তিনি যাহা চাপা দিলেন—এক জন কম্পাউণ্ডার সে কথা প্রকাশ করিয়া বসিল।

ইহার পর কন্‌ফেসন পর্ব্ব। বন্দীর মুখ হইতে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য দারোগা বাহাদুর রীতিমত ছলকৌশলময় সাপুড়ে মন্ত্রে তাহাকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিলেন। মন্ত্র কিন্তু নিষ্ফল হইল, সাপ ভুলিল না, খেলিল না—সাপুড়ের বশ্যতা মানিল না। সর্ব্ব প্রশ্নের তাগিদে তাহার একমাত্র উত্তর—

"আমি নিরপরাধ; এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য যাহা, তাহা ম্যাজিষ্ট্রেটকেই বলিব—"

বন্দী ভাক্তার লোক, অধিকন্তু তাহার ধরণ-ধারণে, বাক্যে এমনতর একটা অভিজাত-শ্রেষ্ঠতা আত্মপ্রকাশ করিতেছিল যে, দারোগা মহাশয় কার্য্যোদ্ধার-সংকল্পেও তাহার প্রতি পীড়নপর হইতে সাহস না পাইয়া, অপরাহ্ণে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট তাঁহাকে লইয়া গেলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ মনরো তখন এ্যাসিষ্টেণ্ট মিঃ রো'র সহিত বাগানে বসিয়া চা-পান করিতেছিলেন। মিসেস্ মনরো এখন বিলাতে। বিদ্রোহ-সংক্রান্ত ঘটনার পূর্ব্বে স্বামীও তাই বিলাত যাইবার মানসে 'প্রিভিলেজ লিবে'র জন্য দরখাস্ত করেন। সম্প্রতি তাঁহার সে দরখাস্ত মঞ্জুর হইয়া আসিয়াছে এবং রো সাহেব তৎপদে বদলি নিযুক্ত হইয়াছেন। যখন ইচ্ছা এখন মনরো পাড়ী মারিতে পারেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বে বিদ্রোহসংক্রান্ত মোকদ্দমাটা শেষ করিয়া যাইবারই তাঁহার ইচ্ছা। তবে কি জানি, তাহা যদি না-ই পারেন, অন্ততঃ এ্যাসিষ্টাণ্টকে তাঁহার

মতানুসারে গড়িয়া পিটিয়া ত রাখা চাই। এই সংকল্পে তিনি তাঁহার শাসন-নীতির অনুবর্ত্তনে চলিবার জন্য মিঃ রোকে যাহা কিছু বলিতেছিলেন, সে সকলই আত্মগর্ব্বপূর্ণ। তিনি না থাকিলে এ রাজ্যের "এনার্কিষ্ট স্পিরিট" এমন সহজে এবং এত শীঘ্র অন্য কেহই দমন করিতে পারিত না; ঘোড়ের চালে রাজাকে তিনি এমন অষ্টপৃষ্ঠে বাঁধিয়া ফেলিয়াছেন যে, এখন আর তাহার নড়িবার সাধ্য কি? সম্ভবতঃ তিনি চলিয়া যাইবার পূর্ব্বেই এই বিদ্রোহের আমূল উচ্ছেদ সাধন করিয়া যাইতে পারিবেন; যদি না-ও পারেন, তিনি ইহার পথ এমন নিষ্কণ্টক করিয়া রাখিতেছেন যে, মিঃ রো সেই পথে চলিলেই অবাধ সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন! সঙ্গে সঙ্গে এই প্রসঙ্গ উপলক্ষে তাঁহার পিয়বন্ধু সুজন রায়ের রাজভক্তির ব্যাখ্যায় গদ্গদ চিত্ত হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট কহিলেন,—"ধন্যবাদ, শত শত ধন্যবাদ তাহাকে। বৃটিশ রাজের এমন এক জন একনিষ্ঠ মঙ্গলকামী মিত্র আমি আর দেখি নাই, তাহার যত্ন পরিশ্রমেই—বিশ্বাসঘাতক রাজার চক্রান্ত প্রকাশ পাইয়াছে—আমরা মহা বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি। প্রসাদপুরের গদীতে তাহাকে এখন বসাইতে পারিলেই তৎকৃত এই মহৎ উপকারের প্রকৃত প্রতিদান দেওয়া হয়। দেশে গিয়া আমি নিশ্চয়ই সে চেষ্টা করিব।"

সুজন যে রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা স্বরূপ পুত্রকেও ধরাইয়া দিয়াছে এবং সে যে এখন রাজসাক্ষী, ইহাও নূতন ম্যাজিষ্ট্রেটকে তিনি জানাইয়া দিলেন।

অতঃপর কম্পাউণ্ডের সীমানায় সদলবলে বন্দীসহ দারোগা সাহেবের সচল-মূর্ত্তি, মেঘের কোলে চাঁদবদনের মত ম্যাজিষ্ট্রেটের নয়নে প্রতিভাত হইল। বহুক্ষণ হইতে তিনি ইহার আগমন-প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। রাত্রিকালে যুদ্ধ-সংবাদ মোটামুটি যদিও প্রাতঃকালেই টেলিফোনে তিনি জানিয়াছেন, তথাপি বন্দীকে নজরবন্দী করিয়া তাহার মুখ হইতে বিদ্রোহ-সংক্রান্ত সমস্ত খবর আদায় করিয়া লইবার জন্য তিনি উদ্‌গ্রীব ছিলেন।

কনষ্টেবল সহ বন্দীকে দূরে রাখিয়া প্রথমে দারোগা মহাশয় নিজে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আসিয়া উভয় সরকারকে যথারীতি সেলাম ঠুকিয়া Good evening, Sirs বলিয়া দাঁড়াইলেন। ছোট সরকার তাঁহার সেলাম ফিরাইয়া দিয়া প্রত্যভিবাদন করিলেন, কিন্তু বড় সরকার বিনা সম্ভাষণে তাঁহাকে কহিলেন, "Shame Inspector Babu, shame! সশস্ত্র শিক্ষিত পুলিস তোমরা,—তোমাদের গোলাগুলী এ ডরে স্বচ্ছন্দে পালায় কি না, অস্ত্রমুখ বাচ্ছা করন—বেদমাশ দল।"

ইন্‌স্পেক্টার বাবু ফরাসী আদর্শে গঠিত তাঁহার চিবুক আলম্বিত ছাগশ্মশ্রুর অগ্রভাগ সুধীরে পাকাইতে পাকাইতে কহিলেন,—"না Sir, মোটেই অস্ত্রমুখ নয় তারা। আপনি সেখানে থাকলে তা বুঝতে পারতেন। আমাদের পক্ষে disadvantage ছিল সম্পূর্ণ। অন্ধকার রাতে, জঙ্গলের গোলোকধাঁধার মধ্য দিয়ে ভূতের মত কোথা থেকে কেমন ক'রে যে তারা আসছে যাচ্ছে—তা মোটেই বোঝা যাচ্ছিল না। তবুও যে এ রকম অবস্থার মধ্যে তাদের এক জনকেও আমরা বন্দী করতে পেরেছি, এতেও যদি আপনারা খুসী না হন ত দুর্ভাগ্য আমাদেরই।"

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তখন প্রফুল্লভাবে বলিয়া উঠিলেন,—"Bravo! three cheers for police regiment! বন্দী স্বীকার করেছে?"

"করে নি এখনো। আপনার কাছে এসে স্বীকার করবে বললে। লোকটা এক জন মাতব্বর ব্যক্তি—ডাক্তার,—দেখলে বুঝবেন,—পঞ্চাশ জন চুনোপুঁটির চেয়ে—এ রকম বড় কাতলার দর ঢের বেশী।"

"ডাক্তার?" এ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন—ছোট হুজুর।

দারোগা উত্তর করিলেন,—"আজ্ঞে হাঁ,—খুব বড় ডাক্তার—প্রসাদপুর-রাজার ডাক্তার। এক জন কনষ্টেবলের পায়ে—আর এক জনের পাঁজরার পাশে গুলী লেগেছিল; কি চমৎকার কাটাকুটি ক'রে যে জোড়তাড় লাগিয়া দিলেন,—দেখে আমরা ত অবাক্! যদি এরা বেঁচে যায় ত ডাক্তারের হাতের গুণেই বাঁচবে।"

"আপনি না বল্লেন প্রাসাদপুর-রাজার ডাক্তার ইনি? এঁর অস্ত্রবিদ্যার যশের কথা আমিও শুনেছি। প্রথমে এখানে যখন নূতন ম্যাজিষ্ট্রেট হয়ে আসি, তখন মিষ্টার ক্লাউডেনের পার্টিতে একবার এঁকে দেখেও ছিলুম।"

মিঃ রো এ কথা বলিয়া থামিলে পর ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন,—"আচ্ছা, তা হ'লে তোমাদের সে great manকে এখানে নিয়ে এস এইবার; দেখে কৃতার্থ হওয়া যাক্।"

ইন্‌স্পেক্টার একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন,—"এইখানে কি আনব? স্বীকারোক্তি নিতে হবে তার?"

ম্যাজিষ্ট্রেট একটু হাসিয়া বলিলেন,—"চল ঘরে যাচ্ছি। তবে স্বীকারোক্তির সময় ইনিও থাক্‌বেন। এঁকেই এখন থেকে তোমাদের ম্যাজিষ্ট্রেট ব'লে জেনো। পরশু মেল ডে—সে দিন আমাকে ছাড়তেই হবে। আশা করি—তার আগেই এ caseটা শেষ ক'রে যেতে পারবো।"

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

বন্দী আনীত হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি প্রসাদপুর রাজার ডাক্তার?"

উত্তর হইল,—"কিছুদিন থেকে সেখানে আছি বটে।"

প্রশ্ন। রাজা ত এখন কল্‌কাতায়—এ সময় তুমি যে প্রসাদপুরে?"

উত্তর। হাসপাতালের একটা case দেখ্‌তে এসেছি।"

প্রশ্ন। শীতের রাত্রিতে, মেঘ বৃষ্টির মধ্যে, সুখের আস্তানা ছেড়ে জঙ্গলে এসেছিলে কি অভিপ্রায়ে?"

উত্তর। শুনেছিলুম জঙ্গলে মাঝে মাঝে ভূত দেখা যায়—তাই—"

কথা শেষ করিতে না দিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট ক্রোধপূর্ণ শ্লেষবাক্যে কহিলেন,—"ওঃ, খুব সাহসী তুমি! কে সঙ্গে ছিল তোমার?"

উত্তর। কেহই না।

প্রশ্ন। কেহই না?

উত্তর। না।

ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশে, দারোগা তখন একটা পিস্তল বন্দীকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ পিস্তল তোমার পকেটে ছিল কি না?

উত্তর। ছিল।

ম্যজিষ্ট্রেট জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ রাজার নামাঙ্কিত পিস্তল—তুমি পেলে কি ক'রে?

উত্তর। রাজা দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন। রাজা দিয়েছিলেন? কেন?

উত্তর। আত্মরক্ষার জন্য।

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন,—"যে ভাল মানুষ, আত্মরক্ষার জন্ত তার পিস্তলের কি দরকার? বল, বিদ্রোহের জন্ত এ পিস্তল তোমার মিলেছিল?"

ডাক্তার বলিলেন,—"আপনার ঘরে কি পিস্তল নাই? আপনি কি বিদ্রোহী?"

ম্যাজিষ্ট্রেট এই উত্তরে অত্যন্ত রাগিয়া গেলেন, চড়া সুরে কহিলেন—"আমি ম্যাজিষ্ট্রেট আমি ইংরাজ! নিগারের সহিত আমার তুলনা ক'রে জান তুমি দণ্ডনীয় হচ্ছ?"

এই সময় পুলিস-কর্ত্তা মিঃ বেনওয়েল তাঁহার দলবলকে দ্বারদেশে রাখিয়া এখানে আসিয়া হাজির হইলেন—এবং বিজন রায়ের সৌজন্যে জঙ্গলের মন্দির ভেদ করিয়া যে সকল হাতিয়ার লাভ করিয়াছিলেন—যথারীতি অভিবাদন এবং অস্ত্রপ্রাপ্তির বিবরণ সংবাদ সহ সেগুলি ম্যাজিষ্ট্রেটের টেবিলে ধরিয়া দিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট একে একে অস্ত্রগুলা হাতে লইয়া দেখিলেন, তন্মধ্যে দুইখানা প্রসাদপুর-নামাঙ্কিত তরবারি। এই দুইখানা মাত্র আড্ডায় ফেলিয়া রাখিয়া প্রসাদপুররাজের অন্যান্য হাতিয়ার ডাকাতগণ ব্যবহারের জন্য পূর্ব্বেই লইয়া গিয়াছিল এবং শরৎকুমারপ্রমুখ দল যে কি কারণে এগুলি হস্তগত করিবার অবসর পান্ নাই, তাহা পাঠক জানেন। পুলিসের কর্ত্তা ম্যাজিষ্ট্রেটের ইঙ্গিতে সেই তরবারির একখানি বন্দীর হাতে দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ অস্ত্র কি চেন তুমি? এ কি প্রসাদপুররাজের?" উত্তর হইল,—"চিনি না; অর্থাৎ পূর্ব্বে এ তরবারি আমি দেখি নাই। কিন্তু ইহা যখন রাজার নামাঙ্কিত, তখন এ অস্ত্র তাঁর।"

মিঃ বেন্‌ওয়েল বলিল, "এ অস্ত্র বিদ্রোহীদের আড্ডায় পাওয়া গেছে; তিনি কি তা হ'লে তাদের এগুলা উপহার দিয়েছিলেন?"

শরৎকুমার দৃঢ়স্বরে উত্তর করিলেন,—"নিশ্চয়ই না। অনেক অস্ত্র তাঁর চুরী গিয়েছে।" ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিসের কর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এই চুরীর সংবাদ কি থানায় লিখিয়েছিলেন তিনি?"

বেন্‌ওয়েল বলিল,—"না তাঁর অস্ত্র চুরীর খবর আমরা কিছুই জানিনে। বিজন রায় এখানে উপস্থিত আছেন; তাঁর কাছ থেকে এ সম্বন্ধে সঠিক খবর পাওয়া যেতে পারে।"

বিজন আসিলে ম্যাজিষ্ট্রেট শরৎকুমারকে নির্দ্দেশ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ইঁহাকে চেন তুমি?"

ডাক্তারের প্রতি বিদ্বেষভাব বিজনের মনে জন্মগত সংস্কার তুল্য এমনই বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, তাঁহাকে দেখিবামাত্র তাহার সর্ব্বশরীরে যেন দাবানল জ্বলিয়া উঠিল এবং তাহার হৃদয়ের মত

কিছু অবশিষ্ট মঙ্গল ভাব, সবটুকুই সে আগুনে জ্বলিয়া পুড়িয়া তৎক্ষণাৎ খাক হইয়া গেল।

বিষময় কটাক্ষে ডাক্তারের দিকে একবার চাহিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের কথার উত্তরে বিজন কহিল, —"চিনি। প্রসাদপুররাজার ডাক্তার।"

পুলিস তখন রাজনামাঙ্কিত তরবারি তাহার হাতে দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, —"জান কি এ তরবারি কার?"

"প্রসাদপুররাজের।"

"বিদ্রোহীদের আস্তানায় কি ক'রে এ তরবারি এল—তা কি বল্‌তে পার তুমি?"

অসঙ্কোচে অম্লানবদনে বিজন রায় উত্তর করিল, —"বলতে পারি। বিদ্রোহীরা এ অস্ত্র রাজার কাছে দানস্বরূপ পেয়েছিল।"

শরৎকুমার আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, উত্তেজিত ভাবে বলিয়া উঠিলেন, "মিথ্যা কথা। একেবারেই মিথ্যা, রাজার এক জন বিদ্রোহিদলভুক্ত কর্ম্মচারী এ সব অস্ত্র চুরী ক'রে নিয়েছিল।"

পুলিস জিজ্ঞাসা করিল, "সে কোথায়?"

শরৎকুমার বলিলেন, "নরকে। সে জীবিত নাই।"

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন, "না, এ খুব বুদ্ধিমানের মতই সাফাই বটে। তুমি এ সম্বন্ধে কি জান বল।" বিজনের দিকে চাহিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট এ কথা বলিলেন।

বিজন বলিল,—"আমি জানি, রাজাই বিদ্রোহিদলের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর দান না পেলে সমিতি চল্‌তেই পারত না,—তাঁকেই সাক্ষী মান্‌তে পারেন।"

শরৎকুমার ইহার উত্তরে কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে নিবারণ করিয়া কহিলেন,—"বস্‌, আর কোন কথা না;—আর কিছু শুনতে চাইনে আমি। একে 'সেলে' লইয়া যাও, দারোগা বাবু—আর বেন্‌ওয়েল, বিজনকেও এখানে আর দরকার নেই। বিজন বাড়ী যেতে পারে। কনষ্টেবলদের এই হুকুম দিয়ে তুমি একবার এখানে এস।" বিজনকে লইয়া পুলিসের কর্ত্তা চলিয়া গেল, আর শরৎবাবুকে লইয়া দারোগাবাবু চলিয়া যাইবার আগে ম্যাজিষ্ট্রেটকে বলিলেন, "যো হুকুম! কিন্তু কনষ্টেবল দু'জনকে বন্দী ডাক্তার চিকিৎসা করবেন ত? নইলে তারা রক্ষা পাবে কি না সন্দেহ।"

ম্যাজিষ্ট্রেট বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "যদি বন্দীকে না পাওয়া যেত?"

"খুব সম্ভবতঃ ম'রতো তারা!"

"তাই মরুক তবে, জাহান্নমে যাক্‌।"

নেটিভ নিগার লোকের প্রতি তাঁহার এইরূপ আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য করিয়া লইয়া দারোগা যখন শরৎকুমারের সহিত দ্বার পার হইয়া গেল, তখন ছোট হুজুরের অনুরোধে আবার তাঁহার ডাক পড়িল।

দারোগা ফিরিয়া আসিলে ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে বলিলেন,—"আচ্ছা, বন্দী-ডাক্তার কনষ্টেবলদের চিকিৎসা করুক,—কিন্তু বন্দিবেশেই যেন ওকে হাঁসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং কার্য্যান্তে যেন 'সেলে' পাঠান হয়।"

যো হুকুম বলিয়া দারোগা চলিয়া গেল। ইত্যবসরে পুলিসের কর্ত্তা ফিরিয়া আসিলে, ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন,—"শোন, বেন্‌ওয়েল, বিজন রায় রাজসাক্ষী হওয়াতেই এমন সহজে বিদ্রোহ দমন হোল; এই কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ বে-কসুর ক্ষমা—আমাদের কাছ থেকে ওর প্রাপ্য। এখন থেকে তুমি ওকে free man ব'লেই জেনো। আর এর পর তোমাদের দপ্তরেও যেন বিজনের বিদ্রোহী নাম না থাকে!"

এই হুকুম দিবার জন্যই ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিস-কর্ত্তাকে হাজির হইতে বলিয়াছিলেন। তিনি চলিয়া যাইবার পর মিঃ রো একটু হাসিয়া বলিলেন,—"আমারও একটি আবেদন আছে—Mr. Monrow."

ম্যাজিষ্ট্রেটও হাসিয়া বলিলেন, "Very well, I am all attention, Sir."

ছোট হুজুর বলিলেন,—"জানেন ত আপনি, ঘোড়া থেকে প'ড়ে গিয়ে আমার স্ত্রীর পা ভেঙ্গে গেছে।"

"Yes, Yes, সে জন্য আমি বড়ই দুঃখিত—ডাক্তার সি দেখছেন ত?"

"হাঁ, কলকাতা থেকে এসে operation ক'রে গেছেন তিনিই। কিন্তু তিনি ত সেখানকার হাঁসপাতালের কায-কর্ম্ম ছেড়ে বেশী দিন এখানে থাকতে পারেন না, এখানকার হাঁসপাতালেরই এক জন ডাক্তারকে এ কার্য্যের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়েছে। ডাক্তার সি কলকাতা থেকে হপ্তায় দু'-এক বার এসে পা দেখে—যা করতে হবে, একেই সব ব'লে ক'য়ে যান।"

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন,—"Good Gods! এখানকার হাঁসপাতালের ডাক্তারের হাতে অস্ত্র-চিকিৎসার রোগী?"

মিঃ রো বলিলেন,—"এখন দেখছি সেটা অনুচিত হয়েছে। গত বারে ডাক্তার সি এসে অসন্তোষ প্রকাশ ক'রে ব'লে গেছেন যে, ওর অস্ত্রচিকিৎসার জ্ঞান কিছুমাত্র নেই—ওর হাতে এ case রাখলে শীঘ্র ত তিনি আরাম হবেনই না এবং আরাম হবার পরও ভবিষ্যতে খোঁড়া হ'য়ে থাকতে পারেন। অতএব তিনি চান এমন এক জন সুযোগ্য অ্যাসিষ্টাণ্ট ডাক্তার, তাঁর এক দিন আসতে বিলম্ব হ'লেও যার উপর তিনি সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারেন।"

"তিনি কারো নাম বল্লেন ?"

"প্রসাদপুররাজকে এ অঞ্চলে চিকিৎসা করতে এসে, তিনি সে সময়ে যাঁকে assistant পেয়েছিলেন, তাঁর উপরই ডাক্তারের বেশী ঝোঁক। তাঁকে আনাবার জন্য তিনি রাজাকে একখানা চিঠিও দিয়েছিলেন ; সে চিঠির উত্তরে রাজা লিখেছেন যে, ডাক্তার শরৎকুমার রায় এখন প্রসাদপুররাজবাড়ীতেই আছেন। তাঁকে বল্লেই তিনি খুসী হয়েই এ 'কেস' নেবেন, আর রাজাও এজন্য তাঁকে লিখেছেন। রাজার চিঠিখানি প'ড়ে আমি খুবই impressed এবং thankful হয়েছি।"

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিয়া উঠিলেন,—"Thankful! for what? Nonsense! নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই ওরা আমাদের প্রসন্ন রাখতে চায়। এতে আমরা thankful হ'তে যাব কেন ? সে যা হ'ক, এই বদমায়েস্ অ্যানার্কিষ্টটাই বুঝি ডাক্তার 'সি'র সেই favourite ?"

"ঠিক তাই। এঁর উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস। তাই বন্দীকে দেখে আমি দৈবানুগ্রহ অনুভব করছি। কাল ডাক্তার আসবেন ; আমি কি সে সময় এঁকেও consultationএর জন্য পেতে পারি ?"

এ প্রস্তাবে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব মনে মনে বিরক্ত বোধ করিলেন ; কিন্তু তবুও ত এ অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারেন না,—অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতাও তাঁহার নাই। প্রকৃত পক্ষে ম্যাজিষ্ট্রেট এখন হইতে মিঃ রোই—ভদ্রতার খাতিরে তিনি তাঁহার অনুমতি চাহিতেছেন মাত্র। মনরো নরম ভাবেই উত্তরে কহিলেন,—"বেশ ত! এর ডাক্তারী যদি তোমার কাযে লাগে সে ত ভালই ; আমিও তাতে খুব সুখীই হব। তবে সুযোগ্য ডাক্তার হ'লেও লোকটা যে 'Dengerous criminal'—তার সঙ্গে ব্যবহার কালে এ কথাটা ভুলো না।"

সেই রাত্রিতেই ম্যাজিষ্ট্রেট—শরৎকুমারের জবানবন্দী হইতে রাশি রাশি প্রমাণ প্রয়োগপূর্ব্বক তাঁহাকে বিদ্রোহী সাব্যস্ত করিয়া দায়রায় সোপর্দ্দ করিলেন এবং জজের বিচার-নিষ্পত্তি পর্য্যন্ত তাঁহাকে 'সেল'বন্দী করিয়া রাখিতে হুকুম দিলেন।

বিদ্রোহিদলের নেতা রাজাকে এই অভিযোগে গ্রেপ্তার করিয়া আনিবার জন্যও পরোয়ানা বাহির হইল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

একে ত দুই ম্যাজিষ্ট্রেটে প্রকৃতিগত মিল বড় একটা ছিল না ; দ্বিতীয়তঃ, এ দেশে আসিয়া স্বার্থবুদ্ধিপূর্ণ আবহাওয়ার গুণে ভিন্নপ্রকৃতির ইংরাজ ক্রমশঃ যেরূপ বেমালুম এক হইয়া পড়েন, এরূপ রূপান্তরিত হইবার সুযোগও মিঃ রো এ পর্য্যন্ত পান নাই। ইনি নবাগত I. C. S. অল্পদিনমাত্র ভারতবর্ষের মাটীতে পা দিয়াছেন এবং মিঃ কাউডেনের অধীনে প্রথম কার্য্য আরম্ভ করায়—মহত্বের আদর্শেরই ছাপ ইঁহার মনের উপর আসিয়া পড়িয়াছে।

অতএব মিঃ রো ভারতবাসীকে এখনও মিথ্যাবাদী, অসভ্য, বর্ব্বর বলিয়া ঘৃণা করেন না ; বাঙ্গালা যে কেহ কার্য্যোপলক্ষে তাঁহার সংস্রবে আইসে,—তাঁহাকে মনুষ্যোচিত ব্যবহারদানেই সম্মানিত করেন, বিচার সম্বন্ধেও বৃটিশ প্রেষ্টিজ ইনি রক্ষা করিয়াছেন, ইনি নিরপেক্ষ বিচারক। পুলিস ইহাকে ভয় করে—তাহার সাজান মামলা মোকদ্দমা ইঁহার নিকট আসিলে প্রায়ই ফাঁসিয়া যায়। সর্ব্বোপরি ম্যাজিষ্ট্রেটের সুনাম—ইঁহার ভৃত্যবর্গ প্রভুর ভয়ে গরীবদের নিকট হইতে অযথা ভেট আদায় করিতে অর্থাৎ ঘুষ লইতে সাহস পায় না।

আসল কথা এই, মিঃ রো যদি জানিতে পারিতেন, তাঁহার কোন ভৃত্য ঘুষ লইয়াছে, তবে সে ক্ষমা পাইত না। বাহুল্যভয়ে একটিমাত্র দৃষ্টান্ত নিয়ে দিলাম।

সে দিন মিসেস্ রো তাঁহার সঙ্গে ছিলেন না—মিঃ রো প্রাতঃকালে একাকী অশ্বারোহণে নিকটস্থ একটি গ্রাম্য স্কুল পরিদর্শনে গিয়াছিলেন ; ফিরিবার সময় দেখিলেন—এক জন স্ত্রীলোক মাঠের ধারের অশ্বথ বৃক্ষমূলে বসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চীৎকার করিয়া কি বলিতেছে। সে ম্যাজিষ্ট্রেট 'সাহেব'কেই অভিশাপ প্রদান করিতেছিল। তাহার পাশে দুই চারিখানা আখের গোছা পড়িয়া ছিল এবং নিকটে এক জন মুসলমান চাষী দাঁড়াইয়া তাহাকে প্রবোধ

দান করিতেছিল। সেখানে আসিয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাঙ্গালায় তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কাঁদে কেন স্ত্রীলোকটি, কি হয়েছে ওর?"

চাষা বলিল, "এজ্ঞে, ম্যাজিষ্টরের চাকর এসে—এ মাইয়ের আখ দু'চারখান লই গেছে—"

স্ত্রীলোক গর্জ্জন করিয়া উঠিল—"দু'চারখান? মুই ত দু'চারখান আপনা হ'তেই তানারে দিছিনু। বেটা জোর করি—আদেকের বেশী লইল, ঐ দেখ ক'খানই বা আছে মোর? আজ ছেলেগুলো আর খাইতে পাবে না, আখ বেচেই চাল মিলত—হাঃ রে—কপাল?" বলিয়া সে শিরে করাঘাত করিতে লাগিল।

মিঃ রো বলিলেন "আমিই সেই ম্যাজিষ্টর,—চল আমার সঙ্গে, কে আখ কেড়ে নিয়েছে দেখিয়ে দাও,—তোমার আখের দাম তার কাছ থেকে তোমাকে দিইয়ে দেব।"

"আপুনি ম্যাজিষ্টর" ! সবিস্ময়ে এই কথা বলিয়া অবনতমস্তকে তাঁহাকে সেলাম করিয়া চাষা তাহার পর স্ত্রীলোকটিকে বলিল—"চ রে—আমিনা চল, তোর ভাগ্য ফিরলো। মাঠের ফসল দু'চারখানা সরকারকেও দিতে হয় বই কি—অ্যাতে এতুই কান্না-কাটি কেন কারস্?"

আমিনা কিন্তু কষ্টে দুঃখে নিতান্ত জ্বলিয়া আছে, সে ম্যাজিষ্ট্রেটের বাক্যে আশ্বস্ত হইল না, তাঁহাকে সেলামও করিল না,—তাহার ভাল কথার উত্তরে ক্রুদ্ধস্বরেই বলিল—"না গো সাহেব, মুই যা'ব না—এই কখানা আছে,—নাও গো নাও,—মুই ঘরকে চল্লু।"

বলিয়া সে উঠিয়া দাড়াইল। চাষা বলিল—"আরে হতভাগ্যি,—সরকার তোর ভাল করবে।"

স্ত্রীলোক রাগিয়া বলিল—"ভাল করবে! মুইদের ভাল করে না—কেউ! মোর খসম যহন বাচি ছিল—তহন ম্যাজিষ্টরকে দুঃখের কথা কইতে গিয়ে কি মারটাই খাইছিল সে! মরি রে মরি দম ফাটি উঠে। মুই যাব না, ওদের দরবারে, নসীবে যা লেখছেন আল্লা তাই হ'বে।" স্ত্রীলোকটি চলিয়া যাইতে উদ্যত দেখিয়া মিঃ রো নিকটে আসিয়া তাহার হাতে দশ টাকার একখানা নোট দিলেন। সে অবাক্ হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তিনি অশ্ব ছুটাইয়া গৃহাভিমুখে গমন করিলেন; পরে তদন্তের ফলে যে সিপাহীর দোষ প্রমাণিত হইল—তাহাকে পদচ্যুত করিলেন।

পরদিন কলিকাতার ডাক্তার আসিলে ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে শরৎকুমারের কথা জানাইলেন, রাজার সহিত তিনি বিদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত শুনিয়া ডাক্তার 'সাহেব' সংশয়চিত্ত হইয়া সবিস্ময়ে কহিলেন—"আমি রাজাকে যতদূর জানি—তাহাতে এ কথা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। সম্ভবতঃ রাজাকে বিপদে ফেলিবার চেষ্টায় ইহাও সুজন রায়ের একটা চাল।"

অতুলেশ্বরকে পূর্ব্বে চিকিৎসা করিতে আসিয়া সুজন রায়ের বিদ্বেষপ্রসূত অনেক ঘটনার কথাই ডাক্তার শুনিয়াছিলেন, এই প্রসঙ্গে সে গল্পও দুই একটা তিনি করিলেন। মিঃ রো শরৎকুমারকে সুনয়নে দেখিয়াছিলেন, তাঁহাকে দোষী মনে করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইতেছিল না, ডাক্তারের মুখে তাঁহার ইচ্ছার পোষকবাক্য তিনি বেশ সন্তুষ্ট হইয়াই শুনিলেন।

যথাসময়ে দুই জন কন্‌ষ্টেবল শরৎকুমারকে মিঃ রোর বাঙ্গলোয় আনিয়া হাজির করিল। রোগীকে দেখিয়া আসিয়া দুই ডাক্তারে—consultation করিতে বসিলেন। শরৎকুমার বলিলেন, "একখানা অতি ক্ষুদ্র ভাঙ্গা হাড়ের কুচি এখনো ভিতরে আছে বলিয়া মনে হয় সেটুকু বাহির করিয়া দিলেই রোগী আরাম হইয়া যাইবেন।"

শরৎকুমারের কথায় ডাক্তার আর একবার রোগীর পা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন এবং তাঁহার মীমাংসাই ঠিক বুঝিয়া একটু অপ্রতিভভাবে কহিলেন—"অন্য ডাক্তারের উপর বিশ্বাস ক'রে নিশ্চিন্ত থাকাটাই দেখছি আমার ভুল হয়েছে। আর একবার তা হ'লে অপারেসনই না করলে চলবে না, দেখছি।"

শরৎকুমার বলিলেন "সামান্য operation, তাতে ভয়-ভাবনার কোনও কারণ নেই।"

সেই দিনই তৎক্ষণাৎ তাঁহারা মিলিয়া রোগীর ক্ষতস্থান হইতে যথানিয়মে ভাঙ্গা হাড়ের কুচি বাহির করিয়া দিলেন। operation বেশ নির্ব্বিঘ্নে শেষ হইল। ডাক্তার তখন রোগীর তত্ত্বাবধান-ভার শরৎকুমারের উপর দিয়া অপরাহ্নে বিদায় গ্রহণ করিলেন। যাইবার সময় ডাক্তার মিঃ রোকে বলিয়া গেলেন—"এবার রোগী শীঘ্রই আরাম হ'য়ে উঠবেন, সম্ভবতঃ আমাকেও আর আসতে হবে না। তবে যদি দরকার হয়—শরৎকুমার জানালেই আমি আস্‌ব।" প্রকৃতই অন্য কোন ডাক্তারকে আর ডাকিতে হইল না। শরৎকুমারের চিকিৎসায় রোগী এক সপ্তাহের মধ্যেই অল্প-সল্প নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইতে লাগিলেন এবং পরে অল্পদিনের মধ্যেই ক্ষতস্থানের আঘাত-বেদনা এমন বেমালুমভাবে মিলাইয়া

গেল যে, পা ভাঙ্গিয়া এত দিন যে মিসেস্ রো অসহ্য যন্ত্রণাভোগ করিয়াছিলেন—তাহা তাঁহার স্মৃতির বিষয় মাত্রই হইয়া রহিল।

বলা বাহুল্য, মিঃ মনরোর সতর্কতা সত্ত্বেও, এই চিকিৎসাসূত্রে ম্যাজিষ্ট্রেট-দম্পতির সহিত শরৎকুমারের গভীর বন্ধুত্ব জন্মিল। বন্দীর সাজ-সজ্জা ফুঁড়িয়া—ভিতরকার আসল মানুষটি তাঁহাদের চোখে ধরা পড়িল। শরৎকুমার যে নির্দোষ, তাহাতেও তাঁহাদের সংশয়মাত্র রহিল না।

ইংরাজের আর যত দোষই থাকুক, সাধারণতঃ ইংরাজ গুণের বশ। একান্তভাবে স্বার্থান্ধ না হইলে শত্রুর মনুষ্যত্বকেও শ্রদ্ধা না করিয়া ইংরাজ থাকিতে পারে না। দুঃখের বিষয় এই, অবস্থাচক্রে এ দেশের মনুষ্যত্বহীন মনুষ্যই সচরাচর তাঁহাদের দৃষ্টিতে পড়ে।

যে দিন শরৎকুমার ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানাইলেন যে, তাঁহার আর রোগীকে দেখিতে আসিবার দরকার নাই, সেই দিন 'সাহেব' মেম দুই জনেই দুঃখ অনুভব করিলেন। বিদায়দানের সময় মিঃ রো তাঁহাকে বলিলেন, "আমি কি আপনার কোন উপকার করতে পারি?"

শরৎকুমার একটু ভাবিয়া বলিলেন—"নিশ্চয়ই পারেন—কিন্তু জানি না, সে প্রার্থনা করা আমার পক্ষে ঠিক হবে কি না?"

মিসেস্ রো অশ্রুপূর্ণনেত্রে বলিলেন, "বড়ই দুঃখ যে, আমার স্বামী আপনাকে ছেড়ে দিতে পারেন না। কেন না, আপনি যখন অভিযুক্ত, তখন বিচার পর্য্যন্ত আপনাকে জেলে থাকতেই হবে। তবে আমার ধ্রুব বিশ্বাস—বিচারে আপনি নিশ্চয়ই দোষমুক্ত হবেন।"

শরৎকুমার বলিলেন—"না, এরূপ অসম্ভব প্রার্থনার ইচ্ছা আমার মনে আসে নাই। যদি ম্যাজিষ্ট্রেট 'সাহেব' সম্মতি দেন—তা হ'লে রাজাবাহাদুর যে কিরূপ বিপদগ্রস্ত, টেলিগ্রাম ক'রে ক্লাউডেন 'সাহেব'কে আমি সে কথা জানাই। তিনি এখন পার্লামেণ্ট সভার এক জন আইরিস মেম্বর, তাঁর উদ্যোগে রাজাবাহাদুর নিষ্কৃতি পেতে পারেন।"

ইতিপূর্ব্বে পাঠককে জানান হয় নাই যে, গভর্ণমেণ্টের সহিত বনিবনাও না হওয়ায় মিঃ ক্লাউডেন কর্ম্মত্যাগপূর্ব্বক দেশে গিয়া পার্লামেণ্টের এক জন সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

মিসেস্ রো আহ্লাদিতচিত্তে কহিলেন,—"আচ্ছা, আমি নিজেই এ খবর তাঁকে টেলিগ্রামে জানাব এবং চিঠিতেও লিখব। তিনি আমার cousin হন। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

শরৎকুমার ইহার পর শান্ত সমাহিতচিত্তে জেলে ফিরিয়া গেলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার জন্য আর কিছু করিতে না পারুন—নির্জ্জন কারাবাস হইতে সাধারণ জেলখানায় তাঁহাকে সরাইয়া দিলেন এবং অন্য কঠোর পরিশ্রমের পরিবর্ত্তে হাসপাতালের কার্য্যভার তাঁহাকে দেওয়া হইল।

রাজা যখন বন্দিরূপে প্রসাদপুরে আনীত হইলেন, তখন ম্যাজিষ্ট্রেটের কৃপায় তাঁহাকেও জেলে আবদ্ধ থাকিতে হইল না, বিচার শেষ পর্য্যন্ত প্রসাদপুর-রাজবাড়ীতেই তিনি interned হইয়া রহিলেন।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

রাজা অতুলেশ্বর বিদ্রোহিতা অপরাধে গ্রেপ্তার হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী সন্ধ্যাকালে হ্রদের ধারে কোমল আস্তরণ বিস্তৃত বাঁধান চাতালের উপর একাকী বসিয়াছিলেন। হাসি ও তাহার মা দিদিমার সহিত রাজকন্যা বায়স্কোপ দেখিতে গিয়াছেন, শ্যামাচরণও তাঁহাদের সঙ্গ গ্রহণ করিয়াছেন।

চন্দ্রহীন রাত্রি, তারকা-ভূষিত আকাশচ্ছটায় কাননহ্রদের স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্মণ্ডিত রূপ মূর্ত্তিমতী একখানি মায়ারাগিণীর মত রাজার নয়ন-মন মুগ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। সুরলহরীর সেই চিত্রার্পিত দৃশ্যের দিকে চাহিয়া মনের কোণে হারান গানের দুইটা ছত্র তাঁহার মনে পড়িয়া গেল,—

মুরলী কি বীণা—
আহা মরি কি বাজিল তা' ত জানি না!

সহসা মৃদুমন্দ শীত বাতাসে তালপত্রাবলী হইতে মর্ম্মর গীতি উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে যেন এক সুরসিক অদৃশ্য জলদেবতা, বাঁধা নৌকাখানাকে নৃত্যভঙ্গে দুলাইয়া দিয়া, পুষ্পগন্ধ উড়াইয়া লইয়া রাজার মুখে সকৌতুকে একটা ঝাপটা মারিয়া গেল।

একি! হাসি আসিল না কি? ঠিক তাহারই অঙ্গবসনের সুবাস এ যে! রাজা আশে পাশে পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন,—কেহ কোথাও নাই, তিনি একাকী। একটা মৃদু দীর্ঘ নিঃশ্বাস উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল—হাসির সে দিনের সেই শেষ কথা—"আপনি যে রাজা।"

সত্যই ত! ঠিকই ত! এই সামান্য একটি কথায় তাহার মনের সব কথাই কি সুন্দররূপে সে প্রকাশ করিয়া বলিয়াছে। সে যে নিতান্ত বালিকা; তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা কন্যা না হইয়া পুত্র হইলে হাসি যে তাঁহার পুত্রবধূ হইতে পারিত। স্বল্পবয়স্কা এই বালিকার পক্ষে তিনি রাজা ছাড়া আর কি হইতে পারেন—কিছুই না—কেহই না।

তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, তাঁহার অন্তরাত্মা বলিয়া উঠিল; "এ কি অসংযম! চিরদিন যে কায নিন্দনীয় ভাবিয়াছ, আজ কি ভুলে নিজেই সেই ভুল করিতে প্রবৃত্ত—ছি ছি!"

রাজা চক্ষু খুলিয়া নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; জ্যোতির্ম্মগুলীও যেন এক-বাক্যে বলিয়া উঠিল—"হইতেই পারে না, ইহা হই-তেই পারে না—তোমার মধ্যে যতক্ষণ এতটুকুও মনুষ্যত্ব আছে,—ততক্ষণ ইহা হইতেই পারে না।"

রাজা এইবার একটু হাসিলেন—হাসিয়া আপন মনে বলিয়া উঠিলেন,—"ভিখারীর শূন্য ঝোলা তবে তোলাই থাক। সে দিন এ গানটি যে গেয়েছিল, সে ঠিকই ইঙ্গিত করেছিল। ভৃত্য তাঁহার পাশে সেতারটি রাখিয়া গিয়াছিল—তিনি বাজাইয়া গান ধরিলেন; বিস্মৃতপ্রায় গানটির অনেকগুলি কলি হঠাৎ তাঁহার মনে আসিয়া পড়িল

মুরলী কি বীণা!
আহা মরি কি বাজিল তা' ত জানি না!
সুধাঝরা সুরে সুরে, মনোপ্রাণ গেল পুরে?
যখন থামিল তান জাগিল চেতনা।
কে পথিক এসেছিল কোন্ পথ দিয়ে?
দূরে বা দাঁড়ায়ে কাছে গেল বাজাইয়ে?
কোন ত সন্ধান তার খুঁজে না মিলিল আর—
রেখে ত গেল না যদি একটুকু চিনা!

সপ্তর্ষি এক পার্শ্ব হইতে ঘুরিয়া অন্য পার্শ্বে গেল, ওরায়েন মাথার উপর চড়িল, সন্ধ্যা-তারা ঢলিয়া পড়িল, রাজা একমনে গাহিতে লাগিলেন

জ্যোতির্ম্ময়ী কিছুক্ষণ হইতে পিঠের দিকে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। গানের শেষ কলি হইতে রাজা যখন প্রথম কলিতে ফিরিয়া আসিয়া শম্ রক্ষা করিলেন—তখন রাণীও তাঁহার পিঠে হাত রাখিল। রাজা সচকিতে ফিরিয়া চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন—"এই যে রাণি? আয়, বোস্, কখন ফির্‌লি? কেমন দেখলি?"

"এইমাত্র ফিরেছি? বেশ দেখলুম, বাবা! তুমি ত গেলে না! রাত হয়ে গেছে—এখন খেতে চল—বাবুয়া!" বাবুয়া রাণীর আদুরে ডাক।

সেতারটা পাশে রাখিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করি-লেন, "হাসি কি এসেছেন?"

রাণী একটু মুচকি হাসিয়া বলিল,—"না, তাঁরা সবাই বাড়ী গেলেন। আমি আর হাসিকে আন্-বার কথা বল্‌তে পার্‌লুম না, আন্‌লেই ভাল হোত—না?"

রাজা কচি মেয়েটির মত তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া তাহার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া বলিলেন,—"আনিস্ নি ভালই হয়েছে, রাত হয়ে গেছে।"

জ্যোতির্ম্ময়ী পিতার চোখের উপর তাহার হাসি-মাখা চোখের ঔজ্জ্বল্য ঢালিয়া বলিল,—"বাবা! একটা কথা বল্‌ব?"

রাজা আন্দাজে বুঝিলেন—কি কথা; একটু হাসিয়া বলিলেন, "বল্‌তে পারিস্।"

"ঠাকুরমাকে কবে আস্‌তে বল্‌ব, বাবা? হাসির মা এই ফাল্গুনে দিন ফেলেছেন।"

রাজা কন্যার গালে একটি মৃদু আঘাত করিয়া বলিলেন,—"আরে পাগলি,—তোরা তোদের নিজের মর্য্যাদা ভুলে যাস্, কিন্তু আমরা যে ভুলতে পারিনে। হাসির সঙ্গে আমার বিবাহ অসম্ভব, সে আমার কন্যাতুল্য।"

রাজকুমারী এতদিন ধরিয়া মনে মনে যে কল্পনা-প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতেছিলেন, সহসা তাহা চুরমার হইয়া গেল। মর্ম্মাহত হইয়া তিনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর একটু সরিয়া বসিয়া বলিলেন,—"তুমি এই রকম ভাবে কথা ক'চ্ছ, যেন বয়সে তোমাদের দু'জনের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। সত্যি ত আর তা নয়—তোমার আর এমনি কি বয়স, বাবা! তোমাদের বিয়েটা কিছু-তেই অশোভন হবে না। তোমার এই অস্বীকারে স্ত্রীজাতির প্রতি মর্য্যাদা কিছুই প্রকাশ পাচ্ছে না; তুমি যে নিজেকে কি রকম খাট ক'রে দেখছ, তাই শুধু বোঝা যাচ্ছে। তোমার মত স্বামিলাভ কি সৌভাগ্যের বিষয় নয়;—তাঁরা ত সকলেই তোমার জন্য হা-প্রত্যাশ ক'রে আছেন।'

রাজা বলিলেন,—"কি যে বলিস্, পাগলি, কখনই না, কখনই না, আমি জানি তা ঠিক নয়। সকলে আমার জন্য হা-প্রত্যাশ ক'রে আছেন—কি যে অদ্ভুত কথা!"

জ্যোতির্ম্ময়ী ইহার অর্থ বুঝিলেন,—বুঝিয়া বলি-লেন,—"আমি ঠিক বল্‌ছি, বাবা, সব্বাই তোমাকে

চায়"—'সব্বাই' কথাটার উপর তিনি খুব জোর দিলেন।

"তুমি যদি এখন পিছাতে চাও ত খুবই আশাভঙ্গ হবে, সকলেরই। রাজী হও, বাবা, বৃথা কাল্পনিক কারণে অমত কোরো না। বাবুয়া লক্ষ্মীটি!"

তিনি তাঁহার গলা ধরিয়া ছল ছল নয়নে প্রাণভরা অনুনয়বাক্যে এই কথা বলিলেন। রাজার মন গলিল, কিন্তু প্রাণ টলিল না। তাঁহার বিবেক বুদ্ধি কিছু পূর্ব্বে তাঁহাকে যে কথা বলিয়াছিল,—তাহা তিনি তবুও ভুলিতে পারিলেন না। তিনি দৃঢ় স্বরেই বলিলেন,—"আচ্ছা, সে কথা হবে এখন বাপ্, পরে হবে—খেতে চল এখন, দেরী হ'য়ে গেছে।"

তাঁহার এমন অনুরোধও রাজার প্রাণস্পর্শ করিল না; অভিমানিনী কন্যা নীরব হইয়া রহিলেন!

রাত্রিকালে রাজা স্বপ্ন দেখিতেছিলেন,—নৌকা চলিতেছে, মাঝি নাই, দাঁড়ি নাই, অকূল সমুদ্রে নৌকা ভাসিয়া চলিয়াছে। যাত্রী তাঁহারা দুই জন; —তিনি ও হাসি। কাছাকাছি পাশাপাশি তাঁহারা বসিয়া—তবুও যেন কত দূরে কত তফাতে। দৃষ্টির ব্যবধান নাই, কিন্তু কাহারও কথা শুনা যায় না, স্পর্শও মিলে না! হাসি নৌকার এমন ধারে বসিয়াছিল যে, প্রতিক্ষণে তাঁহার ভয় হইতেছিল, এখনই সে জলে পড়িবে; তিনি তাহাকে সাবধান করিতে চাহেন, কিন্তু ভাষা কণ্ঠস্ফুট হইতে অসমর্থ, ইচ্ছা,তিনি তাহাকে সরাইয়া বসান, কিন্তু পদ অচল—কি যে অব্যক্ত গভীর যন্ত্রণা! সহসা হাসি জলে পড়িয়া গেল—তিনিও তৎক্ষণাৎ জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন এবং তাহার দেহ পৃষ্ঠে ধারণ করিয়া তীরভূমিতে উঠিলেন। কিন্তু এ—কে? এ ত হাসি নয়। এ যে রাণীর শবদেহ তিনি স্কন্ধে ধারণ করিয়া আছেন! তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, জাগিয়া মুক্তির আনন্দলাভ করিলেন,—স্বপ্ন—স্বপ্ন—তিনি শুধু স্বপ্ন দেখিতেছিলেন,—এ সত্য ঘটনা নয়!

উঠিয়া দেখিলেন, আজ সূর্য্য ওঠে নাই—অন্ধকার প্রাতঃকাল!

দ্বিপ্রহরের পর সেই দিন অনাদি আসিয়া উপস্থিত হইল। অনাদিকে একাকী দেখিয়া প্রথমটা তিনি উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন, পরে তাঁহার মনে পড়িয়া গেল, মিসেস রো'কে দেখিবার জন্য ডাক্তারকে তিনি লিখিয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি খবর বল দেখি? যে কাযের জন্য গেলে, তার কি হোল? ডাক্তার কি মিসেস্ রো'কে চিকিৎসা করবার জন্য সেখানে র'য়ে গেলেন?"

অনাদি শুষ্ককণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া লইয়া রাজার এতগুলা কথার উত্তরে শুধু বলিল,—"ডাক্তার-দা পুলিসের হাতে বন্দী হয়েছেন!"

রাজা যেন হঠাৎ চারিদিক্ শূন্য দেখিলেন,—তাঁহারও মুখে আর কোন কথা ফুটিল না, যন্ত্রের মত কিছু পরে বলিলেন,—"তার পর?"

ইহার কোন উত্তর পাইবার পূর্ব্বেই হরকরা আসিয়া নমস্কার করিয়া রাজার হাতে একখানি কার্ড দিয়া বলিল,—"পুলিস 'সাহেব' দরজায় হাজির—আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।"

"পুলিস 'সাহেব'! আচ্ছা, আস্‌তে বল!"

পুলিস আসিয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার-পত্র দেখাইয়া বলিলেন, "আপনি আমার বন্দী।"

"কি অপরাধে?"

"অপরাধ গুরুতর। রাজ-বিদ্রোহের ষড়যন্ত্রে আপনি অভিযুক্ত!"

অতুলেশ্বর ক্রোধ প্রকাশ করিয়া কহিলেন,—"মিথ্যা অভিযোগ।"

"সত্য মিথ্যা বিচার-সাপেক্ষ, এখন আপনি আমার বন্দী—আপনাকে প্রসাদপুরে যেতে হবে।"

রাজা অভিযোগ-পত্রখানা পড়িয়া দেখিয়া বলিলেন,—"বেশ; প্রস্তুত হ'য়ে নিচ্ছি। এখনি ত ট্রেণ নেই, আপনিও ততক্ষণ খাওয়া-দাওয়া ক'রে নিন।"

রাজা সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সময় পাইলেন। পুলিস-অতিথি থানায় চলিয়া গেলে, তিনি অনাদিকে বলিলেন,—"তুমি এখনি মুখুয্যে-বাড়ী যাও, তাঁদের এ খবরটা জানিয়ে হাসি ও মুখুয্যে মশায়কে সঙ্গে নিয়ে এস।"

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

দ্বিপ্রহরের আহারাদির পর হাসির মা-দিদিমা নিদ্রায় বিশ্রাম লাভ করিতেছিলেন, হাসি কিন্তু দিনের বেলায় ঘুমায় না,—সে তাহার পাঠগৃহে এই শীত-বাদল দিনে গায়ে শাল চাপা দিয়া, কৌচে শুইয়া টেনিসনের Idylls of the King নামক কাব্যগ্রন্থখানার পাতা আনমনে উল্টাইয়া যাইতেছিল। আর প্রেমিকার ন্যায় আগ্রহে রাজকুমারীর প্রতীক্ষায় বারবার দেয়ালের ঘড়ীর দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিল। 'গুড়ুম' করিয়া তোপ পড়িয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে হাসির ঘড়ীটিও ইংরাজ-সদরের প্রধান

দেশীয় লোকের অনুমোদনস্বরূপ—'ঠুং' শব্দে সেই অভ্রান্ত কাল-নির্দ্দেশ মানিয়া লইল।

হাসি বইখানা বন্ধ করিয়া অধীরভাবে বলিয়া উঠিল—"এখনো এলেন না ত তিনি? কখন্ যে আসবেন?"

অদূরে মোটরগাড়ীর ভেঁপু বাজিল সঙ্গে সঙ্গে রাজপথ-মন্থনকারী টায়ারচক্রের গুরুগম্ভীর নির্ঘোষও হইল। হাসি বইখানা হাতে লইয়াই গাড়ীবারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল,—গাড়ীবারান্দা যে এই গৃহ হইতে দূরে নহে, তাহা পাঠক জানেন। মোটর কিন্তু কম্পাউণ্ডে না ঢুকিয়া রাস্তা দিয়াই চলিয়া গেল; হাসি তখন নিরাশার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ঘরে ফিরিল, পড়িতে কিন্তু তাহার আর মন লাগিল না। গৃহ-মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র টেবিলের উপর বইখানা রাখিয়া সে নিকটের চৌকিতে আসিয়া বসিল। তাহার পর বহির প্রথম পাতাটা খুলিয়া রাজা আর্থারের ছবি দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সে বলিয়া উঠিল,—"অনেকটা একই রকম দেখতে,—দু'জনের চেহারার মধ্যে আশ্চর্য্য রকম মিল। বিশেষ মুখের ভাবটুকু ত অবিকল যেন একই! ছবির চোখ দু'টিকে তাঁহারই চোখ ব'লে মনে হচ্ছে। আমার দিকে চেয়ে যেন ইনি কি বলছেন; কি বলছেন তা ত কিছু বুঝতে পারছিনে। ওঃ, বুঝেছি, বুঝেছি! আশীর্ব্বাদ করছেন আমাকে।" হাসি একদৃষ্টে খানিকক্ষণ ছবিখানা দেখিয়া দেখিয়া আবার বলিয়া উঠিল,—"মঙ্গল-আশীর্ব্বাদে ভরা যেন এ চোক দুটি! হায় রে, এ হেন দেবতুল্য স্বামীর মর্য্যাদা রাণী Guinevere বুঝতে পারলে না? কি দুর্ভাগ্য তার! তাঁর সাফাই বাক্য হচ্ছে—মর্ত্ত্যের মানবী ব'লেই, স্বর্গের সূর্য্যতেজ তিনি সইতে পারেন নি।" বত বার পড়া পাতাটা বাহির করিয়া হাসি আবার পড়িল;—

> But who can gaze upon the sun in heaven!
> "He is all fault who hath no fault at all—
> "For who loves me must have a touch of earth—
> "The low sun makes the colour—"

আর পড়িতে পারিল না; বইখানা মুড়িয়া বলিয়া উঠিল,—"এমন রাগ ধরে!" তাহার পর টেবিলের উপর কুনুই রাখিয়া গালে হাত দিয়া মনে মনে ভাবিল—"কথাটা কিন্তু ঠিকই—পাঁক ত স্বচ্ছ জলের সঙ্গে মিশ খায় না, হাজার মেশাও, নিজের ভারে নীচের দিকেই নেমে পড়ে। আর্থার সত্যই কি মহাপুরুষ! যে স্ত্রী এমন অবিশ্বাসিনী, পাপীয়সী, যে তাঁর জীবনের সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ, উচ্ছেদ ক'রে দিলে—তার জন্যও তাঁর কতখানি ব্যথা—কত মমতা! অধম স্বামীকেও যে স্ত্রী আঁকড়ে ধ'রে থাকে, তার অর্থ বোঝা যায়,—স্ত্রীর পক্ষে এরূপ ভালবাসা অনেকটা স্বাভাবিক; কেন না, স্ত্রী স্বামীর একান্ত অধীন, স্বামী ভর্ত্তা, স্বামী ভিন্ন স্ত্রীর গত্যন্তর নাই,—কিন্তু পুরুষের পক্ষে এরূপ মহত্ত্ব একান্তই দেবদুর্ল্লভ খাঁটি মহত্ত্ব; কল্পনাতেও এই উদার মহাপ্রেমিকের দর্শনলাভে প্রাণে মন্দাকিনীর আনন্দতরঙ্গ ছোটে!"

বইখানার সেই স্থানটা সে খুলিল। রাণীর কলঙ্কের কথা প্রকাশ হইয়া পড়ায় তিনি পলাইয়া 'নান্'দিগের ধর্ম্মগৃহে গোপনে আশ্রয় লইয়াছেন। রাজা তাঁহার সন্ধানে সেইখানে গিয়া পত্নীর সহিত অন্তিম বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। কি মর্ম্মস্পর্শী করুণ দৃশ্য! কি অনুরাগদীপ্ত ভাষা! অনেক কথাই তাহার কণ্ঠস্থ, তবু সে আবার পড়িল,—

> Yet think not that I came to urge thy crimes,
> I did not come to curse thee, Guinevere
> I, whose vast pity almost makes me die,
> To see thee laying there thy golden head
> My pride in happier summers, at my feet.
> * * * *
> * * * *
> The pang—which, while weighed thy heart with one—
> Too wholly true to dream in truth in thee,
> Made my tears burn—is also hast—in part.
> And all is past, the sin is sinn'd, and I,
> So I forgive thee, as Eternal God
> Forgives * * * I love thee still
> * * *
> Hereafter in that world where all are pure
> We two may meet before high God and thou
> Wilt spring to me, and claim me thine,

পড়িতে পড়িতে হাসির চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল —সে বইখানা বন্ধ করিয়া অঞ্চলে চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল—"রাজা এইটুকু কেন বুঝলেন না যে, পরলোকের অপেক্ষায় আর তাঁকে থাকতে হবে না, —যে মুহূর্ত্তে রাণী তাঁর অনুতপ্ত হৃদয়ের অশ্রু নিবেদন ক'রে দিয়ে স্বামীর পদতলে লুটিয়ে পড়েছেন—সেই মুহূর্ত্তে এই লোকেই রাজার ইচ্ছা পূর্ণ হয়ে গেছে! সেই পুণ্যমুহূর্ত্তে শাপমুক্ত অহল্যাদেবীরই ন্যায় রাণী পাপতাপমুক্ত হয়ে গভীর পবিত্র প্রেমেই স্বামি বন্দনা করেছেন। আহা, এইটুকু রাজা যদি তখন বুঝতেন? কেন যে তা বুঝলেন না, আমার এমন দুঃখ হয়।"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সে জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। দিনটা সকাল হইতে মেঘলা; —কিছু পূর্ব্বে অল্প একটু বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে; তাহার পর সহসা চন্দ্রকিরণের মত স্নিগ্ধ ম্লান আধ ফোঁটা একটুখানি রৌদ্র জানালার মধ্য দিয়া ঘরখানা একবার চমকিত করিয়া তুলিয়া দুই চারি মিনিটের মধ্যেই আবার মেঘের কোলে লুকাইয়া পড়িল। হাসি উপরে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, তাহার নয়নবর্ত্তী ধূসরবর্ণ আকাশখানার উপরে কালো মেঘের ঢেউগুলা একটার পর একটা ভাসিয়া চলিতেছে। টেনিসনের বিষাদভরা কাব্যগাথাই যেন তাহারা গাহিতে গাহিতে চলিয়াছিল। সেই অভিনয়-গীতি শুনিতে শুনিতে সে আপন মনে বলিয়া উঠিল— "রাগ ধরে—কিন্তু মায়াও করে। ল্যান্সিলটকে আর্থার ভেবে নিয়েই রাণী প্রথমে তাকে ভালবেসে ছিলেন—

"Sir Lancelot went ambassador at first
To fetch her, and she watched him
from her window,
And she took him for the King
So foiled her fancy for him."

রাণীর অন্যায় আচরণে হাসি নিজের প্রাণের মধ্যে যখনই তীব্র জ্বালা অনুভব করে, তখনই এই কথাগুলি আওড়াইয়া মনকে মার্জ্জনা-স্নিগ্ধ করিতে চাহে; কিন্তু তবুও তা ঠিক পারে কই?

"না হয় ল্যান্সিলটকে রাণী রাজাই ভেবেছিলেন —না হয় ভুল ক'রে তাই ভালইবেসে ফেলেছিলেন তাকে,—কিন্তু এমনি কি ছাই সে ভালবাসা যে, বিয়ের পরেও সে জন্য স্বামীর প্রতি অবিশ্বাসী হ'তে হবে? আমাদের দেশের মেয়ে হ'লে কখনই এমনতর হ'ত না; আমি নিজের মন থেকেই এটা ঠিক বুঝতে পারি। শরদাকে কি আমি ভালবাসতুম না, না এখনো বাসিনে? অবশ্য এটা যদিও উপন্যাসের মারাত্মক প্রেম নয়—তাঁকে না পেয়ে আমার জীবনটা ব্যর্থও হয়ে যায় নি, আর চিরকুমারী-ব্রতও আমি গ্রহণ করি নি; তা নাই হোক, তা'র সঙ্গে বিয়ে হ'লে যে আমি সুখী হতুম—আর শুভদৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এই সহজ বন্ধুত্বই যে দাম্পত্য-প্রেমে পরিণত হ'ত, এটা ত বেশ বুঝতে পারি। কিন্তু তবুও ত আমি কর্ত্তব্য ভুলতে পারি নি। শরদাকে বিদায় দিতে আমার মনে তখন খুবই কষ্ট হয়েছিল—তবুও ত মায়ের অমত জেনে শরদার ঐকান্তিক প্রার্থনাও গ্রাহ্য করতে পারলুম না? ভালই হয়েছে,—ভালই করেছি! তখন যদি অত শত না ভেবে লজ্জা-সরম খুইয়ে ইংরাজ মেয়ের মত গোঁ ধ'রে বসতুম যে, শরদাকে ছাড়া আমি আর কাউকে বিয়ে করব না, ওগো মা-বাবা, শরদার সঙ্গেই আমার বিয়ে দাও গো,—তা হ'লে আজ শরদার অবস্থাটাই বা কি রকম দাঁড়াত? এমন রাজকন্যা-লাভ ত তাঁর অদৃষ্টে ঘটতো না! ভাগ্যিস—ভাগ্যিস! কিন্তু শরদা এখানে থাকলে বোধ হয়, এ কথাটা ঘুরিয়ে আমার উপরেই ফেলতেন!"

গৃহটিকটিকিটা এই সময় টিক্ টিক্ করিয়া উঠিল। হাসি বলিল, "ঠিক ঠিক বল্লেই হ'ল কিনা অমনি ঠিক! রাজরাণী হই আগে, তখন সে কথা। আমি কিন্তু এখন একশবার বলব ভাগ্যিস—শরদা ভাগ্যিস!"

শরৎকুমারের সৌভাগ্য ভাবিয়া তাহার মনঃপ্রাণ আত্মপ্রসাদে ভরিয়া উঠিল। মেঘের চলাচল দেখিতে দেখিতে হাসিতে হাসিতে সে ভাবিল,— "ঔপন্যাসিকরা ব'লে থাকেন, প্রেম নাকি জীবনে একবারই জন্মায়, আর জন্মাবামাত্র সমুদ্রবিছার মত তার শত দাঁড়া দিয়ে প্রাণটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে এমন আঁকড়ে ধরে যে, প্রাণ যায়, তবুও প্রেম যায় না। আমার কিন্তু কথাটা ঠিক মনে লাগে না—আমার মনে হয়, দাম্পত্যপ্রেম সম্বন্ধেই এ কথাটা ঠিক খাটে। স্বাতীনক্ষত্রের জলেই যেমন শুক্তিতে মুক্তার জন্ম— সেইরূপ বিবাহের—শুভদৃষ্টিপাতেই নরনারীর হৃদয়ে শুভ্র অটল প্রেমের প্রতিষ্ঠা। অন্ততঃ আমার ত এইরূপই ধারণা। তার আগে, ঐ মেঘগুলার মতই মানুষের প্রেম—তার জীবনপথে সঙ্গীর খোঁজে পথহারা হয়ে ঘুরে বেড়ায়। শরদা এতদিনে তাঁর মনের মানুষ পেয়েছেন, আর আমি? আমি সেই শুভক্ষণের অপেক্ষায় আছি।" সে গুণ্ গুণ্ করিয়া গান ধরিল—

"ওগো, মনের মত সেই ত হবে—
তুমি শুভক্ষণে যাহার পানে চাও?"

কবি ঠিক কথাই বলেছেন—এইটেই আসল সত্য! হাসি পিয়ানোর নিকট আসিয়া তাহার ঢাকনাটা খুলিয়া ফেলিল, নিকটে দাঁড়াইয়াই একবার ঠুংঠাং করিল, তাহার পর চৌপায়ার উপর বসিয়া অন্যমনে উদ্দেশ্যহীনভাবে সা রে গা মা স্বরলহরার উপর ধীরে ধীরে আঙুল চালাইয়া দিল। হঠাৎ একটা বেসুরো সুর তার কানে খট করিয়া উঠিল—সে হাত গুটাইয়া লইল; হাসিতে হাসিতে ভাবিল,—"সে দিনও অন্যমনে এই রকম একটা বেয়াড়া বেসুরো ভুল ক'রে বসেছিলুম! Guinevere যেমন ল্যান্সিলটকে ভেবেছিলেন রাজা, আমিও তেমনি রাজার ছায়ামূর্তিকে ভেবেছিলুম অনাদি দা।"

সে দিনকার দৃশ্য তাহার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল—স্নিগ্ধ অপরাহ্নে আলোকোজ্জ্বল কাননতলে সুগন্ধ-হিল্লোল ছুটিয়াছে, হ্রদবক্ষে মৃদুমনোহর কল্লোল তুলিয়া তরী ভাসিয়াছে—তাহারা দুই সখী তরীযাত্রী—হৃদয়ের লুকায়িত আবেগ খুলিয়া দিয়া গান ধরিয়াছে, নিজেদের সে প্রেমসঙ্গীতে নিজেরাই তন্ময়, মাতোয়ারা মনঃপ্রাণহারা। সহসা কোন্ প্রেমিক পথিকের কর্ণে সেই সঙ্গীতধ্বনি পৌঁছিল, তিনি উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া এখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন! আভা বলিল, তিনি রাজপুত্র—কুমার অনাদি-দা!—

হাসির স্বপ্নমোহাবেশ চূড়ান্ত সীমায় উঠিল, সে নেশায় বিভোর হইল। কিন্তু পরদিন অনাদিকে দেখিবার আশায় দেখিল এ কাহাকে! ইনি ত তাহার কল্পনার প্রেমিক রাজপুত্র নহেন—ইনি যে দেবশ্রী মহাপুরুষ! স্বপ্নের মোহ স্বপ্নে লীন হইয়া গেল—শ্রদ্ধা-ভক্তিভরে এই দেবপুরুষের চরণে সে প্রণতা হইল।

তাহার পর এই স্বপ্নের কথা আবার এক দিন তাহার মনে পড়িয়া গিয়াছিল—যে দিন সে প্রথম অনাদিকে প্রত্যক্ষ করিল। কিন্তু স্বপ্নের ঘোর কাটিয়া গেলে, স্বপ্নের কথা প্রায়ই হাসির বিষয় হইয়া পড়ে—হাসিও তখন সেই কথা মনে করিয়া গোপনে হাসিয়াছিল, আজও হাসিল। হাসিয়া ভাবিল, "অণুভাদির যেমন কথার শ্রী! একদম ছেলেমানুষ! ছোড়দার চেয়েও দেখায় ছোট! দেখলেই মনে বাৎসল্যের উদয় হয়, মধুরতার পক্ষে বেশ ছেলেটি কিন্তু ওর সঙ্গে আবার বিয়ে কি! যখনি মনে করি, হাসিতে দম ফেটে ওঠে। স্বামী যে হবে, তাকে একটু মান্য করতে হবে ত? এর প্রতি কোন দিন মান্যের ভাব ত মনে উদয় হয় নি—হবেও না।"

তার পর হাসি—হাসি থামাইয়া বলিল "যাগ্‌গে আর হাস্‌তে পারিনে—তবে এটা ঠিক,—আর যাকেই বিয়ে করি—এঁকে কখনও করব না।"

হাসি বাজাইয়া আবার গান ধরিল—

"ওগো মনের মত সেই ত হবে
তুমি শুভক্ষণে যাহার পানে চাও?"

একবারমাত্র এই দুই লাইন গাহিয়াই আবার সে থামিয়া ভাবিল—"আচ্ছা, রাজার প্রতি ত আমার শ্রদ্ধা-ভক্তির কিছুমাত্র অভাব নেই, কিন্তু তাঁকে ত আমি প্রেমের পূজা দিতে পারছিনে? তাঁকে দেখলেই বুদ্ধদেবের ভাবগম্ভীর মূর্তি আমার মনে প'ড়ে যায়। রাণী গুনিভিয়ার যে কথা বলেছিলেন, এক হিসাবে কিন্তু খুবই ঠিক,—মানুষ মানুষকেই চায়। তাই শেষ বিদায়-দিনে রাজার দেবমহত্ত্বের মধ্য থেকে আসল মানুষটি যখন রাণীর চোখে পড়লো—তখনই তাঁর মনের প্রেম-ফোয়ারা রাজার প্রতি উথলে উঠেছিল। কিন্তু হায়! তখন too late? রাণী যখন মনে মনে বল্লেন

Now I see what thou art,
Thou art the highest and most
humane too-

তখন রাজা চ'লে গেছেন; হয় ত বা আমারও সে শুভক্ষণ আসবে, কিন্তু কে জানে, আমারও পক্ষে সে সৌভাগ্য too late হবে কি না!"

ঘড়ি ঠুং ঠুং করিয়া দুইটা বাজিল, হাসি চমকিয়া সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিল। এতক্ষণে আবার তাহার রাজকুমারীকে মনে পড়িয়া গেল; বলিয়া উঠিল, "কই, এলেন না ত তিনি এখনও? দু'টা যে বেজে গেল!" আবার তাহার চিন্তাস্রোত উজানে বহিল—"আচ্ছা, সবাই বলছে বিয়ে কর—বিয়ে কর! অমন রাজার রাণী হয়ে জীবন সার্থক কর। অমন স্বামিলাভ বহু পুণ্যেই স্ত্রীলোকের ভাগ্যে ঘটে। তা ঠিকই। কিন্তু আমার দিকটাই সবাই দেখছে—তাঁর দিক্ ত কেউ দেখে না। আমি যে তাঁর একবারেই যোগ্য নই। মা, দিদিমা যাই বলুন, তাঁর রাণী হবার মত না আছে আমার রূপ না আছে গুণ। হ'তে পারে না—তা হ'তে পারে না—মন বলছে—এ কাজটা ঠিক হবে না।" হাসি পিয়ানোর নিকট হইতে

উঠিয়া টেবিলের ধারে বসিয়া কাব্যগ্রন্থখানার পাতা খুলিয়া আর্থারের ছবি আর একবার দেখিল, তাহার পর বইখানা বন্ধ করিয়া আপন মনে বলিল—"সে দিন কিন্তু কি সুন্দরভাবেই তিনি আমার সঙ্গে কথা কচ্ছিলেন! তাঁকে আর সে দিন রাজা ব'লে মনে হচ্ছিল না। হব—আমি তাঁরই রাণী হব, চেষ্টা করব তাঁর মনের মত হ'তে, তাঁকে সুখী করতে—রাজারই রাণী হব আমি।"

গাড়ীর শব্দ হইল, সে উৎকর্ণ হইয়া সেই দিকে মনোনিবেশ করিল, মোটরের ভেঁপু বাজিয়া উঠিল—সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীখানা যেন ভিতরেই প্রবেশ করিল, হাসি তাড়াতাড়ি গাড়ীবারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

অনাদি মোটর হইতে নামিয়া দোতালার উপর উঠিতে না উঠিতে হাসি সিঁড়ির রেলিঙ্গের ধারে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "রাজকুমারী এলেন না যে, অনাদি-দা?"

সিঁড়ির শেষ ধাপটার উপরে চড়িয়া লইয়া অনাদি উত্তর করিল, "আস্‌তে পার্‌লেন না তিনি। তাই আমি তোমাদের নিতে এসেছি।"

বহুবচনবাচ্যে হাসি টীকা করিল "বাবাও যাবেন বুঝি?"

"হ্যা, তাঁরও ডাক পড়েছে।"

হাসি আশ্চর্য্য হইল না। কৃষ্ণলাল বাবু এক জন সুদক্ষ দাবাখেলোয়াড়। যেরূপ তন্ময়ভাবে তিনি ওঙ্কারতত্ত্ব লেখেন, খেলিতে বসিলে প্রায় সেইরূপই তদ্গতচিত্তে তিনি দাবার বোড়ে টেপেন। রাজা বাহাদুরেরও দাবাখেলার বেশ একটু সখ আছে—তিনি যে দিন মুখুয্যেবাড়ী আসেন, প্রায়ই এক হাত দাবা না খেলিয়া ফেরেন না। আর মাঝে মাঝে মুখুয্যেমহাশয়েরও এ জন্য রাজভবনে তলব পড়ে।

"আচ্ছা, অনাদি-দা, তুমি তবে বাবার ঘরে গিয়ে একটু বোসো, দু'মিনিটের মধ্যে আমি প্রস্তুত হয়ে আস্‌ছি।" এই বলিয়াই হাসি এমন তাড়াতাড়ি অদৃশ্য হইয়া গেল যে, অনাদির বিষণ্ণতা তাহার নজরেই পড়িল না।

কৃষ্ণলালের ঘরে গিয়া অনাদি দেখিল, তিনি মুদ্রিতনয়নে চৌকিতে বসিয়া আছেন। নিকটের টেবিলের উপর একরাশ খাতাপত্র, খাতাপত্রের উপর কলমটা গড়াগড়ি যাইতেছে, সম্ভবতঃ হাত হইতে সেটা পড়িয়া গিয়াছে; তিনি বাঁহাতের কনুই দিয়া কতকগুলা কাগজপত্র চাপিয়া ডানহাতখানা খোলা খাতার উপর রাখিয়া ধ্যানস্থ হইয়া ভাবিতেছেন—ওঙ্কার শব্দের নিগূঢ়তত্ত্ব। ঋষিগণ বিরাট্ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে প্রতিচ্ছায়া এই ক্ষুদ্র ওঙ্কারমন্ত্রের ধ্বনিতে প্রতিবিম্বিত করিয়া দেখাইয়াছেন, তাহারই উজ্জ্বল মহিমা হৃদয়-দর্পণে প্রতিভাত দেখিয়া লিখিতে বসিয়া তিনি লেখার কথা ভুলিয়া গিয়াছেন।

অনাদি একবার কাসিল, কোন ফল হইল না, জোরে জোরে দুই একবার পা নাড়িয়া চটিজুতার আওয়াজ করিল, তাহাও কৃষ্ণলালের কানে পৌঁছিল না, তিনি তখন এমনই ভাবভোর। কিন্তু অনাদিও ত বেশী বিলম্ব করিতে পারে না, সে তখন টেবিলের ইলেক্‌ট্রিক ঘণ্টাটা বাজাইয়া দিল। এ ঘণ্টাটি ছিল রাজাবাহাদুরের,—কৃষ্ণলাল একদিন ইহার তারিফ করায় রাজা তাঁহাকে এটি উপহার প্রদান করিয়াছেন। ঘরে আনিয়া পর্য্যন্ত কৃষ্ণলাল কিন্তু ইহার ব্যবহার করেন নাই। ভৃত্য শশীকে ডাকিবার সময় তাঁহার চিরাভ্যস্ত আদরবুলিগুলি কণ্ঠে আসিয়া বহির্গত হইবার জন্য এমনই লাফালাফি করে যে, তাহাদের শান্ত করিতে গিয়া হাতের কাছের ঘণ্টার কথা একেবারেই তিনি ভুলিয়া যান। ঘণ্টার মৃদুমধুর অবিশ্রান্ত আওয়াজে কৃষ্ণলালের এইবার ধ্যানভঙ্গ হইল। নিকটে অনাদিকে দেখিয়া, আহ্লাদে বিস্ময়ে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "তুমি এসেছ, বাবা! কতক্ষণ—কতক্ষণ! ব'সো বাবা, বসো, খবর সব ভাল ত?"

অনাদি কোন ভণিতা না করিয়া একেবারেই বলিল, "খবর বড় ভাল নয়।"

কৃষ্ণলাল ব্যাকুলভাবে একবার ওঙ্কারধ্বনি করিলেন,—তাহার পর উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "খবর ভাল নয়? কারো কি অসুখ-বিসুখ হয়েছে?"

"আজ্ঞে না—পুলিস এসেছে রাজবাহাদুরকে বন্দী ক'রে নিয়ে যেতে।"

"পুলিস এসেছে রাজাবাহাদুরকে বন্দী ক'রে নিয়ে যেতে?" ভীতিবিহ্বল কণ্ঠ হইতে এই প্রশ্ন উঠিল।

অনাদি বলিল—"আজ্ঞে হ্যা।" অতঃপর এ সম্বন্ধে যাহা কিছু তাহার বলিবার ছিল, সংক্ষেপে শেষ করিয়া বলিল, হাসিকে ও আপনাকে আমি নিতে এসেছি, তিনি আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে চান।"

বৃদ্ধের গণ্ড বাহিয়া বড় বড় দুই ফোঁটা অশ্রু

নীচে পড়িল—তিনি ওঙ্কারধ্বনি করিয়া গদগদ কণ্ঠে বলিলেন—"চল বাবা চল, এখনি যাচ্ছি—হাসি কোথা? ডাকো তাকে?"

"সিঁড়িতে দেখা হয়েছে তাঁর সঙ্গে—তিনি কাপড় ছাড়তে গেলেন, আস্‌ছেন এখনি।"

"তাকে এ সব কথা বলেছ কি?"

"না—"

"কিন্তু বাড়ীর ভিতরেও একবার এ খবরটা ত জানানো দরকার। আমার ত, বাবা, মুখে কথা আস্‌ছে না। তুমি গিয়ে বরঞ্চ খবরটা দিয়ে হাসিকে নিয়ে এস—আমি ততক্ষণ গাড়ীতে গিয়েই বসছি।—"

এই সময় হেমচন্দ্রের আবির্ভাব হওয়াতে এ সমস্যা সহজেই সমাধান হইয়া গেল। কর্ত্তাবাবু বলিয়া উঠিলেন,—"এই যে হেম এসেছেন! হেম, তুমিই ভাই তা হ'লে গিয়ে এ খবরটা বাড়ীর ভিতরে জানিয়ে এস।"

হেম বলিল—"কি খবর?"

"ওঃ, তুমি যে এখনো শোন নি,—অনাদি বল বাবা, সব কথা হেমকে, আমি গাড়ীতে গিয়ে বসি।"

দুই এক কথায় অনাদি আসল খবর সবই হেমকে জানাইয়া দিল,—শুনিয়া হেম বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল, হাসিও সাজসজ্জা করিয়া আসিয়া অনতিবিলম্বে অনাদির সহিত গাড়ীতে গিয়া উঠিল।

* * * *

হেম অন্তঃপুরে ঢুকিয়া প্রথমে গেল দিদিমার দালানে। সেখানে তাঁহাকে না পাইয়া হাসির মা'র মহলে আসিয়া গিন্নীর ভাঁড়ার ঘরের বারান্দায় মা দিদিমা দুই জনকেই দেখিতে পাইল। হাসির মা সেখানে বসিয়া তরকারী কুটিতেছিলেন, আর তাঁহার পাশে বসিয়া দিদিমা সন্দেশের ছানা মাখিতেছিলেন। হেম মস্তক নত করিয়া তাঁহাদের প্রণাম করিল। তাহাকে অসময়ে আসিতে দেখিয়া দিদিমা হাত গুটাইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"এই যে হেমবাবু, কি খবর?" গৃহিণী বেগুণটা ফালি করিয়া লইয়া মুখ উঠাইয়া শাশুড়ীর প্রশ্নের উত্তর শুনিবার প্রত্যাশায় নীরবে হেমের মুখের দিকে চাহিলেন। হেম বলিল—"ভাল খবর নয়, মা।" উভয়েরই মুখ অজ্ঞাত বিপদ-চিন্তায় পরিম্লান হইয়া উঠিল। দিদিমা বলিয়া উঠিলেন,—"রাজকুমারীর ত কোন অসুখ করে নি? তিনি আজ এখনো এলেন না—তাই আগে থাকতেই আমার কেমন ভাবনা হচ্ছিল।"

হেম বলিল, "না, তা নয়; শারীরিক ভাল আছেন সকলে—"

"তবে?"

দিদিমার এই প্রশ্নে হেম কহিল—"রাজাবাহাদুর গ্রেপ্তার হয়েছেন।"

"রাজাবাহাদুর গ্রেপ্তার? কেন—কি জন্য?"

মা—দিদিমা—উভয়েই ব্যাকুলভাবে এই প্রশ্ন করিলেন।

হেম বলিল,—"অভিযোগ গুরুতর—রাজবিরুদ্ধে বিদ্রোহিতার ষড়যন্ত্রের Charge!"

দিদিমা শুনিয়া মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন, হাসির মা গম্ভীরভাবে কহিলেন,—"আজকাল বিদ্রোহী হচ্ছে ত অনেকে! কেন বাপু এ সব কায করা? বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে রয়েছি আমরা,—কি যে সব খেয়াল।"

দিদিমা বলিলেন,—"কিন্তু রাজা ত আর এ কায করেন নি—এ যে মিথ্যে কথা!"

হেম বলিল, "হ্যাঁ, তা ঠিক, রাজা বিদ্রোহী নন নিশ্চয়ই—তবে তাঁর কতকগুলা অস্ত্রশস্ত্র বিদ্রোহী ছেলেদের আড্ডায় পাওয়া গেছে—তাতেই এতটা বিপদ।"

দিদিমা বলিলেন,—"রাজার হাতিয়ারশালা থেকে ছেলেরা যে অস্ত্র চুরী করেছে, এ কথা ত আমরাও শুনেছি, পুলিস কি তা জানে না?"

হেম একটু হাসিয়া বলিল—"কিন্তু প্রমাণ করতে হবে ত?"

মা বলিলেন,—"যদি ধর রাজা এরূপ প্রমাণ করতে না পারেন? তা হ'লে?"

"তা হ'লে দণ্ড পাবেন।"

"কিরূপ দণ্ড?"

"ঠিক বলতে পারিনে—যাবজ্জীবনের জন্য দ্বীপান্তরিত হবারই অধিক সম্ভাবনা! প্রাণদণ্ড হ'তেও আটক নেই।"

দিদিমা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কাতরস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"ভগবান্ রক্ষা কর—রক্ষা কর।"

হাসির মা'র হাত হইতে বেগুণের ফালিটা নীচে পড়িয়া গেল। তিনি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, একটু পরে, যুক্তকর মস্তকে স্পর্শ করিয়া বলিলেন,—"ভগবান্ আমাদের সময়ে রক্ষা করেছেন, সর্ব্বপ্রাণে তাঁকে নমস্কার করি। আচ্ছা, তিনি যাবজ্জীবনের জন্য দ্বীপান্তরিত হন যদি, তাঁর রাজ্য ধনসম্পদ কে পাবে? শুনেছি নাকি রাজবিদ্রোহীদের সম্পত্তি গভর্ণমেণ্ট বাজেয়াপ্ত করে?"

হেম বলিল,—"ইচ্ছা করলে তা' পারে বটে—তবে ওয়ারিস থাকলে গদিতে বসিয়ে সরকার রাজ্য চালান্।"

"তা হ'লে রাজকুমারীই রাজ্য পাবেন—তবু ভাল ?"

"নাও পেতে পারেন, সুজন রায় অনেক দিন থেকেই বলছে, এ রাজ্যের অধিকারী তারাই। ম্যাজিষ্ট্রেট শুনছি তার উপর খুব সদয়, সম্ভবতঃ গভর্ণমেণ্ট বিজনকেই গদিতে বসাবে।"

গৃহিণী স্থির হইয়া তাহার কথা শুনিলেন - শুনিয়া অধীরভাবে বলিয়া উঠিলেন,—চিরদিনই ত আমি বলছি—বিজন রায়ের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দাও, তা না—যত রাজ্যের আজগুবি ভাবনায় কর্ত্তা মেতে আছেন! হেমদা চেষ্টা করবে একটু, ভাই তুমি ?"

হেম বলিল,—"আরো কিছুদিন যাক্ না? রাজা ত মুক্তিলাভও করতে পারেন। আমার মনে হয়, তারই অধিক সম্ভাবনা।"

বলিয়া হেম চলিয়া গেল; দিদিমা ছানা ও চিনি সেইখানেই ফেলিয়া রাখিয়া নামজপ করিতে করিতে ঠাকুরঘরে ঢুকিলেন; গৃহিণী অমনোযোগ সত্ত্বেও তরকারী ছেদনে মনোনিবেশ করিলেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

হাসি গাড়ীতে উঠিয়া লক্ষ্য করিল, অনাদি বড় বিষণ্ণ, গম্ভীর। কৃষ্ণলাল চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছিলেন, তাঁহার বিষণ্ণতা সে জন্য সে ধরিতে পারিল না। এরূপ ধ্যানাবস্থা তাঁহার পক্ষে কিছুই অস্বাভাবিক নহে, যখন তখন নিমীলিত নয়নে তাঁহাকে বসিয়া থাকিতে দেখা যায়। কিন্তু অনাদিকে মনে করিতে হাসিখুসী স্ফূর্ত্তিই হাসির মনে জাগিয়া উঠে—আজ তাহার অন্ধকার মুখ দেখিয়া হাসি বড়ই ভীত ও ভাবিত হইয়া পড়িল। বাড়ীর অন্য সকলের ন্যায় তাহারও প্রথমেই মনে হইল—হয় ত বা তবে রাজকুমারীর কোন অসুখ করিয়াছে; সেই জন্যই বা তিনি আসিতে পারেন নাই। ব্যাকুল মৃদুকণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করিল,—"রাজকুমারী ভাল আছেন ত, অনাদি-দা?" এতক্ষণ অন্য কাহারও এরূপ প্রশ্নে অনাদি অপ্রকৃতিস্থ হয় নাই—হাসির এই ব্যথাভরা ব্যাকুলতায় তাহার মনের প্রচ্ছন্ন বেদনা সহানুভূতি-চঞ্চল হইয়া উঠিল। অনাদি পড়' পড়' অশ্রু নয়নে ধরিয়া বাতায়নদ্বারে মুখ বাড়াইয়া দিল, তাহার পর সংযত হইয়া মুখ ফিরাইয়া কহিল—"না, হাসিদি, তিনি ভাল আছেন।"

"তবে—তবে?" হাসির হঠাৎ মনে হইল, হয় ত বা ঠাকুরমা মারা গিয়াছেন, কিন্তু সে কথা ত জিজ্ঞাসা করা যায় না। সে কেবল অনাদির অকথিত বেদনা মনের মধ্যে উপলব্ধি করিয়া অনির্দ্দিষ্ট আতঙ্কে নীরব হইয়া গেল, অনাদিও কোন উত্তর করিল না।

আকাশের মেঘগুলা তখন ঘনীভূত হইয়া দিনকে সন্ধ্যা করিয়া তুলিয়াছিল, অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছিল, কিন্তু বাতাস নাই, শীতও কম, আর্দ্রতায় চাপা শৈত্য মৃদুতর হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু সহসা কেমন একটা কন্‌কনে শীতে হাসির হৃৎপিণ্ডে কম্পন উঠিল, মুখ বিবর্ণ হইয়া পড়িল। হাসির পিঠের স্খলিত শালখানা অনাদি তাহার গায়ে উঠাইয়া দিল। মোটর রাজবাড়ীর গাড়ীবারান্দায় লাগিবামাত্র এক জন হরকরা নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন করিল—রাজা-বাহাদুর এবং রাজকন্যা সঙ্গীত ঘরে আছেন।

রাজার বসিবার ঘরের পাশেই সঙ্গীত-গৃহ। সেই ঘরে মছলন্দ বিছানায় বসিয়া ভজন গাহিয়া পিতা-পুত্রী সুখ-দুঃখ-দাতা ভগবান্‌কেই ডাকিতেছিলেন। বিপদের সময় আমরা যেমন সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার শরণাপন্ন হই, সুখের সময় তাহা পারি কই? তাই বুঝি প্রেম-লোলুপ হরি বিপদের মধ্য দিয়া ভক্তজনকে তাঁহার কাছে ডাকেন।

রাজা তানপুরা বাজাইয়া গান করিতেছিলেন—রাজকুমারী অবনতমস্তকে, করযোড়ে তাহা শুনিতে শুনিতে মাঝে মাঝে এক একটি কলিতে যোগদান করিতেছিলেন।

বহুক ঝটিকা ঝড়, কাঁপায়ে চেতনজড়
ভবের তরঙ্গে যেন না বিচলে এ হৃদয়।
ধরিয়া চরণ যাঁর বিচরি এ পারাবার
পুণ্য শক্তিমান তিনি পরম মঙ্গলময়!
দয়া কর—দয়া কর—দয়া কর দয়াময়!

রাজকুমারীর বুকফাটা করুণস্বর রাজার গম্ভীর কণ্ঠধ্বনির সহিত শেষ ছত্রে মিলিত হইল। রাজা দ্বিতীয় অংশ ধরিলেন—

ঘিরুক নিবিড় ঘন সংসারগগন;
ধ্রুবরূপে দীপ্ত যেন রহে প্রাণ-মন।
আশ্রয় অভয়দাতা হেলায় ঠেলিয়া বাধা
ভেলায় হইব পার তরঙ্গেতে।কবা ভয়!
দয়া কর, দয়া কর, দয়া কর দয়াময়!

উভয়ের এই মর্ম্মভেদী সম্মিলিত প্রার্থনায় ভগবান্ যদি তাঁহাদের প্রতি দয়াবর্ষণ না করেন- তবে তাঁহার—দয়াময় নামের সার্থকতা কোথায়?

গানটি শেষ করিয়া রাজা তানপুরা রাখিয়া দিলেন, কন্যাও অবনত মস্তক উন্নত করিয়া পিতার দিকে দৃষ্টিপাত করিল। জ্যোতির্ম্ময়ীর অন্তরের বেদনা, তাহার আননে কি প্রগাঢ় কালিমাচ্ছায়া প্রকটিত করিয়াছিল! রাজকন্যা ভাবিতেছিলেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে পিতার এই দুঃখ-কষ্টের মূল কারণ,—তাঁহার জন্যই পিতার এই লাঞ্ছনা—অপমান—কষ্টভোগ।

রাজা ভাবিতেছিলেন, নিজের সব কষ্ট তিনি সহিতে পারেন কিন্তু তাঁহার মাতাকন্যার কষ্ট যে তাঁহার পক্ষে অসহ্য। কি বলিয়া কি ভাষায় কন্যাকে সান্ত্বনা দান করিবেন, তিনি তাহা খুঁজিয়া পাইলেন না! তানপুরাটা আবার হাতে লইয়া কন্যাকে বলিলেন—"আজই আমি এই গানটি রচনা করেছি—শোন্ দেখি, রাণি—"

রাণী নীরব হইয়া রহিল—তিনি গাহিতে লাগিলেন—

ওহে প্রভু নিষ্ঠুর রাজন্,
যাহা কিছু ছিল মোর সুন্দর রতন—
পুণ্যপ্রীতি আশা, প্রেম, উজ্জ্বল বাসনা শুভ,
সব ত পূজার তব করেছি অর্পণ!
পারিনি পারিনি শুধু উপাড়িয়া দিতে,
ব্যথার শৈবাল যেটি ঘটেছিল চিতে,
একটু ত ভালো নয়, মলিন পঙ্কিলময়—
লাজে ভয়ে করেছিনু তাই সঙ্গোপন।
জেনেছ তা অন্তর্য্যামী রাজা।
তারি তরে এত দণ্ড এ দারুণ সাজা।
লও তবে তাও লও, হে রুদ্র প্রসন্ন হও,
আপনা নিঃশেষে করি আত্মনিবেদন।

অনাদির সহিত শঙ্কিত, সন্তর্পিত নিঃশব্দচরণে কৃষ্ণলাল যখন কন্যাকে লইয়া ভজনস্থলে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন রাজা গানটি একবার শেষ করিয়া শেষ কলিটি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বার বার করিয়া গাহিতেছিলেন—

লও তবে সব লও, হে রুদ্র প্রসন্ন হও,
নিঃশেষে চরণে করি আত্মনিবেদন।

ইঁহাদের উভয়কেই সুস্থ শরীরে দেখিয়া হাসি অনেকটা আরাম বোধ করিল। কৃষ্ণলাল ও অনাদি মছলন্দের শেষ দিকে বসিলেন—হাসি রাজকন্যার কাছ ঘেঁসিয়া বসিল। রাজা গান শেষ করিয়া চোখ খুলিতেই হাসির প্রতি তাঁহার নজর পড়িল—তানপুরাটা তিনি নামাইয়া রাখিলেন, একটা শোকনীরবতায় সহসা যেন গৃহ পূর্ণ হইয়া উঠিল। একটু পরে কৃষ্ণলালের দিকে চাহিয়া রাজা বলিলেন, "কখন্ এলেন আপনারা?"

"এই—এই এখনি।"

"খবর শুনেছেন?"

"শুনেছি।"

হাসি রাজকন্যার দিকে চাহিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, 'কি খবর? আমি ত কিছু জানিনে।"

রাজা তাহার দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিলেন, "জান না হাসি? আমি আর রাজা নই!"

রাজা কি ঠাট্টা করিতেছেন না কি? কিন্তু ইহা ত ব্যঙ্গের স্বর নহে, হাসির বিস্ময়-কাতর দৃষ্টি নীরবে রাজাকে যে প্রশ্ন করিল—তাহার উত্তর-স্বরূপ তিনি কহিলেন, "এত দিন ছিলাম বটে রাজা, এখন সত্যই ভিখারীর চেয়েও দীনহীন আমি। ভিখারীরও যে অধিকার—যে স্বাধীনতা আছে, তাও নেই আমার—আমি বন্দী।"

এ কথার অর্থ হাসির হৃদয়ঙ্গম হইল না—কিন্তু অর্থ না বুঝিয়াও তাহার নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। রাজা কন্যাকে বলিলেন, "তুমি হাসিকে সব কথা খুলে বল—রাণি।" বলিয়াই রাজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কৃষ্ণলালকে বলিলেন, "ও ঘরে যাবেন—মুখুয্যে-মশাই? আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে।"

রাজা কৃষ্ণলালকে সঙ্গে লইয়া পাশের ঘরে গিয়া বসিলেন, অনাদিও প্রসাদপুরে যাইবার বন্দোবস্ত করিতে চলিয়া গেল—শ্যামাচরণ রাজাদেশে অন্য কাযে গিয়াছিলেন।

সকলে চলিয়া গেলে—হাসি অধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে, রাজকুমারি?"

রাজকন্যা ধীরকণ্ঠে উত্তর করিলেন, "বাবা বিদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছেন। পুলিস তাঁকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে যেতে এসেছে।"

"সত্যই তবে রাজা বাহাদুর বন্দী?"

অব্যক্ত যন্ত্রণায় হাসির বাক্‌রোধ হইয়া গেল। সেদিনকার কথায় হাসি রাজার মনে কিরূপ কষ্ট দিয়াছে, আজ তাহা সে বুঝিল, এত দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও রাজা তাই প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গে সেই কথারই উল্লেখ করিলেন। হাসি রাজকন্যার কোলে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কাতর প্রার্থনায় মনে মনে কহিল,

"হে ভগবান্ অন্তর্য্যামী পুরুষ, এ কি করিলে তুমি? তুমি ত জান আমার প্রাণের কথা! আমার মনের ত্রিসীমানায় ত কোন অভিশাপকল্পনা ছিল না, আমার সর্ব্বস্ব লইয়া সেই অবোধ বাক্যকে নিরর্থক করিয়া দাও, প্রভু, তোমার বজ্রদণ্ড আমার উপর ফেলিয়া ইঁহাদিগকে রক্ষা কর প্রভু!" তাহার হৃদয়ের চঞ্চল প্রেম আজি যেন সহসা স্থিরতা লাভ করিল।

রাজকন্যা তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন, "অধীর হয়ো না, হাসি, বাবা নির্দ্দোষ; যদি সংসারে ন্যায়-সত্যের জয় এতটুকুও থাকে, তবে তিনি মুক্ত হবেনই।"

রাজকন্যার সংযম দেখিয়া হাসি অবাক্ হইয়া গেল, অনেকটা প্রশান্ত হইয়া সে উঠিয়া বসিল। রাজকন্যা বলিলেন, "দোষী আসলে আমি। কার্য্যতঃ না হ'লেও মনে মনে অনেক দিন থেকেই আমি বিদ্রোহী—রাজপক্ষের অন্যায় শাসনে মর্ম্মে মর্ম্মে আমি আহত। এর প্রতীকারচেষ্টায় দোষ হয়ে থাকে ত দোষ সম্পূর্ণভাবে আমারই। আমার কার্য্যোদ্ধার জন্যই বাবাকে তাঁর কল্পনার রাজ্য থেকে টেনে এনে আমি পাশে বসিয়েছি। কিন্তু কিছুই হ'ল না, হাসি, দেশের মঙ্গল বা বিশ্বের মঙ্গল কিছুই আমা হ'তে হোল না, হাসি, কেবল পিতৃঘাতকের কায করলুম। সকলই তাঁর ইচ্ছা। হয় ত বা এরও ফল আছে, সুফল আছে, এই অমঙ্গলের পশ্চাতে হয় ত কল্যাণ দাঁড়িয়ে আছে—সন্তান যেমন ভূমিষ্ঠ হবার আগে মাতৃগর্ভে অপেক্ষা করে, সেই রকম। হোক্, তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্!"

রাজকন্যা নীরব হইয়া রহিলেন, তাঁহার বিশ্বাস-বলে হাসির দুর্ব্বল হৃদয়ও সবল হইয়া উঠিল। রাজকুমারী আবার বলিলেন, "আমার কি ইচ্ছা হয় জান ভাই, হাসি?"

উৎসুকদৃষ্টিতে হাসি তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল; রাজকন্যা বলিলেন, "পুরাণে পড়া যায়, দেবতারা বলিলাভে সন্তুষ্ট হয়ে মঙ্গলবর দান করতেন, এখনও সেই বিশ্বাসে লোকে কালীর কাছে বলিদানের মানত করে। এ কথাটায় আমার কিন্তু কোন দিন প্রত্যয় জন্মায় নি। এর গূঢ় তাৎপর্য্যই আমি ভেবে নিতুম। বলি অর্থে দুষ্কৃতিরই বলিদান বুঝেছি। কিন্তু আজ সহজভাবেই এ কথাটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হচ্চে আমার। ভগবান্ যদি দেশমঙ্গলে আমাকে বলি গ্রহণ করেন—তবে আমার জীবন সার্থক - ধন্য হয়। হে ভগবান, মঙ্গল কর—কল্যাণ কর, পিতা মুক্ত হোন, দেশ মুক্ত হোক—আর—আর—"

শরৎকুমারের নাম তাঁহার জিহ্বাগ্রে আসিয়া থামিয়া পড়িল, তিনি ত অন্তর্দেবতারই মত তাহার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত মুখে আর তাহার কথা কি বলিবেন। তিনি মনে মনেই তাঁহার মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া আবার বলিলেন—"ভারতভূমি কর্ম্মে এক হোক, ধর্ম্মে দৃঢ় হোক্, বিশ্বসংসারে ন্যায় সাম্যের প্রতিষ্ঠা হোক্, বলি গ্রহণ কর প্রভু আমাকে, আমার জীবন সুখ-শান্তি সর্ব্বস্ব তোমাকে সমর্পণ করি—আমার প্রার্থনা সফল কর প্রভু, এই মঙ্গল বর দান কর।" বলিয়া তিনি যখন থামিলেন, তখন তাঁহার গলা জড়াইয়া অশ্রুপূর্ণ নেত্রে হাসি বলিল, "অমন ক'রে বলো না রাজ-কুমারি—বল বল, অমন ক'রে বলির কথা ভাববে না তুমি?"

রাজকুমারী একটু বিষণ্ণ হাসি হাসিয়া তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "তোমার যখন কষ্ট হয়, তখন অমন ক'রে আর বলব না হাসি।"

আজ আর রাজকন্যা একবারও তাকে মা বলিয়া সম্বোধন করিলেন না, তিনি বুঝিয়াছেন, রাজার সহিত হাসির বিবাহ আর এখন সম্ভবপর নহে। হাসির কিন্তু এই আদরের ডাক আজ শুনিতে বড়ই ইচ্ছা করিতেছিল। হাসি রাজকন্যার গলা ছাড়িয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কোথায় নিয়ে যাবে তাঁকে?"

রাজকন্যা বলিলেন "প্রসাদপুরে।"

"সেখানেই কি রাখবে?"

"বিচার শেষ হওয়া পর্য্যন্ত বোধ হয় সেখানেই রাখবে, তাহার পর যদি মুক্তিলাভ করেন ত ভাল—নইলে—"

হাসি নীরবে চাহিয়া রহিল—রাজকন্যা একটু থামিয়া দম লইয়া বলিলেন, "দ্বীপান্তরে পাঠাতে পারে।"

প্রাণদণ্ডের কথাটা রাজকন্যা মুখে আনিতে পারিলেন না; তাঁহার মনের বল—সাহস এখানে কুলাইল না। হাসি তাহার প্রতিধ্বনির মত বলিল, "দ্বীপান্তরে? কোথায় সে কোন্ দেশ? আমরাও সঙ্গে যেতে পারব ত?" হাসি দ্বীপান্তর সম্বন্ধে এমনি অজ্ঞ।

রাজকন্যা কোন উত্তর করিলেন না-এ প্রশ্ন তাঁহার কানে পৌঁছিল কি না, তাহাও ঠিক বোঝা গেল না। তিনি তখন স্তিমিত নেত্রে গুণ গুণ করিয়া স্তোত্র গান ধরিয়াছেন—

তুঁহি একমেবাদ্বিতীয়ং সত্য সুন্দর শিব।
দেহ করুণা—কর করুণা বিভো।

তুমি, অরূপ অপরূপ, সচ্চিদানন্দরূপ!
তব প্রেমরূপে ভরা—নিখিল ভব।
তুমি রুদ্র, ভয়ঙ্কর, দণ্ডপতি।
হও শঙ্কর, সুখকর, তুষ্টমতি।
দেহ কর্ম্মে পুণ্য, কর ধর্ম্মে ধন্য,
আয়বন্দিত হোক নিশিদিন!

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণলালকে অন্য ঘরে লইয়া গিয়া রাজা তাঁহাকে বলিলেন, "আপনারা হাসির বিবাহের জন্য বড় ব্যস্ত হয়েছেন—না?"

কৃষ্ণলাল হাতের উপর হাত রাখিয়া তাহা রগ্‌ড়াইতে সুরু করিয়া উত্তর করিলেন—"হ্যাঁ, গিন্নার কাছ থেকে এ জন্য তাড়া খেতে হয় বই কি?"

রাজার গম্ভীর মুখেও বেশ একটু হাসি ফুটিয়া উঠিল; কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে সে হাসি চাপিয়া লইয়া ধীরভাবেই তিনি বলিলেন, "অনাদিকে কি পছন্দ হয় আপনার?

"অনাদি? হ্যাঁ—হ্যাঁ, বেশ ত ছেলেটি?"

"তাকে জামাই করতে বোধ হয় আপনার গৃহিণীর অমত হবে না? আমার আত্মীয় ব'লে বল্‌ছি মনে করবেন না, কিন্তু সে খুবই ভাল ছেলে;—রাজী আছেন কি আপনি?"

"আপনি—আপনি, এই তুমি বাবা যা বলবে, তাতেই আমি রাজী। আর গিন্নীর কথা যদি বল, তিনি ত এ কথা শুন্‌লে একেবারে নেচে উঠবেন। রাজবংশের প্রতি তাঁর টানটা কিছু অসম্ভব রকমের।"

"বেশ, তা হ'লে আপনি বরঞ্চ এখনি মোটারে ক'রে বাড়ী যান, গিয়ে হাসির মা ও দিদিমাকে এখানে নিয়ে আসুন, আমার ইচ্ছে, আমি চ'লে যাবার আগে, আজই সন্ধ্যায় এ বিবাহটা এখানেই দিয়ে যাই। পুলিস ত আর আমাকে এখন আপনার বাড়ী যেতে দেবে না! নইলে বর সঙ্গে নিয়ে সেখানেই যাওয়া যেত।"

বিস্ময়ে কৃষ্ণলালের হাত রগড়ানো বন্ধ হইয়া গেল, তিনি হাত দু'খানা খুলিয়া চৌকীর মাথায় রাখিয়া বিস্ফারিত নেত্রে রাজার দিকে চাহিলেন। উভয়ে দাঁড়াইয়াই কথা কহিতেছিলেন। রাজা বলিলেন,—"আপনারা রাজী হবেন মনে ক'রে নিয়ে এ বিবাহের আয়োজন আমি এক রকম সবই প্রায় ঠিক ক'রে ফেলেছি।" কৃষ্ণলালের সংশয় দূর হইল, কিন্তু বিস্ময় ঘুচিল না। তিনি সমানই বিস্ফারিত নেত্রে কহিলেন—"আজকেরই এই সন্ধ্যায়? তুমি চ'লে যাবার আগে?"

"হ্যাঁ মুখুয্যে মশায়, আমার তাই ইচ্ছে।"

"তোমার তাই ইচ্ছে? কিন্তু—কিন্তু বড় অসময় যে! আর মেয়েও ত বড় হয়ে উঠেছে;—তাকেও ত একবার জিজ্ঞাসা কর্‌তে হবে?"

"মেয়ে ত এখানেই আছে; জিজ্ঞাসা করুন না। তাকে একবার জিজ্ঞাসা করা দরকার বই কি? তবে বাপ-মার মত আছে জানলে হাসির ত এতে অমতের কোনই কারণ দেখিনে। বিশেষ আমার ত মনে হয়—অনাদিকে হাসি পসন্দই করে। বেশ, আপনি যান, সব কথা তাকে ব'লে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসুন, আমিও তাকে বুঝিয়ে বলি।"

কৃষ্ণলাল চলিয়া গেলেন, তখনি প্রায় শ্যামাচরণ আসিয়া দেখা দিলেন। রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সব ঠিক ত?"

উত্তর হইল—"আর সবই ঠিক, কেবল পুরোহিত মশায় ১০টা রাতের আগে এখানে এসে পৌঁছতে পারবেন কি না সন্দেহ।"

"কিন্তু ততক্ষণ অপেক্ষা কর্‌বার সময় আমার ত নেই। সাড়ে ৮টার সময় প্রসাদপুরের প্রথম ট্রেণ এখান থেকে ছাড়ে—শেষ ট্রেণ পর্য্যন্ত পুলিস কি আর আমাকে এখানে রাখবে?" শ্যামাচরণ একটু ইতস্ততঃ করিয়া ব'ললেন,—"যদি অনুজ্ঞা করেন, আমিই পৌরোহিত্য করব—সে জন্য বিবাহ বন্ধ থাক্‌বে না।" রাজা বলিয়া উঠিলেন—"না, আমিই পৌরোহিত্য করব। অনাদি কোথা?"

"অনাদি? তাকে ত এইমাত্র ব্যাঙ্কে পাঠালুম গহনার বাক্স আন্‌তে।"

মুক্তার মালা চুরী গিয়া পর্য্যন্ত গহনার বাক্স রাজা ব্যাঙ্কেই রাখিয়া দিয়াছেন। রাজা বিরক্তির স্বরে বলিলেন "তাকে পাঠালেন কেন? কখন্ ফিরবে সে?"

"আমাকে যদি আপনি বিবাহের আয়োজন করতে হুকুম দেবার সময় বল্‌তেন যে, বিবাহের প্রধান ব্যক্তি আপনার মনে অনাদি—তা হ'লে কি আর এ রকম গোলযোগ হয়? আমি ভেবেছিলাম—"

রাজার বিরক্তি ক্রোধে পরিণত হইল—তিনি বেশ একটু কড়া সুরেই বলিলেন,—"আপনার যেমন বুদ্ধি! চলেছি মৃত্যুর পথে, এ সময় একটা বালিকার আঁচলে গিরে দিয়ে বিধবা করার জন্য তাঁকে ঘরে বেঁধে রেখে যাব! কেমন ক'রে যে এ কথা আপনার মনে এল, এইটেই আমার আশ্চর্য্য লাগছে।"

শ্যামাচরণ মাথা হেঁট করিলেন, রাজা বলিলেন, "আমি দালানে যাচ্ছি, মুখুয্যেমশায়কে বলুন গিয়ে; তিনি যেন হাসিকে নিয়ে দালানেই আসেন। আর অনাদি ফিরলেই তাকেও দালানে আনবেন। আপনি যেন অন্য কোন কথা এখন অনাদিকে কিছু বল্‌বেন না, যা বলার আমিই তাকে বলব।"

বিচিত্র স্তম্ভাবলী-সুশোভিত মর্ম্মর-প্রস্তরময় ঠাকুর-দালান বিদ্যুতালোকে সমুজ্জ্বল। সম্মুখে উচ্চ বেদীর পশ্চাদ্বর্ত্তী দেয়ালের ভিতরে কারুকার্য্য ক্ষোদিত ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে, তন্মধ্যে প্রসাদপুরের রাজ-বিগ্রহ শ্যামসুন্দর এবং রাধারাণী—বিরাজিত। বেদীর নীচের দিকে গালিচাবিস্তৃত প্রস্তর-মেজিয়ার উপর সম্প্রদানের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, বর-কন্যার আসন, ফুলমাল্য শোভিত ভগবানের প্রতিনিধি-স্বরূপ সাক্ষি-শিলা শালিগ্রাম বিগ্রহ এবং আশে পাশে মাল্য চন্দনের থালা, বসন ভূষণের থালা প্রভৃতি সমস্তই যথানিয়মে রক্ষিত।

কৃষ্ণলালের সহিত হাসি এই দালানেই আসিয়া উপস্থিত হইল। হাসির প্রাণ তখনো রাজার বিপদ-চিন্তায় দুঃখ-প্রপীড়িত। অশ্রুপূর্ণ নয়নে সে রাজাকে কহিল, "ডেকেছেন আপনি?"

হাসির বিষাদ-গম্ভীর মুখ দেখিয়া রাজা আর তৎক্ষণাৎ তাহার বিবাহের কথা তুলিতে সাহস পাইলেন না, শুধু বলিলেন—"হাসি?"

হাসি উত্তর করিলেন, "আজ্ঞা করুন?"

"মুখুয্যেমশায়ের কাছে সব কথা শুনেছ বোধ হয়!"

"ক্ষমা কর্ব্বেন রাজা বাহাদুর! আপনি ফিরে আসুন আগে, তখন ও সব কথা ভাবার সময় আসবে।"

"আমি ফিরে আস্‌ব? তার ত কোন আশা দেখছিনে হাসি?"

রাজা বিষাদ-মলিন ক্ষীণ হাসি হাসিলেন। হাসির অশ্রু শুকাইয়া গেল। রাজকন্যা এই একটু-খানি আগে তাহাকে যে কথা বলিয়াছিলেন—সে কথা তাহার মনের পাতে আটার মত আঁটিয়া গিয়াছিল। সে সতেজ বিশ্বাসে বলিয়া উঠিল, "যদি অমঙ্গল উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি না হয়ে থাকে—ভগবান্ যদি প্রকৃতই মঙ্গল সত্য হন—তবে নিশ্চয়ই অচিরাৎ আপনি মুক্তিলাভ করবেন। মিথ্যার বল সয়তানের বল, সে বল ক্ষণস্থায়ী—সত্যের বলই স্থায়ী পরম বল। এতে আপনি সংশয় করছেন কেন? আপনি যে শীঘ্র মুক্তিলাভ করবেন, আমার তাতে কিছুমাত্র সংশয় নেই।"

রাজা এতদিনে হাসিকে একটি সুন্দর হাসি বলিয়াই জানিতেন; তাহার সেই তরল চঞ্চল মাধুরীর মধ্যে এমন গভীর গাম্ভীর্য্য দেখিয়া তিনি বিস্ময়ে নীরব হইয়া পড়িলেন, মনে মনে ভাবিলেন, এ বাক্য কি দেবতার আশীর্ব্বাদ অথবা দুঃখীজনের প্রতি শুধু মমতার সান্ত্বনা!

হাসি রাজার নিকট হইতে একটু সরিয়া গিয়া দালানে প্রতিষ্ঠিত যুগল দেবতার প্রতি করযোড় হইয়া সর্ব্বান্তঃকরণে একবার প্রার্থনা করিল। তাহার পর পুনরায় রাজার কাছে আসিয়া তাঁহাকে প্রণি-পাতপূর্ব্বক উঠিয়া দাঁড়াইয়া তিনি কিছু বলিবার পূর্ব্বেই দালান পার হইয়া গেল। হাসির পিতা বরাবরই কিছুদূরে দাঁড়াইয়াছিলেন, ধীরে ধীরে ওঁ শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে তিনিও তাঁহার সহবর্ত্তী হইলেন।

একাকী দাঁড়াইয়া রাজার কেবল মনে হইতে লাগিল, উহা কি দেবতার আশীর্ব্বাদ—না শুধুই সান্ত্বনাবাক্য। তাঁহার অন্তর্দেশ—হইতে একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস উথলিয়া উঠিল—সুখে বা দুঃখে সংশয়ে বা বিশ্বাসে, আশায় বা নিরাশায় কে বলিবে!

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ওষ্ঠাধর আকর্ণ বিস্তারপূর্ব্বক সুজন রায় খন্‌খনে হাসি হাসিলেন। হিংসা-পরিতৃপ্তির কি মহানন্দ! যে ভাগ্যবান্, একমাত্র সেই ব্যক্তিই এই সুখ লাভ করে! অতুলেশ্বরকে গ্রেপ্তার করিয়া আনিতে পুলিস কলিকাতায় গিয়াছে; হাতে কড়ি, পায়ে বেড়ি লাগাইয়া খুনী নারকীর মত তাঁহাকে যখন আদালতের কাঠগড়ায় আনিয়া দাঁড় করাইবে, তখন? সেই অপরিমিত সুখ ওরে মন, সইতে পারবি ত তুই? বাছার আমার সেই গর্ব্বদীপ্ত চাঁদপানা মুখখানায় রাহুগ্রাসে অমাবস্যার আঁধি লাগিয়ে দিয়েছে! পূর্ণ গ্রহণ রে পূর্ণ গ্রহণ! দেখবামাত্র মন রে, তোর জীবনের সমস্ত পাপ, তাপ, জ্বালা, মুহূর্ত্তে খণ্ডিত হয়ে যাবে। ওঃ সে কি পরমানন্দ! বল রে মন, জয় জয় সুজন রায়ের জয়।

শয়ন-গৃহের পার্শ্বের যে কুঠরীতে গাদি গাদি রসিদপত্র চারি দেয়াল আচ্ছন্ন করিয়া কড়িকাঠ স্পর্শ করিয়াছে, রাত্রিকালে সেই ঘরের মধ্যে একখানা ইজিচেয়ারে বসিয়া সুজন রায় স্থিরমরূপে তাঁহার

নব সৌভাগ্যের কথা ভাবিতেছিলেন। ভাবিতে ভাবিতে হাসিটা যখন একটু কমিয়া আসিল, শয়নগৃহে আসিয়া তখন খাটের মশারিটা তুলিয়া ধরিয়া গৃহিণীকে একটা ঠেলা দিয়া বলিলেন - "ওগো, শুনছ?" গৃহিণী ঘুমের ঘোরেই রাগ করিয়া বলিলেন —"জ্বালাতন করো না বল্‌ছি, ঘুমোতে হয় ঘুমোও —নইলে উঠে যাও।"

গৃহিণীর মনের ধারণা, প্রভুটি তাঁর শয্যাপার্শ্বেই আছেন। সুজন রায় বুঝিলেন, এ আনন্দের ভাগীদার—তাঁহার মনটিকে ছাড়া দ্বিতীয় কাহাকেও আর পাইবেন না তিনি,—একাকীই তাঁহাকে ইহার সমস্ত ভার বহন করিতে হইবে।

ঘড়ীতে ঢং ঢং করিয়া দুইটা বাজিল,—তিনি মশারিটা ফেলিয়া দিয়া ভৃত্য ভোঁদার তল্লাসে দালানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কম্বলাবৃত ভোঁদা তখন ভূমিতলে মশারিশূন্য মাদুরে শুইয়া প্রভুর ডাক-হাক এবং মশার দংশন ভুলিয়া দিব্য আয়েসে নাক ডাকাইতেছিল। পায়ের ঠেলায় তাহার সুখনিদ্রা ভঙ্গ করিয়া সুজন রায় কহিলেন, অনেক "ঘুমিয়েছিস্—ওঠ বেটা এখন, এক ছিলিম তামাক দে।" ভোঁদার এখানে শুইবার উদ্দেশ্যই ছিল তাহাই। সে চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে উঠিয়া দালানের এক কোণে রক্ষিত সরঞ্জামাদি হইতে অবিলম্বে এক ছিলিম তামাক সাজিয়া হুঁকাটি বাবুজীর হস্তে দিয়াই একবার অন্য রাত্রিকার মত এখান হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। হুঁকার ঘড়ঘড়ানি এবং কাসির খক্‌খকানিতে অতঃপর রাত্রির নিস্তব্ধতা বিচলিত করিয়া তুলিয়া রায় মহাশয় কতকটা সংযতচিত্ত হইয়া ভাবিলেন—"না, আদালতে তাকে দেখতে যাওয়া হবে না; লোকে নিন্দা করবে। আমলাদের মুখের কথাতেই তার অন্ধকার চেহারাখানা আমার চোখে চাঁদের মতই ফুটে উঠবে! দরকার কি সেখানে যাবার, ভাল দেখাবে না—সেটা ভাল দেখাবে না—বুঝলি ত ও মন, সেটা ভাল দেখাবে না।"

তিনটা বাজিল, কলিকার আগুনটুকুও প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিল—তিনি এইবার 'পদ্মনাভ'কে স্মরণ করিয়া খাটে উঠিলেন। বিছানায় বসিয়া ভাবিলেন —"এখন থেকে রায়-বংশের প্রধান হ'লেম ত আমরাই, অখণ্ড রাজ্যের বিরাট অধিনায়ক ত আমরাই!" অপর্য্যাপ্ত আনন্দে তাঁহার হৃদয়খানা ফাটিয়া উঠিতে চাহিল--তিনি আবার গৃহিণীকে ডাকিলেন—"শোন না গো,—ম্যাজিষ্ট্রেট স্পষ্ট ক'রে ব'লে গেছেন,—বিজনকেই তিনি গদিতে বসাবেন—তোমার ছেলে রাজা হবে—ওগো রাজা হবে—শুনছ ত?" গৃহিণী কোন উত্তর করিলেন না; তাঁহাকে ঠেলিয়া উঠাইতে আর সাহস হইল না। রায় মহাশয় তখন পাশ ফিরিয়া চোখ বুজিলেন—নয়ন মুদ্রিত রহিল—কিন্তু অধরোষ্ঠ আবার হাস্যরেখায় বিস্ফারিত হইয়া উঠিল—"হায় রে অতুল, বাছা আমার! এত দিন যে অহঙ্কারে মাটীতে তোর পা পড়ত না! আমার ছেলেকেও তাই কন্যাদানে অস্বীকৃত হয়েছিলি তখন! এইবার পথে এস বাবা! তোমার মেয়ে যতই সুন্দরী হোক্ না কেন—আমার পুত্রবধূ হবার যোগ্য নয়—নয়—নয়! কে চায় মেয়েকে তোর—কে পোঁছে!"

এইরূপ সুখকল্পনায় সুজন রায় বিনিদ্র রাত্রি যাপন করিলেন। কিন্তু সয়তানের এত আনন্দ দর্পহারীর প্রাণে বাজিল, তাঁহার মহাসুপ্তি ভঙ্গ হইল।

পরদিন সুজন রায় সংবাদ পাইলেন, অতুলেশ্বর জেলবন্দী হয়েন নাই, জামীনমুক্ত হইয়া বিচারশেষ পর্য্যন্ত আপাততঃ প্রসাদপুর-প্রাসাদেই আটক রহিলেন। আরও শুনিলেন যে, বিলাতেও তাঁহার পক্ষ হইতে আবেদনপত্র গিয়াছে। ক্রাউডেন সাহেব পার্লামেন্টের এক জন মেম্বর—হয়কে নয় করিতে তাঁহার কতক্ষণ। তাঁহার চেষ্টায় রাজ-বিরুদ্ধের সমস্ত প্রমাণ হয় ত বা অপ্রমাণ হইয়া পড়িবে—ফলে রাজা যিনি, তিনি রাজা, আর ভিখারী যে, সে ভিখারীই থাকিয়া যাইবে। তবুও দুরাশার আশা বুকে আঁটিয়া তিনি সুসংবাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। চামুণ্ডা-মন্দিরে ঘন ঘন পাঁটা, মহিষ বলি এবং গৃহে হোম-স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতি নিয়মিত চলিতে লাগিল। তবু কিন্তু ভাগ্যদেবী প্রসন্ন হইলেন না, প্রায় আড়াই বৎসর অপেক্ষার পর, রাজা জানিবার পূর্ব্বেই মনরো সাহেবের পত্রে তিনি জানিলেন, ক্রাউডেন সাহেবের চেষ্টার ফল ধরিয়াছে। মনরো সাহেবের বিরুদ্ধ-চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া খুব সম্ভব রাজা শীঘ্রই মুক্তিলাভ করিবেন। সুজনের আশা-ভরসা, বজ্রদণ্ডে যেন চূরমার হইয়া গেল, বিপদের সময় আবার তাঁহার মনে পড়িল রাজকন্যাকে। এই অকূল পাথারে তিনিই একমাত্র তাঁহাদের আশা-তরণী। তাঁহার সহিত যদি পুত্রের বিবাহ দিতে পারেন, তবেই সব দিক রক্ষা পায়। কিন্তু অতুলেশ্বর যেরূপ একগুঁয়ে লোক—প্রেমারার তাড়ায় যদি তাহাকে বশে আনিতে পারেন ত পারিলেন, নহিলে এ আশাও তাঁহার বৃথা। এই উদ্দেশ্য মনে ধরিয়া সুজন রায়

অবিলম্বে একদিন রাজমাতার সহিত দেখা করিতে গেলেন।

আজ রাজকন্যার জন্মদিন, উৎসব সমারোহ কিছু নাই। রাজা কেবল প্রাতঃকালে কন্যার শিরশ্চুম্বনপূর্ব্বক সাশ্রুনয়নে বলিলেন, "সুখী হও বৎসে!" রাজকন্যাও কাঁদিতে কাঁদিতে পিতাকে নীরবে প্রণিপাত করিয়া উঠিলেন। ইহার পর আরতি পূজার সময় রাজা সপরিবারে এবং ভৃত্যাদি-বর্গের সহিত দেবমন্দিরে গিয়া কন্যার উদ্দেশ্যে সমবেত মঙ্গল-প্রার্থনা করিলেন এবং দ্বিপ্রহর আরতিকালে আর একবার মহারাণী—রাজকন্যাকে সেখানে লইয়া গিয়া পূজা ও ভোগ-শেষে প্রসাদান্ন তাহার মুখে দিয়া প্রিয়তমা নাতিনীর জন্মোৎসবপর্ব্ব শেষ করিলেন।

আরতি পূজার পর পুত্রপৌত্রীকে খাওয়াইয়া স্নানাহ্নিক-শেষে রাজমাতা যখন উপরে উঠিলেন, তখন বেলা প্রায় তিনটা। ঠাকুর-ঘরের পাচক অল্প আগে প্রসাদান্ন আনিয়া তাঁহার গৃহে রাখিয়া গিয়াছে; জ্যোতির্ম্ময়ী ঠাকুরমার আগমন-প্রতীক্ষায় ঘরে আসিয়া বসিয়াছে। রাজকুমারীর জোর-জবরদস্তী অনুরোধে ঠাকুরমার দিনান্তে একবার করিয়া অন্ন গ্রহণ করিতেই হয়। মহারাণী গৃহ-দালানে আসিয়া রেলিংয়ের নিকট ঊর্দ্ধমুখী হইয়া দাঁড়াইয়া, জপমালা মাথায় ঠেকাইয়া আজ প্রথমেই নলিনীর মঙ্গলকামনায় সূর্য্যপ্রণাম করিলেন। তাহার পর পুত্রের মঙ্গল-ভিক্ষা করিয়া, মালাগাছি দেওয়ালের যথাস্থানে টাঙ্গাইয়া রাখিয়া, আহারস্থানে যাইবার মানসে সবে মাত্র পা বাড়াইয়াছেন—এমন সময়—নন্দী দাসী খবর দিল—"রায় মশয় দেখা করতে আইছেন—গো মহারাণি মা।"

ঠাকুরমা দালানে আসিতেই জ্যোতির্ম্ময়ী গৃহের বাহিরে আসিয়াছিল। এই খবর শুনিয়া সে বলিয়া উঠিল—"বাইরেই তাঁকে কিছুক্ষণ বসতে ব'লে দাও নন্দী। ঠাকুরমা, লক্ষ্মীমা, তুমি শীগ্‌গির খেয়ে নেও, বেলা প'ড়ে গেছে, খেয়ে তাঁকে খবর পাঠালেই হবে।"

ঠাকুরমা বলিলেন—"সেটা ভাল হবে না রাজা" —(মহারাণী নাতনীকে আদর করিয়া যখন তখন রাজা বলিয়া ডাকেন) "সুজন এসেছেন,—দেখা শেষ ক'রেই খাব এখন, এতই কি খাবার তাড়া?"

কিন্তু উভয়ের বিবাদ নিষ্পত্তি হইতে না হইতে সুজন রায় স্বয়ং দালানে আসিয়া দেখা দিলেন। জ্যোতির্ম্ময়ী বিরক্তভাবে গৃহমধ্যে লুকাইয়া পড়িল—তাঁহাকে সমাদৃত করিবার অভিপ্রায়ে রাজমাতা অগ্রসর হইয়া নিকটে দাঁড়াইলেন।

অভিজাতমহত্বে মহারাণীর হৃদয় পূর্ণ। তিনি ধর্ম্মশীলা, উদার এবং সরল প্রকৃতি। সুজন রায় মিত্র নহেন, জানিয়াও তিনি তৎপ্রতি মন্দভাব পোষণ করিতেন না। সুজনের মনে যাহাই থাকুক—বাহ্যিক আত্মীয়তার অভাব তিনি কোন দিন দেখান নাই সুখে-দুঃখে সময়ে-অসময়ে খোঁজ-খবর লইতে আসিয়াছেন। সুতরাং এই বিপদের দিনে তাঁহার আগমন মহারাণী সহজ ভাবেই গ্রহণ করিলেন; এবং মনে মনে ইহাতে সন্তুষ্টও হইলেন। সুজন রায় তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সেই দেবীতুল্য ম্লানমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া—কি বলিবেন, ভাষা খুঁজিয়া পাইলেন না। মহারাণী হস্তোত্তোলনে আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন—"ভাল আছ ত ঠাকুরপো?"

মনে সয়তানের ভাব, মুখে সুজন রায় উত্তর করিলেন—"আর ভাল বৌঠান—বেঁচে আছি, এই-মাত্র। মনে কি আর সুখ আছে, মহারাণি!"

এই সহানুভূতিবাক্যে মহারাণীর রুদ্ধ অশ্রু উথলিয়া উঠিতে চাহিল; অঞ্চলে নয়ন মুছিয়া যথাসাধ্য সংযতভাবে তিনি কহিলেন—"এস ভাই, ঘরে গিয়ে বসবে এস।" অন্তঃপুরের অভ্যর্থনাগৃহে তিনি তাঁহাকে লইয়া গেলেন।

বলা বাহুল্য, এই গৃহ বহুমূল্য আসবাবদ্রব্যাদিতে রাজোচিত সজ্জায় সজ্জিত। স্বদেশী-বিদেশী ভদ্রমহিলাগণ অন্তঃপুরে আসিয়া এই ঘরেই বসেন। কিন্তু এই আড়ম্বরপূর্ণ কোমল আস্তরণমণ্ডিত কৌচ-চৌকির এক প্রান্তে গরুড়বাহন একখানি যে ক্ষুদ্র কাষ্ঠাসন—তাহাই মহারাণীর উপবেশনস্থল।—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, স্বামীর মৃত্যুর পর হইতে মহারাণী কোমল শয্যা ত্যাগ করিয়াছেন।

উভয়ে এই কক্ষে প্রবেশ করিবার পর সুজন রায় অশ্রু-আনতমুখী রাজমাতার হাত ধরিয়া তাঁহাকে উক্ত আসনে বসাইয়া নিজে নিকটের মখমলচৌকি একখানায় বসিয়া বলিলেন—"কেঁদো না বৌঠান, কেঁদো না; তোমার এ ভাইটি যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ কোন ভয়-ভাবনা নেই, ধনপ্রাণ দিয়ে আমি অতুলকে উদ্ধারের চেষ্টা করছি; ভেবো না।"

সেই আশ্বাসবাণীতে রাজমাতার সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিল কি না কে জানে, তবে অকূলপাথারে ভাসিলে মজ্জমান ব্যক্তি কুটাখণ্ডকেও আশ্রয়রূপে গ্রহণ করিতে চায়।

তিনি সুজনের প্রতি কৃতজ্ঞ দৃষ্টিপাত করিয়া

বলিলেন—"মঙ্গল হোক, দাদা, তোমার মঙ্গল হোক।"

সুজন বলিলেন—"তোমার আশীর্ব্বাদ মাথায় ধরি মহারাণি—তবে কি জান; এ সময় আমার নিজের মঙ্গল-অমঙ্গলের চিন্তা আমি একেবারেই ভুলে গেছি। আমি কেবল ভাবছি এ বিপদ্ থেকে তোমাদের উদ্ধার করব কি ক'রে? আচ্ছা, বৌ-ঠাকরুণ, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—মেয়েটার কি করছ তোমরা? এ সময় তার একটা হিল্লে করলে ভাল হ'ত না?"

মহারাণী বলিলেন—"তা হ'ত বই কি?"

"তবে হচ্ছে না কেন? তোমরা আমাকে পর, শত্রু যাই ভাব—আমি ত তোমাদের ভাবনা মন থেকে তাড়াতে পারিনে। আমি ত ছেলে দিতে রাজী আছি তোমাদের; বিয়েটা দিলেই ত হয়।"

"আমার আর তাতে অনিচ্ছা কি ভাই! কিন্তু এ সময় ত অতুলকে ও কথা বলা যায় না।"

"কেন যায় না, তা ত আমি বুঝতে পারিনে। মেয়ে বড় হ'লে তাকে সৎপাত্রস্থ করা ত পিতার কর্ত্তব্য! আসল কথা—অতুল ভাবছে—শত্রুর ছেলেকে মেয়ে দেবো কি ক'রে? স্পষ্ট কথা দিদি—সুজন রায় স্পষ্টবাদী লোক। আবে! শত্রুই যদি হব—তবে তোর বিপদে তোর অপমানে আমার প্রাণ জ্বলে কেন? বিষয়ের অংশীদার হ'লে বিষয়-আশয় নিয়ে অমন ঝগড়াঝাঁটি হয়েই থাকে; কিন্তু তাতে কি মনের আত্মীয়তা নষ্ট হয়? আমি বৌঠান সরলপ্রকৃতির লোক, ও রকম শত্রুভাব আমার মনে ঠাঁই পায় না।"

বলিয়া সুজন রায় থামিলেন; রাজমাতাও ভাবিয়া পাইলেন না, এ কথার কি উত্তর দিবেন। গৃহ নীরবতামগ্ন হইল। কিছু পরে সুজন বিষভরা খন্‌খনে হাসি একটু হাসিয়া আবার কহিলেন—"আমি যদি সত্যই অতুলের শত্রু হতুম তা হ'লে কি আজ সে রক্ষা পেতো?" বলিয়া পকেট হইতে সেই জাল চেকখানা বাহির করিয়া তাঁহাকে দেখাইয়া বলিলেন, "এই যে কাগজখানা দেখছ; এ হচ্ছে—দশটি হাজার টাকার একখানি চেক; অতুল বিদ্রোহী ছেলেদের এখানি দিয়েছিলেন, কোন গতিকে এখানা আমার হাতে এসে পড়েছে। কি ক'রে যে আমি পেলাম, সে কথা তোমাকে ব'লে কোন লাভ নেই, অতুলকে পরে বলব; এখন এখানা আমি যদি কোর্টে দাখিল করি, তা হ'লে কি হয় ভাব ত! বাবাজী যে বিদ্রোহীদের পিঠ থাবড়াচ্ছিলেন, এ থেকে সেটা স্পষ্টই প্রমাণ হয়ে যায়!"

মহারাণী সভয় আগ্রহে বলিয়া উঠিলেন—"ছিঁড়ে ফেল ঠাকুরপো—এখনই ছেঁড়ো ওখানা।"

"ফেলবই ত! আমি শুধু এখানা দেখাতে এনেছি তোমাকে। অতুলকেও একবার দেখাব, না দেখলে ত সে বিশ্বাস করবে না, বুঝবে না ত আমি তার শত্রু কি মিত্র!"

মহারাণী আবার আকুলস্বরে অনুরোধ করিয়া বলিলেন—"বুঝবে, অতুল বুঝবে, ছেঁড় তুমি ভাই কাগজখানা—"

সুজন মহারাণীর অনুরোধে বিচলিত না হইয়া কাগজখানা বেশ বাগাইয়া ধরিয়া বলিলেন—"এক-বার কাণ্ডটা দেখ অতুলের, দশটি হাজারের চেক দিয়েছে কি না বিদ্রোহী ছেলেদের! একেবারে সর্ব্বনেশে প্রমাণ।"

মহারাণীর মাথা দেয়ালে ঝুঁকিয়া ঠক্ করিয়া উঠিল। তিনি মুদ্রিত-নয়নে অর্দ্ধ-অচেতনভাবে বলিয়া উঠিলেন—"শ্যামসুন্দর, হরি হে, এ কি কাণ্ড তোমার! কি খেলা এ খেলছ তুমি আবার আমাদের নিয়ে!"

সুজন রায় উঠিয়া তাঁহার মাথা তুলিয়া ধরিবামাত্র তিনি নিজেই পুনরায় ঠিক হইয়া বসিলেন। সুজনের নিষ্ঠুর কটাক্ষে তাঁহার অশ্রু স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। কোমল বাক্যে নয়নব্যক্ত সেই কঠোরতা চাপিতে চেষ্টা করিয়া সুজন বলিলেন—"ভয় নেই মহারাণি আমি, তোমাদের শত্রু নই। তবে এটা ত বোঝ, বেশী রগড়ালে ভাল জিনিষও মন্দ হয়ে ওঠে। বিশ্বাসেই বিশ্বাস আনে, আমি যে তোমাদের জন্য এত করছি, সেটা তোমাদেরও ত বোঝা চাই।"

"বুঝছি ঠাকুরপো, বুঝছি—রক্ষা কর ভাই তুমি।"

"বুঝছ কোথা? মেয়ে দেবার বেলা বলছ—'তা হবে না'। এতে কি মন বেগড়ায় না? স্পষ্ট কথা আমার মহারাণি, সুজন রায় স্পষ্টবাদী লোক। আমাকে মিত্র ভাব, তোমাদের কোন বিপদ নেই—নইলে মানুষ ত আমি—রাগের মাথায় যদি কিছু ক'রে ফেলি, তখন কিন্তু দুষো না আমাকে। চল্লুম এখন—একবার ভেবে-চিন্তে দেখো। অতুলকেও সব ব'লে যাই।"

রায় বাহাদুর চলিয়া গেলেন, মহারাণী অকূল-চিন্তায় মুহ্যমান হইয়া বসিয়া রহিলেন। রাজকন্যা আসিয়া ডাকিলেন—"ঠাকুরমা।"

রাজমাতা চমকিয়া উঠিলেন। জ্যোতির্ম্ময়ী কাছে আসিয়া হাত ধরিয়া টানিয়া বলিলেন—"চল ঠাকুরমা—খেতে চল, বেলা প'ড়ে গেছে একেবারে—আর দেরী করলে চলবে না।"

রাজমাতা উঠিয়া রাজকন্যার কাঁধে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন—"খাব না, রাজা, খাব না এখন, নিয়ে চল আমাকে শ্যামসুন্দরের কাছে, তাঁর পদতলে হত্যা দেব, তিনি আমাকে নিন—নয় অতুলকে বাঁচান।" বলিতে বলিতে মহারাণী ভূমিতলে কার্পেটের উপরই শুইয়া পড়িলেন। রাজকন্যা কাছে বসিয়া মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "কি হয়েছে ঠাকুরমা—নতুন কিছু কি রায়-খুড়ো ব'লে গেলেন?"

অতুলেশ্বর সুজনকে রায়-খুড়ো বলেন, তাই জ্যোতির্ম্ময়ীও তাঁহাকে সেই নামে ডাকেন।

"বলবে আর কি? অতুল যে চেক বিদ্রোহী ছেলেদের দিয়েছিলেন, সেই চেক তার হাতে এসেছে, সেটা দেখালেন। এ চেক আদালতে যদি দাখিল করেন তিনি, তবে আর কোন কথাই মানবে না সরকার।"

এ কথায় অবিশ্বাস করিবার কিছু ছিল না; রাজকন্যার মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া উঠিল। একটুখানি দম লইয়া তিনি বলিলেন, "রায়-খুড়ো কি সত্যিসত্যি সে চেক কোর্টে দাখিল করবেন? এতদূর সর্ব্বনাশ কি তিনি আমাদের করতে পারেন?"

যাহার অন্তঃকরণ মহৎ—সে এইরূপ করিয়াই ভাবে।

মহারাণী বলিলেন, "বলেছে ত সুজন—তা করবে না—তবে—"

"তবে কি?"

"বন্ধুতার বদলে তিনি বন্ধুতা চান।"

"সে কথা ত বলাই বাহুল্য, এ উপকার কি আমরা কখনো ভুলতে পারব?"

"আরে পাগলি, তিনি চান তোকে তাঁর পুত্রবধূ করতে; তা নইলে—"

রাজমাতার আর কথা ফুটিল না; রাজকন্যাও নিস্পন্দ নির্ব্বাক্ হইয়া গেলেন, সুজনের সর্ত্ত বুঝিতে পারিলেন।

কিছু পরে উঠিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন, ঊর্দ্ধমুখ হইয়া মনে মনে কহিলেন—"হে নির্ম্মম নিষ্ঠুর বিধাতা, ঐটুকু পারি নি শুধু; নিজের কণ্ঠ তোমার খাঁড়ার তলে বাড়িয়ে ধরেছি, তবু ঐটুকু পারি নি প্রভু, ঐটুকু পারি নি। আমার ভালবাসার দেবতাকে মন থেকে ছিন্ন ক'রে তোমার চরণে বলি দিতে পারি নি। তুমি কিন্তু নিষ্ঠুর হরি—তাই চাও, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক; পরীক্ষা শেষ কর, যাহা অসম্ভব, তাহাই সম্ভব হোক, আমার হৃদয়প্রাণের পরিপূর্ণ সম্পদ অখণ্ড প্রেম খণ্ড খণ্ড ক'রে তোমার চরণে সমর্পণ করি—এ বলি তোমার গ্রহণীয় হোক্।"

ফিরিয়া আসিয়া ঠাকুরমাকে বলিল—"ঠাকুরমা, ভেবো না তুমি, ওঠো, কিছু খেয়ে নেবে চল, যা বলছ তুমি, তাই হবে।"

ঠাকুরমা বিস্ময়ে উঠিয়া বসিলেন। রাজকন্যা বলিলেন, "এখনও সম্ভবতঃ রায় বাহাদুর খাবার ঘরেই আছেন—আমি যাই—আর দেরী করব না। আমার যা বলবার, তাঁকেই বলব। তুমি চল, প্রসাদ মুখে দাও একটু।"

রাজমাতার বুক ফাটিয়া উঠিল, রাজকুমারীর মনের বেদনা তিনি নিজের মনে অনুভব করিলেন, কাতর দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"উঠছি, রাজা, উঠছি, তুই যা, আমি উঠছি।"

রাজকন্যা চলিয়া গেলেন, রাজমাতা মন্দিরে গিয়া শ্যামসুন্দরের পদতলে ধন্না দিয়া পড়িলেন।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

"নানি গো, নানি, শোন্ গো নানি; নানায়ে আজ আনতে যাচ্ছি মোরা তোর তরে।"

বয়সভারে অবনতপৃষ্ঠ হইয়াও এক জন বৃদ্ধা লাঠি হাতে বেশ জোরে জোরেই পথ চলিতেছিল। রাস্তার দুষ্ট ছোকরা দুই জন বুড়ীর এই হাস্যকর সামর্থ্যে কৌতুকপীড়িত হইয়া উক্তরূপ সম্ভাষণবাক্যে অভিনন্দিত করিতে করিতে কভু বা তাহার নিকটে, কভু বা হাসিয়া বুড়ীর উদ্যত লাঠির বজ্রকোপ হইতে কিছু দূরে হটিয়া দাঁড়াইতেছিল। এইরূপ আন্তর্জ্জাতিক বাধা-বিঘ্নসত্ত্বেও বুড়ীর গতি এবং ছেলেদের ব্যঙ্গোক্তি কিন্তু বেশ অবিরামগতিতেই চলিয়াছিল।

ক্রমশঃ এই রহস্যালাপ গড়াইয়া আসিল প্রসাদপুর-প্রাসাদসন্নিহিত রাজপথে। তখন বেলা দুইটা। পথে বড় একটা লোকচলাচল নাই। এক জন চুড়িওয়ালা এই কৌতুকদৃশ্যের মধ্যে আসিয়া পড়িয়া ডাক-হাক বন্ধ করিয়া দিয়া এইখানেই দাঁড়াইয়া গেল। রাস্তার অপর পার্শ্বের এক জন গাড়োয়ান এই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া হাসিয়া গরুর ল্যাজ মলিতে

মলিতে 'চল রে বেটা চল' বলিয়া গাড়ী হাঁকাইয়া দিল। ছেলেরা বুড়ীর বাক্যবাণ এবং লগুড়শক্তিকে একই সঙ্গে নিঃশক্তি ব্যর্থ করিয়া দিয়া একটু দূরে সরিয়া গিয়া হাঁকিল—"নানি গো নানি, এত রাগ কেন গো নানি, নানারে আনি হাজির করিব মোরা এখুনি।"

রাজা তখন বারান্দায় একাকী বসিয়া ছিলেন, গোলযোগ শুনিয়া রেলিঙের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। উক্তরূপ ব্যঙ্গাভিনয় দেখিয়া তাঁহার ওষ্ঠাধরে করুণ হাসির রেখাপাত হইল। দুর্ব্বলে সবলে চিরদিনই এইরূপ নিষ্ঠুর অভিনয় চলিয়া আসিতেছে। বিধাতার করুণ নীতি প্রকৃতির এই নিষ্ঠুর শক্তিকে অতিক্রম করিয়া কোনও দিন সর্ব্বেসর্ব্বা হইতে পারিবে কি না, কে জানে।

রাজা একবার গেটের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার দ্বারপাল কেহ ত এই গোলযোগ নিবারণের চেষ্টা করিতেছে না! তাঁহার মনের কথা মনেই মিলাইয়া পড়িবার পূর্ব্বেই এক জন প্রহরী ছেলেদের তাড়াইয়া আসিল। কারণ, বুড়ী অনন্যগতি হইয়া রাজদ্বারে আসিয়া প্রহরীর আশ্রয় ভিক্ষা করিয়াছিল। রাজা দেখিলেন, সে প্রহরী রাজদ্বারপাল নহে, পুলিস পাহারাওয়ালা। সে লাঠি বাগাইয়া ডাক-হাঁক করিতেই ছেলেরা এবার হাসিতে হাসিতে অদৃশ্য হইয়া পড়িল। বুড়ী কিছুক্ষণ দ্বারে দাঁড়াইয়া, একটু দম লইয়া, নিশ্চিন্ত আরাম আবার পথযাত্রা করিল। পুলিসকে দেখিয়া রাজার মনে পড়িয়া গেল, তিনি বন্দী। এত দিন স্বরাজ্যে বন্দী ছিলেন, এখন স্বগৃহে বন্দী। রাজা বারান্দার অন্যপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

পরিষ্কার দিন, শুভ্র মেঘস্তরে সজ্জিত নীলাম্বরতলে ডানা বিছাইয়া দিয়া দুই একটি চিল পাতার মত ভাসিতেছে, আশেপাশে দুই একটি ক্ষুদ্র চাতক পক্ষ আস্ফালন করিয়া পতঙ্গের আকারে উড়িতেছে, দিগন্তের ধার দিয়া বকের সার উড়িয়া গেল, কাকগুলা আম-কাঁঠালগাছের আগায় বসিয়া কা কা ডাক ছাড়িতেছিল, নিভৃত কাননকুঞ্জে গাছের আড়ালে লুকাইয়া ছোট একটি পাখী সুন্দর শিশ ধরিয়াছিল, হঠাৎ শিশ বন্ধ করিয়া উড়িয়া আসিয়া রাজার সম্মুখবর্ত্তী প্রস্তরমূর্ত্তিটির মাথার উপর বসিল, পাথরের একটি শুভ্রাসনের উপর আনতমুখী উক্ত সুগঠিতা মূর্ত্তি পা ঝুলাইয়া বসিয়া, দুইটি ক্ষুদ্র হরিণ-শিশুর গাত্রে দুই হাত রাখিয়া সস্নেহ-দৃষ্টিতে তাহাদিগকে দেখিতেছে। একটি শাবক তাহার কোলের উপর শয়ান, অন্যটি মূর্ত্তির অঙ্কে পা মুড়িয়া দিয়া তাহার দিকে উর্দ্ধমুখ হইয়া আছে, যেন বলিতেছে, আমাকে কোলে উঠাইয়া লও। কোন নিপুণ স্বদেশী ভাস্কর রাজকন্যাকে আদর্শ করিয়া স্নেহময়ী এই শকুন্তলামূর্ত্তি গড়িয়াছিলেন। রাজা ইহার দিকে চাহিয়া কন্যার কথাই ভাবিতে লাগিলেন। মাথার উপর শাণিত অস্ত্র দোদুল্যমান, কখন্ খসিয়া পড়িয়া তাঁহাকে ভূপাতিত করিবে, তাহার ঠিক নাই। তৎপূর্ব্বে কন্যার বিবাহ হইয়া গেলেই তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন। কিন্তু শরৎকুমার ত এখন জেলে, বিচারশেষে তাহার ভাগ্যে কি আছে, কে জানে। অথচ ডাক্তার তাঁহাদের জীবনের সহিত এত দূর জড়িত যে, অন্য কাহাকেও জামাতা করিবার কথা তিনি মনেই আনিতে পারেন না। অনুষ্ঠানপূর্ব্বক না হউক, প্রকৃতপক্ষে জ্যোতির্ম্ময়ী শরৎকুমারেরই বাগ্‌দত্তা, কন্যাও যে তৎপ্রতি অনুরাগিণী, ইহাতেও তাঁহার মনে সন্দেহ নাই। হাসিকেও তাঁহার মনে পড়িল। কিন্তু হাসির ত পিতা-মাতা আছেন। অনাদির সহিত সহজেই তাহার বিবাহও হইতে পারিবে। কিন্তু জ্যোতির্ম্ময়ীকে দেখিবার তিনি ছাড়া আর যে কেহই নাই।

হঠাৎ তাঁহার চিন্তাভঙ্গ হইল। শুনিলেন—"ভাল আছ ত বাবা!" চমকিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া দেখিলেন, যাঁহার সংস্রবে তিনি একবারেই আসিতে চাহেন না, সেই ব্যক্তিই তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। কৈ, কেহ ত তাঁহাকে সুজন রায়ের আগমনসংবাদ জানাইয়া যায় নাই। আবার মনে পড়িয়া গেল, তিনি বন্দী, তাঁহার ভৃত্যেরাও পুলিসের হুকুমবরদার। সুজন সম্ভবতঃ পুলিসের সম্মতিক্রমেই এখানে চলিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাকে জানান্ দিবার প্রয়োজনই বোধ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার মনের এই বিরক্তিভাব তাঁহার ভদ্রতা-সৌজন্যের মধ্যে লুকাইয়া পড়িল। মনে মনেই মনকে সবল কশাঘাত করিয়া, সহজ প্রশান্তভাবেই সুজনকে নমস্কার করিয়া কহিলেন, "এই যে খুড়া মশায়, কি মনে ক'রে? বসতে আজ্ঞে হোক।"

"বসছি বাবা; তুমিও বোসো, এই দেখতে এলুম তোমাকে।"

দুই জনে রেলিঙের নিকটবর্ত্তী দুইখানা চৌকিতে উপবিষ্ট হইলেন। সুজন রায় বসিয়া রাজার দিকে বেশ ভাল করিয়া নজর দিলেন। চেহারাখানা একটু যেন রোগা রোগা, কিন্তু এখনও মূর্ত্তি দিয়া তেজ যেন ঠিকরিয়া পড়িতেছে।

রায় বাহাদুর বড়ই মুসড়িয়া গেলেন। কিছু পরে বলিলেন—"এখনকার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কিছু ঠাণ্ডা-মেজাজের লোক, এখানে তাই তবু তোমাকে থাকতে দিয়েছে। হাকিম যে বিচার করতে আস্‌ছে, সে না কি বড় কড়া, শুনে পর্য্যন্ত ভাবনায় অস্থির হয়ে পড়েছি।"

অতুলেশ্বর মনে মনে হাসিয়া গম্ভীর মুখে বলিলেন—"অত ভাবনা করবেন না, খুড়ো।"

"বল্লেই কি বাবা মন প্রবোধ মানে? তোমার খুড়ীমা ত আহার-নিদ্রা ত্যাগ করেছেন। আস্‌তে চাচ্ছিলেন আজ তিনি, আমি বল্লুম, আগে নিজে গিয়ে একবার দেখে আসি।"

"আনলেন না কেন তাঁকে? তিনি এলে খুব খুসীই হতুম।

রাজা সত্য কথাই কহিলেন। উত্তরে সুজন বলিলেন, "হ্যাঁ, তা আনব এবার। কিন্তু আসবেই বা কখন্? তিনি ঠাকুরঘরে ত সারাদিন ধন্না দিয়েই প'ড়ে আছেন। বিচিত্র লীলা ভগবানের, রাজাকেও তিনি ফকীর বানাচ্ছেন—আর ফকীরকেও রাজমুকুট পরাচ্ছেন।"

সহানুভূতি প্রকাশ করিতে গিয়া তাঁহার বাক্যের মধ্য দিয়া আনন্দ লীলায়িত হইয়া উঠিল; কৌতুক-দৃষ্টিতে তাহা দেখিয়া রাজা বলিলেন—"এবার চামুণ্ডা-পূজায় কত বলি দিলেন খুড়া মশায়?"

সুজন ইহার অর্থ বুঝিলেন; কিন্তু না দমিয়া অন্য অর্থে কথাটা ঘুরাইয়া লইয়া বলিলেন—"এ বিপদের সময় বলি দেব না ত কখন্ আর দেব? শাস্ত্র যে মানে, বলির মাহাত্ম্যও তাকে মানতে হয়। আজকালকার ছেলেদের মতিগতি সব উল্টো—কিন্তু তাতে কি সংসারে সুখবৃদ্ধি হচ্ছে?"

অতুলেশ্বরও এ বাক্যবাণ সহজেই পরিপাক করিয়া লইয়া কহিলেন, "ঠিক বলেছেন খুড়ো। জীবনটা ভুলের মধ্যেই কাটলো, যদি সময় পাওয়া যায়, তা হ'লে আপনার পথ ধ'রেই চলতে শিখব।"

সুজন রায় জিভ কাটিয়া বলিয়া উঠিলেন—"ও কি কথা বলিস? অমন কথা মুখে আনিস্ নে, তোর এ খুড়ো যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ তোদের বিন্দুবিসর্গ চিন্তা নাস্তি। তুই ভাবিস, আমি তোর শত্রু,—বিষয়ের অংশীদার হ'লে সময় সময় শত্রুতা করতে হয় বৈ কি, কিন্তু এখন যে তোর অপমানে রায়বংশের অপমান, এ অপমান ত আমার প্রাণে সহ্য হচ্ছে না। এই কথা আমি মহারাণীকেও বলছিলুম, আর তোমাকেও বলছি।"

"এ সময় তাঁর দেখা পেলেন?"

"কেন পাব না? আমি কি বেগানা লোক না কি? তিনি আমার কাছে মেয়েটার জন্য কত দুঃখই করলেন। তাঁর ভারী ইচ্ছে, আমি পুত্রবধূ করি তাকে। আমিও ত এতে আপত্তির কোন কারণ দেখিনে, তুমি বল্লেই দিনক্ষণ একটা ঠিক হয়ে যায়।"

রাজার মনে এ কথায় বেশ বড় রকম একটা ক্রোধের তরঙ্গ উঠিল—কিন্তু সবলে তাহা চাপিয়া লইয়া বলিলেন—"জামাই ত আমার ঠিকই আছে, শরৎকুমার এলেই বিয়ে হয়ে যাবে।"

সুজন রায়ও ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং ক্রুদ্ধ-ভাবেই বলিলেন "সে হতভাগাটা ত জেলে পচছে, প্রসাদপুরের রাজার মেয়ের ভাগ্যে শেষে এই বর!"

"চিরদিন ত আর সে জেলে থাকবে না।"

"জেলে না থাকে—আণ্ডামানে যাবে। আমি কি না জেনেছি সে খবর?"

"আচ্ছা, বিচার ত শেষ হয়ে যাক্। তখন সে বিষয় ভাববার সময় আসবে।"

সুজন আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না বলিয়া উঠিলেন—"অধঃপাতে যা তবে। আমি ভাল কথা বল্লেও মন্দ হয়—শত্রু কি না আমি! আচ্ছা বেশ, তাই হোক; আমার মিত্রতা উপেক্ষা করলি, শত্রুতাটা কি রকম, তাই দেখে নে এবার! তোমার জীবনের কলকাঠি বাবা হাতে নিয়ে তবে এখানে এসেছি।" বলিয়া চেকখানা দেখাইয়া বলিলেন—"এই চেক তুমি যাদের দিয়েছিলে, তারা আমার কাছেই এনেছিল—ভাঙ্গাবার জন্যে, এ চেক আমি এখনও দাখিল করি নি কোর্টে। বুঝলে ত?"

সুজনের হাতে এ চেক দেখিয়া রাজা প্রথমটা বিস্মিত হইলেন; মুহূর্ত্তে সে বিস্ময় সন্দেহে মিলিত হইল;—তাঁহার বিরুদ্ধে এই যে সব ষড়যন্ত্র, তাহা রায় খুড়োরই কাণ্ড নয় ত? তিনি একটু চড়া স্বরে কহিলেন—"বেশ, চেক কোর্টে দাখিলই করবেন—তার জন্য আমি ভীত নই; জাল চেক আপনার বিরুদ্ধেই প্রমাণ দাঁড়াবে।"

রায় খুড়ো অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন; রোষ-আস্ফালিত স্বরে কহিলেন, "জাল চেক বটে? তুমি বল্লেই ত হবে না। ঝুটো কি সাচ্চা, জহুরী লোকেই সেটা বিচার করবে। জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট সবাই এই মুটোর মধ্যে, বুঝেছ যাদুধন?"

রাজা বুঝিলেন, সুজন যাহা বলিতেছেন—তাহা ফাঁকা আওয়াজ মাত্র নহে;—এই জাল নোটই

সম্ভবতঃ তাঁহার চেষ্টায় রাজপক্ষে বিরুদ্ধ প্রমাণ হইয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু অতুলেশ্বর ভীরু কাপুরুষ নহেন, এ ভয় তাঁহাকে কাবু করিতে পারিল না। কেবল যত্নবদ্ধ ধৈর্য্যবাঁধ তাঁহার ধ্বসিয়া গেল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া ক্রুদ্ধস্বরেই তিনি কহিলেন—"বেশ, আপনার যা ইচ্ছা, তাই করবেন। আমি সহস্রবার মৃত্যু বরণ করতে প্রস্তুত, তবু কন্যাপণে আত্মরক্ষা করব না।"

সুজন 'মোরিয়া' হইয়া উঠিলেন, দাঁড়াইয়া উঠিয়া গালি দিলেন—"অধঃপাতে যাও;—অধঃপাতে যাও; আমার পায়ে ধ'রে এক দিন যদি দয়া ভিক্ষা করতে না হয়, তবে আমার নাম সুজন রায় নয়।" বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন—রাজা পুনরায় চৌকিতে বসিলেন।

বাহিরে সিঁড়ির নিকট আসিয়া সুজন রায় দেখিলেন, জ্যোতির্ম্ময়ী দেওয়ালে ঠেস দিয়া পাষাণ-মূর্ত্তির মত স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি সবিস্ময়ে দাঁড়াইয়া কহিলেন, "রাজকুমারী জ্যোতি-র্ম্ময়ি—তুই মা!"

জ্যোতির্ম্ময়ী পাষাণমূর্ত্তির ন্যায়ই স্তব্ধ নিশ্চল হইয়া রহিলেন,—কোন উত্তর করিলেন না। তিনি আবার কহিলেন—"দেখ মা, তোর জন্যই এই বিবাদ-বিসংবাদ, চিরকালই মেয়েদের জন্য সংসার জ'লে পুড়ে ছারখার হয়ে উঠেছে, সীতার জন্য সোনার লঙ্কা ছারখার; তিলোত্তমার জন্য শুম্ভ-নিশুম্ভের মৃত্যু, পদ্মিনীর জন্য চিতোর আক্রমণ—এ সব ত জানিস তুই। এখন তুমি যদি মা জননি, আমার পুত্রবধূ হ'তে রাজি হও ত সব বিপদ খণ্ডে যায়—তোমার বাবা রক্ষা পান, তোমাদের ধনসম্পদ রাজ্য সব বজায় থাকে। বল মা তুমি, তোমার একটা কথার উপরই সব নির্ভর করছে।"

হঠাৎ পাষাণমূর্ত্তি নড়িয়া উঠিল, তাহার ওষ্ঠাধর ঈষৎ বিভিন্ন হইল, কি যেন সে বলিতে গিয়া আবার নির্ব্বাক্ হইয়া পড়িল।

সুজন রায় আবার বলিলেন—"ভেবে দেখ মা, তুমি ইচ্ছা করলেই সব দিক্ রক্ষা হয়।"

বালিকার কথা ফুটিল, তিনি বলিলেন—"ভেবেছি।"

"কি ভেবেছ? হবে মা জননি, তুমি আমার পুত্রবধূ?

ধীরে ধীরে যন্ত্রচালিত কণ্ঠ হইতে বাক্যস্ফুট হইল, "হব।"

আনন্দ-বিস্ময়ে সুজন রায় নিস্তব্ধ হইয়া গেলেন। অধরোষ্ঠে হাসি বিস্ফারিত হইয়া মিলাইয়া পড়িল—তিনি গম্ভীরস্বরে কহিলেন—"সত্যি বলছিস্ মা?"

জ্যোতির্ম্ময়ী এবার দৃঢ়স্বরে উত্তর করিলেন—সত্যই বলছি। আপনার কাছে পিতার বিরুদ্ধ প্রমাণ কি আছে—যদি আমাকে দেন—তবে—"

"কি করবে তুমি?"

"ছিঁড়ে ফেলব।"

সুজন রায় মুখে যতই আস্ফালন করুন, এই চেক কোর্টে দাখিল করিলে তাঁহার পক্ষেও ক্ষতিজনক হইতে পারে—এ ভয়টুকুও তাঁহার মনে ছিল। তিনি সহজেই চেকখানা জ্যোতির্ম্ময়ীর হাতে দিয়া কহিলেন—"এই নেও মা—আমি ছিঁড়ে ফেলতুম—না হয় তুমিই ছেঁড়ো। আর একবার বল মা, আমার পুত্রবধূ হবে তুমি?"

জ্যোতির্ম্ময়ী একটু বিরক্তির স্বরে কহিলেন, "একশবার এক কথা বলার ত দরকার নেই।"

"কিন্তু ইতোমধ্যে যদি শরৎকুমার এসে পড়ে?"

শবের মত বিবর্ণ, প্রাণস্পন্দহীন চক্ষু দুইটা জ্যোতির্ম্ময়ীর সহসা জ্বলিয়া উঠিল। সতেজে মর্ম্মাহতা নারী কহিলেন—"তার নাম এর মধ্যে আনেন কেন? আমি কথা দিয়েছি, বস্—সেইটে মেনে নিন।"

সুজন রায় অবাক্ হইয়া গেলেন। কি তেজ-স্বিনী অথচ সরলপ্রকৃতি রমণী! এইরূপ নারীর সান্নিধ্যে ইতঃপূর্ব্বে কোন দিন সুজন রায় আসেন নাই—এ জাতীয় জীবের মর্ম্মরহস্য ভেদ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব, তবে জ্যোতির্ম্ময়ী যে বাক্যদান করিলেন, তাহা যে লঙ্ঘন করিবেন না, সেটুকু তিনি ঠিক বুঝিলেন।

আনন্দের আতিশয্যে দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া তিনি বলিলেন, "সর্ব্বমঙ্গলা মা আমার প্রসন্ন হয়েছেন, আর কোন ভয়ভাবনা নেই। রায়বংশের ঘরে ঘরে এত দিনে মিলনের বাতী জ্বল্‌লো। আমি মা এখন যাই, এ খবরটা তোর বাবাকে তুই জানাস, মা। আমি বাড়ী গিয়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন করি গে।"

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সুজন রায় চলিয়া গেলেন, দুঃস্বপ্ন-সঙ্কুল নিদ্রা-বিঘোর হইতে জ্যোতির্ম্ময়ী সহসা যেন জাগিয়া

উঠিলেন। কিন্তু চেতনালাভ করিয়াও তাঁহার মোহাবিষ্ট উদ্‌ভ্রান্ত চিত্ত তখনো পূর্ণমাত্রায় প্রকৃতিস্থ হইতে পারিল না। চেকখানা বামহস্তে সবলে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ধরিয়া ঘুমের ঘোরেই যেন তিনি দ্রুত অবতরণে বাগানে আসিয়া পৌঁছিলেন।

মাহ ভাদ্র; ভাদ্রের চতুর্দ্দশ দিবসে জ্যোতির্ম্ময়ী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন,—সে দিন জন্মাষ্টমী ছিল; কিন্তু এবার তাহার কিছু পূর্ব্বেই তিথি প্রতিপদে জ্যোতির্ম্ময়ী উনবিংশ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ করিলেন।

রাজা বন্দী হওয়া পর্য্যন্ত কন্যার জন্মদিনের সমারোহ-পর্ব্ব যে উঠিয়া গিয়াছে, তাহা পাঠক জানেন। লোকসমাগম এ সময় একেবারেই থামিয়া গিয়াছে। একমাত্র কৃষ্ণলাল কেবল বিনা নিমন্ত্রণেও হাসিকে লইয়া এ দিনে আসিয়া দেখা দেন এবং আন্তরিক সখ্যালাপে এ হেন দুঃসময়েও ইঁহাদিগকে প্রফুল্ল করিয়া তোলেন। এবারও অনাদি পূর্ব্বাহ্নে তাঁহাদের আনিতে গিয়াছে; কিন্তু ট্রেণ ফেল্ করিয়া সকালে তাঁহারা আসিতে পারেন নাই, সম্ভবতঃ সন্ধ্যায় আসিয়া পৌঁছিবেন।

শ্রাবণে এবার অতিরিক্ত বর্ষা হইয়া গিয়াছে। তাই বুঝি কচিৎ কোনও দিন রৌদ্র-বৃষ্টির ক্ষণিক অভিনয়-খেলা ছাড়া "মাহ ভাদরের" এই আধাআধি সময় পর্য্যন্ত "ভরা ভাদরের" কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই। অনেক দিন পরে হঠাৎ কিন্তু আজ শেষ বেলায় আকাশে কালো মেঘের এমনি ঘোরঘটা লাগিয়া গেল যে, মনে হইতে লাগিল, এখনই যেন ধরাতল রসাতলে যাইবে। কড়াক্কড় মেঘগর্জ্জনে, ঘনঘন বিদ্যুৎস্ফুরণে, প্রলয়দেবের তাণ্ডব নৃত্য সূচিত হইল। কিন্তু দেবী পার্ব্বতী মনে মনে ইহাতে প্রমাদ গণিলেন, দেবচরণে অভিমান অশ্রুবিন্দু ঢালিয়া অচিরাৎ তাঁহার রুদ্রভাব নির্ব্বাপিত করিয়া দিলেন। ফলে ক্ষণকাল সজোরে বৃষ্টিধারা নামিয়াই অবিলম্বে আকাশ বর্ষণক্লান্ত হইল। মেঘান্ধকার তবু কিন্তু যথাশীঘ্র ঘুচিল না। ধীরে বিচ্ছিন্ন জলদমালার মধ্যেই লুকাইয়া সূর্য্যদেব অস্তগমন করিলেন। কনক-আভারঞ্জনবিহীন এই ম্রিয়মাণ অপরাহ্নে তাহারই যেন সচেতন প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় জ্যোতির্ম্ময়ী বাগানে লতামণ্ডপতলে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

রাজা বন্দী হওয়া অবধি বাগানের আর তেমন সেবা-যত্ন নাই, অযত্ন-রক্ষিতা লতাবল্লী তবু ফুলহীনা নহে। বালিকা তলদেশে আসিয়া দাঁড়াইবামাত্র দুই চারিটি ফুল খসিয়া পড়িয়া স্বাগত আদরে তাঁহার অঙ্গ চুম্বনান্তে পদতলে লুটাইয়া পড়িল। এই দুঃখের সময়ও রাজকন্যা ফুলসখাদের এই আদর অভ্যর্থনা অগ্রাহ্য করিলেন না। মাটী হইতে তুলিয়া সেগুলিকে তাঁহার শিথিল কবরীভুক্ত করিয়া লইয়া মণ্ডপদ্বারে রক্ষিত চীনা কারিকরের নিপুণ হস্তনির্ম্মিত কৃত্রিম কাণ্ডাসনে বসিয়া শূন্যনয়নে সম্মুখবর্ত্তী সোমানদীর দিকে চাহিয়া রহিলেন।

বর্ষার ভরা নদীর জলে তখন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। তরঙ্গোৎক্ষিপ্ত শ্বেতকণা-লহরী মেঘের কালো বর্ণ অঙ্গে মাখিয়া বাগানের পাড়ে ধাক্কা দিতেছিল। উদ্যান-প্রান্তে পরিচ্ছিন্ন সসীম জলতরঙ্গের উপর অসীম পারাবারের একটি মহাদৃশ্য জ্যোতির্ম্ময়ীর নেত্রপথে ভাসিয়া উঠিয়াছিল,—একখানি ডুবোডুবো ক্ষুদ্র তরণী উঠিয়া পড়িয়া এই পারাবার বাহিয়া উধাও হইয়া চলিতেছিল। কোথায় ইহার গতি? ইহার চালকই বা কে?

বর্ত্তমানের দিকে চাহিয়া বালিকার মন তখন অতীতে মগ্ন হইল। তাঁহার বিশ্বাস-বুদ্ধিহারা জীবনতরীও এক দিন এমনই ডুবো-ডুবো হইয়াছিল। যে যাদুকর নাবিক তাঁহার মায়কাঠির স্পর্শে অচেতন, সেই জড়কেও মুহূর্ত্তে জ্ঞানে প্রেমে পরিপূর্ণ মানবরূপ দান করিয়াছিলেন—তাঁহার সহিত জ্যোতির্ম্ময়ীর জীবন ত আজি সম্বন্ধবিচ্ছিন্ন? সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন? কিন্তু তবু ত তাঁহাকে তিনি স্মৃতি-বিচ্ছিন্ন করিতে পারিতেছেন না! হৃদয়ের সে স্মৃতি কাহিনী উৎসের মতই উঠিয়া আকাশ-বাতাস যে ছাইয়া ফেলিয়াছে! সে দিন যে জীবনের একটি মহা পর্ব্বদিন! কেমন করিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী সে দিনটি ভুলিবেন? সন্ন্যাসীর সহিত বাদানুবাদে তাঁহার চিত্ত যখন সংশয়দোলায় অধীর, অস্থির, তখন যাহার প্রেমোজ্জ্বল ধ্রুবদৃষ্টি, আনন্দময় স্পর্শ বালিকার সেই উদ্বেলিত উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে মঙ্গল বিশ্বাস ঢালিয়া দিয়াছিল, তাহাকে ভুলিবেন কি করিয়া? পরবর্ত্তী কত না সুগভীর দুঃখনৈরাশ্য সেই স্মৃতির প্রভাবে সহনীয় হইয়াছে। আজিও প্রাতঃকালে সে দৃষ্টির অরুণ রেখাপাত তাঁহার হৃদয়াকাশে কত না আনন্দ-মধুর উষালোক রচনা করিয়াছিল। সে ত শুধু মুহূর্ত্ত পূর্ব্বের কথা; আর এখন? সে স্মৃতি শুধু আলোক-দাবানলের বিস্তৃত ঝলক!

বালিকা উর্দ্ধমুখী হইয়া মুদ্রিত নয়নে একমনে ভগবৎ-কৃপা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অনভিজ্ঞ বাল-জীবনে নিরাশা অবিশ্বাস দৃঢ়মূল হইতে পারে না। সে প্রার্থনায় তাঁহার মনপ্রাণ পুনরায় আশাবিশ্বাসপূত হইয়া উঠিল; নয়ন খুলিয়া তিনি

তখন স্তব্ধ বিস্ময়ে দেখিলেন—আকাশের মেঘজাল একেবারেই কাটিয়া গিয়াছে, দিগ্‌বিদিক দিব্যালোক-পূর্ণ। এই আলোকচিত্রের দর্শনে বালিকার হৃদয়ে সহসা প্রফুল্লতার স্পন্দন উঠিল। ইহা কি বিধাতৃ-পুরুষের কৃপা-ইঙ্গিত নহে? কাটিবে কাটিবে—তাঁহার করুণায় এমনই করিয়া তাঁহাদেরও বিপদ-মেঘ কাটিয়া যাইবে। এতক্ষণ পরে মুষ্টি খুলিয়া চেকখানা তিনি পড়িয়া দেখিলেন। সুজন রায় মিথ্যা বলেন নাই, সত্যই এ দশ হাজারের চেক, বিদ্রোহী দলের নেতার নামে রাজা বাহাদুরের দান।

জ্যোতির্ম্ময়ী চেকখানা ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া মাটীতে ফেলিয়া দিলেন; তাহার পর মুক্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আবার মনে মনে বলিলেন, "ধন্য তুমি বিপদ্‌হারি! ধন্য তুমি দয়াময়! ধন্য তোমার প্রেম-করুণা!"

একটা অপূর্ব্ব আত্মপ্রসাদে তাঁহার প্রাণ, মন, আত্মা ভরিয়া গেল, কি নিদারুণ ত্যাগপণে বালিকা যে ভগবানের প্রসন্নতা লাভ করিয়াছেন, সে কথা তাঁহার মনে আসিল না; কোনরূপ আক্ষেপদুঃখে তাঁহার দান-মহিমা ম্লানিম্লান হইল না, জ্যোতির্ম্ময়ী কৃতার্থ-ম্মন্য, আনন্দ-পরিতৃপ্ত হৃদয়ে গুণ গুণ করিয়া গান ধরিলেন—

"তোমার মহিমা অনন্ত অসীমা ;
ধন্য ধন্য তুমি হে দয়াময়!
জয় জয় তব জয়!
তোমার প্রসাদ-জ্যোতি—
অতি মধুর ধ্রুব স্মৃতি
বিপদ দুঃখ ভীতি, সব তাহে লীন হয়!
জয় জয় তব জয়!"

কখন্ যে দিবসের শেষ আলোকটুকু সন্ধ্যার অন্ধকারে আত্মসমর্পণ করিল, কখন্ যে কৃষ্ণ প্রতি-পদের চোর চাঁদ গাছের উর্দ্ধে উঠিয়া পড়িয়া অন্ধকারের প্রাণে স্বকীয় আলোক-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিল,—সঙ্গীত-বিঘোর, ধ্যানমগ্ন জ্যোতির্ম্ময়ীর উন্মীলিত নেত্রেও তাহার সজ্ঞান প্রতিবিম্ব পড়িল না। গানের সুরে সুরে বালিকা তখন বিশ্ব-বীণার প্রীতি-ঝঙ্কাররব শুনিতেছিলেন, বাহিরের আলোকের সহিত অন্তরালোকের অবিচ্ছেদ্য মিলন-সুখ অনুভব করিতেছিলেন। সহসা সঙ্গীতের সে পরমোচ্ছ্বাস স্তব্ধ, শিহরিত করিয়া তুলিয়া অদূর হইতে কে ডাকিল —"রাজকুমারি!" এ কাহার কণ্ঠধ্বনি? এবং পরমুহূর্ত্তেই তাঁহার চক্ষুতারকায় বিভাসিত হইয়া উঠিল এ কাহার মূর্ত্তি? এ যে ডাক্তারদা!

শরৎকুমার নিকটে আসিয়া পরিপূর্ণ আনন্দ আগ্রহে তাঁহার দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া দিলেন। কিন্তু কৈ, রাজকন্যা ত প্রতিদানে এত দিনের পর তাঁহার আগমনে আনন্দপ্রকাশপূর্ব্বক স্বাগত-সমাদরে তাঁহার হস্তে হস্তার্পণ করিলেন না? শরৎ-কুমারের প্রসারিত শূন্য হস্ত নৈরাশ্য-ব্যথায় ধীরে ধীরে অবনত হইয়া পড়িল,—অশ্রুভারাক্রান্ত জলদ-খণ্ডের ন্যায় মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেই প্রফুল্লমূর্ত্তি বিষণ্ণম্লান হইয়া উঠিল। কিন্তু কিছু পরেই মেঘের মতই আবার—সহানুভূতি করে তাঁহার মনের সে অভিমান-অন্ধকার বিদূরিত হইল। তাঁহার মন বলিল, জ্যোতির্ম্ময়ী যে এখন মর্ম্মপীড়িত, এখন ত তাঁহার আনন্দ প্রকাশের সময় নহে। তিনি আশ্বস্তচিত্তে তখন কহিলেন—

রাজকুমারি! সুসংবাদ এনেছি—রাজা বাহাদুর মুক্তিলাভ করেছেন।"

রাজকন্যার বিবর্ণ মুখকান্তি সহসা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; সংশয়পূরিত বিস্ময়ানন্দে শরৎকুমারের প্রতিধ্বনির মতই তিনি কহিলেন,—"মুক্তিলাভ করেছেন?"

উত্তর হইল,—"হাঁ রাজকন্যা।

তথাপি এত বড় সু-খবরে রাজকুমারী যেন পূর্ণ ভাবে আস্থা-স্থাপন করিতে পারিলেন না, বিশ্বাসে সংশয় ঢালিয়া আবার তিনি কহিলেন,—"সত্য বলছেন ডাক্তারদা, কি ক'রে জানলেন? কোথায় পেলেন এ খবর?"

শরৎকুমার একটু মিষ্টমধুর হাসিয়া উত্তর করিলেন, —"সন্দেহের কোনই কারণ নেই রাজকুমারি! প্রিভি কাউন্সিলে আমাদের জয় হয়েছে,—ম্যাজি-ষ্ট্রেটের নিকট তার এসেছে।"

কৃতজ্ঞতা-উচ্ছ্বাসে জ্যোতির্ম্ময়ীর হৃদয়নিভৃতে আবার ধ্বনিত হইল, "ধন্য তুমি দয়াময়! ধন্য তোমার প্রেম-করুণা!"

কিছুক্ষণ উভয়ে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, পরে জ্যোতির্ম্ময়ী সহসা বলিয়া উঠিলেন—"শুনেছিলুম, আপনিও বন্দী হয়েছেন, কিন্তু মুক্তির খবর ত কৈ পাই নি, বুঝতেন যদি—কতটা—" রাজকুমারী এই-খানেই থামিয়া গেলেন তাঁহার মনে পড়িয়া গেল—তিনি অন্যের বাগ্‌দত্তা।

শরৎকুমার আনন্দ-আর্দ্রস্বরে কহিলেন—"এত কাছে থেকেও এত দিন যে এক লাইনও চিঠি পাঠাতে পারিনি,—এতে কি আমারও কম কষ্ট গেছে—

রাজকন্যা? আমিও সবে মাত্র আজকেই মুক্তি লাভ করেছি—"

"আজকেই—কেবল আজকেই?" রাজকন্যার এই আনন্দ-ঔৎসুক্যপূর্ণ প্রশ্নের উত্তরে ডাক্তার বলিলেন,—হ্যাঁ রাজকন্যে, আজকেই। আর সঙ্গে সঙ্গেই সদাশয় ম্যাজিষ্ট্রেটের কৃপায় এই সুসংবাদের বার্ত্তাবহ হয়ে এসেছি।"

"বাবাকে অবশ্য এ খবরটা জানিয়ে এসেছেন?"

"না, আমি আগে এইখানেই এসেছি।"

রাজকন্যা অধীরভাবে বলিয়া উঠিলেন—"তিনি তবে এখনও এ খবর জানেন না? বেশ ত আপনি? চলুন চলুন, এখনই তাঁর কাছে যাই।"

রাজকন্যা উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—শরৎকুমার আবার একটু হাসিয়া বলিলেন,—"চলুন, যাচ্ছি, কিন্তু এতক্ষণে তিনি এ খবর পেয়েছেন—"

"কে দিলে? কি ক'রে পেলেন?"

"আমার সঙ্গে একই ট্রেণে এলেন, আমাদের দেশপূজ্য গোবিন্দজী। রাজা বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করতেই তিনি এসেছেন। তাঁর মারফৎ রাজাকে খবর পাঠিয়ে আমি আপনার কাছে এলুম।"

রাজকন্যা আহ্লাদে বলিয়া উঠিলেন, "মহাত্মাজী এসেছেন? কত দিন থেকে যে তাঁকে দেখার ইচ্ছে করছি। চলুন তবে—চলুন চলুন—"

দুষ্ট চাঁদ অবসর বুঝিয়া এই সময় তাঁহাদের প্রতি সম্মোহন বাণ ছুড়িল—রাজকন্যা শরৎকুমারের প্রেম-দীপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া সপ্তপদী-গমনের এক পদ যেন বাড়াইয়া দিলেন। শরৎকুমার তাঁহার হাত ধরিয়া পুনরায় বেঞ্চে বসাইয়া, সানুনয়ে কহিলেন—"একটুখানি অপেক্ষা করুন; শুধু আর একটি মিনিট বসুন; একটা কথা আছে।"

রাজকন্যা পলকহীন, পূর্ণ কটাক্ষে তাঁহার দিকে চাহিয়া নীরবে যেন জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি কথা?" উত্তর পাইলেন,"এই সু-খবরের পুরস্কার রাজকুমারি? আমাকে নিষ্কাম বার্ত্তাবহ মনে করবেন না। এই শুভদিনে আমি পুরস্কার-প্রার্থী।"

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

শরৎকুমারের কথা রাজকন্যার কানে ভাল করিয়া পৌছিতে না পৌছিতে তাঁহার মাথা ঘুরিয়া উঠিল; তিনি কাষ্ঠাসনের এক পাশের হাতাখানা দুই হাতে ধরিরা ঘূর্ণ্যমাণ মস্তক তাহার উপর রক্ষা করিলেন। শরৎকুমার ব্যস্তভাবে এক হাতে তাঁহার মাথা ধরিয়া রাখিয়া—অন্য হাতে পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া তাঁহাকে বীজন করিতে লাগিলেন। কিন্তু বালিকা প্রকৃতপক্ষে দুর্ব্বল-প্রকৃতি নহেন, তাঁহার ক্ষণিকের এই দুর্ব্বলতা-অবসাদ ক্ষণিকের মধ্যেই তিরোহিত হইল। শরৎকুমারের হাতের ভর হইতে মাথা সরাইয়া লইয়া বেঞ্চের উপর তিনি আবার সোজা হইয়াই বসিলেন; ডাক্তারের প্রেমপূর্ণ উৎকণ্ঠা-ব্যাকুল মুখের দিকে চাহিয়া, দৃষ্টিতে প্রেমিকার আবেগ, স্বরে নিরাশার ক্ষুব্ধ ব্যথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"ডাক্তারদা, আমি অন্যের বাগ্‌দত্তা।"

শরৎকুমার এতক্ষণে বুঝিলেন, রাজকন্যা কেন তাঁহার আগমনে হর্ষ প্রকাশ করেন নাই। 'তিনি বন্দী বলিয়া রাজা কি তবে অন্য পাত্র মনোনীত করিয়াছেন?' এই ভাবিয়া তীব্র যাতনায় ডাক্তার নির্ব্বাক্ হইয়া পড়িলেন, কিছু পরে শুষ্ক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে সে?"

"উত্তর হইল—"বিজন রায়।"

"বিজন রায়!" ডাক্তারের নৈরাশ্য-বেদনা অবজ্ঞা-ঘৃণাভারে যেন নিষ্পেষিত হইয়া উঠিল। তিনি অসংযত আবেগে কহিলেন—"রাজা বাহাদুর কি জানেন না—যে, বিজন—"

তাঁহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়াই জ্যোতির্ম্ময়ী বলিলেন, "না, বাবা এ বিষয়ের কিছুই জানেন না, আমি নিজেই রায় বাহাদুরকে কথা দিয়েছি।"

"নিজে, আপনি নিজে!" যদি আকাশ-খণ্ড তদ্দণ্ডে সহসা শরৎকুমারের মাথার উপর খসিয়া পড়িত, তাহা হইলেও তিনি বুঝি এত ব্যথিত—এত বিস্মিত হইতেন না।

রাজকন্যা আবার বলিলেন, "হ্যা, আমি নিজে, তা হ'লে বাবা বিপন্মুক্ত হবেন, এই বিশ্বাসে। যে চেক তিনি বিদ্রোহীদের দিয়েছিলেন—সে চেক রায়-খুড়োর হাতে এসে পড়েছিল—"

কিন্তু সে যে জাল চেক!"

"বুঝি নি তা। কিন্তু কথা দিয়ে ত আর ফেরান যায় না।"

"সত্যই কি মনে করেন, আপনি সে কথায় বাঁধা পড়েছেন?"

"মনে করি বৈ কি। সে ত আমার মুখের কথা নয়—ধর্ম্মতঃ শপথ।"

"ফাঁকি দিয়ে তারা যে শপথ আদায় ক'রে নিয়েছে, ভুল বুঝে—ভুল বুঝে যে তাদের তুমি কথা

দিয়েছ—সে মিথ্যা প্রবঞ্চনা কখনই তোমাকে বাঁধতে পারবে না,—ধর্ম্মতঃ তুমি আমারই।"

শরৎকুমার তাঁহাকে এই প্রথম তুমি বলিয়া সম্বোধন করিলেন; কেবল তাহাই নহে, এতক্ষণ তিনি রাজকন্যার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছিলেন, এইবার পার্শ্বে আসিয়া বসিয়া, তাঁহার ঘর্ম্মাক্ত হাতখানি আপনার দুই হাতের মধ্যে গ্রহণ করিলেন। রাজকন্যা কোন প্রতিবাদ করিলেন না। তাঁহার হাতের শিরাবিশিরা স্পর্শের মধ্য দিয়া যে ভাব, যে ভাষা অব্যক্তভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছিল—স্বরে তাহাই পরিস্ফুটভাবে ব্যক্ত করিয়া ডাক্তার তখন কহিলেন—"না রাজকুমারি, তুমি আর কাহারও নও—ধর্ম্মতঃ তুমি আমারই। অনেক দিন থেকে আমারই তুমি বাগদত্তা, তোমাকে আমার কছে থেকে কেহই কেড়ে নিতে পারবে না।"

ইহার উত্তরে রাজকুমারীর নয়ন হইতে অশ্রুবিন্দু পড়িয়া তাঁহার হস্ত সিক্ত করিতে লাগিল। ডাক্তারের ইচ্ছা হইতেছিল, সাদর-চুম্বনে সে অশ্রু তিনি মুছাইয়া দেন, কিন্তু সে অধিকার এখনও ত তিনি পান নাই। আত্মসংবরণ করিয়া অবনত দৃষ্টি রাজকন্যার হাতের উপর রাখিয়া তিনি বলিলেন—

"মনে পড়ে কি রাজকন্যা, সে দিনের কথা, যে দিন তুমি আমাকে মালা পরিয়ে দিয়েছিলে? সেই মালাটির ভিতর দিয়ে তোমার হৃদয়খানিই কি আমাকে দান কর নি তখন—বল দেখি?"

আজ শরৎকুমার প্রেম-প্রকাশে বালকের ন্যায় সলজ্জ নহেন, আজ তিনি সাহসী, মুক্তকণ্ঠ, বিশ্বস্ত প্রেমিক।

রাজকুমারী নীরব হইয়া রহিলেন, সলজ্জ অনুরাগে তাঁহার মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল। শরৎকুমার একটু ঝুঁকিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"মূর্খ আমি! সে দিন আমার সৌভাগ্য আমি বুঝতে পারি নি। বুঝলুম যখন—তখন খুবই অসময়, আর তখন থেকেই আমরা দূরে দূরে। কিন্তু স্থানকালের দূরত্ব কি তোমা হ'তে আমাকে কোন দিন বিচ্ছিন্ন করতে পেরেছে—না পারবে? এই কয় বৎসরের অন্ধকার কারাগার তোমারই স্মৃতির আশালোকে রঙীন হয়ে ছিল না কি? আর আজ এত দিন পরে আমি যখন ফিরে এসে তোমার কাছে দাঁড়িয়েছি, এই সুখের দিনে, শুভক্ষণে, তুমি কি আমা হ'তে দূরে স'রে যাবে? অসম্ভব! অসম্ভব!"

সহসা এইখানে শরৎকুমারের বাক্যরোধ হইয়া গেল। তাঁহার অন্তর্লীন গুপ্ত নিরাশা আশার অন্তরাল হইতে ব্যঙ্গের-স্বরে সহসা বলিয়া উঠিল—সংসারে অসম্ভব যা—তাও ত অনেক সময় সম্ভব হয়েই দাঁড়ায়!"

শরৎকুমার তখন হতাশভাবে রাজকন্যার হাতখানি সবলে দুই হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিলেন, তাহার পর মুহূর্ত্তকাল স্তব্ধ থাকিয়া নবশক্তি সঞ্চয়পূর্ব্বক বলিলেন—"আমি কি ভুল কথা বলছি, প্রলাপ বক্‌ছি রাজকুমারি? বল, তুমিই বল? সে দিন মাণিক-প্রাসাদে লতাকুঞ্জ-ভবনে আমাকে বিদায় দেবার কালে নীরব ভাষায় তুমি কি বল নি—যে, তুমি আমারই? আমি কি তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম হৃদয়েশ্বরি? কখনই না, হ'তে পারে না তা। দাবী তাদের নয়, দাবী আমারই। তোমার একটি জন্মদিনে মাল্যদানে আমাকে মনে মনে পতিরূপে বরণ ক'রে নিয়েছিলে তুমি, আর তোমার আজকের জন্মদিনে আমি প্রকাশ্যভাবেই তোমাকে ভাবী পত্নী ব'লে বরণ ক'রে নেব, এই আশা ক'রে তোমার কাছে ভিক্ষা-নত হয়ে দাঁড়িয়েছি। দাও সে ভিক্ষা, সে অধিকার আমাকে, বল তুমি আমারই।"

এতক্ষণ পরে শরৎকুমারের হাতের মধ্য হইতে ধীরে ধীরে হাত ছাড়াইয়া লইয়া রাজকন্যা বলিলেন—"তাতে কি আমাদের কর্ত্তব্যভঙ্গ হবে না? প্রেমের চেয়ে কি ধর্ম্মের কর্ত্তব্য আরও বড় নয় ডাক্তারদা! সমস্ত মহাপুরুষেরা তাঁদের কার্য্যে আমাদের যে এই শিক্ষা দিয়েছেন—ও দিচ্ছেন। বল দাও ডাক্তারদা, কর্ত্তব্যপালনে আমাকে বল দাও।"

শরৎকুমার উঠিয়া দাঁড়াইয়া উত্তরে দৃঢ়স্বরে বলিলেন—"বিশ্বাস কর রাজকুমারি—প্রাণান্ত হ'লেও তোমার কর্ত্তব্য-পথের বাধা আমি হব না। কিন্তু আমি ত মনে করিনে যে, ফাঁকিতে প'ড়ে তুমি যে কথা দিয়েছ—তা পালন করা তোমার কর্ত্তব্য।"

জ্যোতির্ম্ময়ী বলিলেন—"কুরুগণ ফাঁকি দিয়েই পাণ্ডবদের পাশায় হারিয়ে কথা নিয়েছিল—তবু ত পাণ্ডবেরা বনগমনে দ্বিধা করেন নি? আমার মনকে ত বোঝাতে পারছিনে—ভুল শপথ ব'লে আমি স'রে পড়তে পারি। একমাত্র উপায় আমি দেখছি, যাঁদের কাছে আমি শপথে বাঁধা—তাঁরা যদি দয়া ক'রে আমাকে মুক্তি দেন।"

"না যদি দেন—তা হ'লে?"

"তা হ'লে ভগবান্ যা করেন! তাঁর ইচ্ছাই তা হ'লে মেনে নেব! আমি ত আসলে কথা দিয়েছি তাঁকেই। আমার সর্ব্বস্ব পণে তাঁর কাছ থেকেই

পিতার মুক্তি ভিক্ষা করেছি। খুড়দাদা উপলক্ষ মাত্র।"

ভগবান্ যে সত্যই লঘুপাপে বালিকাকে গুরুদণ্ড দিবেন, ইহা শরৎকুমার কিছুতেই মনে করিতে পারিলেন না; তিনি আশ্বস্ত চিত্তে কহিলেন—"সেই কথাই ঠিক। ভগবান্ তোমার মনের সংশয় মোচন করবেন নিশ্চয়ই। তোমার পিতা এ ক্ষেত্রে তাঁরই প্রতিনিধি,—আমার অনুরোধ রক্ষা কর, আমাকে কথা দাও, এ সম্বন্ধে তিনি তোমার পক্ষে যে কর্ত্তব্য স্থির করবেন, তাই তুমি ভগবানের আদেশ ব'লে মেনে নেবে। রাজাবাহাদুর যে তোমার কর্ত্তব্য-পালনে বিরোধী হবেন না—এ বিশ্বাস কর ত?"

জ্যোতির্ম্ময়ী একটু ভাবিয়া বলিলেন—"বেশ, তাই হোক্। কিন্তু—কিন্তু আমি ত তাঁকে সব কথা খুলে বলতে পারব না—আমি যে কি রকমে কতদূর বাঁধা পড়েছি, তাও ত ঠিক বোঝাতে পারব না, এ ছাড়া বিপক্ষের প্রতি তিনি এমনই শ্রদ্ধাহীন যে, খাঁটি পক্ষপাতশূন্য বিচার এ ক্ষেত্রে তাঁর পক্ষে সম্ভবপর না-ও হ'তে পারে।"

ডাক্তার একটুখানি থামিয়া বলিলেন—"তা হ'লে মহাত্মাজীকেও এখানে আনি? তিনি ত দিব্যদর্শক,—তাঁর বিচার ত নির্ভুল হবে? রাজাবাহাদুরের মুক্তি-পত্রখানা আমার কাছে আছে; সেখানা তাঁকে দিয়ে দুজনকেই আমি সঙ্গে ক'রে আনছি। আর তাঁরা যদি অনুমতি দেন ত এইখানেই আমাদের ভাগ্য-বন্ধন হয়ে যাবে।" বলিয়া শরৎকুমার রাজকুমারীর হাতখানি আর একবার হাতের মধ্যে ধরিলেন। তাহার পর তাঁহাকে ছাড়িয়া দ্রুতপদে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ডাক্তার চলিয়া যাইবার পর মুহূর্ত্তকাল জ্যোতির্ম্ময়ী স্তম্ভিতভাবে বসিয়া রহিলেন। আজিকার ঘটনাবলী তরঙ্গ-স্রোতের মত তাঁহার মনের উপর দিয়া অবিশ্রান্তবেগে চলিয়া যাইতে লাগিল। সহসা তাঁহার মনে হইল, রাজাকে ডাক্তার এখানে ডাকিয়া আনিতে গেলেন, ইহা ত ঠিক হইল না,—তাঁহারই ত এখনই পিতার নিকট যাওয়া উচিত ছিল! তিনি শরৎকুমারের অনুসরণ উদ্দেশ্যে তাড়াতাড়ি উঠিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইলেন, কিন্তু যথাসাধ্য দূরে দৃষ্টিপাত করিয়াও তাঁহাকে আর দেখিতে পাইলেন না, বুঝিলেন, তিনি বহুদূরে চলিয়া গিয়াছেন; হয় ত বা এতক্ষণে প্রাসাদেই পৌঁছিয়া থাকিবেন। একাকীই জ্যোতির্ম্ময়ী তখন কানন-পথে দ্রুত চলিতে লাগিলেন। হঠাৎ যেন পাতার উপরে সাবধানে ন্যস্ত—পদশব্দ শুনিতে পাইলেন। পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া অদূরে বনমধ্যে একটা ছায়ামূর্ত্তি লক্ষ্য করিলেন,—তখন পিস্তলের আওয়াজ উঠিল; মুহূর্ত্তে জ্যোতির্ম্ময়ী ভূমি-লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন।

তিনি পড়িয়া যাইবামাত্র এক ব্যক্তি নিকটে আসিয়া তাঁহার পার্শ্বদেশ অধিকার করিয়া বসিল। পথিপার্শ্বের গাছপালার আড়াল হইতে চাঁদের আলো তখন কাননের এই অংশে কুহেলি-মলিনতা ঢালিয়া দিয়াছিল। খুনী সেই অস্পষ্ট আলোকে ভূপতিত মুমূর্ষুর প্রতি ঝুঁকিয়া তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়া বলিয়া উঠিল,—"এ কি! এ ত ডাক্তার নয়। ইনি যে রাজকন্যা! হায় হায়! এ কি করলেম! কি হ'ল এ?"

তিনি মৃত কি তখনও জীবিত, তাহা বুঝিবার জন্য অজ্ঞান রাজকন্যাকে সে একবার নাড়া দিল। রাজকুমারী চোখ খুলিলেন; পাশে লোক দেখিয়া ভাবিলেন,—শরৎকুমার বুঝি! কিন্তু বিজন যখন আহ্লাদের স্বরে বলিয়া উঠিল, "বেঁচে আছেন,—এখনও বেঁচে আছেন ইনি," তখন তাঁহার ভুল ভাঙ্গিল,—জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে তুমি?"

উত্তর হইল—"চিন্‌তে পারছ না আমাকে? আমি যে বিজন রায়! আমায়ই যে তুমি বাগ্‌দত্তা! স্বেচ্ছাতেই যে আমার পত্নী হ'তে স্বীকৃত হয়েছ তুমি। আর নিজের হাতে আমি তোমাকে বধ করলুম! উঃ, কি জ্বালা! হা ভগবান্, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি কিছু আছে।" রাজকুমারী তখনও পূর্ণ জ্ঞান ফিরিয়া পান নাই। প্রকৃত ব্যাপার ঠিক বুঝিতে পারিলেন না, একবার উঠিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু দেহে বেদনা অনুভব করিয়া আবার নিস্পন্দ হইয়া গেলেন। ক্ষতস্থান হইতে রক্তস্রাব নির্গত হইতে লাগিল,—জ্যাকেট ফুঁড়িয়া তাঁহার বাঁ দিক্‌টা সমস্তই রক্তময় হইয়া উঠিল। বিজনের মাথায় একখানা উড়ানি পাগড়ীর মত করিয়া বাঁধা ছিল। সেখানা মাথা হইতে খুলিয়া, জ্যোতির্ম্ময়ীর বাহু ও বক্ষের মধ্যস্থিত রক্তাক্ত অংশ তাহা দ্বারা চাপিয়া ধরিয়া পাগলের মত বলিল, "কি করলেম, হায়, এ কি হোল? যে পিস্তল ছুঁড়লেম ডাক্তারের উদ্দেশে—কার বুকে গিয়ে হায় রে—তার গুলী বিঁধলো?"

রাজকুমারী আর একবার উঠিতে চেষ্টা করিলেন,

তাঁহার চেষ্টায় বাধা দিয়া বিজন ব্যাকুল স্বরে আবার বলিল—"উঠো না, উঠো না,—রক্তে যে সব ভেসে গেল,—নিবারণ করব কি ক'রে? কি উপায়! ডাক্তার? কোথায় গেলে তুমি? এস এস,—বাঁচাও, বাঁচাও, মেরেছি আমি,—আমাদের দুজনেরই যে প্রাণ হ'তে প্রিয়, নিষ্ঠুর পিশাচের মত আমি তাকে মেরেছি; দেবতার মত তুমি এসে তাকে প্রাণ দান কর। হায়! কি করলেম, এ কি হোল!"

রাজকন্যা এবার চোখ খুলিয়া সজ্ঞান ধীর দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, "তুমি বিজন দা! দুঃখ কেন ভাই! বেশ করেছ তুমি! আমি ভাবছিলুম, তোমার কাছে মুক্তি ভিক্ষা নেব। তুমি আমার সে প্রার্থনা না জেনে, না শুনে অযাচিতভাবেই নিজে এসে আমাকে মুক্তি দিলে, আমি অন্তরের সঙ্গেই তোমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি।"

"ধন্যবাদ! ঠাট্টা—উপহাস? বল বল, যা তোমার প্রাণ চায়, তাই বল। হায় হায়! এর চেয়ে যদি আমার বুকে ছুরি বসিয়ে দিতে? তা ত পারবে না তুমি,—তুমি যে দেবা—আর আমি যে পিশাচ! যে হাতে তোমাকে মেরেছি, সেই হাতে নিজের বুকে ছুরি বসিয়ে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব—যদি প্রায়শ্চিত্ত হয় তাতে?"

বলিতে বলিতে বিজন উঠিয়া দাঁড়াইয়া চকিত হস্তে বুকের পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিল।

রাজকন্যা মুমূর্ষু অবস্থাতেও আদেশব্যঞ্জক ধীর-স্বরে কহিলেন—"থামো বিজনদা, থামো!"

বিজনের হাত নামিয়া পড়িল।

"পিস্তল ফেলে দাও, দূরে নদীর জলে।"

বিজন পিস্তল ছুড়িয়া দূরে ফেলিয়া দিল।

রাজকন্যা অতঃপর আদেশ করিলেন—

"বসো আমার পাশে!"

সে মুঢ়ের ন্যায় তাঁহার পাশে বসিল, পূর্ব্বের ন্যায় রক্ত থামাইবার ইচ্ছায় বাহুমূলে কাপড় চাপিয়া ধরিল। রাজকন্যা বলিলেন—"আমার একটি অনুরোধ আছে বিজনদা -"

"বল বল কি অনুরোধ? আগুনে যদি ঝাঁপ দিতে বল ত পতিপ্রাণা সতীর মত প্রফুল্ল মুখে চিতা-ভস্ম হব।"

"না বিজনদা, আমি তোমার মৃত্যু চাইনে; বাঁচতে হবে তোমাকে,—আমি তোমার জীবন ভিক্ষা করছি—কাজ আছে আমার—"

"আমাকে বাঁচতে বলছ তুমি—পলে পলে মৃত্যু-দণ্ডের ব্যবস্থা এ হতভাগ্যের প্রতি! তাই যদি তোমার ইচ্ছা হয় ত তাই হোক্। এ ঘৃণ্য জীবন তোমার কি কাজে লাগবে বল?"

রাজকন্যা মৃদুস্বরে বলিলেন, "পাপ থেকেও ভগবান্ পুণ্য ফুটিয়ে তোলেন,—তোমরা যে পথে চলেছ, সে পথ যে মুক্তির পথ নয়—"

"বুঝেছি রাজকন্যা, তা বুঝেছি, সর্ব্বস্ব খুইয়ে—সে সত্য বুঝেছি।"

"কিন্তু নিজে বুঝলেই ত চলবে না, পরহিতার্থে এই সত্য তোমাকে প্রচার করতে হবে। মহৎ না হয়ে যে মহৎ কার্য্য সাধিত করা যায় না; যে গুরুর কাছে তোমরা বিপরীত শিক্ষা পেয়েছ, তাঁকেও এই সত্য বোঝাতে চেষ্টা কর। যাও, তুমি যাও, কেউ এখানে আসার আগেই তুমি চ'লে যাও—এই আমার প্রাণান্তিক অনুরোধ।"

রাজকন্যা আবার নির্জ্জীব ভাব ধারণ করিলেন। তাঁহাকে কথা কহিতে দেখিয়া বিজন কথঞ্চিৎ আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল- এই নীরবতায় আবার উদ্বেগ-পূর্ণ চিত্তে উন্মাদের মত কহিল—

"যাচ্ছি আমি, এখনই যাচ্ছি,—তোমার আদেশ জগতের সর্ব্বত্র প্রচার করতে যাচ্ছি,—একটু অপেক্ষা কর, ডাক্তার আসুন, দেখে যাই,—তাঁর হাতে তোমাকে সঁপে দিয়ে যাই; তিনি বাঁচিয়ে তুলুন তোমাকে, আমি চ'লে যাই, ঐ যে—ঐ—ঐ ডাক্তার! এস, এস, শীগ্গির—উঃ, এত দেরী।" অদূরে ডাক্তারের মূর্ত্তিচ্ছায়া পরিদৃষ্ট হইল।

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

শরৎকুমার রাজকন্যার নিকট হইতে আসিয়া দেখিলেন, রাজা একাকী বারান্দায় বিচরণ করিতেছেন—নবাগত অতিথি তখন সান্ধ্য উপাসনার জন্য ভজন-গৃহে গিয়াছিলেন। শরৎকুমারকে আসিতে দেখিয়াই অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইয়া সানন্দে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "এই যে ডাক্তার, এস এস!" শরৎকুমারও প্রফুল্লমুখে নিকটে আসিয়া মুক্তিপত্রখানা তাঁহার হাতে দিয়া চরণ-স্পর্শপূর্ব্বক প্রণিপাত করিলেন। পরোয়ানাখানা পাশের চৌকিটার উপর ফেলিয়া, দুই হস্তে আনত শরৎকুমারকে তুলিয়া রাজা তাহাকে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিলেন। কিন্তু কোলাকুলিতেও তাঁহার সাদর-অভ্যর্থনা শেষ হইল না। অতঃপর তাঁহার পিঠ থাবড়াইয়া, আর্দ্রস্বরে পিতৃ-হৃদয়ের পরিপূর্ণ স্নেহ প্রকাশ করিয়া বলিলেন

—"অন্ধকার রাত্রিতে তুমি সূর্য্য-লোকের বারতা এনেছ, কিরূপে তোমাকে অভ্যর্থনা করব, কি দিয়ে তোমাকে পুরস্কৃত করব, তা ত বুঝতে পারছিনে? কোথায় এ সময় রাণী?"

উত্তর হইল—"তিনি বাগানে।"

"দেখা হয়েছে তোমাদের?"

শরৎকুমার স্ত্রীলোকের ন্যায়ই সলজ্জভাবে উত্তর করিলেন—"মহাত্মাজীকে বার্ত্তাবহ ক'রে পাঠিয়ে আমি ভাবলুম—"

রাজা হাসিয়া বলিলেন—"কৈফিয়তের ত দরকার নেই। তাকে তুমি সু-খবরটা তাড়াতাড়ি দিতে গেছ—সে ত ভাল কথা; কিন্তু রাণী তোমার সঙ্গে এল না কেন,—আমি সেই কথাই বলছি।"

শরৎকুমার জানিয়াছেন, রাজকন্যার প্রতিশ্রুতির বিষয় রাজা কিছুই জানেন না, এই জন্য সে কথা এখানে এখন তুলিতে অনিচ্ছুক হইয়া তিনি কহিলেন,—"আপনাকেই আমি সেখানে নিয়ে যেতে এসেছি।"

রাজা হাসিলেন; ভাবিলেন, এ মন্দ প্ল্যান নয়! উপন্যাসের নায়ক-রূপে শরৎকুমার আজ যে বিজন-সুন্দর কাননতলে তাঁহার প্রাণের গোপন কথা রাণীর কানে তুলিয়াছেন সেই কাননদৃশ্যের মধ্যে রাজাকেও তিনি এ কথা বলিয়া তাঁহার অনুরাগের প্রকাশমাহাত্ম্য বুঝি বা সম্পূর্ণ করিতে চান। অথবা কে জানে, রাজকন্যাই যদি বা—শরৎকুমারের মনোভাব জানার পর তাঁহার সহিত একত্রে পিতার নিকট আসিতে লজ্জা বোধ করিয়া থাকেন!

রাজা হাসিয়া বলিলেন—"বুঝেছি, বুঝেছি,—আর বলতে হবে না। আমার মনেও বহুদিন থেকে যে আশা-বাসনা জাগছে, ঘরের আলোর চেয়ে চাঁদের আলোতেই তার প্রকাশ ভাল হবে। চল ডাক্তার, আজ এই শুভ রাত্রিতে তোমাদের অঙ্গুরী-বিনিময় হোক্। বিবাহের অনুষ্ঠান-পর্ব্ব এর পর যথাসময়ে শীঘ্রই সমাধা করব। আংটী আছে তোমার হাতে?"

শরৎকুমার লজ্জিতভাবে মৃদুস্বরে বলিলেন—"আপনার দত্ত আংটীটি পুলিস খুলে নিয়েছিল—এখনও ফেরত পাই নি। আমার আছে একগাছি মালা।"

রাজা সহাস্যে বলিলেন—"সে ত আরো ভালো। কোথায় তোমার মালা? গলায় দেখছিনে ত।"

"আনছি আমি"—বলিয়া তিনি পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন। পাঠক জানেন, রাজভবনে এ তাঁহারই ঘর। ঘরে গিয়া একটি বাক্স খুলিয়া তন্মধ্যে বস্ত্রের নিম্নে সযত্নে রক্ষিত ফুলমাল্য হস্তে গ্রহণ করিলেন এবং তৎসঙ্গে গ্রথিত হাসি-দত্ত ফুলটি তাহা হইতে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া মালাগাছি আনিয়া রাজাকে দিলেন। রাজা মালাটি হাতে লইয়া অবাক্ হইয়া গেলেন, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে রাজকন্যা যে জয়মাল্য তাঁহাকে পরাইয়া দিয়াছিলেন, ইহা ত সেই মালা! আশ্চর্য্য! মালাগাছি শুকাইয়া গিয়াছে, তথাপি ইহার ফুলদল সূত্রবিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে নাই! রাজা সেই শুষ্কমালা ডাক্তারকে ফিরাইয়া দিয়া গম্ভীরভাবেই বলিলেন—"এর চেয়ে পবিত্রতর, উৎকৃষ্টতর প্রেমোপহার আর কিছু হ'তে পারে না। যাও ডাক্তার, তুমি এগিয়ে চল, আমি মহারাণীকে মুক্তির সংবাদ দিয়ে এখনি তোমাদের কাছে গিয়ে পড়ছি।"

ডাক্তার বলিলেন—"মহাত্মাজীকেও আনবেন।"

রাজা সহর্ষে উত্তর করিলেন—"বেশ বেশ, আমিও সেই কথা ভাবছিলাম। তাঁর আশীর্ব্বাদে এ মিলন-রাত্রি পুণ্যজ্যোতির্ম্ময় হয়ে উঠবে।"

শরৎকুমার চলিয়া যাইবার পর রাজা ক্ষণকাল জ্যোৎস্না-প্লাবিত কাননের দিকে নিস্তব্ধে চাহিয়া রহিলেন। এই আনন্দ-দিনে বড় বেশী করিয়া তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল হাসিকে। কিন্তু মর্ম্মোত্থিত গোপন দীর্ঘনিশ্বাস মর্ম্মনিভৃতেই চাপিয়া ধরিয়া, তিনি তখনি মহারাণীর নিকট যাত্রা করিলেন। তখনও মন্দিরে আরতি-ঘণ্টা বাজিতেছিল, রাজা বন্দী হওয়া অবধি মহারাণীর সন্ধ্যাপূজা শেষ হইতে অনেক রাত্রি হইয়া পড়ে। বারান্দার সোপানাবলী উত্তীর্ণ হইয়া তাঁহার হঠাৎ বোধোদয় হইল যে, এ সময় ত তিনি মাতৃদর্শন পাইবেন না। আবার তিনি উপরে উঠিলেন—কিন্তু তখনও গোবিন্দজী ভজনগৃহ হইতে ফেরেন নাই। তাঁহার জন্য কিছুক্ষণ তাঁহাকে অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইল। তিনি বারান্দায় ফিরিবার পর তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া রাজা কাননাভিমুখী হইলেন। এই কারণে কাননে পৌঁছিতে তাঁহাদের কিছু বিলম্ব হইয়া পড়িল।

অন্তিম কাহিনী

রাজার নিকট হইতে বিদায়গ্রহণ করিয়া, আশা-বিশ্বাসপূর্ণ চিত্তে, আশে পাশে ভ্রুক্ষেপ না করিয়াই শরৎকুমার দ্রুত চলিতেছিলেন। লতামণ্ডপের কাছাকাছি আসিয়াই প্রায় পথের মাঝখানে দুর্নিমিত্ত বিভীষিকা-স্বরূপ বিজনকে দণ্ডায়মান দেখিয়া তিনিও থমকিয়া দাঁড়াইলেন। একটা অমঙ্গল আশঙ্কায়

তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। বিজন উৎকণ্ঠাজড়িত কাতরস্বরে তাঁহাকে কহিল,—"বাঁচাও ডাক্তার, বাঁচাও, কোথায় যাও, পাশে—পাশে পাশে দেখ।"

শরৎকুমার তখন পাশে চাহিয়া ভূশায়িত রাজকন্যাকে দেখিতে পাইলেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁহার মাথার মধ্যে ঘুরিয়া উঠিল—তিনি জ্ঞানশূন্যভাবেই নিকটে বসিয়া পড়িলেন। রাজকন্যার রক্তাক্ত কলেবর নজরে পড়ায় অভ্যস্ত কর্ত্তব্যবোধ পুনরায় তাঁহাতে সজাগ হইয়া উঠিল। ডাক্তারী যন্ত্র অল্প-স্বল্প একটি ছোট চামড়ার 'কেসে' চুরুট-দেশলায়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কোটের পকেটেই থাকিত। জিনিসগুলা সব পকেট হইতে বাহির করিয়া লইয়া ভূপৃষ্ঠে ফেলিয়া কোটটা ধীরে ধীরে জ্যোতির্ম্ময়ীর মাথার নীচে তিনি দিয়া দিলেন। তাহার পর সযত্নে তাঁহাকে একটু ফিরাইয়া ধরিয়া ছুরি লইয়া বামদিকের জ্যাকেট কাটিতে আরম্ভ করিলেন।

এই সযত্ন নাড়াচাড়াতেও ব্যথা অনুভব করিয়া রাজকন্যা চোখ খুলিলেন। শরৎকুমারকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার বেদনা-ম্লান মুখকান্তি আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি মৃদুকণ্ঠে বলিলেন,—"তুমি ডাক্তারদা? মালাটি এনেছ বুঝি—ঐ যে তোমার গলায় দেখছি,—দাও, আমাকে পরিয়ে দাও। বিজন-দা আমাকে মুক্তি দিয়েছেন, বিধাতা আমাদের বাসনা পূর্ণ করেছেন—দাও স্বামি—আমার গলায় ঐ মালাটি পরিয়ে দাও।"

কিছুপূর্ব্বে এই প্রেম-অভিভাষণ শুনিলে শরৎকুমার যেরূপ পরমানন্দ লাভ করিতেন তাহা দেবতারও স্পৃহণীয়। বহুদিন বহুদিন ধরিয়া ইহারই জন্য তিনি পিপাসিত, ইহারই কল্পনায় তাঁহার মনপ্রাণ আশা-সঞ্জীবিত! আর আজ? সেই ঈপ্সিত বাণী শুনিয়াই বুকফাটা অশ্রুজলে তাঁহার নয়ন ভরিয়া উঠিল, তিনি চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন। রাজকন্যার অঙ্গবসে ছুরি চালিত করা তখন তাঁহার পক্ষে দুষ্কর হইয়া উঠিল—অশ্রু-নিবারণে সচেষ্ট হইয়া তিনি আনত নয়ন মুদিত করিলেন। রাজকন্যার হাত সে জলে ভিজিয়া গেল। তাঁহাকে নিস্তব্ধ দেখিয়া বিজন ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল,—"কি করছ তুমি? পারছ না বুঝি গুলী বার করতে? দাও, আমাকে যন্ত্র দাও, ওঠ তুমি, আমি বার ক'রে দিচ্ছি।"

বিজনের অস্তিত্ব শরৎকুমার ভুলিয়াই গিয়াছিলেন,—সে একটু দূরে তাঁহার পশ্চাদ্দিকে দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার উক্ত তিরস্কারবাক্যে তিনি সচেতন হইয়া উঠিলেন। অশ্রুজল আপনা হইতেই তাঁহার নয়নে তখন মিলাইয়া পড়িল, তিনি মুখ একটু ফিরাইয়া অবজ্ঞাজনক ক্রুদ্ধদৃষ্টি বিজনের দিকে নিক্ষেপ করিয়া তীব্রস্বরে বলিলেন,—"পাষণ্ড, নরাধম, স'রে যা তুই,—দূর হয়ে যা এখান থেকে; তার পর এক দিন তোর সঙ্গে আমি বোঝাপড়া করব।"

বিজন তবুও অটল পাষাণের মত দাঁড়াইয়া রহিল; কিন্তু শরৎকুমার সে দিকে আর তখন ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজকুমারী সকাতরে বলিয়া উঠিলেন,—"বিজনদাকে বকো না—ডাক্তারদা, ক্ষমা করো, ওঁকে ক্ষমা করো। উনি মুক্তি না দিলে ত আমাদের মিলন হোত না, ভুলে যেও না ভাইটি এ কথা। বল তুমি, ক্ষমা করলে?"

রাজকুমারীর এই কাতরতা ডাক্তারের প্রাণে পৌঁছিল; তিনি একটু ঝুঁকিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন,—"তাই হবে, রাজকুমারি, তোমার যা ইচ্ছা, তাই হবে—শান্ত হও তুমি, আর কথা কয়ো না।"

বিজনের ওড়নাখানা তখনও ভূতলেই পড়িয়া ছিল। শরৎকুমার জ্যাকেট কাটিতে কাটিতে আনত নয়নেই পুনরায় বিজনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"ওড়নাখানা বুঝি আপনার? ভিজিয়ে আনুন দেখি শীগ্গির ক'রে! দেখবেন, দেরী করবেন না!"

ডাক্তারের স্বরে এবার কঠোরতা ছিল না। তাঁহার নিকট হইতে রাজকুমারীকে সেবা করিবার এই অধিকারটুকু পাইয়া কৃতজ্ঞতায় বিজনের হৃদয় ভরিয়া উঠিল, উড়ানিখানা ভূমি হইতে উঠাইয়া সবেগে উড়িয়াই যেন সে তখন নদীমুখী হইল। রাজকুমারী বুঝিলেন, শরৎকুমার তাঁহাকে মার্জ্জনা করিলেন—তাঁহার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। সেই হাসিটি লোপ না পাইতে পাইতে বেদনার ঘোরে তিনি আবার আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন।

ইতোমধ্যে জ্যাকেট যতটা কাটা হইয়াছিল, তাহাতেই শরৎকুমারের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল। ক্ষতস্থান তাঁহার নজরে পড়িয়া গেল। রুমাল দ্বারা রক্ত মুছিতে মুছিতে আশ-পাশ অতি ধীরে ধীরে সামান্য একটু টেপাটুপি করিয়াই তাঁহার মনে হইল, ক্ষতের মুখের কাছেই যেন কিছু আছে। চামড়ার কেসটি হাতের কাছেই ছিল, তাহা হইতে সত্বর একটি যন্ত্র বাহির করিয়া লইলেন। বহু দিন ধরিয়া কত রোগীর উপরে দৃঢ়হস্তে সংযতভাবে তিনি অস্ত্রচালনা করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু রাজকন্যার অঙ্গে সামান্য অস্ত্রটি চালাইবার কল্পনায় তাঁহার হাত কাঁপিয়া উঠিল, দৃষ্টি ঘোলা হইয়া গেল; চাঁদের আলোক

তখন বেশ উজ্জ্বলভাবেই ফুটিয়া উঠিয়াছিল,—কিন্তু সে আলোকও এ কার্য্যের জন্য অপ্রচুর বলিয়া তাঁহার মনে হইতে লাগিল। সন্নাটা রাখিয়া দিয়া তিনি হাত বাড়াইয়া দেশলাইএর বাক্সটা তুলিয়া লইলেন। উদ্দেশ্য—ক্ষতস্থান আগে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইবেন। দেশলাই লইয়া জ্বালাইবামাত্র সে শব্দে রাজকুমারীর ঘুমের ঘোর ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি একটু চমকিয়া তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন,—"মালা—ডাক—দা মালা! আমি যে স্বপ্ন দেখছিলুম—"

শরৎকুমার বুঝিলেন, রাজকুমারী মালা চাহিতেছেন। পাছে ঝুঁকিয়া কাজ করিতে করিতে মালাগাছি রাজকন্যার গায়ে আসিয়া লাগে, সেই জন্য শরৎ নিজের পিঠের দিকে তাহা ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলেন। দেশলাই-কাঠিটা তৎক্ষণাৎ ফেলিয়া দিয়া তিনি কণ্ঠ হইতে মালাগাছি খুলিয়া ধরিয়া উথলিত প্রেমাবেগে একবার বলিলেন, "মণিটি আমার, চিরবাঞ্ছিত ধন!" তাহার পর মালাটি রাজকন্যার কণ্ঠে পরাইয়া তাঁহার ওষ্ঠাধর অশ্রুজলে আর্দ্র করিয়া দিয়া আপনার আনত ওষ্ঠাধর তাহাতে মুদিত করিলেন। তৃষিত জীবনের এই তাঁহার প্রথম প্রেম-চুম্বন, কে জানে ইহাই শেষ কি না।

অতিরিক্ত সুখে রাজকুমারীর নয়ন নিমীলিত হইয়া গেল; শরৎকুমার ভীত অনুতপ্ত হইয়া পড়িলেন। ভাবাবেশে আত্মবিস্মৃতির সময় ত ইহা নহে! কিন্তু রাজকন্যা অজ্ঞান হইয়া পড়েন নাই, শরৎকুমার তাঁহার মাথায় হাত বুলাইবামাত্র তিনি চোখ খুলিয়া বলিলেন,—"ডাক্‌দা!"

উত্তর হইল—"এই যে মণিটি!"

রাজকন্যা মুখখানি একটু উপরে তুলিয়া ডান হাতখানি একটু বাড়াইয়া দিলেন, শরৎকুমার তাঁহার হাতে হাত রাখিবামাত্র তিনি তাহা চাপিয়া ধরিয়া অনুনয়ের সুরে বলিলেন—"আর কোথাও যাবে না ত তুমি, বল ডাক্‌দা—" ডাক্তার কষ্টে অশ্রুসংবরণ করিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিলেন,—"না মণিটি; আর কোথাও যাব না আমি; তোমার কাছ-ছাড়া আর কখনও হব না।"

রাজকুমারী একটি আরামের দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আবার চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। এই সময় বিজন আর্দ্রবস্ত্র লইয়া উপস্থিত হইল। শরৎকুমার রাজকন্যাকে বেশ ভাল করিয়া ঘুম পাড়াইবার ইচ্ছায় সেই কাপড়ের কিয়দংশ ছিঁড়িয়া প্রথমতঃ তাঁহার সমস্ত মুখ জলে ভিজাইবার পর মাথার উপরে সেখানা জলপটি করিয়া রাখিলেন। তার পর নাড়ী পরীক্ষা করিতে করিতে বিজনকে বলিলেন, "দেশলাইএর কাঠি একটা জ্বালিয়ে রাজকুমারীর মাথার পিছনে ধরুন দেখি—আলোটা যেন তাঁর চোখে না পড়ে।"

বিজন তাঁহার উপদেশমত দেশলাই জ্বালাইয়া ধরিল; তিনি এমন ধীর—এমন যত্নে ক্ষতস্থান হইতে গুলী বাহির করিয়া দিলেন যে, রাজকুমারীর ঘুমের ঘোর ভাঙ্গিল না। একবার মাঝে কেবল একটু তিনি চমকিয়া উঠিলেন মাত্র।

গুলী বাহির করিতেই বিজন জয়োল্লাসে বলিয়া উঠিল, "রাজকন্যা বেঁচে গেলেন, এবার বেঁচে গেলেন! ডাক্তার, তুমি ধন্য!"

কিন্তু শরৎকুমার নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। ভিতরের দিকে অন্য গুলী আছে কি না, যতক্ষণ না জানিতে পারেন—ততক্ষণ নিভয় হওয়া যায় না। তিনি বিজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"পিস্তলে কটা গুলী ছিল?" সে বলিল, "তা ত বলতে পারিনে, আমি ত গুলী ভরি নি; তারাই ভরা পিস্তল আমাকে দিয়েছিল।"

"পিস্তলটা একবার দিন্ দেখি?" কিন্তু তাঁহাকে নিরাশ করিয়া বিজন উত্তর করিল—

"আমার কাছে ত পিস্তল নেই, ফেলে দিয়েছি।" শরৎকুমার ভাবিত হইয়া পড়িলেন। প্রাণনাশ করাই যখন উদ্দেশ্য, তখন একাধিক গুলী পিস্তলে থাকারই সম্ভাবনা। এখানে যতদূর চিকিৎসা হইতে পারে, তাহা তিনি করিয়াছেন। এখন ইঁহাকে গৃহে লইয়া গিয়া যন্ত্রাদির রীতিমত সাহায্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, নহিলে বিপৎসম্ভাবনা।

ইহা ভাবিয়া রাজার জন্য অপেক্ষা না করিয়াই তিনি বিজনকে বলিলেন, "আপনি দৌড়ে প্রাসাদে গিয়ে একখানা মোটার আনতে বল্‌বেন কি? আমি ত রাজকন্যাকে একলা এখানে ছেড়ে যেতে পারিনে।" বিজন বলিয়া উঠিল, ব্যাকুল ভাবেই বলিয়া উঠিল—

"রাজকন্যাকে নিয়ে যাবেন এখান থেকে? যাচ্ছি আমি—এখনই যাচ্ছি। কিন্তু একটি কথা বলবার আছে তার আগে! আর ত দেখা হবে না।"

ডাক্তার ভাবিলেন, বিজন ক্ষমা চাহিবে; তিনি নীরসকণ্ঠে বলিলেন—"আমি ত আগেই বলেছি যে—" বিজন তাঁহার মনের কথা বুঝিয়া বলিয়া উঠিল—"না ডাক্তার, আমি ক্ষমার ভিখারী নই, আমি যে পাপ করেছি—তাতে ক্ষমা নেই,—আমি পাষণ্ড নরাধম; শাস্তি দাও আমাকে, যে

শাস্তি তুমি দিতে চাও, দাও। কিন্তু তার আগে রাজকুমারীর হাতটি তোমার হাতে দিতে দাও—এই আমার আকুল প্রার্থনা। তুমি মহাজন—পাষণ্ড পিশাচের প্রার্থনাও অগ্রাহ্য করবে না তুমি, তা আমি জানি।"

বলিতে বলিতে সে বসিয়া পড়িল এবং ডাক্তারের অনুজ্ঞার জন্য অপেক্ষা না করিয়াই তাঁহার দক্ষিণ হস্ত টানিয়া লইয়া রাজকন্যার বাম হাতের উপর ধরিল। অতঃপর দাঁড়াইয়া উঠিয়া পরিপূর্ণ আনন্দে কহিল,—"এখন আমি পবিত্র, আমি ধন্য! তোমার প্রসাদে সর্ব্বপাপতাপ থেকে আমি এখন মুক্ত। কি শাস্তি দেবে, এখন দাও, আমি প্রস্তুত।"

শরৎকুমার যদিও ইতঃপূর্ব্বে তাহাকে ক্ষমা করিয়াছিলেন; কিন্তু সে যে নরাধম, ঘৃণার পাত্র, এ কথা তিনি ভুলিতে পারেন নাই, বিজনের হৃদয়ভেদী অনুতাপে তাঁহার মন হইতে এ পাপ মলিনতাটুকু দূর হইয়া গেল—হৃদয় করুণা-বিগলিত হইয়া উঠিল, যে তাঁহার সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তাহাকেও তিনি এইবার সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করিলেন। তাঁহার অশ্রুপূর্ণ নয়নের দিকে চাহিয়া বিজন মর্ম্মে মর্ম্মে সে ক্ষমা অনুভব করিল এবং আর কোন একটি কথা অতঃপর না কহিয়া মোটার আনিতে বলিবার জন্য ছুটিল।

রাজকুমারী কিছু পরে ঘুম' ঘুম' ভাবেই চোখ খুলিয়া শরৎকুমারকে সহসা বলিলেন—"কাঁদছ তুমি? কেন ডাক্‌দা!"

শরৎকুমার তখন কাঁদেন নাই; কিছু পূর্ব্বে তাঁহার চোখের জলে রাজকন্যার হাত ভিজিয়া গিয়াছিল; বোধ হয়, সেই কথাই এখন বালিকার মনে পড়িয়া গেল। তাঁহার কথায় শরৎকুমারের নয়ন আবার জলপূর্ণ হইয়া উঠিল. তিনি মুখ ফিরাইয়া লইলেন। আনত নেত্রজলে ভূমিতল আর্দ্র করিয়া পুনরায় তাঁহার দিকে ফিরিয়া যথাসাধ্য সংযতভাবে বলিলেন—"না মণিটি, কাঁদি নি ত।" বলিয়া তাঁহার মাথার শুকনো জলপটি খুলিয়া দিয়া কপালে হাত বুলাইতে লাগিলেন। জ্যোতির্ম্ময়ীর ঘুমের ঘোর সহসা কাটিয়া গেল, পূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়া বেশ সজ্ঞানেই কহিলেন "ডাক্‌দা—না, তুমি কাঁদছ, আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি। কেঁদো না ভাইটি, আমার আশা-বাসনা-কল্পনা সবই যে অসম্পূর্ণ; তুমি সেগুলি সম্পূর্ণ কর—ডাক্‌দা,—"

ডাক্তার বলিলেন—"করব বই কি; আমরা দুজনে মিলে তোমার অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করব।" এ কথা রাজকন্যার কানে গেল না, তিনি যা ভাবিতেছিলেন—তাহাই প্রকাশ্যে আবার বলিলেন, "অমঙ্গল কাজে কি ক'রে মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধিত হবে, হ'তে পারে না তা—কখনই হ'তে পারে না, ভারতের মুক্তি মঙ্গলময় অহিংসা নীতিতে,—ঐ যে বাবা, ঐ যে মহাত্মাজী!"

রাজা ও গোবিন্দজী তাঁহাদের যে খুবই কাছে আসিয়া পড়িয়াছেন, শরৎকুমার তাহা ইতঃপূর্ব্বে জানিতে পারেন নাই, এমনই অনন্যমনে তিনি রাজকুমারীর কথা শুনিতেছিলেন।—তাঁহাদিগকে দেখিয়া ডাক্তার উঠিয়া দাঁড়াইলেন—রাজকন্যা বলিলেন—"বাবা, গুরুদেব, আপনারা আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করুন; আমাকে পদধূলি দিন।"

গোবিন্দজী বলিলেন "স্বস্তি স্বস্তি।"

কন্যাকে ভূশায়িত দেখিয়া রাজা মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন। প্রকৃত অবস্থা যে কি, কিছু না বুঝিয়াও এইটুকু বুঝিলেন যে, রাজকন্যার কোন সাংঘাতিক দৈববিপদ ঘটিয়াছে। কন্যার নিকটে বসিয়া পড়িয়া মাথায় হাত রাখিয়া সকাতরে, সাদরে ডাকিলেন, "রাণি আমার।" জ্যোতির্ম্ময়ী মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "দুঃখ করো না বাবা। আজ আমরা বিপন্মুক্ত. আজ আমাদের মিলন-রাত্রি।"

বেদনা-কম্পিত বক্ষে অশ্রু-উচ্ছ্বাস রুদ্ধ করিয়া ধরিয়া তিনি নীরব হইয়া রহিলেন। জ্যোতির্ম্ময়ী আবার বলিলেন, "সেতারাটি কোথায় তোমার? বাজাও না বাবা! সাম্য রাগিণীতে তোমার সেতারা ঝঙ্কৃত ক'রে তোল; শুনতে শুনতে আমি বিশ্বের সঙ্গে এক হয়ে পড়ি, বাজাও না বাবা!" বলিতে বলিতে রাজকন্যা তাঁহার হাতটি রাজার কণ্ঠে তুলিয়া দিবার অভিপ্রায়ে তাহা উঠাইতে গেলেন, কিন্তু পারিলেন না, ঈষৎ উত্তোলিত হস্ত নামিয়া পড়িল, শরৎকুমার তাহা ধরিয়া রাখিলেন। রাজা বসিবামাত্র তিনিও পাশে বসিয়াছিলেন।

মোটার লইয়া বিজন আসিয়া পৌছিল এবং গাড়ীখানা কিছু দূরে রাখিয়া, অগ্রসর হইয়া আসিতেই রাজাকে দেখিয়া তাহার যেন দম বন্ধ হইয়া পড়িল, দাবাগ্নির জ্বালা হৃদয়ে ধরিয়া মূঢ়ের ন্যায় সে দাঁড়াইয়া রহিল। বিজনকে এ সময় এখানে দেখিয়া রাজাও অবাক্ হইয়া গেলেন! এ দুর্ঘটনায় কি তবে সুজন রায়েরও কোনও হাত আছে নাকি! তিনি নীরব জিজ্ঞাসায় শরৎকুমারের দিকে চাহিলেন। শরৎকুমার কি উত্তর দিবেন, যেন ভাবিয়া পাইলেন না। "বিজন—ভুল ক'রে—হঠাৎ—" তিনি থামিয়া

থামিয়া অতি মৃদুস্বরে এই কয়েকটি কথা উচ্চারণ করিতে না করিতে, বিজন নিজেই রাজার নিকট আসিয়া নতশির হইয়া কহিল,—"আমিই রাজা-বাহাদুর ভুল ক'রে রাজকন্যাকে আহত করেছি। যা দণ্ড দেবেন, আপনি দিন।"

রাজার অনুমান তবে সত্য? সুজন রায়ের চক্রান্তেই তাঁহার প্রাণাধিক কন্যার জীবনসংশয়। রাজার হৃৎপিণ্ড-নির্গত রক্তস্রোত উৎক্ষিপ্ত হইয়া মস্তিষ্ক আলোড়িত করিতে লাগিল। দুই হাতে মাথা চাপিয়া ধরিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া বেদনাগম্ভীর স্বরে তিনি বলিলেন, "হাঁ রে হতভাগ্য মাতৃহন্তারক। দেশমঙ্গলের জন্য যে মাতা তাঁর সুখশান্তি সর্ব্বস্ব পণ করেছেন, তাঁকে তুই হত্যা করলি। এর দণ্ড আমি কি দেব? এর সমুচিত দণ্ড এ জগতে নেই; অন্য জগতে আছে কি না, জানি না। যা দুর্জ্জন, তুই চ'লে যা।"

বিজন মৌন হইয়া রহিল। তাহার বুকে যে জ্বালা জ্বলিতেছিল, রাজার তিরস্কার-জ্বালা হইতেও তাহা প্রখর প্রচণ্ড। জ্যোতির্ম্ময়ী সকাতর অনুনয়ে বলিয়া উঠিলেন, "বাবা, মাপ করো বিজন দাকে! অনুতপ্ত আশ্রিতজনকে তাড়িয়ো না। আশ্রয় দিয়ে তাকে সুপথে চালিত করো।"

রাজা তখন শোকাকুল, এ কথা তিনি শুনিলেন; কিন্তু মর্ম্মে প্রবেশ করিল কি না, বোঝা গেল না। হৃদয়বিদারক স্বরে তিনি কহিলেন, "হায় হায়! সব ব্যর্থ! রাণীর আমার এত আশা, আকাঙ্ক্ষা, উদ্যম, কল্পনা—সব বৃথা! সব ব্যর্থ!"

জ্যোতির্ম্ময়ী মোহজড়িত কণ্ঠে বলিলেন,—"কেন বলছ বাবা তুমি অমন ক'রে? আমার কষ্ট হচ্ছে।"

বলিতে বলিতে রাজকন্যার সাশ্রু নয়ন বুজিয়া আসিল। রাজা মুহূর্ত্তকাল নীরব হইয়া রহিলেন; তাহার পর কন্যার মাথায় হাত রাখিয়া মুদ্রিত নয়নে আবার বলিয়া উঠিলেন, "সৃষ্টির মধ্যে যা কিছু ভাল, —যা কিছু উৎকৃষ্ট, তাই দিয়ে যে স্বয়ং বিধাতাপুরুষ তোকে গ'ড়ে তুলেছিলেন! সুন্দর সুরূপ মূর্ত্তিখানির মধ্যে আকাশের মতই প্রেমদীপ্ত সুবিশাল হৃদয় লুকিয়ে ছিল তোমার! কুসুমকোমল ঐ লক্ষ্মীশ্রীতে সূর্য্য তার মঙ্গল জ্যোতি, বিদ্যুৎ তার তেজঃশক্তি ঢেলে দিয়েছিলেন। আমার ত তোমাকে মানুষ করতে হয় নি—তুমিই মাতৃস্নেহে আমাকে মানুষ ক'রে তুলেছিলে! ওগো স্নেহময়ী মা আমার! হায় হায়! সবই ব্যর্থ হোল! সয়তানের খড়্গে বিধাতার চমৎকার রচনা অকালে চক্ষুর নিমিষে নষ্ট হয়ে গেল রে, হায় হায়!"

রাজকন্যার নয়ন তেমনই নিমীলিত রহিল; মোহ-ঘোরেই তিনি একবার ফুঁপাইয়া উঠিলেন। শরৎ-কুমার অশ্রু মুছিয়া রাজাকে বলিলেন,—"আপনি এমন অধীর হ'লে ত চলবে না। এঁকে ত বাঁচাতে হবে, উঠুন, চলুন, এইবার ঘরে নিয়ে যাই।"

রাজা নিরাশা-ব্যাকুল স্বরে বলিলেন,—"পারবে তুমি? বাঁচাতে পারবে ডাক্তার? না না, সে আশা কোরো না। হায় হায়, সব ব্যর্থ,—আশা-বাসনা সব বৃথা! সয়তানের নিদারুণ খড়্গ যে ভগবানের ইচ্ছাকে ভেঙে চুরমার ক'রে দিয়েছে—তুমি পারবে? পারবে না ডাক্তার - পারবে না, স্বর্গের ধনকে তুমি মর্ত্ত্যরাজ্যে বেঁধে রাখতে পারবে না! স্বয়ং বিধাতা-পুরুষ হার মেনেছেন, আর তুমি পারবে? হায় হায়, সব ব্যর্থ - সব চুরমার!"

শরৎকুমার হাত দিয়া অশ্রু উথলিত আনত মুখ ঢাকিলেন।

মহাত্মাজীও এই শোকদৃশ্যে অভিভূত হইয়া স্তব্ধভাবে পাশে দাঁড়াইয়া ছিলেন। শক্তি সংগ্রহ করিয়া লইয়া এতক্ষণের পর বলিলেন,—"রাজা, শোক করবেন না। ইনি ত মানবী নন—ইনি একটি মঙ্গল ভাব; একটি Idea, ইঁহার মৃত্যু নাই।"

রাজা একটু হাসিলেন, - অশ্রু অপেক্ষাও সে হাসিতে সুগভীর যাতনা প্রকাশিত করিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন—"কি বলছেন আপনি! মঙ্গলের মৃত্যু নাই? মিথ্যা—সে কথা! মিথ্যা সে বিশ্বাস! এ রাজ্য হ'তে মঙ্গল কল্যাণ যা কিছু সব চ'লে গেছে, —নাই নাই,—এ দেশে মঙ্গল নাই, এ জাতির কল্যাণ নাই! সবাই বলে,ভারত পুণ্য-ভূমি, মিথ্যা—সে কথা মিথ্যা! এ হতভাগ্য দেশ চিরপাপ-নিমজ্জিত, এই মোহান্ধ জাতি চির-অভিশপ্ত। মঙ্গল নাই, এ দেশের মঙ্গল নাই!"

রাজকন্যার মোহঘোর আবার ভাঙ্গিয়া গেল; তাঁহাকে জাগরিত দেখিয়া মহাত্মাজী রাজার কথার উত্তরে কিছু না বলিয়া তাঁহাকে বলিলেন—"রাজ-কন্যে, এই একটু আগে ডাক্তারকে তুমি যে কথা বলছিলে, সেই কথা আর একবার বল ত মা! তোমার সেই মঙ্গলবাণীর মঙ্গল ভাবে মঙ্গল কার্য্য-শক্তি আমাদের মধ্যে পরিপূর্ণরূপে উদ্বোধিত হয়ে উঠুক।"

রাজকন্যা আনন্দকম্পিত ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন—"গুরুদেব! আপনি আমার কাছে এসে বসুন।

ভগবান্ আমার প্রতি সুপ্রসন্ন,— তাই এত দিনে গুরু-দর্শন পেলুম। আমার আর কিছু বলার নেই· আপনি আমার চিরাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করন-- সত্য মঙ্গল মন্ত্রে আমাকে দীক্ষিত করুন। কানে কানে নয়, মৃদুস্বরে নয়, আকাশভেদী সেই মন্ত্রধ্বনিতে সচেতন হয়ে উঠে—বিশ্বজগৎ সমস্বরে আমার সঙ্গে ব'লে উঠুক --

'অসতোমা সদ্গময়--
তমসোমা জ্যোতির্গময়।'

ঋষিমুখে যেন বেদগান ধ্বনিত হইল, সকলে কুহক-মুগ্ধ হইয়া শুনিলেন।

এই সময় অনাদি, হাসি ও কৃষ্ণলাল আসিয়া পৌঁছিলেন। জ্যোতির্ম্ময়ী সহাস্যে তাঁহাদের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিয়া পূর্ণ কণ্ঠে সুস্পষ্ট উচ্চারণে আবার গাহিলেন ;--

"অসতোমা সদ্গময়—তমসোমা জ্যোতির্গময়—
মৃত্যোর্মামৃতং গময়-- "

জ্যোতির্ম্ময়ীকে ঘিরিয়া বসিয়া তাঁহারা অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। গুরুদেব বলিলেন—"কেঁদো না তোমরা ; রাজকন্যার ইচ্ছা পূর্ণ কর। জিঘাংসা দ্বারা যে ভারতের মুক্তি নাই, রাজকন্যার উপদেশে এ সত্য আমার মর্ম্মের শিরা-উপশিরায় অঙ্কিত হয়ে গেছে। এস, আমরা সকলে মিলে আজ এই পবিত্র শোকসভায়—অহিংস-মন্ত্র গ্রহণ ক'রে দেশ-মঙ্গল-ব্রত ধারণ করি। এ সভার প্রেসিডেণ্ট আজ স্বয়ং রাজকন্যা জ্যোতির্ম্ময়ী।"

কৃষ্ণলাল প্রাণ ভরিয়া বলিয়া উঠিলেন—

"ওঁ"

অদূরে ধ্বনিত হইল—

"বন্দে মাতরম্"

নব-বিবাহিত দম্পতি পণ্ডিতমহাশয় ও কুন্দবালা রাজকন্যা-দর্শনে আসিয়াছেন।—

সমাপ্ত

বিচিত্রা

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত

উপহার

—–—✲—–—

তোমারেই দিতে হবে ? তাই লও, বেশ !
দেখো যেন না প'ড়েই করিও না শেষ !
অত কেন হাসি রাণি ? বল দেখি মনোবাণী
কার ছবিখানি এত দেখিছ সরেশ ?

বিচিত্রা

হাসি

প্রথম পরিচ্ছেদ

তাহাকে যেই দেখে সেই বলে—"আহা বেশ মেয়েটি ত।"

আমার কিন্তু মনে হয় যে, সে 'বেশের' চেয়েও একটু বেশী ভাল। তাহার সুদীর্ঘ পল্লবযুক্ত বড়-বড় চোখদুটি এমন স্বপ্নময় ভাবে ঢল ঢল, ছোট-ছোট সুগঠিত অধরোষ্ঠ-দু'খানি এমন হাসি হাসি, আর উজ্জ্বল শ্যামবর্ণখানি এমন স্বাস্থ্য-লাবণ্যপূর্ণ যে, অনেক সুরূপা গৌরীকে ফেলিয়া তাহার দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

তাহার দিদিমার চোখে ত সে অদ্বিতীয় সুন্দরী,—তিনি ডাকেন তাহাকে রূপসী বলিয়া। কিন্তু আসল নাম তার সুগুণা। কি গুণের পরিচয় পাইয়া তাহার দাদামহাশয় অন্নপ্রাশনকালে সেই অব্যক্তদন্ত দশ-মাসের শিশুটির নাম দিয়াছিলেন সুগুণা, তাহা জানি না; তবে কালে তাহার এ নাম সার্থক হইয়াছে। ঘর-বাহির তাহার গুণের পরিচয়ে মুগ্ধ। পিতার আর কেরাণী রাখিতে হয় না, যত তাঁহার চিঠিপত্র সে টাইপ করিয়া দেয়; মায়ের জমাখরচ সেই রাখে; দিদিমাকে সে বাঙ্গলা পুস্তক পড়িয়া শুনাইয়াই পরিতৃপ্ত নহে, অবসর সময়ে ইংরাজী উপন্যাসের তর্জমা করিয়াও শুনায়। রন্ধনেও তাহার হাত ভাল, এমন কি, তাহার হস্ত-প্রস্তুত মিষ্টান্নের একবার [illegible] পাইয়াছেন, আত্মমর্য্যাদা বিসর্জন দিয়াও তিনি [illegible] বাবু মুখুয্যেবাড়ীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। [illegible] বালিকা পটু, সে সঙ্গীত- [illegible] সে-কাল গিয়াছে! নব্য- [illegible] —মেয়ে জন্মিবা- [illegible] গানবাজনা [illegible] রাখিতে [illegible] আজকাল মেয়ের গানবাজনা শেখানো [illegible] নহে, বরঞ্চ প্রশংসনীয়—কারণ ইহা সুপাত্র লাভের একটি উপায়। দরকারের নিকট আইনকানুন আপনা হইতে শিথিল হইয়া পড়ে।

কিন্তু বালিকার সকল গুণের সেরা গুণ—তাহার কোমল প্রকৃতি, তাহার আত্মগর্ব্বহীন সরলতা। সদাবিকাশিত মিষ্ট হাসিতে, অমায়িক সহজ কথা-বার্ত্তায় তাহার মনের এই রূপটুকু আত্ম-অজানিত কি সুমধুর ভাবেই আত্মপ্রকাশ করে!

দিদিমা কিছু কিছু সংস্কৃত জানেন; তিনি তাহাকে শুনাইয়া যখন-তখন আওড়ান—

> "পয়সা কমলম্ কমলেন পয়ঃ
> পয়সা কমলেন বিভাতি সরঃ।
> মণিনা বলয়ং বলয়েন মণি,—
> মণিনা বলয়েন বিভাতি করঃ।" ইত্যাদি।

ইহার ভাবার্থ এই, জলে যেমন পদ্ম, পদ্মে যেমন জল এবং উভয়ের সম্মিলনে সরোবর যেমন শোভা পায়, সেইরূপ তাহার নাতনীটির রূপ তাহার গুণকে এবং গুণ রূপকে ফুটাইয়া উভয়ে মিলিয়া তাহার আধারকে সুশোভিত করিয়াছে। দিদিমার প্রশংসায় নাতনীটি হাসিয়া ঢলিয়া পড়ে—কিন্তু গর্ব্ব বোধ করে না।

শ্রীকৃষ্ণের শতনাম। আর কিছুতে না হউক, এই আদর্শে বালক-বালিকার নামের পশ্চাৎ একাধিক নেজুড় টানিয়া—আমরা যে ভক্তজাতি, ইহার প্রমাণ দিতে পারি না কি? বাঙ্গালী-ঘরে বোধ হয় এমন ছেলেমেয়ে নাই, যাহার একাধিক নাম না আছে। আমাদের নায়িকাটিও যে এ সম্বন্ধে বর্জ্জিত-বিধির মধ্যে গণ্য নহেন—তাহার পরিচয় আমরা পূর্ব্বেই পাইয়াছি। কিন্তু উল্লিখিত দুই নাম ছাড়া তাহার আরও একটি নাম আছে। বালিকা সদা-হাস্যময়ী বলিয়া পিতা তাহার নাম দিয়াছেন হাসি।

ভাবে অনুভাবে বালিকার পক্ষে এ নামটি এত

সঙ্গত যে ক্রমশঃ ইহাই তাহার ডাকনাম হইয়া পড়িয়াছে।

হাসির হাসিটি তাহার বাপমার নিকট কি সুমধুর! দিদিমার নিকট বিশ্ববিমোহিনী! তাহার প্রিয় আত্মীয়স্বজন সখা-সখীদিগের নিকটও অতি সুন্দর। তথাপি ইহার শোভা বাদানুবাদবিবর্জ্জিত, সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। মেয়েছেলের মুখে সারাদিন এমন হাসি কাহারও কাহারও মনে বড় বাড়াবাড়ি, অশোভন বলিয়াই ঠেকে।

আশ্চর্য্য নহে! যে পঞ্চভূতের সমষ্টি এই মানব, তাহার সর্ব্বপ্রধান ভূত কি? আমি ত বলি তাহার ভেদ-বুদ্ধি। স্বয়ং ভগবানের অস্তিত্ব লইয়াই যখন নানামুনির নানামত; আমি আছি বা নাই ইহাতেও যখন মতভেদ, তখন হাসির হাসিটুকুতেও যে কেহ কেহ চন্দ্রের কলঙ্ক দেখিবেন ইহাতে আশ্চর্য্য কি?

সত্যই হাসি না হাসিয়া কথা কহিতে পারে না—বা না হাসিয়া গম্ভীরভাবে কাহারও কথা সে শুনিতে পারে না। এইরূপে শ্রোতা ও বক্তা উভয়ের মধ্যে রসিকতার কোনো প্রচ্ছন্ন প্রয়াস লুক্কায়িত না থাকিলেও সে অকারণে হাসে; আর কারণ থাকিলে ত কথাই নাই, প্রফুল্ল হাসিতে কমলের মত সে ঢলিয়া পড়ে। অতএব এত হাসি সকলের সহ্য হইবে এমন আশা করা যায় না।

কিন্তু শ্বশুর-গৃহ তাহার এই হাসি সহ্য করিবে কি না অপাততঃ এই চর্চ্চাতে দু-এক জন প্রৌঢ়া হিতাকাঙ্ক্ষিনীর অতি দুঃখেতেও বেশ সুখে সময় অতিবাহিত হইতেছে। নিজের মেয়ের কালো রূপ এবং বধূর ঘুমটধারী গুমট-মুখের প্রতি হতাশনয়নে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক গোপনে যাহার যতই দীর্ঘনিশ্বাস উথলিয়া ওঠে, মুখে ততই সজোরে তিনি বলেন—"মেয়েছেলের রূপ লইয়া আর কে ধুইয়া খায়?" প্রিয়সখী অমনি পাল্টা উত্তরে যখন ধুয়া ধরেন—"তা তো বটেই, মেয়েছেলেদের "স্বভাবটাই" আসল, তোমার আমার বৌয়ের মুখে কি কেউ কখনো হাসি দেখিতে পায়?" তখন হাস্যে ভাষ্যে প্রসঙ্গটা উত্তরোত্তর অতিরিক্ত-মাত্রায় জমিয়া ওঠে।

কিন্তু ঘরের মধ্যেই এই আন্দোলন আবদ্ধ রাখিয়া তাঁহাদের তৃপ্তি নাই। হাসির পিতৃ-মাতাকে এ সম্বন্ধে সাবধান করাটা তাঁহারা একান্ত কর্ত্তব্য জ্ঞান করেন।

দিদিমা কিন্তু এ রকম অযাচিত উপদেশে জ্বলিয়া যান। রাগিয়া বলেন,—"বিধাতা আগে বর গড়িয়া তার ক'নে সৃষ্টি করেন। হাসির বরকে সু- করিবার জন্যই হাসিকে তিনি এমন হাসি দিয়া গঠিত করিয়াছেন। হাসির পিতা তাঁহার মাতারই একেলে সংস্করণ,—অর্থাৎ তাঁহার মনের গঠন মাতারই অনেকটা অনুরূপ; তবে শিক্ষা দীক্ষায় সংস্কৃত মাত্র। তিনি এরূপ উপদেশে রাগেন না, হাসিয়াই বলেন,—"দরকার না থাকিলে হাসির হাসি আপনিই সংযত হইয়া আসিবে, সে জন্য আমাদের ভাবিবার প্রয়োজন নাই।" মা কিন্তু কথাটাকে উপেক্ষা করিতে পারেন না, মনে-মনে ইহার সারবত্তা মানিয়া লইয়া মেয়েকে সাবধান হইতে শিক্ষা দেন। মেয়ে যখন উত্তরে সানুনয়ে বলে,—"আচ্ছা মা আমি, আর হাস্‌ব না।" এবং কিছুক্ষণ গম্ভীর হইয়াও থাকে, তখন মা কিন্তু দুই চক্ষে অন্ধকার দেখেন।

তবে নক্ষত্রের অম্বরে মহাবিপ্লব না ঘটিলে তাহার জ্যোতিহীনতা যেমন ক্ষণস্থায়ী, সেইরূপ হাসির হাসিও মাতার সাদর উপদেশ ভুলিয়া কিছু পরে মেঘমুক্ত জ্যোতির ন্যায়ই পুনঃপ্রকাশিত হইয়া মাতার ক্ষোভের কারণ দূর করিয়া দেয়।

এইরকম করিয়া হাসি-খুসীর মধ্যেই হাসি আঠার বছরের মেয়েটি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু তাহার এখনও বিবাহ হয় নাই। বড় কি নূতন কথা! নব্য-সম্প্রদায়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া, ঘোর হিন্দু-সমাজেই বা কয়জন পিতা আজকাল অষ্টম বর্ষীয়া কন্যাদানে গৌরীদানের পুণ্যলাভে কৃত-কৃতার্থ!

অতএব আমি কৈফিয়ৎ-আহ্বান অগ্রাহ্য করিয়া উপন্যাস লেখকের জয়পতাকা উড়াইলাম! পতাকা পত-পত-শব্দে কি বলিতেছে শোন:

"জয় উপন্যাসিকের জয়! এখন আর বাঙ্গালী-ঘরে বয়স্কা অবিবাহিতা কন্যা বা প্রেম-পরিণয় লেখকের কল্পনামাত্র নহে, ইহা ঘরের কথা, দৈনন্দিন ঘটনা!" আমিও পতাকার সহিত সমস্বরে নিজের জয়ধ্বনি গাহিয়া পুনরায় সগর্ব্বে বলিতেছি, অষ্টাদশ বর্ষীয়া হাসি এখনও অবিবাহিতা।

স্বরূপা, সুগুণা, ধনী পিতামাতার স্নেহের ক্রোড়ে প্রতিপালিতা হাসির আর কিছুরই অভাব নাই, অভাব কেবল একটি সুপাত্রের। সংসারে সাধারণ মিল সহজে মিলে, অসাধারণের মিল পাওয়াই দুর্ঘট। এই কারণেই বোধ হয়, তাহার এখনও বিবাহ হয় নাই। অথচ তাহার বরের যে নিতান্ত অভাব তাহাও নহে; হাসির রূপ-গুণের সমজদার বিস্তর। প্রচুরতা বশতঃই সম্ভবতঃ তাহার মধ্য হইতে কোনো-একটিকে নির্বাচন করা [illegible] পক্ষে [illegible]

কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহাদের চোখে যাহার রূপ লাগে, তাহার গুণের অভাব, যাহার রূপগুণ দুই-ই দেখিতে পান, ধনমর্য্যাদায় অথবা বংশমর্য্যাদায় হয় ত বা সে খাট; আর যে ছেলেটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে হাসির যোগ্য বর বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহাকে জামাতা করা তাঁহাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব, কেন না, হয় ত বা সে ভিন্নবর্ণ অথবা ভিন্নগোত্র।

এইরূপে ছাঁটছোট বাদসাদ দিয়া তবুও দুইটি পাত্র তাঁহাদের হাতে আছে। দুই জনের মধ্যে বিধাতা কার ভাগ্যে হাসিকে লিখিয়াছেন, তাহা তিনিই জানেন।

এক জন ধনিপুত্র, কিন্তু পাশের যাচাইয়ে তাহার বাজার-দর কম। ইউনিভারসিটি পরীক্ষায় পাশ অপেক্ষা ফেল-নম্বরই তাহার অধিক। অথচ তাহার বুদ্ধিশুদ্ধিরও অভাব নাই, অভাব কেবল সেই উদ্যমটুকুর—সেই প্ররোচনার—যাহার বলে সাধারণতঃ আমাদের দেশের অনেক স্বল্পবুদ্ধি ছেলেও বুদ্ধিমান বনিয়া যায়। চাকরী-করার সেই তাগাদাটুকু বিজনকুমারের ছিল না বলিয়াই বুঝি তাহার বুদ্ধিতে উদ্যমের যোগাযোগ ঘটিতেছিল না।

আর এক জন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ-সন্তান; ২৪ বৎসরের মধ্যেই ডাক্তারীর শেষ পরীক্ষা দিয়াছে—পাশ যে হইবে তাহা একরূপ স্থিরনিশ্চয়, তবুও তাহার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত—কেন না, নিজের ভাগ্য তাহাকে নিজেই গড়িয়া লইতে হইবে; ইহাতে বাধাবিঘ্ন বিস্তর।

হাসির মাতার তাই ইচ্ছা ধনিপুত্র বিজনকুমারকেই জামাতা করেন। পুত্র শচীনের সে হৃদয়-বন্ধু; সেই তাহাকে প্রথমে এখানে আনে। বিজনকুমার দেখিতে ভাল, কথাবার্ত্তাতেও বিনয়ী, আর হাসির পিতার দিকের একটা কি দূর-সম্পর্কের দাবীতে কাকী-মা-সম্বোধনে যখন-তখন কাছে আসিয়া তাঁহার স্নেহ-প্রবণ হৃদয়ের অনেকখানি সে অধিকার করিয়া লইয়াছে।

শরৎকুমারও তাঁহাদের অনুগত, ছেলেবেলা হইতেই যাওয়া-আসা করে, কিন্তু পড়াশুনার চাপে অনেকদিন হইতেই সে বড় বিব্রত; সুতরাং তাহার অবসর কম। তথাপি সে এখানে একেবারে যে আসে না এমন নহে, কিন্তু যাহার টানে আসে, তাহাকে সে প্রায়ই কর্ত্তার ঘরে দেখিতে পায়, সেই জন্যই বিশেষতঃ অন্তঃপুরে তাহাকে আর বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না।

যেখানে অধিক ইচ্ছা সেইখানেই প্রায় সফলতায় বিলম্ব দেখা যায়। তাই রক্ষা—নহিলে উপন্যাস লেখকের বড় দায় হইয়া উঠিত। বিজনকুমারের সহিত হাসির বিবাহেও একটি বিষম বাধা ঘটিয়াছে। বরপক্ষ হইতে এ সম্বন্ধে কোনই প্রস্তাব আসিতেছে না। তাহার বাপের ইচ্ছা বি-এটা পাশ করিলেই তাহাকে বিলাত পাঠাইবেন, আর যত দিন না পাশ করে, তত দিন তাহার বিবাহ দিবেন না। কিন্তু বিজনকুমার কাকীমার কাছে ঘরের অনেক কথা বলিলেও এ কথাটা চাপিয়া গিয়াছে। হাসির মাতা ভাবেন, বিজনকুমারের ত এ দিকে টান দেখিতেছি, লজ্জায় সম্ভবতঃ সে এ বিষয়ে আপনা হইতে বাপকে কিছু বলিতে পারে না। কিন্তু ছেলে যখন ভাল, সর্ব্বতোভাবে মনোমত, তখন গর্ব্ব করিয়া তাহাদের প্রস্তাবের জন্য বসিয়া থাকাটা নির্বুদ্ধিতার কার্য্য। বড়মানুষের ছেলে, কাল শুনিব তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। তিনি সেইজন্য কর্ত্তাকে ক্রমাগত তাড়া দেন যে, "চেনাশুনা ঘর, বরের বাপের সঙ্গে তোমার একটু সম্পর্কও আছে; তুমিই আপনা হইতে কথাটা ওঠাও।"

কর্ত্তা ফিলজফার লোক, অতএব অলস-প্রকৃতি, কোনও কাজে তাঁহাকে ভিড়ান বড় সহজ নহে। যতক্ষণ তিনি অন্য কাজ করিবেন, ততক্ষণ তাঁহার দর্শনতত্ত্ব লেখায় ব্যাঘাত ঘটিবে। তাঁহার মতে মানুষের যাহা দরকার, তাহা সহজেই মেলে, তাহার জন্য অতিরিক্ত প্রয়াস অনাবশ্যক। যদি সহজে বিজনকুমারকে পাওয়া যায় ত ভাল, আর না পাওয়া যায় তাহাও মন্দ নহে, শরৎকুমার ত আয়ত্তের মধ্যেই রহিয়াছে।

এ রকম মনের গঠন বেশ সুখের সন্দেহ নাই, তবে অনেক সময় দুঃখেরও কারণ হইয়া উঠে। এজন্য সময় সময় গৃহিণীর নিকট তাঁহার বিস্তর লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। কিন্তু এই উপভোগের প্রতি দারুণ বিতৃষ্ণা বশতঃ গৃহিণীর সকল অনুরোধ, সকল ভারই তিনি যেরূপ বিনা বাক্যব্যয়ে শিরোধার্য্য করেন, সেইরূপই দ্বিধাহীন চিত্তে অন্যের স্কন্ধে তুলিয়া দিয়া নিষ্কৃতি লাভ করেন। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। গৃহিণীর অনুরোধ পালনের ভারটি চুপে চুপে আত্মীয়-প্রবর হেমচন্দ্রের মাথায় চাপাইয়া আপনি নিশ্চিন্তমনে জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদাভেদ-রহস্য-নির্ণয়ে নিযুক্ত হইলেন। গৃহিণী কিন্তু এ কথা জানেন না, জানিলে সম্ভবতঃ অন্য চেষ্টা দেখিতেন।

কর্ত্তাবাবু একটি অনতিবিস্তৃত গৃহে ছিন্ন কাগজ-বেষ্টনীর মধ্যে, একটি ছোট টেবিলের নিকটে বসিয়া কাগজের পর কাগজে নানা ফিগার আঁকিয়া জিওমেট্রি-সাহায্যে জীবাত্মা ও পরমাত্মার একাত্মবাদ প্রমাণ করিতে ব্যস্ত। বৃত্ত বা লাইন—যাহা জগতের সার নিদর্শক তাহা বিন্দুর সমষ্টি বই আর কিছুই নহে,—ইহাই বিশ্বকোষ, অথচ এই বিন্দুগুলি স্ব স্ব-প্রধান; বৃত্তের মধ্যে ইহার প্রভাব অসীম, কিন্তু তফাৎ করিয়া লও ইহা বিন্দুমাত্র; অতএব পরমাত্মাতেই জীবাত্মার এবং জীবাত্মাতেই পরমাত্মার বিকাশ। বহুদিন ধরিয়া এই তত্ত্বনির্ণয়ের জন্য তিনি 'ফিগার' আঁকিতেছেন; কিন্তু এই জড়চিত্রে জ্ঞানময় আত্মার প্রতিষ্ঠা দ্বারা কিরূপে বিপক্ষ-যুক্তিগুলিকে খণ্ডন করিবেন, তাহার ভালরূপ মীমাংসা হইতেছে না। আজ তাঁহার মাথায় সেই তত্ত্বের উদয় হইয়াছে। শব্দ-শাস্ত্রের সাহায্যে ও শব্দদ্বারা বহুকাল হইতে এই সত্য প্রমাণিত হইয়া আসিতেছে, হঠাৎ এই জ্ঞানে তিনি প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন। জিওমেট্রির ফিগার লেখা কাগজগুলি সব ফেলিয়া দিয়া একখানা নূতন কাগজে দেবনাগরী অক্ষরে ওঁ শব্দটি বেশ বড় ছাঁদে তিনি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এমন সময় গৃহিণী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কই সে বিয়েয়ের কি হ'ল ?"

বাধা পাইয়া কর্ত্তা বড়ই আহত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু রাগ-প্রকাশের সাহস নাই, কাগজের দিকে বদ্ধদৃষ্টি হইয়াই বলিলেন, "কোন্ বিষয়ে ?"

"ভুলে গেছ নাকি ?"

কর্ত্তার অক্ষরের একটা দিক একটু ল্যাগড়া হইয়া পড়িল; তিনি একটু অসংযত স্বরেই বলিলেন -"আঃ ভুলব কেন ? তবু বল না ?"

"গিয়েছিলে কি, বিজনের বাপের কাছে ?"

এইবার কর্ত্তা অক্ষর হইতে মুখ তুলিয়া গৃহিণীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—"আমার যাওয়াটা কি ভাল দেখায় ? হেমকে সে ভার দিয়েছি।"

"হেমকে ভার দিয়েছ ?" গৃহিণী রাগিয়া গেলেন —"ঠিক জুড়িদারটিই বটে।"

"না আমাকে সে কথা দিয়েছে—কাজটা হাসিল ক'রে তবে অন্নজল গ্রহণ করবে। তুমি একটুও ভেব না—"

"দেখ, মেয়ে বড় হয়ে উঠলো—তোমার—"

কর্ত্তা অধীর হইয়া পড়িলেন, সানুনয়ে বলিলেন —"দেখ গিন্নি—একটা মস্ত প্রমাণ আমার মাথায় এসেছে, লক্ষীটি—তুমি এখন—"

"তুমি কি ক্ষেপলে ? মেয়ে বড় হয়েছে তার জন্য ভাবনা নেই—কেবল—"

"তোমার পায়ে পড়ি—"

"দেখ আমি মাথামুড় খুঁড়ে মরব—"

"আঃ জ্বালালে তুমি! আচ্ছা বল কি করতে হবে ? ব'লে ফেলো।"

"তোমার ঐ কাগজগুলো কিন্তু আমি ছিঁড়ে ফেলব।"

কি জানি কথাটা গৃহিণী কার্য্যেই যদি পরিণত করিয়া বসেন! কর্ত্তা তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার অভিপ্রায়ে হাস্যমুখে বলিলেন—"কি করতে হবে বলই না, কোন্ কথাটা বল দেখি তোমার না শুনি ?"

"হ্যা শোন বটে, কিন্তু এক কান থেকে অন্য কানে আর পৌঁছায় না। আর কিছু তোমার করতে হবে না, তুমি নিজে গিয়ে রায় মশায়কে একবার নেমন্তন্ন ক'রে এস !"

"শুধু-শুধু নিমন্ত্রণ! ক্ষেপলে নাকি ?"

"তা শুধু-শুধু কি নিমন্ত্রণ ক'রতে নেই! খোকা পাশ হয়েছে—তাই যেন আহ্লাদ ক'রে খেতে বলছ, আপনার জন ত সে তোমার, এতে আর দোষ কি ?"

"তা বেশ তাই হবে। আগে কিন্তু এই লেখাটা শেষ করতে দাও। যতক্ষণ এটা না শেষ হচ্ছে—ততক্ষণ কিন্তু কারো সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালান আমার পক্ষে অসম্ভব।"

কর্ত্তা আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না। কিন্তু ফলটা ভাল হইল না; গৃহিণী রাগিয়া বলিলেন, "আমি চল্লুম তবে। তুমি যে-রকম জ্বালাচ্ছ, কিরোসিনের তেলে জ্ব'লে দেখছি আমাকে ঠাণ্ডা হ'তে হবে।"

গৃহিণীকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া কাগজপত্র ফেলিয়াও কর্ত্তার উঠিতে হইল। তাড়াতাড়ি তাঁহাকে ফিরাইয়া সাদরে বলিলেন—"রাগ করো না আমার যাদটি, তোমার চোখে আগুন দেখলেই যে আমার প্রাণে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়—"

গৃহিণী যখন বাঁকা-নয়নে চাহিয়া একটু হাসিলেন, তখন আশ্বস্ত হইয়া কর্ত্তা আবার বলিলেন—"আচ্ছা আমি একটা কথা বলি শুনবে ?"

"চিরদিনই ত শুনে আসছি।"

"একেই ত বলে লক্ষীটি! আচ্ছা বিজনকে যদি নাই পাওয়া যায়, তাতে এমন কি ক্ষতি! শরৎ ত আমাদের হাতেই রয়েছে—এমন গুণবান্

ছেলে আর কোথায় পাবে বল! এমন অল্পবয়সেই ডাক্তারীর শেষ-পরীক্ষা দিয়েছে—আর পাশও—"

গৃহিণীর আর ধৈর্য্য রহিল না—"বুঝেছি, বুঝেছি —এইজন্যেই তুমি বিজনের বাপের সঙ্গে দেখা করতে চাও না,—এই অভিপ্রায়েই তুমি এত দিন আমাকে ঠকিয়ে আসচ। তোমার ভাল ছেলে তোমার থাক্—আমি কিন্তু অমন গরীব ছেলেকে মেয়ে দেব না—আমার প্রাণ থাকতে ত নয়ই,– এ ঠিক জেনো।"

গৃহিণী রাগিয়া চলিয়া গেলেন। কর্ত্তা যে ইতিপূর্ব্বেই শরৎকে কন্যাদান করিবেন বলিয়া একরূপ কথা দিয়াছেন, সে কথাটা তাঁহাকে বলিতে কিন্তু আর তাঁহার সাহসে কুলাইল না!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হাসির পিতামাতা নিজেদের ইচ্ছার ভারেই ভারাক্রান্ত করিয়া কন্যার ভাগ্য তৌল করিতে ব্যস্ত। এ তৌলদণ্ডে হাসির ইচ্ছারও যে অন্ততঃ একটুখানি স্থান হওয়া উচিত, এ কথাটা তাঁহাদের মনেই পড়ে না। উপন্যাসলেখক ছাড়া সাধারণ সকল বাঙ্গালীরই পক্ষে বোধ হয় ইহা বিস্মৃতির বিষয়। আমি কিন্তু অনেকবার হাসির মনের কথাটি ধরিবার চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু পারি নাই। বাস্ রে, মেয়ে কি চাপা! যতই কেন এ কথা পাড় না, তাহার হাসি দিয়াই সেটাকে সে চাপিয়া ধরে। আজকালকার মেয়েদের সরলতার অর্থে যদি কেহ ভাবেন যে, সে মনের কথাটি সকলের কাছে খুলিয়া ধরিবে, তবে তিনি নিশ্চয়ই ভুল করিবেন। হয় ত বা আমিও তাহাকে ভুল বুঝিয়াছি—হয় ত বা তাহার ভিতরে প্রেমের আঁচড় এখনো পড়ে নাই, নয় ত বা নিজের মনের গোপন ভাব নিজেই সে বোঝে না—বুঝিবার অবসর ঘটে নাই। তাহা নহিলে কি এমন সরল ছেলেমানষি হাসিটুকু সর্ব্বদাই তাহার মুখে ফুটিয়া থাকিত! কে জানে?

সে যে কাঁদিতে জানে, সেই দিন কিন্তু জানিতে পারিয়াছি। তখন সে পিতার ঘরে যাইতেছিল, মাতার ক্রুদ্ধ কণ্ঠ শুনিয়া দ্বারদেশে বদ্ধপদ হইয়া দাঁড়াইল। শুনিল - "অমন গরীব ছেলেকে কখ্খনো মেয়ে দেবো না!" শরৎকুমার মাতার এতদূর অবজ্ঞাভাজন! ছি ছি! সজোরে তাহার মাথায় যেন লৌহদণ্ডের আঘাত বাজিল। বেদনায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, কেহ দেখিবার পূর্ব্বেই সে নিজের ঘরে আসিয়া বিছানায় লুটাইয়া পড়িল। * * * *

সেদিন তাহার সঙ্গে যাইবার দিন নহে। সেতারের পুরাতন গৎগুলা সে অভ্যাস করিতে বসিল। মা একবার এ ঘরে আসিয়া তাহাকে বাজাইতে দেখিয়া আর ডাকিলেন না, নিজেই রান্নাঘরে চলিয়া গেলেন। দাসী আসিয়া বিজুলি-বাতির কলটা টিপিয়া দিয়া সন্ধ্যা-বাতি জ্বালিয়া গেল। হাসি অন্যমনে সেতারে ঝঙ্কার তুলিতে লাগিল,—কিন্তু বাজনাটাকে সে আজ কিছুতেই সুরে ঠিক করিতে পারিল না। গৎগুলা সুরে-তালে কেবলি বেসুরা-বেতালা বাজিতে লাগিল। সেতারটার কাণ্ডকারখানা দেখিয়া অবাক হইয়া হাসি একটুখানি বিরক্তির হাসি হাসিল, তাহার পর উঠিয়া পাশের গাড়ীবারান্দায় গিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের আস্তাবলের দিক হইতে একটা আনন্দ-সঙ্গীতের হিল্লোল কানের মধ্য দিয়া তাহার প্রাণে গিয়া পৌছিল।

পূর্ণিমার ভরা চাঁদখানা আকাশের একপ্রান্তে উঠিয়া সমস্ত আকাশ ও পৃথিবী আলোকে ভরিয়া দিয়াছিল। বাগানের বকুলগাছ ঝাউগাছ ও আমগাছের ছিদ্রের মধ্যে আর আলোক-অন্ধকারে ভেদ ছিল না। একটা কোকিল আমগাছের ডালে বসিয়া উষার আগমন-গীতিতে সন্ধ্যাকে আহ্বান করিতেছিল। আর হাস্নুহানার সুগন্ধ জোয়ানীর হৃদয়মথিত আনন্দসঙ্গীতের সহিত মিলিয়া পূর্ণিমার আলোকময়ী রজনীকে সার্থক করিয়া তুলিয়াছিল।

জোয়ানী, হাসিদের সহিসের বোন; বয়স ২০ বৎসর; দুই চারি দিনের মধ্যেই তাহার বিবাহ হইবে। এত দিন সে ভাইয়ের নিকটেই আছে,— এইবার নিজের ঘর করিতে যাইবে। সে চুলার উপরে হাঁড়ি চাপাইয়া নীচে কাঠ দিতে-দিতে গান ধরিয়াছিল "সঁইয়া পরদেশো, পরসিনো,—ধৈরয. কৈসে ধঁরু মৈ।"

বিরহের গানটা মিলনসঙ্গীতের ন্যায়ই তাহার কণ্ঠ হইতে আনন্দ ধ্বনিত করিতেছিল। বারান্দায় দাঁড়াইয়া—হাসি আর সকল কথা ভুলিয়া লুব্ধ কর্ণ পাতিয়া গানটি শুনিতে লাগিল; সেই সঙ্গীতের আনন্দস্পর্শ বসন্ত-সমীরের ন্যায় তাহাকে পুলকিত করিয়া তুলিল।

সহসা পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল—"হাসি!"

হাসি চমকিয়া ফিরিয়া চাহিয়া বলিল—"শর-দা—তুমি ?"

"একটা সু-খবর দিতে এসেছি !"

"সু-খবর ! বল বল ?"

"কি দেবে আগে বল ?"

"কি চাও তুমি ?"

"না কিছু না।—আমি পাশ হয়েছি।"

হাসি আনন্দে করতালি দিয়া বলিয়া উঠিল—"পাশ হয়েছ ! কি মজা ! বাবাকে বলেছ ?"

"না, আজ এখনও বলি নি—তবে তিনি জানেন। গেজেট বার হবার আগেই কাল এ খবর পেয়েই তাঁকে জানিয়েছি।"

"আমাকে বল্লে না কেন—কাল ?"

শরৎ স্ত্রীলোকের মতই অপ্রতিভভাবে একটু মৃদুমধুর হাসিয়া উত্তর করিল,—"কাল ত তোমাকে সে ঘরে দেখলুম না—আর তোমার বাবার সঙ্গে অন্য কথাও একটু ছিল।"

"আচ্ছা বেশ বেশ ! কিন্তু মাকে বলেছ ?"

"না, এখনও বলা হয় নি।"

"তবে আমি যাই—এখনি খবরটা দিয়ে আসি।"

"না, একটু দাঁড়াও—আর একটা কথা আছে।"

"কি ?"

"আমি বিলাত যাচ্ছি !"

"কবে ?"

"হপ্তাখানেকের মধ্যেই।"

"এত শীঘ্র ?"

"দেরী ক'রে লাভ কি ? যত শীঘ্র গরীব নামটা ঘোচে, সেই ত মঙ্গল।"

বিকালের ঘটনাটা সে এতক্ষণ একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল, শরতের কথায় তাহা মনে পড়িয়া গেল। শরৎ কি তবে কোন রকমে মায়ের ভাবটা টের পাইয়াছে নাকি ! লজ্জায় তাহার হাসি মুখখানি মলিন-বিবর্ণ হইয়া পড়িল। আপনা হইতে চোখ দুটি আনত হইয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া দেখিল—দেয়ালের কোণে যে একটি ঘাসের ফুল অন্য-চক্ষুর অন্তরালে লুকাইয়া ফুটিয়াছিল, শরৎ সেটিকে আবিষ্কারপূর্ব্বক তুলিয়া লইয়া টবের ফার্ণের পাতার সহিত বাঁধিতেছে, বন্ধন-রজ্জু তাহার গলার ছিন্ন উপবীত-সূত্র।

তোড়া বাঁধা হইলে শরৎ হাসির দিকে সাগ্রহে চাহিল। ইচ্ছা, তোড়াটি তাহাকে উপহার দেয়; কিন্তু বাঙ্গালীর ছেলে, বলি বলি করিয়া আর মুখ ফোটে না; ইতিমধ্যে হাসি ফুলটি অধিকার করিয়া লইয়া বলিল,—"এস শর-দা—তোমাকে পরিয়ে দি।"

শরতের মনের কথা মনেই রহিয়া গেল ! হাসি নিজের কাপড়ের একটা পিন খুলিয়া লইয়া তাহার কোটে ফুলটি আটকাইতে আটকাইতে বলিল,—"কবে ফিরবে শর-দা ?"

"জানি না। সম্ভবতঃ বছর তিনেক পরে !"

"চিঠি লিখবে ?"

"যদি বল।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়।"

"তবে লিখব।"

"লিখবে ?"

"লিখব।"

"তিন্ সত্যি ?"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ।"

ফুল পরাইয়া হাসি হাত সরাইয়া লইয়া বলিল, "শর-দা গান শুনছ ? কেমন লাগছে !" জোয়ানীর আকাশস্পর্শী বিরহসঙ্গীত মৃদু কোমলতর সুরে তখন নামিয়া পড়িয়াছিল :

শরৎ সে কথার উত্তর না দিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"এখনি যেতে হবে হাসি।"

"এখনি কেন যাবে ? আর ত পাশের পড়া পড়তে হবে না তোমার। দেখেছ শর-দা, কেমন চাঁদ উঠেছে ?"

"একটি কথা বলব ?"

"বল না শর-দা—"

"তুমি চাঁদের চেয়েও সুন্দর !"

"কি যে বল তুমি !"

"বলবার অধিকার পেয়েছি হাসি। তোমার বাবা বলেছেন, তাঁর আপত্তি নেই।"

"কিসে ?"

"বুঝতে পারছ না হাসি ?"

হাসির এবার লজ্জায় মুখ লাল হইয়া উঠিল, কিন্তু মায়ের কথা স্মরণ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল।

শরৎ বলিল,—"কিন্তু তুমি বল হাসি ?"

"কি বলব ?"

"তোমার ইচ্ছে আছে কি না ?"

"কেন বাবা ত বলেছেন !"

"বাবা ত তোমার মনের কথা বলেন নি; তুমি বল হাসি !"

হাসি চুপ করিয়া রহিল। শরৎ আগ্রহভরে তাহার হাতদুখানি নিজের হাতের মধ্যে ধরিয়া তাহাতে তাহার সমস্ত প্রাণ, মন ঢালিয়া বলিল,—"বল

হাসি, তুমি বল; আকাশের ঐ আলোভরা চাঁদের দিকে চেয়ে বল তুমি—তোমার ইচ্ছা আছে। বল বল; এস আমরা এই শুভ মুহূর্ত্তে দু'জনের কাছে দু'জনে শপথ ক'রে—বলি—"

হাসি শরতের হাতের মধ্য হইতে নিজের হাত-দুখানি ধীরে ধীরে টানিয়া লইয়া বলিল,—"না, শর-দা।"

শরতের উচ্ছ্বাস-আবেগময় সুখস্বপ্ন কঠোর বজ্রের ধ্বনিতে সহসা যেন ভাঙ্গিয়া গেল! সুধা চাহিতে নিষ্ঠুর দেবতার নিকট এ কি প্রাণঘাতী গরল লাভ করিল না! শরৎ মুমূর্ষুর ন্যায় কাতর-কণ্ঠে কহিল—"বলবে না?"

"না।"

"কেন হাসি?"

"জানি না।"

শরৎ বুঝিল, ইহা হাসির সবিনয় অস্বীকার-বাক্য।

তাহার যেন সমস্ত শক্তি অবশিত হইল; অতি কষ্টে সে বল-সঞ্চয় করিয়া কহিল—"বেশ হাসি! বিদায় তবে,—আর দেখা হবে কি না, জানি না।"

শরৎ চলিয়া গেল। জোয়ানীর গান তখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে; পূর্ণিমার স্বচ্ছ আলোক খণ্ড কালো মেঘের মধ্যে সহসা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে; আর হাসির প্রফুল্ল হাসিখানি তাহার মনের দারুণ অন্ধকারের মধ্যে অতি অস্বাভাবিক ভাবে মিলাইয়া পড়িয়াছে। যখন পরমুহূর্ত্তে সে পুনরায় হাসিবে—তখন কি পূর্ব্বের সরল স্বাভাবিক আনন্দদীপ্তিতেই সে হাসি ফুটিয়া উঠিবে? কে জানে!

শরৎ চলিয়া গেল। হাসি গাড়ী-বারান্দার থামে ভর দিয়া মূর্ত্তিমতী বেদনার ন্যায় শূন্য-কাতর দৃষ্টিতে রাস্তার দিকে চাহিয়া রহিল। সেই সময় এক জন কে অপরিচিত পথিক মার্জ্জিত-সুকণ্ঠে তান ছাড়িয়া গাইয়া গেল—

"মনে রইল ও সই মনের বেদনা!
প্রবাসে যখন যায় গো সে—
তারে বলি বলি আর বলা হোল না!"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শরৎকুমার

শরতের ঘরখানি একতলায়, ঠিক বাগানের ধারেই, ঘরের পাশেই ছোট্ট একটু বারান্দা। রাত্রিকালে পড়িতে পড়িতে অবসন্ন বোধ করিলে, শরীর-মনে বলসঞ্চয়ার্থে কত সময় সে এই বারান্দায় আসিয়া দাঁড়ায়। বাগানের ফুলের গন্ধে তখন কাহার হাসি মনে পড়িয়া যায়? তারকার জ্যোতিতে কাহার নয়নের দৃষ্টি তাহার দৃষ্টির উপর ভাসিয়া উঠে। আকাশ-পৃথ্বী-মথিত এই আশানন্দ সংগ্রহ করিয়া লইয়া সে যখন পুনরায় পাঠে মনোনিবেশ করে, তখন আর কোন পরিশ্রমকেই তাহার পরিশ্রম বলিয়া মনে হয় না। তিলে তিলে সঞ্চিত বহু দিনের সেই জীবনব্যাপী আশা আজ একটি মুহূর্ত্তে এমন করিয়া দগ্ধীভূত ভস্মে পরিণত করিলে তুমি?—হা ভগবান্!

হাসির নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া আজিও সে বারান্দায় দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। তরুলতায়, আকাশে-বাতাসে চন্দ্রালোকের কি পুলক-কম্পন বহিয়াছিল! কিন্তু শরতের হৃদয়ে?—ইহার এক কণাও প্রবেশ করিল না। পুরাতন আনন্দ-দৃশ্যের দিকে চাহিয়া সে একান্ত নিরানন্দ মনে, আকুল হৃদয়ে কেবলি ভাবিতে লাগিল—"উঃ, আজই যদি আমি এখান হইতে চলিয়া যাইতে পারিতাম!"

পরদিনই সে আপনাকে বিলাত-যাত্রার আয়োজনে ব্যাপৃত করিয়া তুলিল। শরৎ আজন্মকাল হইতে মাতুল শ্যামাচরণের আশ্রয়েই পুত্রবৎ প্রতিপালিত। তিনিই তাহাকে বিলাত পাঠাইতেছিলেন। সকালেই মামার নিকট হইতে শরৎ খরচপত্র লইয়া নয়টা না বাজিতে বাজিতে কোনরূপে আহারাদি শেষ করিয়া একখানা ঠিকা গাড়ীর দোলায় নিউ-মার্কেটের দিকে ছুটিল।—গেটের কাছে নামিয়াই সম্মুখে দেখিল বন্ধুবর শ্রীধরকে। জিনিষপত্র চিনিতে এবং কিনিতে শ্রীধর যেমন পাকা, শরৎ তেমনই কাঁচা। যে কাজে যে পটু, সে কাজ করিতে তাহার লাগেও ভাল, অন্যথা ঠিক বিপরীত। অতএব দু'জনের সঙ্গলাভে দু'জনে সুখ বোধ করিল। তাহারা দোকানে দোকানে ঘুরিয়া-ফিরিয়া নানারূপ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহপূর্ব্বক অবশেষে চলিল লেড-ল কোম্পানীর দোকানে! অভিপ্রায়, সেখানে শরৎ কলার, টাই ও কামিজ প্রভৃতি কতকগুলা জিনিষ কিনিবে, আর পোষাক-পরিচ্ছদ কিছু কিছু ফরমাসও দিবে। নানা কাপড়ের মধ্য হইতে দু-একটা কাপড় বাছিতে এবং গায়ের মাপ-জোপ দিতে যে কতটা সময় যায়, ইতিপূর্ব্বে সে জ্ঞানই শরতের ছিল না। এ কার্য্য সমাধা করিয়া টমাস্ কুকের গেটের কাছে যখন তাহারা নামিল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ভ্রম করিয়া

আফিসের গেটও বন্ধ হইয়া গেল। সেদিন শনিবার। —দরজা বন্ধের আওয়াজটা এমন জোরে শরতের বুকে ধাক্কা দিল যে, ক্ষণকাল জ্ঞানশূন্যের মতই সে সেই ফুটপাথের উপর বদ্ধপদ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

শরতের এতটা নৈরাশ্য শ্রীধরের নিকট ভারী হাস্যজনক বলিয়া মনে হইল। তথাপি হাসিটা চাপিয়া লইয়া সান্ত্বনার স্বরে সে বলিল,—"এত মুষ্‌ড়ে পড়লে কেন হে? ক্যাবিন্ আজ এন্‌গেজ করা হোল না তাতে আর ক্ষতিটা কি এমনই? জাহাজ ত আর আজই ছাড়ছে না—ছাড়বে সেই ১৫ই, আর আজ মাসের ছ-তারিখ। চল চল আজ রেসের দিন, সেখানে যাওয়া যাক্, মন-টন সব ভাল হয়ে যাবে।"

ঠিকা গাড়ীর গাড়োয়ান শরতের চেনা লোক, জিনিষ-পত্র সহ তাহাকে বিদায় করিয়া দিয়া দুই বন্ধুতে পদব্রজে রেস্-কোর্সের দিকে চলিল। গেটের নিকট পৌঁছিয়া, দুখানা টিকিট কিনিয়া লইয়া তাহারা একটা প্রাঙ্গণে আসিয়া পড়িল। ভিতরে ঢুকিয়াই শ্রীধর মুহূর্ত্তমধ্যে কোথায় যে অদৃশ্য হইয়া গেল, তাহার টিকি পর্য্যন্ত আর দেখা গেল না। এই জনাকীর্ণ অপরিচিত রাজ্যে একাকী পড়িয়া প্রথমটা শরৎ কেমন একটা বিজনতা উপলব্ধি করিল। ক্রমশঃ সে ভাবটা কাটাইয়া উঠিয়া চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিল। এই সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণে 'বুকমেকার'গণ স্থানে স্থানে দাঁড়াইয়া বাজি-খেলার টিকিট বিক্রয় করিতেছিল। তাহাদের সম্মুখে টাঙ্গান বোর্ডে যে যে ঘোড়া এ যাত্রা দৌড়িবে, তাহাদের নাম লেখা। সেখানে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া বাজিদারগণ তাহা পড়িতেছে, পড়িয়া ঘোড়া বাছিয়া সাধ্যমত বা অসাধ্যমত কোন একটা বা ততোধিক ঘোড়ার নামে বাজির টাকা জমা দিতেছে। শরৎকুমার এইরূপ দু-একটা ভিড়ের পাশ কাটাইয়া দৌড়চক্রের নিকটে বেড়ার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। এই স্থান—বিশেষতঃ এরূপ দৃশ্য তাহার নিকট সম্পূর্ণই নূতন।—শরৎ যে বিকাল বেলাটাও ঘরে বসিয়া কাটায় এমন নহে, তত দূর ভাল ছেলে সে নয়। গড়ের মাঠের বেঙ্গলী ব্যায়াম ক্লবের সে এক জন মেম্বর। প্রায়ই বিকালবেলা সে মাঠে আসিয়া কোনদিন খেলিত, কোনদিন বা খেলা দেখিত; কিন্তু ইহার পর আর কোন স্থানে যাইবার তাহার সময় হইত না; সখ্‌ও ছিল না।

ইতিপূর্ব্বে অনেকগুলা দৌড় হইয়া গিয়াছে। আর একটা আরম্ভের এখনো কিছু সময় আছে, তবুও বেড়ার ধারে ইতিমধ্যে লোক জমিতে আরম্ভ হইয়াছিল। দেখিতে দেখিতে আরোহী- (জকি) পরিচালিত বহু অশ্ব চক্র-মধ্যে সারি দিয়া দাঁড়াইল। সঙ্কেতকার (Starter) সাঙ্কেতিক যন্ত্র খুলিয়া দিয়া সঙ্কেত করিবামাত্র মুহূর্ত্তে সেই সকল অশ্ব একই সঙ্গে চক্রপথ আলোড়িত করিয়া ক্ষিপ্র বেগে ছুটিল। দর্শকগণ মাতিয়া উঠিল, অশ্বের প্রতিপদক্ষেপে বাজি-খেলোয়াড়দিগের হৃৎপিণ্ডে রক্তস্রোত দারুণ বেগে উঠিতে পড়িতে লাগিল; জকিগণ নিজ নিজ ঘোড়াকে সর্ব্বাগ্রে চালাইবার চেষ্টায় প্রাণের প্রতি মায়ামমতা ভুলিয়া গেল! কি এ বিকট উত্তেজনা! সর্ব্বগ্রাসী উন্মাদনা! বিরাট বিশ্বের ঝটিকা-আবর্ত্তন যেন এই ক্ষুদ্র বেষ্টনীর মধ্যে কেন্দ্রীভূত হইয়া অন্তর্ভুক্ত নরনারীকে উন্মত্ত দোলায় দোল দিতেছে!

এক জন জকি মধ্য-পথে ঘোড়া হইতে পড়িয়া গেল। মাথা ফাটিয়া তাহার সর্ব্বশরীর রক্তাক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহার প্রতি মায়ামমতা দেখাইবার সময় ইহা নহে। একটা বেগবান্ অশ্ব জকির গা ঘেঁসিয়া চলিয়া গেল। মনে হইল, তাহার জানুর উপর যেন ঘোড়াটার পায়ের আঘাত পড়িল। দু'চারিজন কোমলহৃদয় দর্শক আহা আহা করিয়া উঠিল, শরৎকুমার দুই হাতে আপনার চক্ষু ঢাকিয়া ফেলিল। যখন হাত সরাইয়া পুনরায় চক্রের দিকে চাহিল, তখন আর সেই হতভাগ্য জকিকে সেখানে দেখিল না,—তখন ঘোড়াগুলা নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া পড়িয়াছে। সহসা আকাশভেদী রবে সম্মান-জয়ধ্বনি উঠিল। রণ্‌জির নাসিকা সর্ব্বাগ্রে দেখা গিয়াছে, তাহারই জিৎ। আহ্লাদে গর্ব্বে তাহার জকির মাথাটা যেন আধ হাত উচ্চ হইয়া উঠিল। 'বেটি' ও 'সুইটি' রণ্‌জির প্রায় কাছাকাছি আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। এ ক্ষেপ দৌড় এইরূপে শেষ হইয়া গেলে, রণ্‌জির অনুবর্ত্তী ভাবে অশ্বগণ জয়ধ্বনির মধ্যে স্বস্থানে ফিরিয়া চলিল।

আর সকলে বেড়ার ধার হইতে সরিয়া যাইবার পূর্ব্বেই শরৎকুমার সেই আহত জকির সন্ধানে যাত্রা করিয়াছিল! আপনাকে ডাক্তার রূপে পরিচয় দিয়া সে অবিলম্বে আহতের শুশ্রূষার স্থানে আসিয়া দেখিল, তাহার কলেজেরই এক জন পরিচিত ডাক্তার জকির মাথা বাঁধিয়া দিতেছেন। শরৎ সাহায্য করিতে চাহিলে তিনি প্রফুল্লচিত্তে তাহাকে ধন্যবাদ দানপূর্ব্বক জকির জানু পরীক্ষা করিতে বলিলেন। সাতিশয় তৎপরভাবে পরীক্ষাপূর্ব্বক শরৎ জানাইল যে, যত দূর মন্দ হইয়াছে বলিয়া মনে করিয়াছিল,

তাহা হয় নাই, জানু-গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে মাত্র, কিন্তু ভাঙ্গে নাই। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সহকারে সে যেরূপ দক্ষতার সহিত পা বাঁধিয়া দিল, তাহাতে ডাক্তার সাহেব অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহার তখন ক্লবে যাইবার সময়। শরৎ দৈবপ্রেরিত রূপে আসিয়া সাহেবকে এ সময় উদ্ধার না করিলে তাঁহার টেনিস খেলার এবং পানারামেরও যে বিলম্ব হইয়া পড়িত, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি ধন্যবাদ সহকারে শরতের নামের কার্ডখানা চাহিয়া লইলেন।

প্রাঙ্গণের একধারে দুই জনে কথা হইতেছিল। এক জন ভগ্নহৃদয়ে কহিল—"এবারও হেরে গেলুম বিজনদা! এই শেষ chanceটা আমাকে দিতেই হবে।"

কথাটা বলিল শচীন্দ্র, ওরফে খোকা, হাসির ভ্রাতা। উত্তরে বিজন বলিল—"টাকা কোথা শচীন?"

"কেন, তোমার 'বেটি' ত দ্বিতীয় দাঁড়াল—তুমি ত বেশ টাকা পাবে।"

"বেশ টাকা পাব? হায় রে! টায়টোয়ে যদি ধারগুলো শোধ যায়, তবেই ঢের; এর মধ্যে তোমার ধারই ত অনেক।" বলিয়া বিজন বাজির টাকা আনিতে ছুটিল। এই সময় শরৎ এ দিকে আসিতে আসিতে শচীনকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল—"হ্যাল্লো!" শচীন হঠাৎ শরৎকে এখানে দেখিয়া প্রথমটা একটু যেন অবাক হইয়া গেল; পরমুহূর্ত্তেই আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া শরতের প্রতিধ্বনি স্বরূপ বলিল, "হ্যাল্লো শর-দা! কতক্ষণ? তুমিও বাজি খেলছ নাকি?"

"না, খোকাবাবু না।"

"তবে এখানে এসে কি লাভ?" সে অবজ্ঞার স্বরে মুখভঙ্গী করিল। তার পর কি মনে হইল; খুব নিকটে আসিয়া আস্তে আস্তে বলিল—"একটা কথা আছে শর-দা।"

"কি কথা?"

"এখানে না—ঐ গাছতলায় চল।" শরতের সহসা মনে হইল, "হয় ত ভাইকে দিয়া হাসিই বা তাহাকে কোন কথা বলিয়া পাঠাইয়াছে কিম্বা যদি বা কোন চিঠিই দিয়া থাকে?" একবার তাহার পিতার অসুখের সময় হাসি তাহাকে একখানা পত্র লিখিয়া আসিতে বলিয়াছিল। একটা অকারণ আশায় তাহার মাথাটা যেন সহসা ঘুরিয়া উঠিল! গাছতলায় আসিয়া দুই একবার ঢোক গিলিয়া বাধ বাধ করিয়া শচীন বলিল, "শর-দা, তোমার কাছে টাকা আছে?" শরতের ধীরে ধীরে একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল; একটুখানি সময় লইয়া বলিল—"আছে।"

"আমাকে কিছু ধার দেবে?"

"কত?"

"বেশী নয়, শ তিনেক?"

"তিনশ। তা হ'লে যে আমার টিকিটের টাকা কম পড়বে!"

শরৎ বিলাত যাইবে—শচীন তাহা শুনিয়াছিল, বলিল,—"তার ত দেরী আছে, ষ্টীমার ত আজই ছাড়ছে না,—আমি তোমাকে কালই টাকা ফেরত দেব।—আমাকে এই শেষ chanceটা দাও শর-দা —দয়া কর, নইলে এ দেনা থেকে উদ্ধার পাব না।"

"কিন্তু যদি এবারও না জেতো?"

"নিশ্চয়ই জিতব—bound to win, তুমি কি মনে কর, ভগবান্ এমন নিষ্ঠুর, এমন unjust!" তাহার এইরূপ উন্মত্ত বাক্যে শরৎ অবাক হইয়া গেল, তাহার মায়া করিতে লাগিল; ছেলেবেলা হইতে ছোট ভাইটির মত তাহাকে মনে করে। করুণ স্বরে কহিল,—"কিন্তু তুমি দেখছ না'—পরশুই আমার ক্যাবিন ঠিক ক'রতে হবে, নইলে এ যাত্রা আমার যাওয়াই বন্ধ হয়ে যাবে।"

"বন্ধ হবে না! আমি তোমাকে ঠিক বলছি।"

"ধর যদি নাই জেতো?"

"তবুও আমি কালই তোমার টাকাটা ফেরত দিয়ে দেব।"

"কি ক'রে? তোমার বাবাকে ত আমি চিনি, তিনি ত দিতে পারবেন না। আর হেমবাবুর কাছে টাকা আদায় করা বড় সহজ নয়।"

"মায়ের কাছে নেব; আমার পাশের পুরস্কার তাঁর কাছে পাওনা আছে।"

"কিন্তু তোমার ত ধার অনেক—সব কি—"

"আঃ, তাতে আর হয়েছে কি? সে ভাবনা আমার। ধর যদি আমার ঘোড়াটা প্রথম হয়—তা হ'লে আমার ভাগ্য ওলট পালট হয়ে যাবে। উঃ কি মজা!"

শরৎ হাসিয়া বলিল,—"ধর, তা হ'ল না?"

"তা হ'লেও তোমার টাকা কালই চুকিয়ে দেব; দেবই দেব। তোমাকে শপথ ক'রে বলছি।"

"শপথ ক'রতে হবে না—কিন্তু আর একটা বিষয়ে যদি শপথ কর ত আমি দিতে পারি!"

"কি?"

"তুমি কথা দাও, এবার হারো বা জেতো, আর কখনও এ রকম বাজির খেলা খেলবে না ?

"যদি শপথ না করি ?"

"তা হ'লে টাকা দেব না।"

শরৎকুমারের স্বর দৃঢ়—শচীন বুঝিল, উপায়ান্তর নাই। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল—তাহার পর বলিল,—"বেশ তাই হবে, আমি শপথ করছি, এই আমার শেষ বাজি খেলা।"

শরৎ পকেট হইতে ৩০০ শত টাকা বাহির করিয়া শচীনকে দিল।

সৌভাগ্যক্রমে এবার শচীন জিতিল, তাহার ঘোড়া দ্বিতীয় হইল। ইহাতে ৫০০ শতের উপর সে টাকা পাইয়া গেল, কিন্তু তবুও তাহার সব ধার শোধ গেল না। বিজনকুমার তাহাকে যত টাকা ধার দিয়াছিল, সব টাকা কাটিয়া লইয়া কেবল ৫০ টাকা মাত্র তাহার হাতে দিল। তাহাই শরৎকে দিয়া শচীন সান্ত্বনয়ে বলিল, "শর-দা, তুমি কিছু মনে ক'র না, দেখলে ত বিজন-দা আগে তার টাকা সব কেটে নিলে; আমি মনে করেছিলুম তোমাকেই আগে দেব; কিন্তু তা আর হ'ল না। নাই দিকৃগে, ভয় পেয়ো না—আমি নিশ্চয়ই কাল তোমাকে টাকা পাঠিয়ে দেব।" বার বার এইরূপে শর-দাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক টমটমে আসিয়া উঠিল এবং গাড়ী হাঁকাইয়া দুই বন্ধুতে গৃহযাত্রা করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বাজি খেলার নেশা হইতে শচীনকে রক্ষা করিতে পারিল, এই ভাবিয়া শরৎ বেশ একটু আনন্দ অনুভব করিল। তবে এই আনন্দ তাহার আত্মপ্রসাদে পরিণত হইত, যদি ঋণের বদলে টাকাটা সে শচীনকে দানরূপেই দিয়া দিতে পারিত। তাহা পারে নাই বলিয়া শরৎকুমারের মনে একটা দুঃখ রহিয়া গেল; একটা ধিক্কারেরও উদয় হইল। এত বড় হইয়াছে সে, এখনো একটা পয়সার জন্য মামার উপর নির্ভর করিতে হয়। তাঁহার বৃদ্ধ বয়সের ব্যয়ভার কোথায় সে লাঘব করিবে,—না এখনও তাহার জন্য মামারই ভাবিতে হয়। শরৎ বিলাত গেলে এ ভাবনা তাঁহার কত বাড়িয়া যাইবে! সে যদি কলিকাতায় বসিয়া প্র্যাক্‌টিস করে, তাহা হইলে অবশ্য এ দায় হইতে তিনি মুক্তিলাভ করেন। ধৈর্য্য ধরিয়া কাজ করিলে অল্পদিনের মধ্যে এখানে তাহার পসার জমিবারও সম্ভাবনা—কারণ, সে সার্জ্জারিতে সর্ব্বপ্রধান হইয়াছে, কিন্তু মামারই যে বিশেষ ইচ্ছা সে বিলাত যায়,—তিনিই ত একান্ত উৎসাহ সহকারে তাহাকে ইংলণ্ডে পাঠাইতেছেন। কি করিয়া পিতৃতুল্য মাতুলের গভীর স্নেহ-প্রণোদিত মঙ্গল-ইচ্ছাকে সে উপেক্ষা করিবে? তাহার নিজেরও যদি ইহাতে অনিচ্ছা থাকিত, তাহা হইলেও সে তাঁহার এ ইচ্ছাকে অগ্রাহ্য করিতে পারিত না। কিন্তু শরতের মনেও এ ইচ্ছা চিরদিনই প্রবল। একদিন এই ভিত্তিমূলে আশা-আকাঙ্ক্ষার যে সুন্দর প্রাসাদের নক্সা আঁকিয়াছিল, নিরাশার জলে তাহা মুছিয়া গিয়াছে,—তবুও সে বিলাত যাইতে চায়; কেন না ইহাই এখন তাহার শান্তিলাভের উপায়।

শরৎ শচীনের নিকট হইতে টাকা ফিরাইয়া পাইবার অপেক্ষায় রহিল। রবিবারে টাকা পাইবার কথা, কিন্তু মঙ্গলবারেও টাকা আসিল না। তবে কি শচীনকে টাকার জন্য শরৎ চিঠি লিখিবে? কিন্তু তাগাদা করিতেও তাহার প্রবৃত্তি হইল না। নিশ্চয়ই শচীন টাকাটা সংগ্রহ করিতে পারে নাই,—পারিলেই নিজে আসিয়া দিয়া যাইত। চিঠি লিখিলে তাহাকে কেবল বিব্রত করা হইবে মাত্র!

কিন্তু আমার কাছে কি বলিয়া জবাবদিহি করিবে সে? কি করিয়া আবার আজ টাকা চাহিবে?

শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য তাঁহার শ্যালীপতি রাজা অতুলেশ্বরের ষ্টেটের ম্যানেজার। রাণীগঞ্জে ইঁহার যে কয়লার খনি আছে—প্রায় শনিবারে শ্যামাচরণ তাহার তত্ত্বাবধান করিতে যান,—এবং হিসাব নিকাশ সহ প্রায়ই সোমবারে বাড়ী ফেরেন। এবার তিনি সোমবারের পরিবর্ত্তে বুধবারে বাড়ী ফিরিলেন, কিন্তু তখনও শরতের টাকা আসিল না, শরৎ বুঝিল, আর টাকা পাইবার আশা নাই।—এই দুশ্চিন্তার মধ্যে বিলাত যাওয়ার ইচ্ছাটাও তাহার যেন একরকম ডুবিয়া গেল।

মামা খাওয়া দাওয়ার পর অফিসঘরে কাগজের দপ্তরের সম্মুখে টেবিলের নিকট চৌকিতে বসিয়া একটা পায়রার পালকে কান চুলকাইতেছিলেন, এমন সময় শরৎ আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। পালকটা টেবিলে কলমদানীতে রাখিয়া তাহাকে সম্মুখের চৌকিতে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন,—"ক্যাবিনের টিকিট কেনা হ'লো?"

"না, এখনও হয় নি?"

"এখনও হয় নি! এ ষ্টীমারে তা হ'লে দেখছি তোর যাওয়াই হবে না! আজকালকার ছেলেদের যে কি রকম পাথুরে চাল হয়েছে,—তাঁরা থাকবেন ঢিট হ'য়ে ব'সে—আর কাজগুলো যেন আপনি এসে ধরা দেবে! এমন গয়ংগচ্ছ কেন, ব্যাপারখানা কি বল দেখি?"

"টাকা কম প'ড়ে গেল।"

"টাকা কম প'ড়ে গেল। যত কিছু খরচ হ'তে পারে হিসাব ধ'রে তার উপর আমি যে একশ' টাকা বেশী দিয়ে দিলুম। কত টাকা কম পড়েছে?"

"আড়াইশ!"

"আড়াইশ? সর্ব্বনাশ! অত টাকা কি ক'রলে তুমি?" শরৎকে নীরব দেখিয়া লজ্জিত মনে করিয়া বলিলেন—"থাক্ আর বলতে হবে না—বুঝেছি ব্যাপারখানা কি! বিলিতি লোকে বেড়ে চোমরা ক'রে ধরেছে আপনাকে আর সামলাতে পার নি, হাজার হোক্ ইংরেজ বাচ্ছার খোসামোদ! মনটা গোলে মোম হ'য়ে পড়ে—তখন কি আর টাকাকড়ি মনে থাকে! উপেন-দাদা এ কথাটা বড্ড ঠিক বলেন —ইংরাজে যত দিন পায়ের জুত বুরুস না করে, তত দিন রাঙ্গা মুখের মোহ ছোটে না। সাধে কি তোকে বিলাত পাঠাতে চাই—নিজের সাধ ত মিট্‌ল না, চিরকালই নিগার রয়ে গেলুম।"—

শরৎ একটু হাসিয়া বলিল "না মামা—"

"আরে আর লজ্জায় কাজ কি? যা হয়েছে তা হয়েছে,—তবে নবাবের ভাগ্নে যে নস্, ভবিষ্যতে এটা মনে রাখিস। সেকালে আমরা কি রকম চালে চলেছি শুনবি? একখানা আফিসের কাপড়ে ১০টি বছর কাটিয়েছি, তার পর যদি তোমার মামীর অনুরোধের দায়ে না পড়তে হ'তো,—আর রাজাবাহাদুরের দেওয়ানী পদটা না পেতুম, তা হ'লে আরও কত দিন যে চাপকানটা আমায় চেপে থাক্‌তেন, তা বলতে পারিনে।"

কথাটা বলিয়া শ্যামাচরণ বাবু একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, সম্প্রতি বৎসরখানেক মাত্র তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছে। মামীর নামে শরতেরও চক্ষু ছল্‌ছল্ করিয়া উঠিল। মামীর স্নেহে সে মাতার অভাব কখনও অনুভব করে নাই। তিনি তাহাকে এতই ভাল বাসিতেন যে, মেয়েরা অনেক সময় ঈর্ষাকাতর হইয়া মাকে অনুযোগ করিত। মা হাসিয়া বলিতেন,—"তোরা আমার মেয়ে বইত নয়—ও যে আমার পুত্র-সন্তান।" আসল কথা বালক পিতৃ-মাতৃহীন বলিয়া আপনার স্নেহে তিনি তাহাকে ভুলাইয়া রাখিতে চাহিতেন। তিনি যে তাহার আপনার মা নন—মাতুলানী মাত্র, শরৎ শিশুকালে তাহা জানিতই না,—বড় হইয়া যখন জানিল, তখনও তিনি শরতের হৃদয়-সিংহাসনে মাতৃরূপেই অধিষ্ঠিত রহিলেন।

কিছুপরে শ্যামাচরণ বলিলেন—"কি এত কাপড় কিনেছিস নিয়ে আয় দেখি, কখনও ত ওরকম কাপড় পরা হয় নি,—দেখেও একবার চক্ষু সার্থক করি--"

"না, আমার কাপড়ে অত খরচ হয় নি। আপনি কাপড়ের জন্যে যে টাকা দিয়েছিলেন, তার চেয়ে বরঞ্চ কম টাকাই লেগেছে।"

"তবে কিসে অত খরচ ক'রে এলি?"

"এক জন বন্ধুকে ধার দিয়েছি।"

এইবার তিনি সত্যসত্যই রাগিয়া গেলেন।

"বন্ধুকে ধার দিয়েছ! তোদের কি একটুও ধর্ম্ম-জ্ঞান, কাণ্ডজ্ঞান নেই? আজকালকার ছেলেরা কি এতদূর পাষণ্ড হৃদয়হীন! জানিস্ কত কষ্ট ক'রে তোকে আমার বিলাত পাঠাতে হ'চ্ছে? বড় মেয়েটিকে এবার ভাল ক'রে পূজার তত্ত্ব পর্য্যন্ত করা হ'লো না। বেশ বুঝেছি সেজন্যে তার কত গঞ্জনা সহ্য ক'রতে হবে। মেজমেয়েটি আসন্নপ্রসবা,— তাকেও আনতে পারছিনে; আনলেই ত খরচ-পত্র আছে। ছোটটির বিয়েটাও পিছিয়ে দিতে হ'চ্ছে। শুধু ত তোর প্যাসেজ-মনি নয়—বিলাত যাবামাত্র ভর্ত্তির খরচ প্রভৃতি কত খরচ আছে। যত দিন তুই পাশ হয়ে ফিরে না আসবি, তত দিন আমার আর মুক্তি নেই। আর তুই এর মধ্যে বন্ধুকে ধার দিয়ে নবাবি ক'রতে গেলি!"

রাগের মুখে বলিয়া ফেলিয়া শ্যামাচরণ ভাবিলেন —"অত কথা না বলিলেই হইত।" শরৎ নতমুখে রহিল। মামা যে কতদূর কষ্ট স্বীকার করিয়া তাহাকে বিলাত পাঠাইতেছেন, ঠিক সে জ্ঞানটা এত দিন তাহার ছিল না! আজ সহসা তাহার যেন অন্ধ নয়ন খুলিয়া গেল। কিছু পরে সে বলিল, "তবে মামা আমি বিলাত যাব না—এইখানেই প্র্যাক্‌টিস্ করি।"

"অমনি রাগ হ'লো। আজকালকার ছেলেদের একটা কথা বলার যো নেই; আমার বাবা রাগের সময় আমাকে কত গালিগালাজই না দিতেন,— কিন্তু সেই বিষের মধ্যেও আমরা অমৃত উপলব্ধি করেছি। আমি ত কোন জন্মে দেবদেবী মানিনে, ঈশ্বর আছেন কি না আছেন তাও জানিনে, কখনও জানতে চাইওনি; কিন্তু বাবার মনে আঘাত লাগবার

ভয়ে প্রতিদিনই শালগ্রাম শিলার কাছে মাথা নুইয়েছি। তুই ভাব্‌বি, এ কি চাতুরী? চাতুরী নয়, এটা পিতৃভক্তি। এ সংসারে জ্ঞানবান্‌ স্রষ্টা পুরুষ কেউ আছেন কি না জানিনে; কিন্তু আমার পিতৃদেব যে আমার স্রষ্টা পুরুষ তা আমি জানি, তিনিই আমার মনে সাক্ষাৎ দেবতা। সে ভক্তিটুকু আজকালকার ছেলেরা হারিয়েছে!"

"না মামা, তা নয়। আজ আমি খুব ভাল ক'রে বুঝছি, আমার জন্য আপনি কত কষ্ট স্বীকার ক'রছেন। কিন্তু তবুও ত আপনি কর্ত্তব্য-পালনে কুণ্ঠিত নন,—আমারও কি এ সম্বন্ধে একটা কর্ত্তব্য নেই?"

"দেখ্‌ ঐ লম্বা-চওড়া কথাগুলো শুনলে আমার গায়ে বিছুটির জ্বালা ধরে। ও সব বক্তৃতা রাখ্‌। এখনি টাকা দিচ্ছি - নিয়ে যা,—ক্যাবিন ঠিক ক'রে আয়, - এ ষ্টীমারে আর যাওয়া হবে না, ওবে পরের ষ্টীমারে যেতে পারবি। তোর ভাল আমি যা বুঝি তাই কর্‌।"

"কিন্তু আমারও ত এখন বোঝবার ক্ষমতা জন্মেছে।"

শ্যামাচরণের সর্ব্বাঙ্গে এইবার সত্যই বিষের জ্বালা ধরিল। ছেলে-মেয়ের নিকট হইতে প্রতিবাদ তাঁহার অসহ্য! ইহাই তাঁহার স্বভাবের একটা বিশেষ দুর্ব্বলতা; ইহাতে তিনি শ্রদ্ধাভক্তিরই একান্ত অভাব দেখেন। রাম পিতৃসত্য-পালনের জন্য বনবাস গিয়াছিলেন—আর এখনকার ছেলেদের গুরুজনের প্রতি একটা অবিসম্বাদী শ্রদ্ধাবিশ্বাসও নাই! হায় রে! ইহার পর তিনি আর আত্মসংবরণ করিয়া কথা কহিতে পারিলেন না; ক্রোধ-বিকৃত স্বরে বলিলেন, —"লক্ষ্মীছাড়া, তোমার অস্থি-মজ্জায় দেখছি ইংরাজী স্বাধীনতা ঢুকেছে। (যেন তিনি এ দোষ হইতে নিজে সম্পূর্ণ মুক্ত!) তোমাকে বিলাত পাঠিয়ে সত্যই ফল নেই; আরও জানোয়ার বনে আসবে। যা ইচ্ছা তবে তাই তুমি কর।"

শরৎ ধীরে ধীরে পকেট হইতে নোটের তাড়া বাহির করিয়া টেবিলে রাখিল। তিনি এত দূর প্রত্যাশা করেন নাই; ভাগিনেয়ের স্পর্দ্ধায় তিনি অবাক্‌ হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। এ সাহসে তিনি রাগ করিবেন—না প্রশংসা করিবেন? কিন্তু ইহা স্থির করিতে পারিবার পূর্ব্বেই তাঁহার চক্ষু খুলিতে হইল। এক জন ভৃত্য একখানা তার-পত্র লইয়া উপস্থিত হইল। শ্যামাচরণ সেখানা হাতে করিয়া শরৎকে বলিলেন, "রসিদ লিখিয়া দাও।"

টেলিগ্রাম পড়িয়াই শ্যামাচরণ চমকিয়া উঠিলেন—বলিলেন, "রাজা বাহাদুর ঘোড়া থেকে প'ড়ে গেছেন, ডাক্তার নিয়ে আজকার গাড়ীতেই প্রসাদপুর যেতে হবে। তুই যা এক জন ভাল ডাক্তার ঠিক ক'রে আয়। আমি ততক্ষণ অন্যান্য আয়োজন ক'রে ফেলি। আগামী ষ্টীমারে তোর যখন বিলাত যাওয়া হ'লোই না, তখন তুইও সঙ্গে চল্‌। সার্জ্জারিটা ত তুই ভাল বুঝিস্‌। তুই সঙ্গে থাকলে আমার ভাবনাটা অনেক কম হবে।"

শরৎ ইহাতে কোন আপত্তি প্রকাশ না করিয়া ডাক্তার ঠিক করিতে গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রাণী জ্যোতির্ম্ময়ী

রাজা অতুলেশ্বরের তৃতীয়া কন্যা জন্মগ্রহণ করিল ঠিক জন্মাষ্টমীর দিনে। দুই কন্যার পর এবার রাজা-বাহাদুর যে পুত্রমুখ দর্শন করিবেন—এ বিষয়ে রাজবাড়ীর আবালবৃদ্ধ সকলেই একরকম নিঃসন্দেহ ছিলেন;—নহিলে তাঁহার আভিজাত্য তরণীর হাল ধরিবে কে? রাজার বংশরক্ষা, কুলরক্ষা রাজ্যরক্ষা হইবে কিরূপে?

রাত্রিকাল হইতে এই বহু প্রত্যাশিত নবীন কাণ্ডারীর আগমন অভ্যর্থনা উপলক্ষে সকলেই ব্যতিব্যস্ত; বহির্বাটীতে ডাক্তার, গণৎকার, গুরুপুরোহিতদিগের সমাগম হইয়াছে; অন্তঃপুরে সূতিকাগৃহের পার্শ্ববর্ত্তী বারান্দা আত্মীয়া, দাসী, পরিচারিকায় পূর্ণ; তাহারা শঙ্খ, ধান্যদূর্ব্বা, নববস্ত্র, রত্নভূষণ প্রভৃতি বিবিধ আয়োজন দ্রব্যাদি সাজাইয়া অতিথিবরণ জন্য উৎসুক হইয়া অপেক্ষা করিতেছে এবং নিশ্বাস ফেলিবার অনবসর সত্ত্বেও গল্পগুজবে সুখ-নিশা অতিবাহিত করিতেছে। নীচের উঠানে সমবেত বাদ্যকারগণ মঙ্গল শঙ্খধ্বনিতে অতিথির শুভাগমন-বার্ত্তা লাভের জন্য কান পাতিয়া আছে। চারিদিকের উৎফুল্ল জনতা-বেষ্টিত সূতিকাগৃহ জনবিরল, কেবল দুই জন মাত্র ধাত্রী সেখানে প্রসূতির শুশ্রূষায় নিযুক্ত ছিল, আর মহারাণী—অতুলেশ্বরের মাতা বধূর শীর্ষদেশে বসিয়া তাহাকে বীজন করিতে করিতে নাম জপ করিতেছিলেন।

রাজা চিন্তিত মনে, শুষ্কমুখে সংবাদ লইবার জন্য বারবার অন্তঃপুরে যাতায়াত করিতেছিলেন। তিনিই

কেবল ভাবিতে ভুলিয়া গিয়াছেন তিনি কি চান—কন্যা বা পুত্র; প্রসূতির চিন্তাতে এমনি তিনি একাগ্রচিত্ত।

অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে শ্যামসুন্দর-মন্দিরে যখন নহবতে প্রভাতী রাগিণী বাজিয়া উঠিল, ঠিক সেই সময়ে নবশিশু ভূমিষ্ঠ হইল। তাহার রোদনধ্বনিতে অন্তঃপুরিকাগণের প্রাণে একটা অপরিমিত উচ্ছ্বলিত আনন্দ-আবেগ বহাইয়া দিল। দোলোৎসব রাগিণী আজ তাহার মধ্যে অস্ফুট, আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। শিশু-কণ্ঠের সাড়া পাইয়া মঙ্গল-শঙ্খ তাহার প্রতি-ধ্বনি গাহিল, হুলুধ্বনি উঠিল, বাদ্যকারদিগের ঢাক ঢোল কাঁসী ঘণ্টা,—সানাইয়ের মৃদু নিনাদে মিলিত হইয়া আকাশে বাতাসে একটা পুলক মত্ততা জাগাইয়া তুলিল। বহির্বাটী ও অন্তর্বাটীর সন্ধিস্থলে যে প্রহরী পাহারায় নিযুক্ত ছিল—সে তাহার কর্তব্য ভুলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে রাজাকে গিয়া খবর দিল যে তাঁহার বংশধর ও ছত্রধর জন্মিয়াছে।

এই সকল কাণ্ড এমন চকিতে সম্পন্ন হইয়া গেল যে, নবশিশু যে কি সন্তান, ইহা জিজ্ঞাসা করিতেও মহারাণীর অবসর হইল না, বুঝি সাহসেও কুলাইল না।

ধাত্রী যখন শিশুকে কোলে তুলিয়া লইয়া আপনা হইতে বলিল "কন্যা-সন্তান গো" তখন মহারাণীর নিশ্বাস যেন বদ্ধ হইয়া পড়িল; নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল,—প্রসূতির মুখে গরম দুধ দিতে তিনি ভুলিয়া গেলেন। শিশুর রোদনধ্বনি শুনিয়া বারান্দা হইতে উঠিয়া—দ্বার ঠেলিয়া যাহারা সূতিকাগৃহে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল—তাহারা হা-হুতাশ করিতে করিতে কেহ বসিয়া পড়িল, কেহ বা ফিরিয়া গেল; শঙ্খধ্বনি হুলু-ধ্বনি সহসা থামিয়া পড়িল। নিমেষের মধ্যে চারিদিকে যেন একটা হাহাকার প্রবাহ বহিল; উঠানের বাদ্যধ্বনি কেবল থামিল না; যেমন বাজিতেছিল, সেইরূপই বাজিতে লাগিল বাদ্যকার-দিগকে বারণ করিবার উদ্যমটুকুও তখন কাহারও রহিল না।

তাহার নবসংসারে এতদূর নিরানন্দ নিরাশা আনয়ন করিয়াছে, তাহা না জানিয়া সদ্যোজাত সদ্যঃস্নাত নববস্ত্রে সজ্জিত শিশু মধু মুখে পাইয়া দুইটি অঙ্গুলির সহ চক্ চক্ শব্দে তাহা পান করিতে করিতে প্রজ্বলিত দীপশিখার প্রতি আনন্দ-বিস্ময় দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। ধাত্রী কিছু পরে মহারাণীর কোলে কন্যাকে ফেলিয়া দিয়া কহিল,—"মেয়ে হ'য়েছে, তাতে এত দুঃখ কেন মহারাণি? সাত রাজার ধন এক মাণিক ব'লে কোলে তুলে নিন্। দেখুন দেখি কত রূপ!"

তখন প্রসূতি নিরাপদ হইয়াছেন,—তাঁহার সেবাশুশ্রূষা শেষ করিয়া ধাত্রী তাঁহার গায়ের উপর একখানা শুভ্র বস্ত্র ফেলিয়া দিয়াছে। সূতিকাগৃহের দ্বার সকল এখন উন্মুক্ত, গৃহপ্রবিষ্ট অরুণালোকে বালিকা-শিশুর মুখখানি কি সুন্দর দেখাইতেছিল! তাহার দিকে চাহিয়া মহারাণীর অশ্রু স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। এ কি! সত্যই এ কি রূপ! কি লাবণ্য! সুবর্ণবর্ণের গোলায় কে যেন ইহাকে ধুইয়া দিয়াছে! মহারাণী অবাক হইয়া তাহাকে দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু মেয়ের রূপ দেখিয়া তাঁহার দুঃখ কমিল না—বরঞ্চ বাড়িয়া উঠিল, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তিনি মনে মনে বলিলেন—"এ শিশু যদি আমার অতুলের পুত্র-সন্তান হইত—হায় রে।"

রাজা কন্যা-দর্শনে আসিলে মা বলিলেন,—

"এবারও তোমার মেয়ে হোল অতুল! ভেবে-ছিলুম ছেলে হবে,—তা ভগবান্ সে আশা পূর্ণ কর-লেন না।"

রাজা সতৃষ্ণনয়নে কন্যাকে দেখিতে দেখিতে বলিলেন,—"তাতে দুঃখ কেন মা,—সংসারে কি মেয়ের দরকার নেই?"

"আমাদের সংসারে ছেলেরই যে দরকার ছিল। তা এবার হোল না, অন্যবারে হবে।"

"নাই হোল মা।"

"বেশ বল্‌ছিস্ যা হ'ক! তোর এত বড় বংশ, এত বড় নাম সব লোপ পেয়ে যাবে নাকি?"

"লোপ পাবে কেন? মেয়েরাই আমার নাম রাখবে?"

"আলাসনে অতুল! তুই হ'লি রায়চৌধুরী—জামাই হবে তোর ঘটক, চটক একটা ত!"

"এই জন্যে এত ভাবনা! আমি দেখো—নামের মামলা ঠিক মিটিয়ে নেব। জান—চাটুয্যে বাড়ুয্যে মজুমদার মহলানবীশ—সকলেই রায়চৌধুরী হ'তে পারে,—আমি যে জামাই করব—তার ল্যাজে নিশ্চয়ই রায়চৌধুরীটা বসিয়ে দেব—তুমি নিশ্চিন্ত থাক মা!"

"হাসাসনে বাছা,—আহা এ মেয়ে যদি তোর ছেলে হয়ে জন্মাত রে!"

"অত দুঃখ কেন করছ মা! ভুলে গেছ যে আমাদের আদি বংশ মেয়েরই বংশ। আমার প্রমাতামহী তাঁর পিতৃরাজ্যে রাণী হয়েছিলেন—আমার মেয়েও তাই হবে। আমার অন্য দু মেয়ের নামকরণ করেছ তুমি,

আমি এ মেয়ের নাম রাখ্‌লুম রাণী জ্যোতির্ম্ময়ী। তোমার নাতি হয় নি ব'লে যে ক্ষোভ হয়েছে—নাতনীকে রাণী ব'লে ডেকে সে ক্ষোভ মিটিও। যদি তাতেও দুঃখ না ঘোচে—তবে না হয় রাজা ব'লেই একে ডেকো।"

এই বলিয়া রাজা হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন।

* * * * * *

জ্যোতির্ম্ময়ী কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিল বলিয়া ঠাকুরমা যে পরিমাণে দুঃখিত হইয়াছিলেন—তাহার অধিক পরিমাণ স্নেহাদর পরে সে তাঁহার নিকট হইতে আদায় করিয়া লইল! কেবল ঠাকুরমার নহে, বাড়ীর সকলেরই সে আদরের সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইল।

রাজার জ্যেষ্ঠা কন্যা হিরণ্ময়ী এখন পাঁচ বৎসরের এবং মধ্যমা কিরণময়ী তিনের কোটা পার হইয়াছে, সুতরাং জ্যোতির্ম্ময়ীর আবির্ভাবে অন্তঃপুরিকাগণের স্নেহধারা অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে তাহার প্রতি বর্ষিত হইতে লাগিল। বোন দুইটিরও ত সে খেলার পুতুল, তাহাকে পাইলে তাহারা আহার-নিদ্রা ভুলিয়া যায়। রাজবাড়ীর আত্মীয়া পরিচারিকাগণের অবস্থাও তথৈব চ, শত কাজের মধ্যেও অবসর করিয়া লইয়া তাহারা শিশুদর্শনে ছোটে। আর মহারাণীর ত কথাই নাই—জ্যোতির্ম্ময়ী তাঁহার বক্ষের ধন। তাহাকে দখল পান না কেবল তার প্রসূতি, স্তন্যপান করাইবার সময়ে মাত্র কন্যাকে তিনি কোলে পান।

রাজান্তঃপুরে ভৃত্য-প্রবেশের নিয়ম নাই। কেবল দুই জন মাত্র এ সম্বন্ধে বর্জ্জিত-বিধির মধ্যে গণ্য। রাজার শৈশবভৃত্য হরিরাম—আর রাজার পিতার আমলের দৌবারিক কালীদীন পাঁড়ে। ইহারা এৎলা দিয়া মহারাণীর নিকট যাইতে পারে। পেন্সনভোগী পাঁড়ে এখন এত বৃদ্ধ হইয়াছে যে, চোখেও ভাল দেখিতে পায় না—কানেও কম শোনে—কিন্তু তাহার বিশ্বাস সে দেউড়িতে না থাকিলে রাজবাড়ীর আদব-কায়দা রক্ষা হওয়া অসম্ভব, তাই পেন্সন লইয়াও সে এ বাড়ী ছাড়িতে পারে না। ফলে চোখের গুণে সে রাজার বন্ধু-বান্ধবদিগকেও গেট হইতে নির্ব্বাসন আজ্ঞাদান এবং কানের দোষে পাত্রাপাত্র নির্ব্বিশেষে গালি-গালাজ দিতেও কুণ্ঠা বোধ করে না। মাঝে-মাঝে নূতন লোকের নিকট রাজাকে এজন্য অপ্রস্তুত হইতে হয়। একবার ম্যাজেষ্ট্রেট সাহেবকে নাকি বড়ই নাকাল হইতে হইত, যদি না—সেই সময় রাজা আসিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতেন। তবে রাজার বন্ধুরা পাঁড়েকে সকলেই চেনে, তাই তাহার ব্যবহার ক্ষোভের পরিবর্ত্তে তাহাদের কৌতুকই উদ্রেক করে। রাজার অল্পবয়স্ক আত্মীয় বালকদিগের নিকট হইতে পাঁড়ের এজন্য উপদ্রবও কম সহ্য করিতে হয় না, বার্দ্ধক্যের দুর্ব্বলতা-অপরাধ চিরদিনই বালকদিগের হাসি-তামাসার বিষয়।

বৃদ্ধ পাঁড়ে এবং হরিরামের শিশুদর্শন আবেদন যথাসময়ে পেশ হইল। ষষ্ঠীপূজার পর অন্তঃপুরের দালানে এক জন পরিচারিকা শিশুকে কোলে লইয়া দাঁড়াইল—পাঁড়ে নিদ্রিত বালিকার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া অন্ধনয়নকে যথাসম্ভব ফুটাইয়া তুলিয়া মস্তক আঘ্রাণে তাহাকে অভিনন্দন করিল। হরিরামের চিত্ত এত সহজে তৃপ্তিলাভ করিল না। পরিচারিকার নিকট হইতে তাহাকে নিজহস্তে তুলিয়া সুনিপুণা ধাত্রীর মত আস্তে আস্তে দোল দিতে দিতে হর্ষবিস্ফারিত নয়নে তাহাকে দেখিয়া সে মন্তব্য প্রকাশ করিল, "রাজকুমারী কি হুবহু রাজার মতই দেখিতে হইয়াছেন!"

এ কথা মহারাণী কিন্তু এ পর্য্যন্ত একবারও মুখে আনেন নাই। ইহার পর হইতে হরিরামের সংসারের শত মায়ার সহিত আর এক মায়ার যোগ হইল। সে প্রতিদিনই একবার করিয়া শিশুকে দেখিতে আসিত। যে দিন কোন কারণে তাহাতে ব্যাঘাত ঘটিত, সেই দিন শ্যামসুন্দরের আরতির সময়েও মনঃস্থির রাখা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিত। কেবলি তাহার মনে হইত—হয় ত বা রাজকুমারীর কোন অসুখ হইয়াছে।

শিশু যখন আট দশ মাসের—তখন হইতে হরিরামের এক নূতন কাজ জুটিল। বালিকার নরম নরম রেশমী চুলগুলি সে তাহার মাথার উপর চূড়াকারে বাঁধিয়া কটি আলম্বিত পীতধড়ার উপর সোনার পাটা কষিয়া তাহাকে সে শিশুকৃষ্ণ-বেশে সাজাইত। সজ্জাশেষে বালিকাকে বুকের উপর দাঁড় করাইয়া সেই মোহনরূপ মুগ্ধভাবে দেখিতে দেখিতে গান ধরিত—

নাচে আমার গোপালমণি দেখবি যদি আয়,—
তার—পীতধড়া মোহনচূড়া, নূপুর বাজে পায়।

হরিরামের গানের সঙ্গে সঙ্গে বালিকা হাসিয়া হাসিয়া নাচিত। ঠাকুরমা এই নাচ দেখিয়া এতই মুগ্ধ হইয়া গেলেন যে, হরিরামের অবিলম্বে পাঁচ টাকা করিয়া বেতন বৃদ্ধি হইল—অধিকন্তু এত দামী ভাল ভাল কাপড় সে উপহার পাইতে লাগিল যে, তাহার

স্রীকন্যার বেশভূষা অন্যান্য পরিচারিকাগণের ঈর্ষার কারণ হইয়া দাঁড়াইল। রাজাও মাঝে মাঝে আসিয়া কন্যার নাচ দেখিয়া প্রীতিলাভ করিতেন। বয়োবৃদ্ধি সহকারে শরীর-মনের স্ফূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহার নাচেরও উন্নতি দেখা গেল।

তিন বৎসর বয়স হইবার আগেই তাহাকে হরিরাম গায়িকা করিয়া তুলিল। বালিকার নিকট আসিবার সময় হরিরাম তাহার জন্য প্রতিদিন এক-গাছি করিয়া ফুলের মালা লইয়া আসে। মালাটি তাহার গলে পরাইয়া, হাতে একটি বাঁশী তুলিয়া দেয়। শিক্ষানিপুণ বালিকা—বাঁশীটি দুই হাতে ধরিয়া নূপুর পরা পা-দুটি একটির উপর আর একটি রাখিয়া হরিরামের মোটা গলার সঙ্গে মিলাইয়া আধ আধ কোমল কণ্ঠে গান ধরে—

নাচে আমার গোপালমণি দেখবি তোরা আয়,—
তার, পীতধড়া মোহন-চূড়া—নূপুর বাজে পায়!
তার—বনমালা গলায় দোলে,
(সে যে) রুণুঝুণু রঙ্গে চলে—
তার, নয়ন-কোণে চাঁদের আলো ঝলকিয়ে যায়!
দেখবি যদি শ্যামের লীলা, আয় গো ছুটে ব্রজবালা,
তার হাতের বাঁশী—শোন্ রে আসি কি মধুর গায়!

গান আরম্ভ হইবার পর হরিরামের তুড়ির সঙ্গে সঙ্গে বালিকার নৃত্য আরম্ভ হয়—এই মনোমোহন নৃত্য দেখিবার জন্য রাজবাড়ীতে ছুটাছুটি পড়িয়া যায়। রাজার ইচ্ছা হইল—কন্যার এই নৃত্য-গীতে তিনি বন্ধুবান্ধবদিগকে এক দিন পরিতৃপ্ত করেন। কিন্তু পুরুষ-মজলিসে আনীত হইয়া বালিকা এমনি নিস্তব্ধ গম্ভীর হইয়া গেল যে, পিতার শত অনুরোধেও একটি পা তাহার নড়িল না। কন্যার যে বেশ একটু জিদ আছে, সেই দিন হইতে তাহা বেশ বুঝা গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

জ্যোতির্ম্ময়ী যখন ৭।৮ বৎসরের বালিকা তখন রাজবাড়ীতে উপর্য্যুপরি দুই তিনটি শোচনীয় ঘটনা ঘটিল। রাজার দুই কন্যারই বিবাহ হইয়াছিল অল্প বয়সে, এক জমীদারের দুই পুত্রের সহিত। জ্যেষ্ঠা হিরণ্ময়ীর ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সে প্রসবের সময় অকাল-মৃত্যু ঘটিল, আর ইহার অল্প দিন পরে কিরণময়ীও ইহলোক ত্যাগ করিল। কি পীড়ায় যে তাহার মৃত্যু হইল—অতুলেশ্বর তাহা জানিতেও পারিলেন না। সব শেষ হইয়া যাইবার পর তাঁহার নিকট এ খবর আসিল। রাণী তখন অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন—এই অল্প সময়ের মধ্যে দুই কন্যার মৃত্যুশোক তাঁহার সহ্য হইল না, অকালপ্রসবে তিনিও ইহলোক ত্যাগ করিলেন। রাজবাড়ীর সকলেই শোকনিমগ্ন হইল, বালিকার জীবনেও একটা সুগভীর কষ্টের রেখা পড়িল, কিন্তু মর্ম্মাহত হইলেন অতুলেশ্বর। এই আঘাতে মহা-কাল-চক্রের কক্ষবিচ্যুত হইয়া তাঁহার জীবন যেন ভিন্ন পথে প্রধাবিত হইল। দুঃখের মধ্য দিয়া ভগ-বান যেন তাঁহাকে নব জন্মদানে নূতন জ্ঞানে প্রবুদ্ধ করিলেন।

অতুলেশ্বর স্বভাবতঃ উদারপ্রকৃতি—মনে মনে বুঝিতেন স্ত্রী-শিক্ষা স্ত্রী-স্বাধীনতা দেশের পক্ষে, জাতির পক্ষে, কল্যাণজনক! কিন্তু এ সত্য তাঁহার মনে এমন বদ্ধমূল ভাবে বসে নাই—যে, আজন্ম সংসারের বেড়া ভাঙ্গিবার সাহস তাঁহার জন্মায়, আজ তিনি বুঝিলেন—স্ত্রী-শিক্ষা কেবল মাত্র কল্যাণ-জনক তাহা নয়—স্ত্রী-জাতির জ্ঞাননেত্র উন্মেষের উপর জাতির গতি-মুক্তি একান্ত ভাবে নির্ভর করিতেছে! তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন—জ্যোতির্ম্ময়ীকে আর ছোট বেলায় বিবাহ দিবেন না—এবং তাহাকে রীতিমত লেখাপড়া শিখাইবেন।

এই সময় প্রসাদপুরে ম্যাজিষ্ট্রেট বদল হইল। নূতন ম্যাজিষ্ট্রেট ক্লাউডেন সাহেবের পত্নী রাজার এই শোকের সময় আন্তরিক ভাবে সহানুভূতি দেখা-ইতে লাগিলেন। ক্রমশঃ উভয়ের মধ্যে বেশ একটু বন্ধুত্ব জন্মিল, তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তায় রাজা মনের ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে যেন দৈবশক্তি লাভ করিলেন। তাঁহার সাহায্যে এবং তাঁহার পরামর্শে রাজান্তঃপুরে একটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। বাঙ্গলা পড়াইতে কলিকাতা হইতে দুই জন শিক্ষয়িত্রী আসিলেন, ইংরাজীর জন্য স্থানীয় মিশনারী মেম দুই জন নিযুক্ত হইলেন। রাজবাটীর বালিকাগণ এবং প্রজাদিগের কন্যাও অনেকে এখানে শিখিতে লাগিল।

ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নী নিজে দুই তিন দিন বিদ্যালয়ে আসিয়া সেলাই শিখাইতেন,—পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ইহার তত্ত্বাবধান করিতেন—এবং মাসে একবার করিয়া ছাত্রীদিগের পরীক্ষা গ্রহণ করিতেন। জ্যোতির্ম্ময়ীর মেধাশক্তি দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইতেন। যাহা তাহাকে শেখান হইত, অতি সহজে এবং অল্প সময়ের মধ্যে সে তাহা অভ্যস্ত করিয়া লইয়া অপেক্ষাকৃত জটিল পাঠ গ্রহণের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিত।

ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নী তাহাকে কন্যার ন্যায় ভালবাসিতেন। সদাসর্ব্বদা নিজের বাটীতে লইয়া যাইতেন।

রাজা বিকালে বায়ুসেবনে গমনকালে প্রায়ই কন্যাকে সঙ্গে লইতেন। সকালে সে ঘোড়ায় চড়িতে শিখিত। অনেক সময় পিতার সহিত শীকারেও যাইত। মেয়েদের নির্ভীকতা শিক্ষা দিবার প্রয়োজন আছে,—ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নী রাজাকে ইহা বেশ করিয়া বুঝাইয়াছিলেন! একবার জ্যোতির্ম্ময়ী শীকারস্থলে তাহার সাহসের আশ্চর্য্যরূপ পরিচয় দিয়াছিল। একটা শীকারী হাতী সেখানে কি কারণে কে জানে মাহুতের অবাধ্য হইয়া বেগে ছুটিয়া—সকলকে ভয়বিহ্বল করিয়া তুলিল। মাহুত যদি একেবারে বে-এক্তার হইয়া পড়ে, তবে হস্তী যে কত লোককে পদদলিত—আহত করিবে, তাহার ঠিক নাই। এই আতঙ্ক-চাঞ্চল্যের মধ্যে জ্যোতির্ম্ময়ী প্রশান্তভাবে বাঁশিধ্বনির মত মধুর অথচ উচ্চস্বরে,—ডাকিল—"মিতিয়া—মিতিয়া"! সে স্বরে ধাবমান হস্তীর গতিবেগ সহসা স্তম্ভিত হইয়া পড়িল—উর্দ্ধকর্ণ হইয়া সে দাঁড়াইল,—আবার বালিকা ডাকিল—"আও ভাইয়া—আও মিতিয়া"- হাতী ধীরে ধীরে তখন জ্যোতির্ম্ময়ীর হস্তীর নিকট আসিয়া শুণ্ড তুলিয়া ধরিল; বালিকা সেই সময় আদর করিয়া স্কন্ধবিলম্বিত শীকার-ঝুলি হইতে এক খণ্ড রুটি বাহির করিয়া তাহাকে প্রদান করিল,—সে সেলাম করিয়া প্রসন্নচিত্তে তাহা গ্রহণ করিয়া শান্ত হইয়া গেল। বালিকা যে হাতীশালায়, ঘোড়াশালায় গিয়া জীবজন্তুর সহিত ভাব করে—ম্যাজিষ্ট্রেট-দম্পতি তাহা এই প্রথম জানিলেন। সুতরাং এ ঘটনায় তাঁহারা তেমন বিস্মিত হইলেন না, কিন্তু ভৃত্যেরা সকলেই সবিস্ময়ে বলিল—"জন্মাষ্টমীর দিনে বালিকার জন্ম—তাহার দৈবশক্তি হইবে না?"

এইরূপ অনাচারের মধ্যে কন্যাকে লালিত পালিত করিতে দেখিয়া মহারাণী মনে মনে ক্ষুব্ধ হইতেন,—কিন্তু প্রকাশ্যে কিছু বলিতেন না। রাজা মেয়েকে সঙ্গে রাখিয়া মনের মত শিক্ষা-দীক্ষা দিয়া যদি শোক ভুলিয়া থাকেন, ত তিনি কোন্ প্রাণে তাঁহাকে নিরস্ত করিবেন? আর কত দিনই বা এ খেলা! যত দিন কন্যার না বিবাহ হয়—সেই ক'টা দিন বই ত নয়? লউন এই কয়েক দিন রাজা তাঁহার সখ মিটাইয়া!—কিন্তু মহারাণী যখন দেখিলেন বার বৎসরের মেয়েরও বিবাহের নামগন্ধ রাজা মুখে আনেন না, তখন তিনি ভীত হইয়া জেদ ধরিয়া বসিলেন,—"মেয়ের বর খোঁজ, বিবাহ দাও,—তাহাকে অন্তঃপুরিকা কর,—আর তোমার সঙ্গে সঙ্গে রাখিও না।"

রাজা কিন্তু এবার অটল,—তিনি একান্ত দৃঢ়তার সহিত বলিলেন,—না মা, আমি আর ছোটবেলায় মেয়ের বিবাহ দেব না, আমাকে ঐ অনুরোধটি ক'রো না।"

মা উত্তরে প্রথমতঃ কোন কথা খুঁজিয়া পাইলেন না। দুইটি কন্যার অকাল-মৃত্যুর স্মৃতি তাঁহাকেও নিস্তব্ধ করিয়া তুলিল! কিছু পরে দুঃখের চিন্তা মনের মধ্যে চাপিয়া লইয়া হাসিয়া বলিলেন—"মেয়েকে স্বয়ংবরা করবি না কি রে?" এইরূপ কৌতুকবাক্যে পুত্রের মন হইতে শোকস্মৃতি তাড়াইয়া দিবেন, এই তাঁহার অভিপ্রায়।

তাঁহাদের কথা হইতেছিল অন্তঃপুরের দালানে একখানা তক্তাপোষের উপর বসিয়া। স্বামীর মৃত্যুর পর হইতে মহারাণী কোমল শয্যা গ্রহণ করিতেন না। রাজা মাতার কথায় পাশের উন্মুক্ত আকাশ-খণ্ডের দিকে চাহিয়া কণ্ঠাগত সুদীর্ঘ নিশ্বাস সন্তর্পণে ধীরে ধীরে ফেলিয়া উত্তরে বলিলেন, "ক্ষতি কি? আগে ত সেই রকমই হ'তো।"

"সে কাল নেই রে—কতবার সে কথা বোঝাব তোকে? যা যায়, তা কি আর ফেরে অতুল!" অনিচ্ছাসত্ত্বেও মহারাণীর মুখ হইতে এই কথাই বাহির হইয়া পড়িল—সঙ্গে সঙ্গে নয়নে জলও ভরিয়া উঠিল। এবার রাজার পালা,—মায়ের অশ্রুজল নিবারণ উদ্দেশে তিনি কৌতুকচ্ছলে বলিলেন,—

"কেন মা, কালচক্র ঘুরে ফিরে ত সেই একই পথে আসে,—এ কালকে সে কাল ক'রে তুলব আমরা, সে জন্য ভাবনা কি! সেই চেষ্টাতেই ত আমি আছি—সেটা কি বুঝছ না মা?"

"বুঝছি ব'লেই ত ভয় পাই। অসাধ্যসাধন করতে গিয়ে কি-একটা অদ্ভুত কাণ্ড ক'রে বসবি! তা বাছা বিয়ে এখন নাই দিলি—পাত্র দেখে রাখতে ক্ষতি কি?"

"বড় না হ'লে যখন বিয়ে দেবই না, তখন পাত্র দেখে লাভও ত নেই। বরঞ্চ ক্ষতি এই—পরে আরও ভাল পাত্র যদি পাওয়া যায়, তখন তাকে গ্রহণ করবার আর উপায় থাকবে না।"

এই সময় সহসা জ্যোতির্ম্ময়ীর সময়োচিত আবির্ভাবে সে কথা বন্ধ হইয়া গেল। সে দিন ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ী তাঁহাদের নিমন্ত্রণ ছিল। বালিকা সে জন্য প্রস্তুত হইয়া পিতাকে ডাকিতে আসিয়াছিল। কিন্তু নিমন্ত্রণে যাইবে বলিয়া সজ্জাড়ম্বর

তাহাতে কিছুই ছিল না। বেশী সাজসজ্জা বা গহনা পরা রাজা ভালবাসেন না, মেয়েরও সেইরূপ রুচি হইয়াছে। প্রতিদিন বিকালে যে সাজে সে পিতার সহিত গাড়ীতে বেড়াইতে যায়— আজও তাহার সেই একইরূপ সাজ। সে পরিয়াছে ফিকা গোলাপী রঙের একখানি সাড়ী, শাদা রেশমের একটি জ্যাকেট ও শাদা রঙের জুতা মোজা। অলঙ্কারের মধ্যে উন্মুক্ত কেশ-বন্ধনী স্বরূপ শিরোভাগে মুক্তার কাজ করা একটি গোলাপী ফিতা, দু' একটি ব্রোচ; হাতে দুগাছি মুক্তার চুড়ি, আর কণ্ঠে একগাছি মতির মালা। জ্যোতির্ম্ময়ীর শিক্ষয়িত্রী গভর্ণেস কুন্দবালা তাহাকে সাজাইয়া দিয়াছিল। এই স্বল্পতর সাজে তাহার রূপখানি এত খুলিয়াছিল যে, মনে হইতেছিল, বালিকা যেন কতই সাজ-সজ্জা করিয়াছে। রাজা কন্যার প্রতি আনন্দপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "সময় হয়েছে বুঝি, চল রাণী।"

রাজা কন্যাকে রাণী বলিয়াই ডাকিতেন। তাঁহারা চলিয়া গেলেন,—মহারাণীর নয়নে কন্যার রূপ অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রতিবিম্বিত হইয়া রহিল। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া স্বগতঃ বলিলেন, "হায় রে!" এত রূপ—মেয়ের, এ না জানি কার হাতে পড়বে, সে আদর করবে কি অনাদর করবে—তারই বা ঠিক কি? সাধে কি মেয়ে-ছেলে হ'লে দুঃখ করি! মেয়ে জন্মের ত কত সুখ! এই জন্যেই অতুল মেয়ের শীগ্‌গির বিয়ে দিতে চায় না, তাও বুঝি,—কিন্তু তবুও ত দিতে হবে রে বোকা!"

মহারাণী রাজার অজ্ঞাতসারে জ্যোতির্ম্ময়ীর পাত্রের সন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে রাজা আর একটি অভূতপূর্ব্ব কাজ করিয়া বসিলেন। ১২ বৎসরের মেয়েকে আজও বাহিরে রাখিয়া রাজা ক্ষান্ত নহেন, তার সংস্কৃত শিক্ষার জন্য এক পণ্ডিত নিযুক্ত হইল। মহারাণী অনেক সহিয়াছেন, কিন্তু এত বড় একটা অনাচার তিনি চুপ করিয়া সহিতে পারিলেন না। পুত্রকে ডাকিয়া—শিরে করাঘাত-পূর্ব্বক কহিলেন, "তুই কি জাত-ধর্ম্ম সব খোয়াবি রে? নিদেন আমার মরণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর।"

রাজা তাঁহার ক্রোধোক্তিতে না দমিয়া হাস্য-মুখেই বলিলেন,—"জান মা, তোমার ঐ আঘাত আমার মাথাতেই পড়ছে! আমাকে অভিশাপ লাগছে? তুমি দেখে নিও—কে আগে মরে।"

রাজার এই কথায় মহারাণী জাতি-ধর্ম্মের ব্যবস্থার কথা ভুলিয়া গেলেন।

এই রকম কৌশলে বরাবরই পুত্র মাকে হার মানাইয়া আসিতেছেন। মহারাণী আকুল কণ্ঠে কহিলেন, "ষাটের বাছা ষষ্ঠীর দাস, অভাগিনীর আঁচলের ধন তুই—অমন কথা মুখে আনিস নে বাছা,—তোর মেয়েকে নিয়ে তুই যা খুসী করগে।"

"কিন্তু তুমি অসুখী হ'লে ত তা পারব না মা। তোমার দুষ্ট ছেলের সব কাজই খুসী হ'য়ে তোমাকে মেনে নিতে হবে। জ্যোতির্ম্ময়ী ছেলে নয় ব'লে তোমার এত আক্ষেপ—তাতেই না আমি তাকে ছেলে গড়বার চেষ্টাতে আছি।"

মায়ের রাগ ছেলের কথায় পড়িয়া আসিয়াছিল, তিনি হাসিয়া বলিলেন—"ওরে নির্ব্বুদ্ধি, তুই ইচ্ছা ক'রলেই কি তা হবে? শেষে তোর মেয়েটি চিত্রাঙ্গদা হ'য়ে দাঁড়াবে—দেখে নিস্।"

"অর্জ্জুনের মত নাতজামাই যদি পাও—তাতে ত তোমার আপত্তিও হবে না মা।"

"সেই বরই প্রার্থনা করি। তোর মেয়ে ভাগ্যবতী,—হ'তেও পারে।" এইরূপে ক্রন্দনপর্ব্ব হাস্যে পরিণত হইলে মহারাণী বলিলেন,—"তবু ত বাছা তোর একটি বংশধর চাই। অর্জ্জুন নাতজামাই তোর মেয়ের প্রাণ ঠাণ্ডা করবে—কিন্তু তোর ছেলে নইলে আমার প্রাণ ঠাণ্ডা করে কে বল দেখি? বিয়ে কর্ বাছা,—কত দিন আর বাঁচব—আমার এই সাধটি পূর্ণ কর, লক্ষ্মী ছেলেটি আমার।"

"সব সাধ কি সংসারে পূর্ণ হয় মা। ছেলে হবার হ'লে আগেই হ'তো। এখন মেয়ে নিয়েই তোমার সাধ-বাসনা পূর্ণ ক'রতে হবে।"

"তাই বা দিচ্ছিস কই? মেয়ের ত বিয়ে দিতে চাচ্ছিস নে।"

"দুইটা মেয়ের ত ছোটবেলাতেই বিয়ে দিয়েছিলে, —কত সাধ তোমার পূর্ণ হ'লো বল দেখি? তোমাদের মনের গতি আমি বুঝে উঠতে পারি নি? পদে পদে ঠেক্‌বে—কিছুতেই তবু শিখতে চাইবে না!" রাজা রাগ করিয়া এই কথা বলিয়া চলিয়া গেলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বন্দে মাতরম্

"আর ব'লো না পণ্ডিত মশায়, আমার সর্ব্ব-শরীরে রক্ত চন্‌চন্ ক'রে উঠ্‌ছে, আমি আর শুনতে পারিনে।" বলিল রাজকুমারী জ্যোতির্ম্ময়ী তাহার পণ্ডিত দেবব্রত ভট্টাচার্য্যকে।

প্রায় দুই বৎসরকাল ভট্টচায্ মহাশয় বালিকার সংস্কৃত শিক্ষকতায় নিযুক্ত হইয়াছেন, বাড়ীর সকলে প্রত্যাশা করিয়া আছে—এইবার অচিরাৎ ভারতে দ্বিতীয় 'গার্গী' বা 'উভয় ভারতীর' অভ্যুদয় তাহারা দেখিবে। পণ্ডিত মহাশয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা আরও অধিক,—দ্বিতীয় কেন, ছাত্রীকে অদ্বিতীয় পণ্ডিত করিয়া তোলাই তাঁহার অভিপ্রায়। কেন না, এইজন্যই তিনি বেতনভোগী, অধিকন্তু এই কার্য্য সাধন করিতে পারিলে—পরলোকের অপেক্ষায় আর তাঁহাকে থাকিতে হয় না, ইহলোকেই হাতে-হাতে পুরস্কৃত হইতে পারেন। কিন্তু সকলের এত বাসনা-কামনা ব্যর্থ করিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী সংস্কৃত-শিক্ষার উপলক্ষে দীক্ষিত হইল কিসে? না দেশানুরাগে।

রাজকুমারীর সংবাদপত্র পড়িবার নেশা কখনও ছিল না—এখনও নাই, কিন্তু জ্যোতির্ম্ময়ী শুনিতে চাক্ বা নাই চাক্, তাহাতে কিছুই আসে-যায় না, —যত রাজ্যের সংবাদ বহন করিয়া আনিয়া পণ্ডিত মশায় ছাত্রীকে শুনাইয়া পরিতৃপ্তি লাভ করেন। কোন্ ইংরাজের পদাঘাতে কোন্ কুলীর প্লীহা ফাটিয়াছে, ট্রেণের গাড়ীতে ইংরাজ ফিরিঙ্গি কর্তৃক কোন্ দিন কোন্ ভারতবাসী লাঞ্ছিত অপমানিত হইয়াছে, কোর্টে ইংরাজ ভারতবাসীর মকদ্দমায় কখন কিরূপ অবিচার হইতেছে, এই সব খবরই প্রধানতঃ পণ্ডিত মশায় বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়া বলেন। শুনিয়া ক্রোধে বেদনায় জ্যোতির্ম্ময়ীর গোলাপী বর্ণ আগুনের মত রাঙ্গা হইয়া উঠে, তাহা দেখিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের দেশপীড়নজনিত মনের জ্বালা অনেকটা প্রশমিত হইয়া আসে।

এখন পণ্ডিত মশায় বলিতেছেন, "মফঃস্বলের একজন ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেট অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিবার সময় পার্শ্ববর্ত্তী এক জন ভদ্রলোককে চাবুক মারিয়াছে। ভদ্রলোকটির অপরাধ, অন্যমনাবশত তাঁহাকে সেলাম করিতে ভুলিয়া গিয়াছিল।"

এই সংবাদে জ্যোতির্ম্ময়ী যেন নিজের অঙ্গেই কষাঘাত অনুভব করিয়া উদ্দীপ্ত কাতরস্বরে কহিল— "আমি আর শুনিতে পারি না।" পণ্ডিত মশায় এত সহজে যদিও দমিবার পাত্র নহেন, কেন না মুখ বন্ধ রাখিতে হইলে দম ফাটিয়া তাঁহার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া যাইবার সম্ভবনা, তথাপি তিনি একটু হতাশার স্বরে কহিলেন—"তবে থাক্, এ সব কথা তোমার মত বালিকার না শোনাই ভাল। পড়।"

"না, এখন আমার পড়তেও ইচ্ছা করছে না।"

পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার হাতের অমৃতবাজার পত্রিকাখানির পাতা উল্টাইয়া তাহার দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া অন্যমনে বলিলেন, "তবে অন্বয় কর? কস্মিংশ্চিদ্‌বনে ভাসুরকো নাম সিংহঃ প্রতিবসতি স্ম।"

প্রথম পাঠ বালিকার অনেক দিন শেষ হইয়াছে —এখন সে পড়ে রঘুবংশ মুগ্ধবোধ ইত্যাদি। কিন্তু পণ্ডিতের কথায় প্রতিবাদ না করিয়া বালিকা অন্বয় করিল—কস্মিংশ্চিৎ প্রদেশে অসুরকো নাম সিংহ-স্ত্রাসয়তি জনগণান্।

পণ্ডিতমহাশয় বুঝিলেন, একটা গলদ করিয়া ফেলিয়াছেন, বালিকার দিকে চাহিয়া একটু উত্তেজিত স্বরে বলিলেন—"দেখ রাজকুমারি, হাসি-তামাসার কাল এ নয়।"

"আমি হাসি-তামাসা করি নি—প্রাণ থেকে যা অনুভব করছি তাই বলছি। পড়তে পারব না এখন পণ্ডিতমশায়।" বলিয়া হাতের বইখানা জ্যোতির্ম্ময়ী ছুড়িয়া নীচে ফেলিয়া দিল।

গৃহের একপার্শ্বে তাহার শিক্ষয়িত্রী কুন্দবালা চৌকিতে বসিয়া নীরবে সেলাই করিতেছিল। বইখানা উঠাইয়া টেবিলে রাখিয়া সে কহিল, "রাজকুমারি, সংবাদপত্রে ক'টা পীড়নের কথাই বা প্রকাশ হয়—! আপনি তাই শুনেই এত অধীর হয়ে ওঠেন, সব কথা কানে গেলে না জানি কি করতেন! দেখুন দুর্ব্বল হ'লেই সহ্য করতে হয়, এটা জগতের নিয়ম, ইংরাজ-বাঙ্গালীর কথা ছেড়ে দিন, আমাদের দেশে দুর্ব্বলা অসহায়া নারীজাতির যে কিরূপ কষ্ট, কত লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়, একটু বড় হ'লে তখন বুঝবেন।"

পণ্ডিতমহাশয় দেখিলেন বেগতিক, কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছে, আর তাঁহার অযত্ন-অনাদর যে কতক পরিমাণে ইহার কারণ নয়, তাহা ত তিনি মনে করিতে পারেন না। একটু তাড়াতাড়ি তিনি বলিলেন,—"তবে আমি আজ উঠি, আজ ত দেখছি তোমার পড়া হবেই না।"

"না পণ্ডিতমশায় বসুন, আর কিছু খবর থাকে ত বলুন। আমি ভেবে দেখছি—কষ্ট হয় ব'লে কষ্টকর কথাগুলিকে তফাতে রাখাটা ঠিক নয়। তাতে ত পীড়ন বন্ধ হবে না!"

জ্যোতির্ম্ময়ীর অনুজ্ঞায় পণ্ডিতমশায় পরিত্যক্ত চেয়ার পুনর্গ্রহণ করিলেন। কুন্দবালা বলিল— "আমি প্রত্যক্ষ ঘটনা দু-একটা জানি, শুনবেন রাজকুমারি? আমার একটি খুড়তুত ভাই ভাগলপুরের ষ্টেশন-মাষ্টার, তিনি স্বচক্ষে ঘটনাটি দেখেছেন।"

"বল না কুন্দবালা?" বালিকা কিছু বলিবার

পূর্ব্বেই পণ্ডিতমহাশয় তাহাকে এই অনুরোধ করিলেন।

কুন্দ পণ্ডিতের দিকে চাহিতে গিয়া সম্মুখের দেয়ালের আয়নাখানায় অগ্রে দৃষ্টিপাত করিল,—মাথার শিথিল সাড়ীখানা ঠিক করিয়া এইবার ছলে কপালের কেশদাম অলক্ষ্যে ঠিক করিয়া লইয়া কহিল,—"সেখানকার একজন বড় সাহেব—নাম করব না. কল্‌কাতায় যাবেন,—ট্রেণ ছাড়তে একটু দেরী ছিল, ষ্টেশনের খানাঘরে ব'সে গেলাসের উপর গেলাসে মদ ঢাল্‌ছেন—আর খাচ্ছেন, দু'ট ঘণ্টা পড়ল, তবু তাঁর হুঁস নেই, তৃতীয় ঘণ্টা পড়লো—আমার ভাই তাঁ'কে খবর দিলে যে এইবার গাড়ী ছাড়বে। তাড়াতাড়ি উঠে তিনি গাড়ীর উদ্দেশে ছুটলেন। তিনি তখন নেশায় চুরচুরে। পথে দু চারজন কুলী জনতা ক'রে দাঁড়িয়েছিল, লাথি-মেরে তাদের সরিয়ে পথ করে নিলেন ধাক্কায় একজন লোক ঠিক গাড়ীর সামনে প'ড়ে গেল, তিনি এমন জোরে জুতোর ঘায়ে তাকে ঠেলে দিলেন যে, তার মাথা ফেটে রক্তারক্তি হ'য়ে উঠল,—সাহেব তাতে ভ্রুক্ষেপ না ক'রে গাড়ীতে গিয়ে উঠলেন।"

জ্যোতির্ম্ময়ী নিস্তব্ধ হইয়া শুনিল, তাহার চক্ষু জলপূর্ণ হইয়া উঠিল। খানিক পরে বলিল—"পণ্ডিতমশায় একটা কথা বলব? আমার মনে হয়, খবরের কাগজে এ রকম দুর্ব্বল-পীড়নের কথা প'ড়ে আপনারা আনন্দভোগ করেন। আর জানেন, এই মনে ক'রেই আমার বেশী কষ্ট হয়।"

"আনন্দভোগ করি?" পণ্ডিতমহাশয়ের নয়ন বিস্ফারিত হইয়া উঠিল।

"নিশ্চয়ই! যেমন রাস্তায় মারামারি হ'লে পথিকেরা মজা অনুভব করে, সেই রকম। নইলে ভাই-বোন, মা-বাপ লাঞ্ছিত হচ্ছে দেখলে বা শুনলে কেউ কি চুপ করে থাকতে পারে?"

"কি করব বল? উপায় কি?"

"কি করবেন? প্রতিকারের চেষ্টা করুন।"

"প্রতিকারের চেষ্টা!" পণ্ডিতমহাশয় অবাক্ হইয়া গেলেন। লম্বা দাড়ীতে হাত বুলাইয়া উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—"ভগবান্ যদি ইচ্ছা করেন, তবেই প্রতিকার হবে। আমাদের মত দুর্ব্বল জীবের প্রতিকার-চেষ্টা, আর যূপকাষ্ঠে কণ্ঠদান—একই কথা।"

"প্রতিদিন জীবন্ত দগ্ধ যন্ত্রণা ভোগ করার চেয়ে যূপকাঠে কণ্ঠদানও আমি ভাল মনে করি।"

পণ্ডিতমহাশয় অসহায় বালকের মত কুন্দবালার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া যেন নীরবে প্রশ্ন করিলেন,—"এ মেয়ে পাগলের মত বলে কি?"

জ্যোতির্ম্ময়ী বলিল—"আপনি ত আমাকে পড়িয়েছেন—উদ্যমেন হি সিধ্যন্তি কার্য্যাণি ন মনোরথৈঃ। ইংরাজিতেও একটা প্রবাদ আছে—নিজেকে যে সাহায্য করে, ভগবান্ তার সহায় হন। জাতির মঙ্গল-চেষ্টা করা ত আর বিদ্রোহিতা নয় যে, আপনি ফাঁসি যাবেন! আলসেমীর আরামটুকু ছাড়তে চান না ব'লেই এসব কাজে আপনারা উদ্যমহীন। আমি স্ত্রীলোক হ'য়ে যে কাজ অসাধ্য-সাধন মনে করি না—আপনারা পুরুষ হ'য়ে সে কাজে ভগবানের মুখ চেয়ে নিবৃত্ত থাকেন। ভগবান্ ত মানুষের দ্বারাই কাজ করিয়ে নেন।"

পণ্ডিত মহাশয়ের বিস্ময় উত্তরোত্তর বাড়িতেছিল. তিনি মুগ্ধের মত কহিলেন,—"কি করতে বল তুমি?"

"সহরে, নগরে, গ্রামে, পল্লীতে, বিদ্যালয়ের সঙ্গে সঙ্গে যদি রীতমত ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া হয়, তা হ'লে শারীরিক তেজের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের যে মনের তেজও বাড়বে, তাতে সন্দেহ মাত্র নেই। তখন তাদের পীড়ন করতে কারো সাহসই হবে না।"

কুন্দবালা বলিল,—"এক সময় হিন্দু-মেলা নামে কল্‌কাতায় একটা মেলা হয়েছিল,—তার উদ্যোগে দিনকতক নাকি ছেলেদের মধ্যে ব্যায়াম-চর্চ্চার খুব ধুম প'ড়ে গিয়েছিল।"

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন—'হাঁ, সে অনেক দিনের কথা,—আমরা তখন ছেলেমানুষ।"

জ্যোতির্ম্ময়ী প্রশ্ন করিল—"বন্ধ হোল কেন?"

কুন্দবালা উত্তর করিল—"আমাদের ত কার্য্যের উৎসাহ সূর্য্য-চন্দ্রের আলোক নয় যে, স্থায়ী হবে; তেলের বাতি আর কতক্ষণ জ্বলে?"

"সংসারে ত তেলের বাতির প্রভাব কম নয়। সূর্য্য চন্দ্রকে ধরে রাখা যায় না,—কিন্তু সহজেই আমরা প্রদীপে তেলের যোগান্ দিতে পারি। আমাদের দেশের কবিরা, দেশনায়করা কি বহুদিন ধ'রে তাই কর্‌ছেন না? যখন পড়ি "তোমার তরে মা সঁপেছি দেহ, তোমার তরে মা সঁপেছি প্রাণ"—তখন আমার দেহ-প্রাণ নবশক্তিতে বলীয়ান্ হ'য়ে ওঠে,—যখন পড়ি—

"তুমি ক্ষুধাতৃষ্ণাতুর,—গৃহ ধনধান্যপুর
অন্নজল তবু নাহি মেলে—
তবু তারা খেলে।"

তখন আর হাসতে খেলতে ইচ্ছা করে না।"

"কিন্তু সকলের মনের ভাব এই রকম না হ'লে ত কোন কাজ হয় না।" বলিল কুন্দবালা ;—উত্তর-স্বরূপ পণ্ডিতমহাশয় বলিলেন—"মনের ভাবের অভাব বশতই যে লোক নিরুদ্যম—আমার তা মনে হয় না। গভরমেণ্টের অসন্তুষ্টি বলে ত একটা জিনিষ আছে!"

বালিকা জ্যোতির্ম্ময়ী এইবার অবাক্ হইয়া গেল,—কথাটা এমনই তাহার নিকট হাস্যজনক মনে হইল, হাসিয়া সে বলিল—"গভরমেণ্টের ভয়? কেন? গভরমেণ্ট আমাদের ত শত্রু নন, আমাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী রাজা। আমাদের পীড়ন করে যারা তারা সাধারণতঃ ছোট লোক ইংরাজ—নয়ত হীনচেতা গভরমেণ্ট কর্ম্মচারী। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের অপরাধের দায়ী কি গভরমেণ্ট? গভরমেণ্টই ত আমাদের মঙ্গল-কামনায় সহরে, গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন ক'রছেন,—আর আমরা ব্যায়াম-চর্চ্চা করতে গেলে তাঁরা নিষেধ করবেন? এ কখনই হ'তে পারে না। দেশের লোকের মন যে কত হীন দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছে—এইরূপ বৃথা ভয়ই তার প্রমাণ। একথা শুনলে আমাদের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব নিশ্চয়ই হাসবেন।"

পণ্ডিত বলিলেন—"আমরা ত গভরমেণ্ট কর্ম্মচারীকে গভরমেণ্ট থেকে পৃথক করতে পারিনে। তাঁরা পদে পদে তাঁদের কার্য্যে, তাঁদের ব্যবহারে জানিয়ে দেন যে, আমরা তাঁদের 'ভূত'-বচনেরও যোগ্য নই। কর্ম্মচারীদের আমাদের প্রতি এই যে অসম্মান, ঘৃণা, গভরমেণ্ট তা থেকে কি আমাদের রক্ষা করতে চেষ্টা করেন?"

জ্যোতির্ম্ময়ী বলিল—"অবশ্যই করেন, নইলে শাসন-নীতির অর্থ কি? গভরমেণ্ট ত আর আমাদের জন্যে এক আর ইংরাজের জন্যে অন্য আলাদা আইন করেন নি। দণ্ডনীতি ত ইংরাজ ভারতবাসী উভয়ের পক্ষে একই! এইখানেই ব্রিটিশ রাজ্যের উদারতা।"

"হ্যাঁ, বহির পাতাতে বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ ঠিক বিপরীত।"

"আপনি আবার ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে গভরমেণ্টকে এক করছেন। গভরমেণ্ট যে অত্যাচারীর পক্ষপাতী—এইরূপ মনে করাই যথার্থ বিদ্রোহিতা। আমি যদি বিচারক হতুম—আর দেখতুম, কোন ইংরাজের প্রতি কোন বাঙ্গালী অত্যাচার করছে—তা হ'লে তাকে একতিলও কম দণ্ড দিতুম না।—এ আমি খুব জানি। ন্যায়ের কাছে ত স্বদেশ বিদেশ নেই। আর এত বড় ভারতসাম্রাজ্য যাঁরা শাসন করছেন—এ রকম পক্ষপাতী অনীতি কি তাঁরা অবলম্বন করতে পারেন?"

পণ্ডিত বলিলেন—"তুমি এখনও অর্ব্বাচীন, পরে বুঝবে তা পারেন কি না এবং করেন কি না? আমরা যদি ইংরাজের সমাধিকার পেতুম—তা হ'লে ত আমাদের ক্ষুণ্ন হবার কোন কারণ থাকত না। দু'হাত তুলে আশীর্ব্বাদ করতে করতে পুত্রকন্যাকে রাজার হাতে সঁপে দিয়ে বৃদ্ধকালে নিশ্চিন্ত মনে বনগমন করতুম। ইলবার্টবিলের সময় কি হয়েছিল রাজাবাহাদুরকে জিজ্ঞাসা ক'রো। আর একজন ট্যাসফিরিঙ্গিও অস্ত্র-ধারণের অধিকারী, কিন্তু তোমার বাবারও লাইসেন্স দিয়ে তবে ঘরে অস্ত্র রাখতে হয়। তিনি ত কনগ্রেসের এক জন নেতা, কোন দুঃখে কনগ্রেসের সূচনা—তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেই জানবে। তুমি এইমাত্র বল্লে রাজা আমাদের মঙ্গল-চেষ্টার বিরোধী হ'তে পারেন না, কিন্তু কোনো গভরমেণ্ট কর্ম্মচারী দেশের লোকের কনগ্রেসে যোগ দিতে সাহস করেন না কেন?—না গভরমেণ্ট কনগ্রেসকে সুনজরে দেখেন না। আর রাজপুরুষের এই বৃথা সন্দেহ, ভুল বিশ্বাসই আমাদের উদ্যমহীনতার প্রকৃত কারণ।"

জ্যোতির্ম্ময়ী নিস্তব্ধভাবে সকল কথা শুনিল, এই বিষয়ের একটা দিক যেন সে আজ প্রথম দেখিতে পাইল। কিছু পরে বলিয়া উঠিল—"কোন মিথ্যা বা ভুল চিরদিন কখনো স্থায়ী হয় না। এমন এক সময় নিশ্চয় আসবে, যখন রাজা প্রজা উভয়েই আপনাদের ভুল বুঝতে পারবে। প্রজা বুঝবে আমাদের নিজেদের মঙ্গল-উদ্দেশ্য-সাধনের জন্যে রাজ-ভয়ের বাধা কাটিয়ে উঠতে হবে, আর রাজাও বুঝবেন, প্রজার মঙ্গলে রাজারই মঙ্গল—তাঁহারই শক্তি বৃদ্ধি, অতএব প্রজাশক্তিকে বাধা দেওয়ার পরিবর্ত্তে প্রশ্রয় দেওয়াই রাজ-কর্ত্তব্য।"

কুন্দবালা বলিল—"কোন ভুল কি সহজে ভাঙ্গে রাজকুমারি? ভুল ভাঙ্গতে অনেক সময় জীবন পর্য্যন্ত নাশ হয়।"

জ্যোতির্ম্ময়ীর নয়নে অনুরাগ-আলোক,—স্বরে উৎসাহ-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল, মূর্ত্তিমতী কল্যাণী যেন কহিল—"বেশ, প্রাণ দিয়েও যদি এ ভুল ভাঙ্গাতে হয়, তাতেও আনন্দ ছাড়া দুঃখ করবার কি আছে? আমি একজন সামান্য বাঙ্গালী মেয়ে, অন্যায়ের দমনে এত তেজ, এত বল অনুভব করছি আমি কোথা থেকে? আমাদের দেশের আকাশে বাতাসেই

কি সে তেজ ছড়ানো নেই? আমি নিশ্চয় বল্‌ছি, আমি যেমন আজ এখানে এ রকম ক'রে ভাবছি—তেমনি আরও অনেকেই ভাবছেন। প্রাণে প্রাণে আমাদের বৈদ্যুতিক সংবাদ চালিত হচ্চে। আমরা কৃতকার্য্য হবই হব। সময় এসেছে—সময় এসেছে,—অন্যায় চিরদিন জয়ী হয় না।"

দেবব্রত ভট্টাচার্য্যের নয়নে আনন্দমঠের দেবী-মূর্ত্তি সহসা বিভাসিত হইয়া উঠিল, তাঁহার কণ্ঠ হইতে বাল্মীকির প্রথম গীতি-ধ্বনির ন্যায় উচ্চারিত হইল—দেবী-মা, তুমি ধন্য!

বন্দেমাতরম্!

অষ্টম পরিচ্ছেদ

রাজা অতুলেশ্বর

অতুলেশ্বর যখন নিতান্ত শিশু, তখন তাঁহার পিতা রাজা ধর্ম্মেশ্বরের মৃত্যু হয়। তাঁহার অভিভাবক পিতৃব্য নিঃসন্তান রাজা কর্ম্মেশ্বর ভ্রাতুষ্পুত্রকে সন্তানের মতই স্নেহ করিতেন। কর্ম্মেশ্বর লোক মন্দ ছিলেন না—কিন্তু পান-দোষে তাঁহাকে নিস্তেজ ও অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলিয়াছিল।

প্রসাদপুরের রাজগণ চিরদিনই কলা-বিদ্যার অনুরাগী এবং উৎসাহদাতা। অতুলেশ্বরের পিতামহ-রচিত সঙ্গীতাবলী বৈষ্ণব কবিদিগের পদাবলীর ন্যায় পূর্ব্বাঞ্চলে সমাদরে গীত হইয়া থাকে। কর্ম্মেশ্বরের যদিও রচনা-ক্ষমতা নাই, কিন্তু গানবাদ্য লইয়াই প্রায় তাঁহার সময় কাটে। যাত্রাদি পর্ব্বের ত কথাই নাই—সময় সময় কলিকাতা হইতে বাইজীর দল—এবং থিয়েটারও আসে। তিনি শুনিয়াছিলেন—কলিকাতার কোন ধনিভবনে হীরা, বুলবুল নামে দুই সুবিখ্যাতা গায়িকার সহিত সঙ্গৎ করিতে গিয়া অদ্বিতীয় পাখোয়াজী গোলাম আব্বাসের এত পরিশ্রম হইয়াছিল যে, গান-শেষে হার্টফেল করিয়া তখনি তাঁহার মৃত্যু হয়। অদ্বিতীয় গোলাম আব্বাসের অভাবে তিনি যে বাইজী দুইজনকে রাজসভায় আহ্বান করিতে পারিলেন না—এই আপশোষে তাঁহারও হার্টফেল করিবার উপক্রম হইয়াছিল। ইহা ছাড়া তাহার মোসাহেব দল মাঝে মাঝে সখের যাত্রাও করিত এবং তাঁহার সভায় কবির লড়াইও চলিত। এই যুদ্ধে তিনি যাহাকে বাহবা প্রদান করিতেন—তাহার অবস্থা ফিরিয়া যাইত। নিম্নে একটি উদাহরণ প্রদত্ত হইল।

একটু ফিকা-রঙের খোস মেজাজে রাজা কহিলেন—"আজ অমাবস্যার রাত, চাঁদ উঠবে কি না বল ত হে?"

একজন তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গান ধরিল—

আমরা মোদের রাজারেই জানি;
সূর্য্য-চন্দ্রের না ধারি ধার যমকে না মানি।
রাজা মোদের ঢালেন সুধা—
তৃপ্ত করেন তৃষ্ণা-ক্ষুধা—
সর্ব্বপ্রাণে স্তুতিগানে—তাঁরেই বাখানি।

তাহার গান শেষ হইলে দ্বিতীয়জন গাহিল—

শ্রীবৃন্দাবনে—ও গো শ্রীবৃন্দাবনে—
ধরা দিল অমার শশী রাধিকার সনে।
যে দেখিল সেই মজিল—প্রাণে মনে।

তৃতীয়জন তখন তান দিয়া গান ধরিল—

প্রেমের বন্যা উথলে যখন ওঠে গো মনে—
আঁধারের বাঁধ আপনি যায় টুটে—
অমাবস্যায় ভরা চাঁদ ফোটে
আলোক-ফুলের ঝরণা লোটে—বিশ্ব-ভুবনে।

রাজা ইহাকেই সভা-কবির শিরোপা প্রদান করিলেন।

রীতিমত নেশা সুরু হইলে কিন্তু রাজা ভিন্ন লোক হইয়া পড়েন—তখন তাঁহাকে সামলান দায় হইয়া উঠে। সে সময় প্রায়ই তিনি পদব্রজে ভ্রমণে বহির্গত হন। তাঁহার দল বল সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতে থাকে। অগ্রগামী রাজার আশে-পাশে, পশ্চাতে থাকিয়া—মোসাহেবগণ কেহ ধরেন আলবোলা (নলটি কিন্তু রাজার মুখে) কাহারও হাতে মদের বোতল, কেহ লইয়াছেন গ্লাস, কাহারও গলায় মৃদঙ্গ ঝুলিতেছে—কেহ বা সেতারা তানপূরা বহিয়া চলিয়াছেন। এই অপরূপ দৃশ্য যে দেখে, তাহার হাস্য সম্বরণ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে।

অতুলেশ্বর কলিকাতায় থাকিয়া পড়াশুনা করিতেন। ছুটিতে যখন বাড়ী আসিতেন, তখন কর্ম্মেশ্বর খুব সাবধান হইয়া চলিতেন—এরূপ দৃশ্য তাঁহার নজরে পড়িত না।—একবার মাত্র অসময়ে বাড়ী আসিয়া খুল্লতাতের এই অবস্থা তিনি দেখিয়াছিলেন—কিন্তু দেখিয়া তাঁহার হাসি পায় নাই, হৃদয় লজ্জায় বেদনায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার সমবয়সী দূরসম্পর্কীয় এক জন আত্মীয়কে তখন হাসিতে দেখিয়া তিনি আত্মসম্বরণ করিতে পারেন নাই,

তাহাকে চপেটাঘাতপূর্ব্বক গৃহে গিয়া বালকের ন্যায় রোদন করিয়াছিলেন। মদ্যপানে মানুষ যে কিরূপ পশুর অধম হইয়া পড়ে, এই দৃষ্টান্তে তাহা তিনি শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তিনি মদ স্পর্শ করিতেন না।

কর্ম্মেশ্বর পারতপক্ষে ইংরাজদের সহিত মিশিতেন না—কিন্তু দেখা হইলে নত হইয়া সেলাম করিতে বা 'মন-যোগান' কথা কহিতে ত্রুটি করিতেন না। জমীদারের পক্ষে কার্য্য-উদ্ধারের ইহাই অব্যর্থ 'পলিসি' বলিয়া সেকালে জ্ঞান ছিল। কিন্তু কলেজের শিক্ষা-দীক্ষার ফলে অতুলেশ্বরের ভিন্নরূপ মেজাজ হইয়া উঠিল, কোন ম্যাজিষ্ট্রেট দেখা করিতে আসিলে বা তিনি কাহারও নিকট গমন করিলে কখনও সেলাম করিতেন না। কিন্তু যেখানে কর্ম্মেশ্বর সেলাম করেন—সেখানে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র কেবল সেকহ্যাণ্ড করিবার জন্য হাত বাড়াইয়া দিলে দেখায় নিতান্ত অদ্ভুত, সেই জন্য কর্ম্মেশ্বরের নিকটে কোন ইংরাজ আসিলে, তিনি সেখানে অনুপস্থিত থাকিতেন। তাহাতে কর্ম্মেশ্বর অসন্তুষ্ট হইতেন। এক দিন কিন্তু অতুলেশ্বর ধরা পড়িলেন। কলিকাতা হইতে ফিরিয়া বৈঠকখানায় পদার্পণ করিয়াই দেখিলেন—কর্ম্মেশ্বর দুই এক জন ইংরাজের সহিত বসিয়া গল্পগুজব করিতেছেন। কুমার আসিতেই তিনি পরস্পরের সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন। কিন্তু অতুল ত কই কাহাকেও সেলাম করিল না! হাস্যমুখে সকলকে হাত বাড়াইয়া দিল। কর্ম্মেশ্বর মনে মনে প্রমাদ গণিলেন,—এক দিন যে এ শিক্ষার ফলভোগ করিতে হইবে, তাহাতে তাঁহার মনে সন্দেহ রহিল না। অতুলেশ্বর যে-কয়দিন বাড়ী রহিলেন, পুনঃপুনঃ নিজের কাছে ডাকিয়া আনিয়া তাহাকে হিতোপদেশ দিতে লাগিলেন। সে-কয়দিন ভাবনায়-চিন্তায় মদের গ্লাস পর্য্যন্ত তাঁহার মুখে উঠিল না—সভা নিস্তব্ধভাব ধারণ করিল,—মোসাহেবগণ সুখে নিদ্রা দিয়া বাঁচিল। কিন্তু কর্ম্মেশ্বরের উপদেশের ফল যে নিতান্তই বিফলে পরিণত হইয়াছে,—অচিরাৎ রাজা এক দিন বুঝিতে পারিলেন। ইলবার্টবিলের সময় বালক অতুলেশ্বর প্রসাদপুরে এক প্রতিবাদসভা আহ্বান করিয়া স্বয়ং হইলেন তাহার প্রেসিডেণ্ট। ইহার পর ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আসিয়া কর্ম্মেশ্বরের সহিত কে জানে, কি কথাবার্ত্তা কহিয়া গেলেন, রাজ্যে ঘোষিত হইল—অতুলেশ্বর এখন নাবালক—তাঁহার কোন কার্য্যকলাপ রাজার অনুমোদিত নহে। কুমার অতুলেশ্বরের কোন কার্য্যে প্রজাগণ যেন যোগদান না করে। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে অতুলেশ্বর ব্যায়াম-সমিতি প্রভৃতি দেশহিতকর নানা সভা-সমিতি স্থাপন করিয়াছেন; রাজার আদেশে —অকালে সে সমস্তই নষ্ট হইয়া গেল। কুমার মর্ম্মপীড়িত হইয়া কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। সেখানে তিনি নানারূপ দেশহিতকর অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন —কিন্তু নিজের রাজ্যে তিনি নগণ্য পুরুষ হইয়া রহিলেন। কার্য্যতঃ কিছু করিতে না পারিলেও গানে কবিতায় তাঁহার দেশানুরাগ প্রকাশিত হইতে লাগিল।

কর্ম্মেশ্বরের মৃত্যু হইল—জ্যোতির্ম্ময়ী জন্মিবার দুই একমাস মাত্র পূর্ব্বে। অতুলেশ্বর যখন রাজা হইলেন, তখন তাঁহার বয়স চব্বিশের অধিক নহে। তাহার পর রাজার জীবনে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে এবং তাহার ফলে তাঁহার জীবনের গতি কোন্ দিকে ফিরিয়াছে, তাহা পাঠক অবগত আছেন।

* * *

প্রাসাদসংলগ্ন নবনির্ম্মিত গৃহে বসিয়া রাজা অতুলেশ্বর লেখাপড়া করেন। গৃহে জানালা-দরজা অনেকগুলি; দক্ষিণের জানালা হইতে শীতকালে যে নদী রজত-পাতের মত নয়নে প্রতিভাত হয়,—বর্ষাকালে ইহাই বিশাল আকার ধারণ করিয়া তেজস্বিনী, স্রোতস্বিনী মূর্ত্তিতে রাজবাটীর অনতিদূরে বহিয়া যায়। গৃহের সম্মুখেই মুক্তছাদ—সকালে সন্ধ্যায় রাজা এইখানে বসিয়া প্রকৃতির শোভা সন্দর্শন করেন—জ্যোতির্ম্ময়ী সময় পাইলেই পিতার কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। আসিবার সময় বাগান হইতে তাঁহার জন্য কতকগুলি ফুল তুলিয়া আনে। রাজা প্রভাতে অরুণরাগ-রঞ্জিত আকাশে নবোদিত সূর্য্যের শোভা দেখিয়া তন্ময়ভাবে স্বরচিত গানে ঈশ্বরবন্দনা করেন—বালিকা মুগ্ধভাবে তাহা শুনিয়া—তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তান ধরে। বৈকালিক বায়ু-সেবনের পরও প্রশান্ত রজনীতে পিতাপুত্রীতে এইখানে আসিয়া বসে। রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী হইলে রাজা কন্যাকে সেতার বাজাইতে বলেন; কখনও কখনও তাহার হাত হইতে সেতারাটা টানিয়া লইয়া নিজেই বাজাইতে থাকেন। জ্যোতির্ম্ময়ীর সেতার-শিক্ষা হইয়াছে তাহার পিতারই নিকটে। মাঝে মাঝে রাজা যখন কন্যার সংস্কৃত বিদ্যার পরীক্ষা গ্রহণ করেন, তখনই জ্যোতির্ম্ময়ী মনে মনে বিপদ গণে। বিদ্যাশিক্ষায় সে যে আশানুরূপ মনোযোগ দিতে পারিতেছে না, ইহা সে নিজে বেশ বোঝে। রাজা কিন্তু পরীক্ষায় অসন্তুষ্টির কোন কারণ পান

না। প্রথম প্রথম জ্যোতির্ম্ময়ী পণ্ডিতের কাছে যখন দেশ-পীড়নের কথা শুনিত, তখন পিতার নিকট সে কথা তুলিয়া তাহার সত্যমিথ্যা যাচাই করিয়া লইতে চাহিত। রাজা কিন্তু এ সকল কথায় তাহাকে প্রশ্রয় দিতেন না—প্রায়ই রাগ করিয়া বলিতেন, "এ সব খবর তোমাকে কে দেয়? খবরের কাগজ পড় বুঝি? আমি বারণ ক'রে দেব বাড়ীর ভিতরে যেন খবরের কাগজ না যায়। বেশ জেনো, খবরের কাগজের অনেক কথাই অতিরঞ্জিত, তোমার কোমল মনের উপর ওসব খবরে অনর্থক আঘাত দিচ্ছে।"

জ্যোতির্ম্ময়ীর মত বুদ্ধিমতী বালিকার নিকট পিতার মনের ভাব অপ্রচ্ছন্ন রহিল না—তিনি যে কেন এসব কথা কন্যাকে জানিতে দিতে চান না তাহার সে বেশ একরকম অর্থ করিয়া লইল। পণ্ডিত মহাশয় যে তাহার গেজেট, এ কথা কিন্তু একেবারেই পিতাকে জানাইল না, বুঝিল, তাহা হইলে তাঁহার কাজটি থাকিবে না। জ্যোতির্ম্ময়ী এ সম্বন্ধে ক্রমশঃ সাবধানে পিতার সহিত কথা কহিতে আরম্ভ করিল—এই এক বিষয়ে তাহার মনের ভাব পিতার নিকট অপ্রকাশিত রাখিল; ভাবিল, যদি বিধাতা দিন দেন, তখন পিতাকেও তাহার পক্ষ করিয়া লইবে।

রাজা আপাততঃ উল্লিখিত ঘরে টেবিলের নিকট চৌকিতে বসিয়াছিলেন। তাঁহার সম্মুখে কবিতার বই একখানা খোলা, কিন্তু সে দিকে তাঁহার দৃষ্টি নাই; গৃহদেওয়ালে টাঙ্গান রাজপরিবারের বহু তৈলচিত্রের মধ্যে একখানির দিকে তিনি তন্ময়-ভাবে চাহিয়াছিলেন। চিত্রখানি তাঁহার প্রমাতা-মহী বিচিত্রা দেবীর বাল্যকালের অশ্বারূঢ়া মূর্ত্তি। রাণীর পিতা সোমেশ্বর রায়ের অঙ্কিত ছোট পেনসিল-স্কেচ হইতে পরে ইহা একখানি বড় তৈলচিত্রে পরিণত হইয়াছে। এ চিত্রে বালিকা বিচিত্রা যোদ্ধ্‌পুরুষের সাজে সজ্জিত। তাঁহার মস্তকে শিরস্ত্রাণ, বক্ষে ঢাল, হস্তে বর্শা এবং কটিদেশে তরবারী বিলম্বিত। এই সাজে তাঁহাকে অতি সুন্দর দেখাইতেছিল। রাণী বিচিত্রা দেবীর সম্বন্ধে অনেক প্রবাদবাক্য রাজ্যমধ্যে প্রচলিত। তাহার মধ্যে একটি এই যে—এক সময় রাজ্যে বর্গী আক্রমণের বড় ভয় হইয়াছিল। তখন রাজ-জামাতা—রাণীর স্বামী দেশে ছিলেন না। রাজ-কোতোয়ালের সহিত পরামর্শ করিয়া দেওয়ান মহাশয় স্থির করিলেন যে, বালক পুত্র দুইটির সহিত রাণীকে অন্যত্র কোথাও পাঠাইয়া দিয়া পণদানে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহারা বর্গীকে বিদায় দিবেন। কিন্তু রাণী এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া স্বয়ং সৈন্যবাহিনীর নায়করূপে অশ্বারোহণ করিলেন। সৈন্যগণের মধ্যে তখন প্রবল উৎসাহ জাগিয়া উঠিল। স্বয়ং মহিষ-মর্দ্দিনী যুদ্ধে আগতা, এই বিবেচনা করিয়া ভীত বর্গিদল রাণীমূর্ত্তিকে দূর হইতে প্রণাম করিয়া পলায়ন-পর হইল।

এই অশ্বারূঢ়া বিচিত্রামূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রাজা আজ ভাবিতেছিলেন, এ হেন তেজস্বিনী রাণীর বংশধরগণ অধুনা কিরূপ হীনবল নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। এ কালে রাজভবনে প্রহরীর হস্তেই বন্দুক তলোয়ার শোভা পায়! শীকারের সময় ছাড়া সৈন্য-বেশে অস্ত্র ধরিবার অধিকার পর্য্যন্ত তাঁহাদের এখন নাই। ধীরে ধীরে তাঁহার একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। জ্যোতির্ম্ময়ীকে তিনি যাহাই বোঝান, নিজের মনে এ হীনতা তিনি খুবই অনু-ভব করেন। কিন্তু ইহা ভাবিয়া তাঁহার দীর্ঘ-নিশ্বাস পড়ে মাত্র—উষ্ণ শোণিত পূর্ব্বের ন্যায় এখন আর চঞ্চল হইয়া ওঠে না, মরিবার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মায় না।

এক সময় কন্যার ন্যায় অত্যাচার-পীড়ন হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা করিবার জন্য অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি যেরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠিতেন, সে তেজ সে উত্তে-জনা তাঁহার স্তিমিত হইয়া আসিয়াছিল।

অনেকক্ষণ ধরিয়া রাজা এই ছবিখানি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। যখনই তিনি এ ছবি দেখেন, তাঁহার মনে হয় এ যেন জ্যোতির্ম্ময়ীরই প্রতি-কৃতি। পুরুষ-বেশ ধারণ করিলে বুঝি বা তাহাকে ঠিক এই রকমই দেখাইবে। বড় ইচ্ছা করে এইরূপ সাজে তিনি কন্যার একখানি ছবি তুলিয়া লন। বিচিত্রা দেবীর সেই বসন-ভূষণ শিরস্ত্রাণ এখনও মাতার নিকট সযত্নে রক্ষিত আছে, তাহাও তিনি জানেন। তবে এ প্রস্তাবে মাতা-পুত্রে যে একটা তুমুল দ্বন্দ্ব বাধিয়া উঠিবে—সেই কল্পনাতেই তিনি এ ইচ্ছাটাকে মনে মনেই চাপিয়া রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন।

হঠাৎ তাঁহার চিন্তাতে বাধা পড়িল; দ্বারস্থ হরকরা গৃহপ্রবেশ করিয়া রাজাকে জানাইল যে, "গৃহ-কর্ম্মচারী জ্ঞানবাবু জরুরি সংবাদ দিতে আসিয়াছেন।"

রাজাদেশে জ্ঞানবাবু সমীপস্থ হইয়া কহিলেন—"ধর্ম্মাবতার, মহারাণীর অনন্তব্রতের ভেট ভট্টপল্লীতে

পৌঁছিয়া দিয়া পুরোহিত ষ্টীমারে ফিরিয়া আসিয়াছেন।"

"এ সংবাদ আমাকে দিতেছ কেন? মহারাণীকে গিয়া বল।"

"পুরোহিত জখম হইয়া আসিয়াছেন!"

"জখম! কেন? কে করিল?"

"ভুলক্রমে তিনি মেমসাহেবদের ক্যাবিনে ঢুকিয়া পড়িয়াছিলেন—তাই—"

"তাই—কি? মেমসাহেবরা মারিয়াছে নাকি?"

রাজা অধীর হইয়া ব্যঙ্গের ভাবে এই প্রশ্ন করিলেন। উত্তরে জ্ঞানবাবু বলিলেন, "সত্যই মেমসাহেবরা তাঁহাকে মারিয়াছেন—কুকুরের শিকল দিয়া মারিয়া ঠাকুরকে রক্তারক্তি করিয়া তুলিয়াছেন—তাঁহার অবস্থা বড় খারাপ।"

ক্রোধে রাজার শোণিত সর্ব্বাঙ্গে যেন টগবগ করিয়া ফুটিয়া উঠিল, তিনি আরক্তনয়নে বলিলেন—"কোথায় তিনি?"

"আমরা তাঁহাকে রাজবাড়ীর উঠানে আনিয়া ফেলিয়াছি।"

রাজা দ্রুতপদে অবতীর্ণ হইলেন। উঠানে আসিয়া দেখিলেন,—বৃদ্ধ পুরোহিতের আহত মস্তক কোলে রাখিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী তাঁহাকে বীজন করিতেছে—সম্মুখে বসিয়া চিকিৎসক আহত স্থানে পটী বাঁধিতেছেন—আর রাজবাড়ীর লোকেরা উঁহাদের ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং জ্যোতির্ম্ময়ীর আদেশে ফরমাস খাটিতেছে। রাজা আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইতেই জ্যোতির্ম্ময়ী নতমুখ উন্নত করিয়া তাঁহার দিকে চাহিল—তাহার যত্নরুদ্ধ অশ্রুজল আর বাঁধ মানিল না. আরক্ত-নয়ন হইতে ক্রুদ্ধ করুণার ধারা উথলিয়া উঠিয়া গণ্ড বাহিয়া পুরোহিতের মস্তক সিক্ত করিতে লাগিল। সেই তেজস্বিনী নারীমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রাজার পুনরায় মনে হইল, বিচিত্রা দেবীর আত্মাই নবশরীর ধারণ করিয়া বুঝি জ্যোতির্ম্ময়ীতে পুনরাবির্ভূত হইয়াছে!

এই সময় ভীড় ঠেলিয়া পণ্ডিতমহাশয় জ্যোতির্ম্ময়ীর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়া অস্ফুট মৃদু কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—

"বন্দে মাতরম্!"

নবম পরিচ্ছেদ

ম্যাজিষ্ট্রেট-দম্পতি

সন্ধ্যাকাল, আকাশ-প্রান্তে ভাসমান চতুর্থীর চন্দ্রকলা তটিনীর স্বচ্ছ সলিলদর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া মৃদু তরঙ্গে তরঙ্গে সাঁতার দিয়া চলিয়াছে। মন্দিরে কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়া থামিয়া গিয়াছে, তাহার নিবৃত্তি অবসরে রসুনচৌকি-ধ্বনিত সান্ধ্য রাগিণী আকাশে বাতাসে ম্লান-মধুর তান তুলিতেছিল; রাজা এ সময়ে প্রায়ই মুক্তছাদে আসিয়া বসেন, আজ ঘরের মধ্যে, টেবিলের নিকটে, দীপালোকের সম্মুখে আসন গ্রহণ করিয়া নিবিষ্টচিত্তে কি লিখিতেছিলেন;—এই সময় জ্যোতির্ম্ময়ী আসিয়া তাঁহার স্কন্ধে হাত দিয়া দাঁড়াইল। সদ্যোলিখিত ছত্রগুলির দিকে ঈষৎ ঝুঁকিয়া বলিল—"বাবা, কবিতা লিখছ?" রাজা হাতের কলমটা রৌপ্য-কলমদানীতে রাখিয়া বলিলেন—"বস্ রাণি,—তোর patient কেমন আছেন?"

জ্যোতির্ম্ময়ী একখানা ছোট চৌকী রাজার চৌকীর নিকট টানিয়া পিতার পাশ ঘেঁসিয়া বসিয়া কহিল, "তিনি ভালই আছেন। দু-এক দিনের মধ্যেই বেশ আরাম হয়ে উঠবেন,—কিন্তু—"

"ঐ কিন্তুটাকে যে ভুলতে চাই রাণি।"

"দু-একটা কথা আমার কিন্তু বলার ছিল বাবা। থাক, তবে পরেই বলব। কি লিখছ বাবা,—পড় না?"

"শুনবি?—বেশ, শোন্,—সে ভাল কথা।"

রাজা সুস্পষ্ট-কণ্ঠে আবেগভরে পড়িতে লাগিলেন;—

বল্ ভাই বল্ কেন পেয়েছিল বল?
দলিতে ছলিতে কি রে অভাগা দুর্ব্বল?
তোদের স্বার্থের মুখে বলিদান যেতে সুখে—
নিরীহ পরাণগুলি সৃজিত কি ধরাতল?
ধাতার প্রসাদ ধু তোমাদেরি তরে শুধু,
তাহাদের ভাগ্যে যত বজ্র আর হলাহল?
তা নয় রে মহাবলি, এ শুধু বিবেকে দলি
বাড়াইছ আপনার প্রতিশোধ কর্ম্মফল!
হরি নন সয়তান, কৃপাময় ন্যায়বান্,—
এ শক্তি পেয়েছ দান,—বারিতে অন্যায় ছল।
তাহে যদি কর হেলা, আসিবে তোমারো পালা
সুখ মোহে দুঃখতাপ বাড়াইছ এ কেবল?
সাধিতে শক্তির কাজ, বাসনা যদি হে আজ
বিনাশি আর্ত্তের দুঃখ আন পুণ্য সুমঙ্গল।

পড়া শেষ হইলে নীরব-জিজ্ঞাসায় রাজা কন্যার মুখের দিকে চাহিলেন—কিন্তু জ্যোতির্ম্ময়ী অন্য সময়ের ন্যায় আবেগভরে মনোভাব প্রকাশ করিল না, দুই ফোঁটা অশ্রু ধীরে ধীরে তাহার নয়নে সঞ্চিত হইয়া উঠিল, আনত দৃষ্টিতে তাহা নেত্রচ্যুত করিয়া কহিল —"এখন কিছু বলব না ভেবেছিলুম, কিন্তু না ব'লে থাকতে পারছিনে; এখনও কি কাজ করার সময় হয়নি বাবা? কবিতাতেই মনের আকুলতা প্রকাশ ক'রে ক্ষান্ত থাকবে?

যে বেদনায় তাঁহার কবিতার ছত্রগুলি রক্তরাঙা হইয়া উঠিয়াছিল, সেই বেদনার জ্বালা স্বরে প্রকাশিত করিয়া অতুলেশ্বর কহিলেন,-"একান্ত নিরুপায় রাণি, নিতান্ত শক্তিহীন! আমাদের এই নিষ্ফল ক্রন্দন এক দিন কারও মনে, কারও তেজে সফলতা লাভ করবে,—এইরূপ আশা করি;—কিন্তু—"

"বাবা,—তুমিও এ কথা বলছ?"

"সত্য কথা যে রাণি; সবল চিরদিনই দুর্ব্বলকে পীড়ন ক'রে আসছে,—করবেও। এ শক্তিকে রোধ করা যেরূপ শক্তির কাজ, সে সামর্থ্য আমার আছে কি রাণি?"

জ্যোতির্ম্ময়ী উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল,—"এ কথা আমি মানি না। দুর্ব্বল-পীড়ন যে সবলের স্বভাব, তা কখনই নয়। কারও কারও পক্ষে এ কথা ঠিক হ'তে পারে, কিন্তু সাধারণ নিয়ম বিপরীত বলেই মনে হয়। নইলে পৃথিবীতে ত দুর্ব্বল তিষ্ঠোতেই পারত না। আর ইংরাজ জাতের পক্ষে যে এ কথা খাটে না,তাঁদের শাসন-নীতিই তার স্পষ্ট প্রমাণ। আমরা যে আজ এ ভাবে ভাবতে শিখেছি, তাও ত ইংরাজী শিক্ষার ফল। আজ ব্রাহ্মণের সহিত ধোপা-নাপিতও এক বিদ্যালয়ে একাসনে ব'সে শিক্ষালাভ করছে, ব্রাহ্মণ-শূদ্রে সমভাবে বেদপাঠের অধিকারী; কায়স্থ রমেশ দত্ত আজ বেদ অনুবাদ ক'রে ব্রাহ্মণের মুখ হেঁট করেছেন, যদিও আমি মনে করি, মুখোজ্জ্বল করেছেন।"

"ইংরাজের গুণের পক্ষপাতী তোর চেয়ে আমি কম নই রে—তবে—"

—"তবে উদার ইংরাজজাতও সময় সময় দুর্ব্বল-পীড়ন করে কেন? এ প্রশ্ন যখনি আমার মনে উদয় হয়, তখন সঙ্গে সঙ্গে তার উত্তরটাও শুনতে পাই।"

রাজা কোন কথা কহিলেন না, নীরব কৌতূহল-দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; বালিকা বলিল—"অবশ্য কোন জাতের মধ্যে সকলেই মহৎপ্রাণ হয় না—কিন্তু সে কথা ছেড়ে দিয়ে, এই পীড়নের আসল অর্থ হচ্ছে,—যেখানে অবমাননাই শিরোভূষণরূপে ধৃত হয়, সেখানে দুর্ব্বল-রক্ষার পরিবর্ত্তে দুর্ব্বল-পীড়নেই সবল প্রকৃতি ক্রমশঃ অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।"

উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন; কিছু পরে কন্যা কহিল,—"দেখ বাবা, সে দিন আমার হরিরাম, কেশব পাঁড়ের পা ধুইয়ে সেই ময়লা জল এক চুমুকে পান ক'রে যেন ধন্য হয়ে গেল, আর পাঁড়েও তাকে এই পুণ্যদান ক'রে আপনার ব্রাহ্মণত্বের গৌরবে গর্ব্বস্ফীত হয়ে উঠলো। দেখে আমার যে কি দুঃখ হোল, বলতে পারিনে! কিছু দিন পরে ইংরাজ-হস্তে পীড়নের ফলও এই রকম দাঁড়াবে! আমি—আর দেখতে পারিনে বাবা!"

"কি করব বল?"

"কিচ্ছু ক'র না তুমি,—তুমি শুধু আমার সহায় হও। বাবা, রাজ্যের যত বিদ্যালয় আছে, আমি তাতে ব্যায়ামের ব্যবস্থা করতে চাই—অনুমতি দাও তুমি—"

রাজা কন্যার ভাষায় একটু বিস্মিত হইলেন; "আমি ব্যবস্থা করতে চাই?" বলিতে ত পারিত— "তুমি ব্যবস্থা কর।"

নিজের মনের অজ্ঞাতসারে—রাজা বিচিত্রা দেবীর ছবিখানির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া কন্যার মস্তকে সাদরচুম্বন করিয়া কহিলেন—"রাণীর আজ্ঞা কি অবহেলা করা যায়— হবে হবে।"

জ্যোতির্ম্ময়ীও উঠিয়া দাঁড়াইয়া তখন ছোট মেয়ের মত পিতাকে বাহু-বেষ্টনে বাঁধিয়া বলিল,—"না বাবা —'হবে' বল্লে আর চলবে না, ভবিষ্যৎকে এখন বর্ত্তমানে আগিয়ে নিতে হবে। আমি পণ্ডিত মহাশয়কে তোমার নাম ক'রে হুকুম দিয়েছি—আমাদের পিছনের বড় আমবাগানে কাল থেকে ছেলেরা যেন প্রত্যহ ব্যায়াম শিখতে আসে। আজ থেকে ছমাসের মধ্যে তুমি তাদের পরীক্ষা নিতে চাও- এইরূপ জানিয়ে দিয়েছি।"

রাজা বলিলেন—"রাণি, তুই যে রাজারও রাজা হলি?"

"না বাবা, আমি রাজার সেনাপতি। আমার ইচ্ছা করে, রাণী বিচিত্রার মত আমি দেশ রক্ষা করি।"

এবার উভয়ে নীরব প্রশংসায় বিচিত্রার তৈল-চিত্রের প্রতি দৃষ্টি স্থাপিত করিলেন।

রাজা মনে মনে জ্যোতির্ম্ময়ীর তেজস্বিতায় গর্ব্ব অনুভব করিলেন, কন্যার ইচ্ছা ও উদ্যমের প্রশংসা

করিলেন, তাহার প্রস্তাব সর্ব্বহৃদয়ে অনুমোদন করিলেন। তথাপি তাঁহাকে ভাবিতে হইল—এরূপ কার্য্যে গভর্ণমেণ্টের অসন্তোষের কোন কারণ ঘটিতে পারে কি না।

এ দেশের জমীদার ও রাজাদিগের অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয়, তাহাদের কার্য্যক্ষমতার পরিসর যে কত কম, তাহা তিনি বাল্যকালে প্রতি পদে ঠেকিয়া শিখিয়াছিলেন; বিদেশী রাজা যে ভারতবাসীর গূঢ় স্বভাবের এবং অন্তর্নিহিত ভাবের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে কত অক্ষম, তাহাও সঙ্গে সঙ্গে বুঝিয়াছিলেন। অধিকাংশ স্থলে শূন্যে আকাশকুসুম রচনা করিয়া তাঁহারা বিদ্রোহিতার ভয় পান। এক জন স্বল্পবুদ্ধি ভারতবাসীও তাহার হাস্যকারিতা বুঝিতে পারে; কিন্তু ইংরেজের ন্যায় বুদ্ধিমান্ জাতিও- (সম্ভবত নিজের দেশের তুলনায়) তাহাতে বিদ্রোহের আভাস প্রত্যক্ষ করিয়া এমন ভীত চঞ্চল হইয়া উঠেন যে, তখন রাজভক্তি ও রাজবিদ্বেষের মধ্যে রেখা টানাও তাঁহাদের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়ে- এবং ইহার অনিবার্য্য ফলভোগ করিতে হয় বেচারা প্রজাদের। এইরূপ অভিজ্ঞতার ফলে রাজার দেশহিতকর কার্য্যোদ্যম একেবারে বিনষ্ট হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি কংগ্রেসের এক জন উৎসাহী নেতা ছিলেন; কিন্তু ইদানীং তাহাতেও তাঁহার উৎসাহের অভাব হইয়া পড়িয়াছিল। অর্থদান করিতেন বটে, কিন্তু কার্য্যত ইহা হইতেও একরূপ দূরে দূরে থাকিতেন। সংবাদ-পত্রও তিনি ভাল করিয়া পড়িতেন না; বিশেষতঃ দেশের লোকের প্রতি পীড়ন-সংবাদ সমস্তই বাদ দিয়া যাইতেন। যাহার প্রতীকার তাঁহার দ্বারা সম্ভব নহে, এইরূপ বিষয়ে আপনাকে নিদ্রিত রাখিবেন—ইহাই তাঁহার সঙ্কল্প ছিল; কিন্তু পারিলেন কই? দৈব—কন্যারূপে তাঁহাকে ঠেলিয়া জাগাইয়া তুলিল।

তাঁহার মনের এইরূপ নিভৃত আলোড়ন-বৃত্তান্ত কন্যাকে তিনি কিছুই জানিতে দিলেন না; সমস্ত রাত্রি চিন্তার পর প্রাতঃকালে ম্যাজিষ্ট্রেট-ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এ সম্বন্ধে কোন কার্য্য করিবার অগ্রে তাঁহাদের পরামর্শ গ্রহণ করাই যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিলেন।

ম্যাজিষ্টেট-দম্পতি রাজার যে কিরূপ অন্তরঙ্গ বন্ধু, তাহা পাঠক অবগত আছেন। কিন্তু কেবল রাজপরিবার নহে, রাজ্যের সকল লোকই তাঁহাদের গুণে মুগ্ধ। ক্লাউডেন সাহেবের নামের সহিত ইহারা নানা রকম টাইটেল যোগ করিয়াছিল,—যেমন দয়াল, ভারতবন্ধু, ন্যায়াবতার ইত্যাদি। কিন্তু ইহার কোনটাতেই যখন তাহাদের মনের আশা মিটিল না—তখন ইঁহার নাম দিল তাহারা, হিন্দু ক্লাউডেন সাহেব। এ নাম দিবার কারণও ছিল,—কোন পর্ব্বোপলক্ষে ইঁহারাও জুতাহীন পদে শ্যামসুন্দরের মন্দির-দ্বারে দাঁড়াইয়া রাজার সহিত একত্রে আরতি দর্শন করিতেন। সকলে যখন প্রণাম করিত, ইঁহারাও হাটু গাড়িয়া নতমুখে বসিতেন। প্রথম প্রথম তাঁহাদের এই ব্যবহার লোকের চক্ষে এতই অস্বাভাবিক ও বিস্ময়জনক বোধ হইয়াছিল যে, তাহারা ইঁহাদের সারল্যে বিশ্বাস করিতে পারিত না। গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গোয়েন্দা নিয়োজিত হইয়া ইঁহারা রাজার কার্য্যকলাপ ও মনোভাব বন্ধুত্বাসূত্রে অবগত হইয়া পরে অনর্থ উৎপাদন করিবেন- এইরূপই অনেকে সন্দেহ করিত; কিন্তু সত্যের জয় পড়িয়াই আছে! কিছু দিন পরে সকলেই নিজ নিজ অমূলক সন্দেহে মনে মনে লজ্জাবোধ করিতে লাগিল।

রাজার মুখে পুরোহিতের প্রতি অত্যাচারের কাহিনী শুনিয়া ম্যাজিষ্টেট-দম্পতি সাতিশয় লজ্জিত এবং মর্ম্মপীড়িত হইলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

কোন স্বাধীন জাতিভুক্ত মহদন্তঃকরণ ব্যক্তির পক্ষে দুর্ব্বল-রক্ষা এমনি স্বভাবসিদ্ধ যে, ইহার অন্যথা দেখিলে আত্মপর-নির্ব্বিশেষে তাঁহার হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগে। অধিকন্তু এইরূপ নিষ্ঠুর ঘটনা কোন আত্মীয়কৃত হইলে এই আঘাত ব্যথার উপর লজ্জার জ্বালা তাঁহাকে দাহন করিতে থাকে। এই শ্রেণীর লোকের আহত ন্যায়বুদ্ধিতে প্রতীকার-চেষ্টা একবার জাগিয়া উঠিলে শত নির্য্যাতন অগ্রাহ্য করিয়া কিরূপ ভীমবলে তাহা কার্য্য করিতে সক্ষম—তাহার দৃষ্টান্ত, হিউম, রিপণ প্রভৃতি মহাপ্রাণগণ। এরূপ কার্য্যকরী ত্যাগক্ষমতা দুর্ব্বল পরাধীন জাতির পক্ষে সম্ভবপর নহে।

মিসেস্ ক্লাউডেন বলিলেন,—"এ রকম এক একটা নিষ্ঠুর ঘটনা দেখে মনে করবেন না যে, আমাদের জাতটাই এত ভীষণ! একটা কথা বলব রাজা, আমাদের স্বভাব-বিকৃতির জন্য আপনারাই কিন্তু অনেক পরিমাণে দায়ী।" রাজা হাসিলেন,—তাঁহার

জ্যোতির্ম্ময়ীর কথা মনে পড়িল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিলেন—

"আমি যখন সুলতানপুরে ছিলুম, তখন রাজ প্রাসাদে নিমন্ত্রণে গিয়ে একবার বড় লজ্জায় পড়তে হয়েছিল। ঘরের মধ্যে দুখানি রাজসিংহাসন রাখা হয়েছিল, আমাদের তাতে বসতে ব'লে রাজা রইলেন দাঁড়িয়ে; আমি নিজে না ব'সে তারি একখানাতে আমার স্ত্রীর পাশে রাজাকে জোর ক'রে বসিয়ে দিলুম।—"

ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নী হাসিয়া বলিলেন,—"বেচারার চেহারাখানা যদি তখন দেখতেন রাজা!—সে চেহারা আমি কখনও ভুলতে পারব না। আমার স্বামী থাক্‌বেন দাঁড়িয়ে আর তিনি কি না বসবেন রাজতক্তে! এমন বে-আদপী তাঁর কাছ থেকে ত প্রত্যাশা করা যায় না; তিনি কাতরভাবে তখনি উঠে পড়লেন।"

রাজা গম্ভীরভাবে বলিলে,—"মাপ করবেন মিসেস্ ক্লাউডেন, অতিথিকে দাঁড় করিয়ে নিজে বসাটা আমরা সত্যই বে-আদপী মনে করি।"

ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নী বলিলেন,—"আমরাও অতিথিকে দাড় করিয়ে নিজে বসিনে। তবে মর্য্যাদা দান-ছলে নিজের অমর্য্যাদা ক'রে অতিথিকে অস্বচ্ছন্দ ক'রে তুলিনে।"

রাজা বলিলেন, "চৌকীতে বসতে ত আমরা অভ্যস্ত নই মিসেস্ ক্লাউডেন। ও সব ফ্যাসান আধুনিক ইংরাজী অনুকরণ। আমরা গালচের উপরই ঘরে সদা-সর্ব্বদা বসি। আপনারা আমাদের রীতিনীতি জানেন না বলেই রাজার ব্যবহার অদ্ভুত ভেবেছেন।"

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন,—আপনাদের রীতি-নীতি সব বুঝিনে ব'লে অনেক সময় ভুল ধারণা জন্মায় সন্দেহ নেই; কিন্তু বড় বড় হরফে আঁকা সুস্পষ্ট স্তুতিবাদগুলোকেও যদি রীতিনীতির দোহাই দিয়ে ভুল বুঝতে পারতুম তা হ'লে খুসীই হতুম রাজা।"

রাজা এবার হাসিয়া বলিলেন,—"আপনারা হলেন আমাদের হর্ত্তা-কর্ত্তা, একটু আধটু স্তুতিবাদ করতে হয় বৈ কি। রাজা আছেন আমাদের বিদেশে লুকিয়ে, তাঁর ত দর্শন পাইনে; আপনাদেরই রাজাসনে বসিয়ে আমরা ভক্তি প্রকাশ করি। আপনারাও যেমন আমাদের মর্ম্মে প্রবেশ করতে পারেন না, আমরাও তেমনি ঠিক বুঝে উঠতে পারিনে, আমাদের কোন ব্যবহারে আপনারা সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হবেন; কাজেই কোন কোন সময় অদ্ভুত ব্যাপারও যে একটা না হয়ে পড়ে, তা নয়।"

ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নী বলিলেন—"বেশ, তা হ'লে অন্য দিকটাও দেখুন, ক্রমাগত দু'হাতে সেলাম পাওয়া অভ্যাস হয়ে গেল, এক দিন এক হাতের সেলামে কি মন ওঠে? তখন তার অন্যরূপ অর্থ করাই আমাদের পক্ষেও স্বাভাবিক নয় কি? প্রথম থেকে উভয় পক্ষ যদি যথাযথভাবে চলে ত আর কোনরূপ অনর্থের কারণ ঘটে না।"

রাজা বলিলেন,—"সাহস পাই কৈ মিসেস্ ক্লাউডেন? সকলেই ত আর ক্লাউডেন সাহেব বা তাঁর মেম নন; সেলাম না করলে যখন পিঠে লগুড়াঘাত পড়বে জানি, তখন পিঠ বাঁচিয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ।"

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব হাসিলেন; তাঁহার পত্নী বলিলেন—"আমি হ'লে কিন্তু এ বুদ্ধিকে জলাঞ্জলি দিয়ে এমন তেজে চলি—যাতে লগুড়াঘাত পিঠে পড়তে অবসর না পায়। জানেন ত রাজা, একটা তেজী বেড়াল কি কুকুর দেখলে সশস্ত্র মানুষও পিছিয়ে দাঁড়ায়।"

"কিন্তু সে শুধু মুহূর্ত্তের জন্য - তার পর অমার্জ্জনীয় অপরাধের শাস্তি হাতে-হাতেই তার লাভ হয়। আপনারা স্বাধীন জীব, আপনাদের মুখে তেজের কথা শোভা পায়—কিন্তু অকারণে যারা নিষ্পেষিত, রাঙা মেঘ দেখলেও তাদের মনে আগুনের আশঙ্কা জাগে।"

ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নী কহিলেন,—"কিন্তু এরূপ ভয়কে বিসর্জ্জন না দিলে ত কোন জাতির মঙ্গল নেই।"

রাজা একটু হাসিয়া বলিলেন—"আপনিই তা হ'লে দেখছি জ্যোতির্ম্ময়ীর গুরু। এইরূপ ভাবের কথা আজকাল তার মুখে ত ক্রমাগতই শুনি।"

জ্যোতির্ম্ময়ীর নামে ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নীর মুখ হর্ষোজ্জ্বল হইয়া উঠিল; আবেগভরে বলিলেন—"What a darling girl she is!'

রাজা কহিলেন,—"Daring too! এর মধ্যে সে এক কাণ্ড ক'রে বসেছে,—প্রসাদপুরের যত স্কুলে ব্যায়াম-শিক্ষা প্রবর্ত্তনের হুকুম দিয়েছে।" শুনিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট-দম্পতি একই সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন—"ভালই ত করেছে।"

"কিন্তু বহুপূর্ব্বে আমার শ্মশ্রুহীন অবস্থায় আমিও এই রকম কাজ একবার করতে গিয়েছিলুম, তাতে কমিশনার সাহেব তখন বাধা দেন।"

মেমসাহেব এই কথা শুনিয়া উত্তেজিত স্বরে

বলিলেন—"Nonsense!" সাহেব কিন্তু ধীরভাবেই বলিলেন,—"বোধ হয়, কমিশনার সাহেব কোনরূপ ভুল বুঝেছিলেন,—তিনি কি স্পষ্ট ক'রে নিষেধ করেছিলেন?"

"জানি না। তবে ততদূর ত সব সময় আবশ্যক হয় না। অনেক সময় ইঙ্গিতে মন বুঝে আমরা কাজ করতে বাধ্য হই। আমার কাকা মহাশয় অন্ততঃ কমিশনারের সেইরূপ অভিপ্রায় বুঝেছিলেন।"

"কিন্তু ইঙ্গিতে বুঝতে হ'লে অনেক সময়ই ভুল বোঝার সম্ভাবনা। আপনারাই তাঁকে তা হ'লে খুব সম্ভব ভুল বুঝে থাকবেন। নইলে ব্যায়ামচর্চ্চায় ত কোনই দোষ নেই। আমার বরঞ্চ মনে হয়, জর্ম্মণ দেশের মত সকল দেশেই লোকশিক্ষা আর ব্যায়াম-চর্চ্চা compulsory হওয়া উচিত। আমরা এদেশের মঙ্গল-সাধনে নিয়োজিত হয়েছি—এতে বাধা দিলে আমরা নরকগামী হব। আমি এই ব্যায়াম-সমিতির প্রেসিডেণ্ট হ'তে চাই।"

কৃতজ্ঞতায় রাজার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি কিরূপ বাক্যে আপনার মনের ভাব প্রকাশ করিবেন, বুঝিতে পারিলেন না। কিছু পরে ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন,—"যদি সকলেই আপনাদের মত সদাশয় লোক হতেন ত ইংরাজ-রাজ্য রামরাজ্য হয়ে উঠতো! কিন্তু একটু চোখ খুলে দেখলেই আপনি দেখতে পাবেন যে, আপনাদের মধ্যে এমন লোকও অনেকে আছেন, যাঁরা আমাদের পশুতুল্য ভেবে পশুতুল্যই নিস্তেজ ক'রে রাখতে চান।"

ম্যাজিষ্ট্রেট-দম্পতি অধোমুখ হইয়া রহিলেন; সহসা এ কথার কোন উত্তর দিতে পারিলেন না; রাজা আবার বলিলেন—"আমরা ত অকৃতজ্ঞ জাত নই;—আর সত্য সত্য অসভ্য জাতও নই। এ দেশের ছোটলোক আর আপনাদের দেশের ছোটলোকদের সঙ্গে তুলনা করলে এ কথাটা স্পষ্ট বুঝতে পারবেন। অথচ মানুষের কাছে মানুষ যেটুকু ভদ্রতা প্রত্যাশা করতে পারে, ততটুকু ভদ্র-ব্যবহার আমাদের দিতে তাঁরা সৌজন্যের অপব্যয় জ্ঞান করেন। রেলগাড়ীর এক কম্পার্টমেণ্টে কোন ভারতবাসী নিগারকে তাঁরা বরদাস্তই করতে পারেন না। পশুদের কষ্টনিবারণী আইন কার্য্যকরী, কিন্তু আমাদের দেশের লোক সবল বুটের আঘাতে যখন মরে, তখন অপরাধটা তার প্লীহারই উপর গিয়ে পড়ে, এবং এ সম্বন্ধে যে সন্দেহ প্রকাশ করে, কি উচ্চ-বাচ্য করে, রাজ-আইনে সেই দণ্ডনীয়। অতএব নীরবে সইতে পার ত মঙ্গল, নইলে উচ্ছন্ন যাও।"

মনের আবেগে রাজা আজ মুক্তকণ্ঠ। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব দুঃখিতভাবে বলিলেন,—"সকল জাতের মধ্যেই ভাল-মন্দ লোক আছে রাজা।"

"তা ঠিক। আসলে আমাদের দুঃখ সে জন্য নয়—গভর্ণমেণ্টের আচরণে যে বিমাতার ভাব প্রকাশ পায়—সেইটেই আমাদের প্রকৃত কষ্টের কারণ। দেখুন এক জন অধম ফিরিঙ্গীরও যে সব রাজনৈতিক অধিকার আছে, কি অপরাধে যে আমরা তাতেও বঞ্চিত, তা ত বুঝতে পারিনে। এই অবিচারেই আমরা মর্ম্মাহত।"

ক্লাউডেন সাহেব বলিলেন—"তবুও নিরাশ হবেন না, কেবল এ দেশে ব'লে নয়—আমাদের দেশেও গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে কোন অধিকার আদায় করতে অনেক কষ্ট পেতে হয়। এই দেখুন, এত চেষ্টাতেও আইরিসরা কি এখনো হোমরুল আদায় করতে পেরেছে? আর সাফরিজিষ্ট দল ত আমাদের দেশেরই মেয়ে, ভোট অধিকার পাবার জন্য তারা কি চেষ্টাই না করছে—তবু ত গভর্ণমেণ্ট এখনো অটল। সকলে যেমন কালের মুখ চেয়ে রয়েছে—আপনাদেরও সেইরূপ থাকতে হবে। যদি যোগ্যতা দেখাতে পারেন একদিন কৃতকার্য্য হবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু অসীম অধ্যবসায় সহকারে প্রস্তুত হ'তে থাকুন।"

এই সময়ে চাপরাশী আসিয়া একখানা কাগজ ম্যাজিষ্ট্রেটের হাতে দিল, তিনি রাজার সম্মতি লইয়া লেফাফা ছিঁড়িয়া পাঠে মনোনিবেশ করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

রাজা এই সুযোগে বিদায় গ্রহণের জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু মেমসাহেবের অনুরোধে আবার তাঁহাকে আসন গ্রহণ করিতে হইল। ম্যাজিষ্ট্রেটকে একাকী রাখিয়া উঁহারা দুই জনে বারান্দায় আসিয়া বসিলেন।

মেমসাহেব বলিলেন—"আমার একটা কথা অনেকবার মনে হয়েছে—বলব রাজা? কিছু মনে করবেন না। রাজনৈতিক অধিকারের জন্য আপনারা পরমুখপ্রত্যাশী; কিন্তু যে সব বিষয়ের উন্নতি আপনাদের নিজের হাতে তাতে ত আপনাদের সমবেত চেষ্টা দেখিনে? আপনাদের ঘরে স্ত্রীজাতি

যখন শক্তিময়ী হয়ে উঠবে, লোকশিক্ষায় সমাজ যখন প্রবল হয়ে উঠবে, তখনই কি আপনাদের জাতীয় যোগ্যতা প্রকৃত দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হবে না ?"

রাজা কহিলেন—"সকল দেশেই রাজনীতির চেয়ে সমাজনীতির সংস্কার কঠিন, তা ত বোঝেন ? বিশেষ আমাদের সমাজ বহুদিনের সভ্যতা এবং অভিজ্ঞতার ফল। বাইরের লোকে বুঝতে পারে না—কিন্তু আমাদের পক্ষে সমাজ-নীতির কঠিন বেড়া ভাঙ্গা একরূপ দুঃসাধ্য সাধন !"

"তাই ত দেখছি। আপনাদের সমাজের মুখপত্র ব্রাহ্মণসভা ত বিলাত-যাত্রার পর্য্যন্ত বিরোধী! হাস্যকর !"

"এটা হাস্যকর হ'লেও, সমাজনীতি ভাঙ্গতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে যে অনেক ভাল জিনিষও হারাতে হয়, এটা ঠিক।"

"উপায় নেই। কাঁটাগাছ বাছতে গেলে দু'চারটা ভাল গাছ ত নষ্ট হবেই।"

রাজা ধীরে ধীরে তাঁহার শ্মশ্রুহীন চিবুকে একবার হাত বুলাইয়া গম্ভীরভাবেই কহিলেন,—"আসল কথা রাজনৈতিক অধিকার অভাবে দেশের লোক যেরূপ সমভাবে ক্লেশ অনুভব করে যখন কোন সমাজনীতি সকলের পক্ষে সেইরূপ কষ্টকর হবে, তখনই তার সংস্কারে সমবেত চেষ্টা অনিবার্য্য হয়ে দাঁড়াবে। তা ছাড়া এ দেশে লোকশিক্ষা বা স্ত্রীশিক্ষা যে আদৌ নেই, সেটাও নিতান্ত ভুল। এ দেশে উচ্চনীচ শ্রেণীর মধ্যে অর্থের দিক ছাড়া অন্য বিষয়ে খুব যে একটা পার্থক্য আছে, তা নয়। বরঞ্চ ধর্ম্মের ভাব চাষাভূষা এবং স্ত্রীজাতির মনে যত প্রবল, উচ্চশ্রেণীর মধ্যে ততটা নেই। তার কারণ কথকতা, পুরাণপাঠ প্রভৃতি যে সব উপায়ে এ দেশে লোকশিক্ষা হয়—তা এখন সাধারণ গ্রাম্যলোক এবং স্ত্রীজাতির মধ্যেই আবদ্ধ। ইংরাজী শিক্ষানবীশ পুরুষদের মধ্যে তার চর্চ্চার অবসর কোথা !"

"সব দেশেই স্ত্রীলোকদের ধর্ম্মের ভাব বেশী—"

মেম সাহেবের কথা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই ক্লাউডেন সহেব দেখা দিয়া বলিয়া উঠিলেন—"অর্থাৎ গোঁড়ামী আর সঙ্কীর্ণতা! পাদ্রি ও পুরোহিতরা যে এ জন্য তোমাদের কাছে কৃতজ্ঞ—তা কেউ অস্বীকার করতে পারে না।"

সকলেই হাসিলেন ; তিনি রাজার পাশের এক খানা আরামচৌকী দখল করিয়া লইয়া একটা চুরুট রাজার হাতের কাছে ধরিলেন। রাজা ধন্যবাদ দানে তাহা লইতে অসম্মত হইলে নিজেই তাহা ধরাইয়া ধূমপান আরম্ভ করিলেন। রাজা ক্লাউডেনের কথার উত্তরে কহিলেন, "এ স্থলে আমিও আপনার সহিত একমত। আমাদের মেয়েরা দেশের পুরাতন আচারগুলি যত্নে রক্ষা করেন ব'লেই এখনো সেগুলি টিঁকে আছে।"

"আপনি সেটা কি ভাল মনে করেন না ?"

"মন্দ মনে করিনে, যদি পুরাতন মর্য্যাদা রক্ষার উদ্দেশ্যেই সে সব অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু আচারগুলি-কেই ধর্ম্ম ব'লে গ্রহণ করলে দোষ হয়ে পড়ে বৈ কি।"

"তবেই ত আপনি স্বীকার করছেন—যেরূপ শিক্ষায় একটা বিচার-ক্ষমতা জন্মে, আপনাদের মেয়েদের মধ্যে সেরূপ শিক্ষার প্রচার আবশ্যক।"

ক্লাউডেন সাহেব এতক্ষণ চুপ করিয়া ধূমপানে মগ্ন ছিলেন, চুরুটটা হাতে লইয়া তাহার ছাই ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে বলিলেন, "রাজার মুখ দিয়ে এ কথা স্বীকার করবার কি দরকার আছে ডিয়ার ?"

মিসেস্ ক্লাউডেন বলিলেন,—"আমি এ কথাটা ঠিক রাজাকে বলছিনে, দেশের লোকের উদ্দেশে বলাই আমার অভিপ্রায়।"

রাজা হাসিয়া বলিলেন—"দেশের লোকে এ কথার কি উত্তর দেবে, জানিনে, তবে—স্ত্রীজাতির মনের প্রসারতা না বাড়লে দেশের মঙ্গল নেই ; এটা আমি মনে করি বৈ কি। অতীতের তুলনায় আমাদের স্ত্রীজাতির শিক্ষা-দীক্ষা অবস্থা যে হীন হয়ে পড়েছে, চোখ চাইলেই ত তা দেখতে পাওয়া যায়। তবে স্ত্রীশিক্ষার দিকে লোকের লক্ষ্যও পড়েছে। দেখুন না, দেশের কত মেয়ে বি-এ, এম-এ পরীক্ষাও দিচ্ছেন,—আর অনেক সুশিক্ষিতা মহিলা দেশের জন্য কাজও করছেন।

মিসেস্ ক্লাউডেন উত্তরে কহিলেন,—"কিন্তু আপনাদের সমাজ প্রকৃতভাবে তাঁদের স্বদলভুক্ত জ্ঞান করে কি ? তাঁরা হলেন একটা show! দরকার-মত অন্যজাতির চোখের সামনে ধ'রে গর্ব্ব করার বস্তু। তাই নয় কি ? দেখুন, আমি কলকাতায় গিয়ে দু'চারটি ধনী ঘরের পরদানসীন মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করেছিলুম। তাদের স্বামীরা কন্‌গ্রেসের লোক ; সমাজসংস্কার সম্বন্ধে কাগজ-পত্রে প্রায়ই তাঁদের প্রবন্ধ প্রকাশিত দেখি। কিন্তু তাঁদের মেয়েদের ব্যবহার দেখে আমাকে ভারী নিরাশ হ'তে হয়েছিল।"

রাজা তাঁহার প্রতি উৎসুক দৃষ্টিপাত করিলেন,

মিসেস্ ক্লাউডেন আবার কহিলেন—"একটি বাড়ীতে আমি কিরূপ অপ্রস্তুত হয়েছিলুম, শুনবেন? তাঁরা থালা পুরে আমাকে নানারূপ মেঠাই খেতে দিয়েছিলেন। আমার কাছেই একটি ছোট মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল; কি কুবুদ্ধি হ'লো আমার, প্লেট্ থেকে তার হাতে একটি মেঠাই দিলুম। অমনি গিন্নী ঠাকরুণ চড়াস্বরে ব'লে উঠলেন, "করলেন কি মেমসাহেব্! ও সব ত ও খায় না!—ফেলে দে, ফেলে দে—রাক্ষসী, অসুখ করবে।" ততক্ষণ মেয়েটি দিব্য ক'রে মেঠাইটির অর্দ্ধেক গালে পুরে দিয়েছে। বৌরা ঘোমটার মধ্যে থেকে চোখ-টেপাটেপি করতে লাগলেন, একটা দাসী এসে বকতে বকতে তাকে টেনে নিয়ে গেল; বেচারী কাঁদতে কাঁদতে চ'লে গেল, আমার আর অপ্রস্তুতের সীমা রইল না।"

রাজা অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, "মানুষে মানুষকে স্পর্শ করলে আচারভ্রষ্ট ধর্ম্মভ্রষ্ট হ'তে হয়—আমাদের মনের এই যে সঙ্কীর্ণতা, এইটেই সর্ব্বাপেক্ষা আমার শোচনীয় ব'লে মনে হয়। তা ছাড়া মেয়ে-পুরুষের মধ্যে এতে যেরূপ বর্ণবিভাগ সৃষ্টি হয়েছে, সেটাও বড় অদ্ভুত! কিন্তু আমার বিশ্বাস, বেশী দিন এ রকম থাকবে না।"

মিসেস্ ক্লাউডেন কহিলেন, "শিক্ষায় কালে এ সব নিশ্চয়ই চ'লে যাবে। কিন্তু আমি অনেক পুরুষের সঙ্গে কথা ক'রে দেখেছি—এখনও স্ত্রী-শিক্ষার আবশ্যকতা তাঁরা ঠিক উপলব্ধি করেন না। অনেকে ভাবেন—শিক্ষায় নারীস্বভাব বিকৃত হয়ে যায়। তাদের প্রাণে আর তেমন স্নেহমমতা থাকে না। কেহ কেহ আমার মুখের উপরেই বলেছেন, ভারত-রমণীর মত আমরা ভালবাসতে পারিনে, ত্যাগ স্বীকার করতে জানিনে ইত্যাদি।"

ক্লাউডেন সাহেবের চুরুটটা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল; তিনি সেটা বাহিরে ছুড়িয়া ফেলিয়া বলিলেন, "ঠিকই ত বলেছে। আমি যদি আজ মরি—তুমি কাল নিশ্চয়ই আর একটা বিয়ে ক'রে বসবে।"

পত্নী উত্তর করিলেন, "আর তুমি! fair exchange, no robbery."

"আমি! By Jove! কক্ষনো না। আমি তোমার ছবির সামনে kneel down ক'রে থাকব, দেখে নিও।"

রাজা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "দেখুন Mrs. Clowden, আমাদের কোন মেয়ে আপনাদের এইরূপ রসিকতা শুনলে shoked হ'তো।"

সাহেব বলিলেন, "Good souls! তোমরা যদি তাদের মত হ'তে, তা হ'লে কোন স্বামী মরতে ভয় পেত না।"

মেমসাহেব বলিলেন—"ওর কথা শুনবেন না, রাজা, আমারাও good souls, আচ্ছা, ভাবুন দেখি আপনি, সমাজ আইনে ভারতরমণী নিগড়-বাঁধা; ইচ্ছাতে হউক, অনিচ্ছাতে হউক, নিষ্ঠুর পশু স্বামীরও পদসেবা করা ছাড়া তাদের উপায় নেই। কিন্তু আমরা স্বাধীনভাবে উপার্জ্জন করিতে পারি—আমাদের ডাইভোর্স আছে—একাধিকবার বিবাহ আমাদের মধ্যে দোষের নয়—এ সত্বেও আমাদের মেয়েরা স্বামীর জন্য কত সহ্য করে? আপনারা উপন্যাসে স্ত্রীলোকের ত্যাগস্বীকারের বিষয় যা পড়েন, তা একটুও বাড়ানো কথা নয়। মহারাণী (আপনার মা) শুনে আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন যে, সব ছেলে-মেয়েগুলিকে বিলাত পাঠিয়ে আমি একলা আছি। কিন্তু তাদের মঙ্গল ভেবেই আমরা সে কষ্ট সহ্য করি। স্ত্রীজাতির মধ্যে কষ্ট-স্বীকার, আত্ম-বিসর্জ্জন স্বাভাবিক, নইলে বিধাতার সৃষ্টি রক্ষা হয় না। শিক্ষাতে এ ভাব বাড়ে, কিন্তু কমে না।"

ক্লাউডেন সাহেব বলিলেন—"Bravo! কিন্তু কোন পাদ্রী থাকলে তোমাকে contradict করতো,—আদমের অধঃপতন হয়েছিল কেন, বল দেখি?"

ক্লাউডেন-পত্নী সহাস্যে কহিলেন, "এই দেখুন, রাজা—সেই আদিকাল থেকেই মেয়েরা সহ্য ক'রে আসছে। নিজের দোষে স্বর্গচ্যুত হলেন আদম—দোষ পড়ল বেচারী ইভের ঘাড়ে।"

রাজা বলিলেন—"আমি ইভ হ'লে আদমজাতীয় জীবের ত্রিসীমা মাড়াতুম না।"

মেমসাহেব বলিলেন, "তাতে ত আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হোত না। দোষের ভাগ নিজে নিয়ে তাদের গুণগুলি ফুটিয়ে উজ্জ্বল ক'রে তোলাই ত আমাদের জীবনের কাজ।"

ক্লাউডেন সাহেব বলিলেন—"বড় বেশী রকম আত্মপ্রশংসা করছ, challenge করতে হোল দেখছি।"

রাজা বলিলেন—"Mr. Clowden, আত্মপ্রশংসা এ নয়; মেয়েদের আদর্শ যা হওয়া উচিত, তাই ইনি বলছেন; অন্ততঃ আমরা যে রকমটা চাই।"

ক্লাউডেন সাহেব বলিলেন—"Very sorry for you রাজা। আমি কিন্তু কিছুতেই মেয়েদের স্কার্ট ধ'রে চলতে রাজি নই।"

মিসেস্ ক্লাউডেন এ কথায় আর কোন কথা না

কহিয়া রাজাকে বলিলেন—"দেখুন রাজা, এ দেশে এসে আমার সর্ব্বপ্রথমেই কি অভাব মনে জেগেছিল, জানেন ?"

"না, ঠিক বুঝতে পারছি নে।"

"নারীবর্জ্জিত নিমন্ত্রণ আর সভাসমিতি। কোন দেশমঙ্গল কার্য্যে মেয়েদের সহযোগিতা না থাকলে সে কাজ কি সফল হ'তে পারে ?" রাজা নীরবে তাঁহার সুগঠিত গুম্ফযুগের অগ্রভাগ-কুঞ্চনে মনোনিবেশ করিলেন। মেমসাহেব বলিলেন,—"শিক্ষাতে মেয়েদের হৃদয় সঙ্কুচিত হয় না, তাদের কার্য্য-পরিসর কেবল বাড়ে, তাদের স্নেহ-মমতা ঘরের সীমা ছাড়িয়ে অসীমের দিকে ছোটে। তোমার জ্যোতির্ম্ময়ী আমার এই কথারই দৃষ্টান্ত।"

ক্লাউডেন সাহেব বলিলেন,—"না dear, তোমার সঙ্গে আমি একমত হ'তে পারছিনে। জ্যোতির্ম্ময়ী কেবল শিক্ষার ফল নয়, অন্য অনেক মেয়েকে তুমি ঐ রকম ক'রে শিখাও, সে ত জ্যোতির্ম্ময়ী হ'তে পারবে না। genius ত সকলে নয় ?"

"কিন্তু শিক্ষাতে geniusও ফুটে ওঠে। রত্নেরও জহুরীর হাতে মার্জ্জিত হওয়া দরকার !"

ক্লাউডেন-পত্নীর এই কথায় রাজা বলিলেন,—"তা ঠিক ! এই ভারতভূমিই ত সীতা, সাবিত্রী, খনা, লীলাবতীর দেশ। শিক্ষার প্রভাবে এক দিন আবার ভারতবর্ষ নারী-গৌরবে গৌরবান্বিত হ'য়ে উঠবে, এ বিশ্বাস আমার মনে প্রবল।"

ক্লাউডেন সাহেব এই কথার উত্তরে সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন,—"আর কে বলতে পারে, নারীজাতির দ্বারাই ভারতের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধৃত হবে না ?"

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর রাজা হৃষ্টচিত্তে বাড়ী ফিরিবামাত্র কন্যা তাঁহার হাতে তাহার ব্যায়াম-সমিতির একখানি নিয়মাবলী আনিয়া দিল। তাহাতে নিম্নলিখিত নিয়মসূত্র লিখিত ছিল—

১। ভগবানের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইবে।

২। ভারত-সম্রাটের শুভ-কামনা করিবে।

৩। দেশমঙ্গলে নিজের মঙ্গল জ্ঞান করিবে।

৪। নারী-সম্মান রক্ষা করিবে ; এবং দুর্ব্বলের সহায় হইবে। স্বদেশি-বিদেশি নির্ব্বিচারে অত্যাচারিত ব্যক্তির পক্ষাবলম্বন করিবে।

৫। শরীর-মনের তেজোবৃদ্ধিকর ব্যায়াম-চর্চ্চা করিবে।

৬। অযথা বলপ্রকাশ বা দ্বন্দ্ব করিবে না ; কিন্তু অপমানিত হইলে নতমুখে তাহা সহ্য করিবে না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

মাল্যদান

আমাদের দেশেই বিশেষতঃ বুঝি সকল মঙ্গল-কার্য্যের মূলেই মতানৈক্য সগর্ব্বে মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়। জ্যোতির্ম্ময়ীর ব্যায়াম সমিতিও যে তাহার অনুগ্রহে বঞ্চিত হইবে, এরূপ আশা করা যায় না।

প্রথমতঃ—অতুলেশ্বরের মাসহারাভোগী প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধ বেকার আত্মীয় অনাত্মীয়দল যাঁহারা কর্ম্মেশ্বরের মোসাহেবী করিয়া দিনপাত করিতেন, তাঁহারা এই অবসরে পুরাতন স্মৃতি উদ্ঘাটিত করিয়া পুরাতন রাজার স্তুতিবাদচ্ছলে বর্ত্তমান রাজার মতিগতির নিন্দা আরম্ভ করিলেন। সুখের বিষয় বলিতে হইবে যে, এই এমন একটি আলোচনা আছে, যাহাতে আমাদের দেশেও মতের একতা দেখা যায়। সকলেই তাঁহারা একবাক্যে দুঃখ করিতে লাগিলেন যে, প্রসাদপুর আর পুরুষের রাজ্য নহে, তাঁহারা বাস করিতেছেন এখন নারীরাজ্যে! আহা, সে কি সুখের দিনই গিয়াছে! রাজার পশ্চাতে মদের বোতল লইয়া ছুটিতে ছুটিতে যখন রাঙ্গারসে আকণ্ঠ তাঁহাদের ভরিয়া উঠিত! আর এখন তামাকটা আফিংটাও কষ্টে জোটে! হায় রে!

যুবকেরা গন্ গন্ করিতে লাগিল, অন্য কারণে। রাজকুমারী পণ্ডিত-মহাশয়কে সমিতির সেক্রেটারী করিয়াছেন, তাঁহার কর্ত্তৃত্ব তাহাদের অসহ্য বোধ হইল। যদিও ইহারা সকলেই প্রায় প্রসাদপুরের স্কুলে পড়ে, অতএব পণ্ডিত-মহাশয়ের ছাত্র,—হইলে কি হয়, সংস্কৃত শেখান এক কথা, আর ব্যায়াম-বিস্তার অধ্যক্ষতা করা অন্য কথা। হাজার হোক, তাহারা রাজার আত্মীয়-কুটুম্ব, তাহাদের মধ্যে এ পদের উপযুক্ত লোক কি কেহ ছিল না! প্রকাশ্যে কিন্তু জ্যোতির্ম্ময়ীর নিকট এ আপত্তি তুলিতে তাহারা সাহসী হইল না। তবু ভাবে গতিকে এই অসন্তুষ্টি বুঝিয়া লইয়া তর্ক-যুক্তিতে এবং মিষ্টবাক্যে বালিকা তাহাদের বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে, পণ্ডিত মহাশয় সেক্রেটারী হইয়াছেন বলিয়া, ইহাতে তাহাদের অপমান নাই। চিরদিনই এ দেশে ব্রাহ্মণেই অস্ত্র-বিস্তারও গুরু হইয়া আসিয়াছেন—দেবগুরু হইয়া আসিয়াছেন। দেবগুরু বৃহস্পতি, অসুরগুরু শুক্র এবং কুরু-পাণ্ডব-গুরু দ্রোণাচার্য্য সকলেই ব্রাহ্মণ।

অতএব এ ক্ষেত্রে পণ্ডিত-মহাশয়ের নিরস্ত্র কর্ত্তৃত্বে তাহাদের ক্ষুণ্ণ হইবার কোনই কারণ বা নজীর নাই।

এইরূপ নানা বাধা-বিঘ্ন খণ্ডন করিয়া তেজস্বিনী নারী অবশেষে জয়লাভ করিল। অল্পদিনের মধ্যেই তাহার সমিতি বড় ছোট ছেলের দলে পূর্ণ হইয়া উঠিল। রাজবংশীয় এবং প্রজাবংশীয় যুবকদিগের সম্মিলনে রীতিমত ব্যায়াম কার্য্য চলিতে লাগিল। লাঠিখেলার সর্দ্দার হইল হরিরাম, তাহার সহকারী স্বরূপ আরও কয়েকজন পাইক নিযুক্ত হইল। তাহারা ছোট খাঁড়া চালাইতেও শিখাইত। ইহা ছাড়া কুস্তি, দৌড়ধাপ, হাডুডুডু, ব্যাটবল প্রভৃতি নানারূপ ব্যায়াম ক্রীড়া চলিত। প্রত্যেক খেলার জন্য সপ্তাহে দুই একদিন করিয়া সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। ইতিমধ্যে জ্যোতির্ম্ময়ী ছোট লাঠি লইয়া অন্তঃপুরেও একটি ক্লাশ খুলিয়া দিল। ফুটবল ক্রিকেট খেলা হইত একটু দূরের মাঠে, কিন্তু লাঠি খেলা ইত্যাদির জন্য ছেলেদের দল সপ্তাহে তিন দিন রাজবাটীর পশ্চাতের আম-বাগানে আসিয়া জমা হইত। রাজা খেলার সময় সব দিন উপস্থিত থাকিতে পারিতেন না, কিন্তু তিনি উপস্থিত থাকিলেও অধিনায়কতা করিত তাঁহার কন্যা। ছেলেরা সকলেই বয়সে তাহার বড়—বালিকার পিতার বয়সী দু'চারজন লোকও ইহার মধ্যে ছিলেন—যেমন পণ্ডিত মহাশয়! কিন্তু সকলকেই জ্যোতির্ম্ময়ী সেনাপতির ন্যায় পরিচালনা করিত। কোন ছেলের পদাঙ্গুলিটুকুও সীমানা রেখার বাহিরে পড়িয়া গেলে জ্যোতির্ম্ময়ীর ইঙ্গিতে সে তটস্থ হইয়া যথাস্থানে দাঁড়াইত। লাঠিখানা কেহ ঈষৎ অযথাভাবে ধরিলে জ্যোতির্ম্ময়ী নিজে লাঠি বাগাইয়া ধরিয়া তাহাকে শিক্ষা দিত। কোন্ দলে কোন্ ছেলে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী হইবে, তাহাও ঠিক করিয়া দিত জ্যোতির্ম্ময়ী। কেবল হার-জিতের মীমাংসা করিতেন স্বয়ং রাজা। জ্যোতির্ম্ময়ীর পরিচালনায় পণ্ডিত মহাশয়ের ন্যায় শ্মশ্রুধারী ব্যক্তিও যেন লাটিমের ন্যায় ঘুরিতেন। তাহার উৎসাহ কটাক্ষে শ্রান্ত খেলোয়াড়গণও নব বলে যেন বলীয়ান হইয়া উঠিত। সমিতির অভিধান হইতে শ্রান্তি ক্লান্তি কথা দুইটা একেবারেই যেন উঠিয়া গিয়াছিল। এইরূপে নামে মাত্র পণ্ডিত-মহাশয় রহিলেন কর্ত্তা, কিন্তু আসলে কর্ত্তৃত্ব করিত তাঁহার ছাত্রী। ইহাতে রাজ-আত্মীয়গণের মনের মেঘও ক্রমশঃ কাটিয়া গেল। রাজা এই ক্ষণজন্মা নারীর কার্য্যকলাপ মুগ্ধ নেত্রে দেখিয়া ভাবিতেন,—না জানি কোন্ মহাকার্য্য সাধন-উদ্দেশ্যে ইহার জন্ম?—অথবা এই অসাধারণ রমণীর জীবনের পরিণতি অবশেষে সাধারণ ভাবেই সম্পন্ন হইবে? মনোদেবতার নিকট হইতে রাজা এ প্রশ্নের কোন উত্তর পাইতেন না।

বাধার আর শেষ নাই। ব্যায়াম-পরীক্ষার দিন সন্নিকট, রাজা সহসা ঘোড়া হইতে পড়িয়া জখম হইলেন। তিনি অপরাহ্ণে অশ্বারোহণে যাইতেছিলেন জীবনপুরের সীমানা পরিদর্শনে, ইহার প্রান্তে তাহার এক সরিকের জমীদারী। সরিক অপর কেহ নহেন, বিজনকুমারের পিতা। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষ শঙ্কর রায় বিচিত্রাদেবীর দূরসম্পর্কীয় খুল্লতাত ছিলেন। রাজা কন্যাকে রাজ্যাধিকার প্রদান করিয়া তাঁহার ভ্রাতৃবংশকে বিষাদপুর জমীদারী দিয়া যান। কিন্তু এই দানে সন্তুষ্ট বা কৃতজ্ঞ হওয়া দূরে থাকুক, শঙ্কর রায়ের সন্তানসন্ততিগণ বংশপরম্পরায় চিরদিনই বিচিত্রা দেবীর বংশের প্রতি একটা বিদ্বেষ পোষণ করিয়া আসিতেছেন। কন্যাকে আবার কোন্ রাজা বিষয়বিভব প্রদান করে; রাণীর নামে রাজসিংহাসনে বসায়? প্রধান বংশের কাহাকেও তিনি পোষ্যপুত্র লইতে পারিতেন না কি? তাহা না করিয়া ন্যায়তঃ প্রসাদপুর-বংশকেই তিনি ত ফাঁকি দিলেন।

যাঁহার বিষয় ছিল, তিনি যে ইচ্ছা করিলে এক কাণাকড়িও তাহাদের নাও দিতে পারিতেন, এ কথা মনে করিয়া কেহ এ বংশের প্রতি কখনও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে নাই। বরঞ্চ অবকাশ পাইলেই প্রসাদপুরের রাজাকে তাহারা ক্লেশ দিয়াই আনন্দ অনুভব করে। উভয়পক্ষীয় প্রজার মধ্যে দাঙ্গাহাঙ্গামা ত এজন্য প্রায় লাগিয়াই আছে। অথচ প্রকাশ্যে ইঁহাদের মধ্যে ভদ্রতাসৌজন্যের ত্রুটি নাই। কোন ক্রিয়াকর্ম্মে উভয়দলেই নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ পাইয়া থাকেন এবং দেখা হইলেই উভয় পক্ষ—বিশেষতঃ বিষাদপুর-পক্ষ মিষ্ট সম্ভাষণে আত্মীয়তার উৎস ছুটাইয়া দেন।

আপাততঃ বিজনকুমারের পিতা সুজন রায় বিষাদপুরে আসিয়াছিলেন—অতুলেশ্বরের প্রজাগণ তাঁহার আগমনে অতিরিক্ত উৎপাত-সম্ভাবনায় উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। এ সম্বন্ধে সুজন রায়ের মস্তিষ্ক এত উর্ব্বর যে, তাঁহার কার্য্যপ্রণালী আগে হইতে বুঝিয়া সাবধানতা অবলম্বন করাও সহজ নহে। যাহা হউক, রাজা উভয় সীমানার মধ্যে লোকজন যথেষ্ট রাখিয়া দিয়াছিলেন এবং প্রায়ই প্রতিদিন নিজে একবার এদিকে আসিয়া খোঁজ-খবর লইয়া যাইতেন।—

আজ পরিদর্শনের পর গৃহে ফিরিতে প্রায় সন্ধ্যা

হইয়া আসিল,—জীবনপুরের পুল পার হইয়া বন্ধ রাস্তায় পড়িবামাত্র ঘোড়া থমকিয়া দাঁড়াইল। তেজস্বী আরব প্রভুর একান্ত বাধ্য, কিন্তু আজ রাজার ইঙ্গিতে সে চলিল না, কান খাড়া করিয়া দাঁড়াইল। রাজা এদিক ওদিক চাহিয়া কিছুই দেখিতে পাইলেন না, রাত্রি হইয়া পড়িলে বিপদ ঘটিতে পারে তিনি ঘোড়াকে কশাঘাত করিলেন—অগত্যা ঘোড়া ছুটিল, কিন্তু দশপদ জমা অগ্রসর হইতে না হইতে হঠাৎ গাছ হইতে একটা বিকটাকার জন্তু রাজার মাথার উপরে লাফাইয়া পড়িল—এই অসতর্কিত অবস্থায় ঘোড়া ও অশ্বারোহী দু'জনেই পড়িয়া গেলেন।

জন্তুটাও সঙ্গে সঙ্গে নীচে পড়িয়া স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইল রাজাকে আক্রমণ করিবে বা ঘোড়াকে সে যেন ভাবিবার জন্য মুহূর্ত্তকাল সময় গ্রহণ করিল। এই অবসরে ভূপতিত অবস্থাতেই বক্ষের পিস্তল ডান হস্তে বাহির করিয়া লইয়া রাজা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িলেন। কুঁইকুঁই শব্দে কাতরোক্তি করিয়া জন্তুটা শুইয়া পড়িল। রাজা তখন দেখিলেন, সে একটা বনমানুষ। সেই সময় রাজার পশ্চাৎবর্ত্তী ঘোড়সওয়ার দুই জন রঙ্গস্থলে আসিয়া পড়িয়া মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা চালাইতে বিলম্ব করিল না।

রাজা পড়িয়া জানুদেশে বিশেষ আঘাত পাইয়াছিলেন। সওয়ারদের সাহায্যে কষ্টে-শ্রেষ্টে পুনরায় ঘোড়ার উপর বসিয়াই কোনরূপে বাড়ী আসিয়া পড়িলেন,—তাঁহার মৃত শীকারও তাঁহার সঙ্গে আনীত হইল।

প্রসাদপুরের টেলিগ্রাম আফিস ৯টার পর বন্ধ হইয়া যায়, সুতরাং সে রাত্রে আর কলিকাতায় তার পৌঁছিল না। পরদিন সংবাদ পাইয়া শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য যথাসময়ে ডাক্তারাদি সহ যে প্রসাদপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাহা পাঠক ইতিপূর্ব্বেই অবগত আছেন।

রাজবাড়ীর সকলেই বুঝিল—এই নূতন রকম উৎপাৎ সুজন রায়েরই সৃষ্টি। তাহার পিতা মাতা কেন যে পুত্রের দুর্জ্জন নাম না দিয়া অনর্থক এই সাধু নামটির পর্য্যন্ত অবমাননা করিয়াছেন, এই পুরাতন আক্ষেপোক্তি আবার অনেকেরই মুখে নূতন সুরে ধ্বনিত হইতে লাগিল। কিন্তু রাজবাড়ীর মনের কথা বাহিরে প্রকাশ হইতে না হইতে সুজন রায় নিজেই রাজাকে নিরতিশয় দুঃখ-প্রকাশপূর্ব্বক লিখিলেন যে, "তাঁহার পলাতক পোষ্য নরবানর কর্ত্তৃক রাজা আহত হইয়াছেন শুনিয়া তাঁহার দুঃখের শেষ নাই। বহু চেষ্টাতেও তাঁহার লোক জন এ কয় দিন উহাকে ধরিতে পারে নাই, রাজা উহাকে মারিয়া ভালই করিয়াছেন।" পত্রে এইরূপ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াই তিনি ক্ষান্ত রহিলেন না, এক দিন রাজাকে দেখিতেও আসিলেন। তখন জ্যোতির্ম্ময়ী পিতার নিকটে ছিল, তাহার মহিমময়ী সৌন্দর্য্য তাঁহাকে অভিভূত করিয়া তুলিল। জীবনে এই প্রথমবার মনে একটা অনুতাপও জাগিল—যে ইহাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ, অত্যাচার তাঁহার কর্ত্তব্য হয় নাই। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উর্ব্বর মস্তিষ্কে সংকল্প জাগিল যে, এই কন্যার সহিত বিজনকুমারকে বিবাহ-সূত্রে গাঁথিয়া উভয় রায়বংশকে এক করিবেন। ইহাতে রাজকন্যা এবং রাজত্বের অধিকারী হইবেন তাঁহারা—এবং পরস্পরের মনোমালিন্যও চিরদিনের মত বিলুপ্ত হইবে।

এ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টায় তিনি বিলম্ব করিলেন না, রাজাকে দেখিবার পর মহারাণীর চরণধূলি গ্রহণ-বাসনায় অন্তঃপুরে গমন করিলেন এবং রীতিমত ভাবে এই প্রস্তাব উত্থাপিত করিলেন। মহারাণী ইহাতে মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেন, মেয়ের ত বিবাহ দিতেই হইবে, এমন সুবিধামত ঘর বর আর মিলিবে কোথা। তবে নিজের ছেলের উপর তাঁর বিশ্বাস নাই,—রাজা যে এ প্রস্তাবটা কি ভাবে গ্রহণ করিবেন—তাহা ত বলা যায় না!

মহারাণী তাই আহ্লাদ প্রকাশের মধ্যেও একটু কুণ্ঠিত ভাবে বলিলেন,—"আমার ত বাবা খুবই ইচ্ছা দু'হাত বাঁধা পড়ে, দুই পরিবার এক হয়ে যায়। কিন্তু আজ কাল সেদিন নেই তাও ত দেখছ বাবা! মেয়েকে যে রকম স্বাধীন ক'রে তুলেছে বাপ, কোন দিন সে কারো গলায় নিজে মালা তুলে না দিলে বাঁচি।

সুজন রায় হাসিয়া বলিলেন,—"তা স্বয়ম্বর সভায় আমার ছেলে যদি বসে, তার গলাতেই মালা উঠবে কাকীমা; সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।"

মহারাণীও হাসিলেন, বলিলেন, "তা বেশ। বিজনকুমার কি এখানে এসেছে? তাকে তবে পাঠিয়ে-টাটিয়ে দিও। মেয়ে-ছেলে দুজনের পরিচয় আগে হোক্। আজকাল ত আমাদের ইচ্ছাতেই শুধু কাজ হবে না।"

রায়মহাশয় বলিলেন,—"বিজন কলকাতাতেই আছে। আমি যত শীঘ্র পারি বাড়ী গিয়ে তাকেই জমীদারী দেখতে এখানে পাঠাব।"

মহারাণী রাজার কাছে, সুযোগমত এক দিন এ কথা পাড়িলেন,—রাজা কিন্তু এ প্রস্তাব একেবারেই অগ্রাহ্য করিয়া বসিলেন,—বলিলেন, "বাপকো বেটা ত? অমন কুচক্রী বাপের ছেলের সঙ্গে সম্বন্ধ ক'রে কখনই আমি বিয়ে দেব না; তবে মেয়ে যদি কোন দিন আপনা থেকে ওকে বিয়ে করতে যায় ত স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু তারও কোনই সম্ভাবনা নেই।"

মহারাণী মনে মনে ভারী রাগিয়া গেলেন,—রাজার যে কি রকম মতিগতি হইয়াছে,—ভাল কথা যা বলা যায় তাই মন্দ হইয়া ওঠে! তবুও হাল ছাড়িলেন না—ভাবিলেন, "বেশ, তবে তাই হবে,—মেয়ে নিজেই যাতে পছন্দ ক'রে বিয়ে করতে চায়—সেই চেষ্টাই দেখা যাবে।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ঘোড়া হইতে পড়িয়া রাজার যেরূপ আঘাত লাগিয়াছিল; আসলে সেরূপ কোন ক্ষতি হয় নাই। জানুর অস্থি সরিয়া পড়িলেও ভাঙ্গিয়া যায় নাই। সেই জন্য যথাশীঘ্র তিনি আরোগ্য লাভ করিলেন। ডাক্তার তাঁহাকে নিরাপদ দেখিয়া দু'এক দিনের মধ্যেই চলিয়া গেলেন। কাজকর্ম্ম ফেলিয়া শ্যামাচরণও অধিক দিন থাকিতে পারিলেন না। কলিকাতার দলের মধ্যে শরৎকুমার একাকী মাত্র রাজ-চিকিৎসকরূপে তাঁহার সেবার জন্য এখানে রহিয়া গেলেন।

রাজা ঘোড়া হইতে পড়িয়া গিয়া পর্য্যন্ত জ্যোতির্ম্ময়ী পূর্ব্বের ন্যায় নিয়মিতরূপে ছেলেদের ব্যায়াম খেলার সময় উপস্থিত থাকিতে পারে না। ছেলেরা আপনারা খেলে, ঝগড়া করে, সর্দ্দারদের উপর সর্দ্দারি করিয়া শিক্ষার বিশৃঙ্খলা আনয়ন করে। পণ্ডিত মহাশয়ের সাধ্য কি তাহাদের রাশ টানিয়া সোজা রাখেন! অথচ শরৎকুমার যখন মাঝে মাঝে তাহাদের নিকট আসিয়া দাঁড়ান—তাঁহাকে সর্দ্দাররূপে মানিতে তাহারা অপমান বোধ করে না। কেন না, প্রতিপদেই তাঁহার নায়ক-যোগ্য ভাব তাহারা অনুভব করিয়া স্বতঃই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাকৃষ্ট হইয়া উঠে।

জ্যোতির্ম্ময়ী বিকাল বেলা পিতার নিকট থাকিয়া প্রায়ই শরৎকুমারকে এ-সময়টা খেলিবার ছুটি দেন। শরৎ কোন দিন বা ফুটবল কোন দিন বা ক্রিকেট খেলায় যোগদান করেন,—আর কোন দিন বা লাঠি খেলার স্থলে উপস্থিত থাকিয়া কাহারও ভুলচুক দেখিলে সংশোধন করিয়া দেন। শরৎকুমার ইহাদের মধ্যে সম্প্রতি দুইটি অভিনব খেলার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

গৎকা, এবং ইংরাজী প্রথায় দস্তানা ধরণে ঘুসাঘুসি খেলা।

এই স্থানে গৎকা খেলার একটু ব্যাখ্যা করিলে যাঁহারা এ খেলা দেখেন নাই, তাঁহাদের বুঝিতে সুবিধা হইবে।

গৎকা চামড়া মোড়া একরূপ ছোট লাঠি, ইহা থাকে খেলকের ডান হাতে, আর বাম হাতে থাকে ইস্ক্রুপ দ্বারা আঁটা দুইটা ছোট শৃঙ্গ দ্বারা প্রস্তুত একটা লম্বা হরিণ-শৃঙ্গ। ইহা ঢাল স্বরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রয়োজনস্থলে ইহা দ্বারা বিপক্ষের প্রহার হইতে সাধারণতঃ আত্মরক্ষা করা হয় এবং সুবিধা মত বিপক্ষকে ইহা দ্বারা খোঁচা দেওয়াও চলে। এই খেলায় ডান পা সম্মুখে রাখিয়া সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া অৰ্দ্ধভঙ্গ ঠাটে দাঁড়াইতে হয়।

রাজা বেশ ভাল হইয়া উঠিলেন। জন্মাষ্টমীর উৎসব-দিনে বালিকা পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ করিবে, সেই দিন তাহার ব্যায়াম-সমিতির পরীক্ষা-উৎসব। কিছু দিন হইতে উদ্যোগ-আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে। ভাদ্রমাস, কি জানি যদি বৃষ্টি আসিয়া পড়ে, মাঠের স্থানে স্থানে ছোট তাম্বু পড়িল। ফুটবল প্রভৃতি দৌড়ধাপ খেলার মুক্তমাঠ এক পাশে রাখিয়া অন্য পাশে একটা বড় চালা বাঁধা হইল, চালার মধ্যে প্রেসিডেন্টের মঞ্চের চারিদিকে দর্শকদিগের সুরনির্ম্মিত আসন এবং মধ্যস্থলে ঘুষাঘুষি ও লাঠি খেলা প্রভৃতির সুনির্ম্মিত স্থান।

শরৎকুমার কলিকাতার অভিজ্ঞ লোক; তাঁহার উপরেই প্রধানতঃ এই আয়োজনের নেতৃত্বভার পড়িয়াছে তিনিও প্রসন্নচিত্তে এ ভার গ্রহণ করিয়াছেন! রাজা কন্যার সহিত মাঝে মাঝে এখানে তত্ত্বাবধান করিতে আসেন; শরতের কার্য্যোদ্যম, ক্ষিপ্রকারিতা এবং দূরদর্শিতা দেখিয়া পিতা কন্যা উভয়েই মুগ্ধ হইয়া যান। শরৎ যেন চলিয়া কাজ করিতে জানে না, সে কাজ করে ছুটিয়া। অধিকন্তু রাজা এ সম্বন্ধে এমন কোন উপদেশও ইঙ্গিত করিতে পারেন না—যাহা ইতিপূর্ব্বে শরৎ ভাবিয়া ঠিক করিয়া না লইয়াছে।

ছেলের দলের আনন্দ-উৎসাহের সীমা নাই। দুর্গা-পূজার প্রতিমা-গঠনের সময় যেরূপ আনন্দোৎসাহে

বালকেরা মূর্ত্তি-গঠন নিরীক্ষণ করে- সেইরূপ আনন্দে তাহারা মত্ত। প্রভেদের মধ্যে এ ক্ষেত্রে কেবলমাত্র তাহারা দর্শক নহে, সকলেই এক এক জন গঠন-তৎপর পটুয়া। পণ্ডিত মহাশয়ের হাতে-কলমে কিছুই বড় একটা করিতে হয় না। বিনা শ্রান্তিতেও হাঁপাইয়া উঠিয়া তিনি কেবল মাঝে মাঝে বন্দে মাতরং বলিয়া ডাক ছাড়েন,—ছেলেরাও কাজ করিতে করিতে পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত সমস্বরে বন্দে মাতরং শব্দে গগন ফাটাইয়া তোলে। ছেলের দল এই এক বিষয়ে নির্ব্বিরোধে তাঁহাকে মানিয়া চলে।

এইরূপ আনন্দমত্ততার মধ্যে যথাসময়ে উৎসব-আয়োজন সম্পন্ন হইল। মাঠ, চালা, তাম্বু, রঙ্গিন বস্ত্রে, নিশানে, ফলে ফুলে সজ্জিত হইয়া উঠিল।

প্রেসিডেণ্টের নামে প্রসাদপুরের সকল ইংরাজই নিমন্ত্রিত হইলেন। রাজার নামে ধনী দরিদ্র সকল প্রজাই আহূত হইল। আশে-পাশের জমীদার এবং কর্ম্মচারিগণও নিমন্ত্রণ-পত্র পাইলেন। যাঁহারা পত্র পান নাই—তাঁহারাও ভিক্ষা করিয়া নিমন্ত্রণ লইতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, বিজনকুমার কিছু পূর্ব্ব হইতেই প্রসাদপুরে আসিয়াছেন এবং তাঁহারও নিমন্ত্রণ হইয়াছে।

আজ জ্যোতির্ম্ময়ীর মহানন্দের দিন। কিন্তু সে আনন্দে তাহার অধীরতা প্রকাশ পায় নাই। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সস্ত্রীক গাড়ী হইতে নামিবামাত্র ছেলেরা বন্দে মাতরং ধ্বনিতে তাঁহাদের সমাদৃত করিয়া মঞ্চে আনিয়া বসাইল। রাজা কন্যাকে লইয়া প্রেসিডেণ্টের পাশেই বসিলেন, বিজনকুমার তাঁহাদের পার্শ্বে-ই স্থান গ্রহণ করিলেন। অন্যান্য ইংরাজ ও জমীদারগণও এইস্থানে বসিলেন।

সভাপতি এবং তৎপত্নীকে ফুলগুচ্ছ এবং ফুলমাল্য উপহারে জ্যোতির্ম্ময়ী অভিনন্দিত করিবার পর কতকগুলি গেরুয়াবস্ত্রপরিহিত ভিক্ষুক-ব্রাহ্মণবেশী বালক গান আরম্ভ করিল—

ভিক্ষাং দেহি জননি গো, ভরিয়ে দে ঝুলি,
আর কিছু চাহি না ত শুধু পদধূলি।
শুধু মা গো চাই বর, এই আশীর্ব্বাদ কর,
তোমার সেবায় প্রাণ পুণ্য ক'রে তুলি।
মনে রাখি যেন তোরে সকল কাজে,
তোর দুঃখ নিশিদিন প্রাণে যেন বাজে।
তব মুখ সব আগে নিত্য যেন মনে জাগে
তোমার চিন্তাতে যেন সব চিন্তা ভুলি।

গানের পর প্রেসিডেণ্ট অভিভাষণ পাঠ করিলেন, তাহার পর খেলা আরম্ভ হইল। ফুটবল প্রভৃতি খেলা কাল হইবে, চালার ভিতরে যে সব খেলা হইতে পারে—তাহারই দিন আজ। প্রথমে আরম্ভ হইল কুস্তি। তাহার মীমাংসা হইয়া গেলে ১৫ মিনিট কাল অবসর দেওয়া হইল। ইহার পর লাঠালাঠি প্রভৃতি খেলা আরম্ভ হইবে।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

সকলে খেলা দেখিতে মত্ত,কিন্তু বিজনের সে দিকে মন ছিল না; সে মাঝে মাঝে জ্যোতির্ম্ময়ীর দিকে আড়নয়নে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে নিম্নলিখিত কবিতার লাইনটি মনে মনে আবৃত্তি করিতেছিল।

"Fain would I climb,
but that I fear to fall—"

যদি জ্যোতির্ম্ময়ী তাহার মনের কথা জানিতে পারিতেন, তাহা হইলে কি রাজ্ঞী এলিজেবেথের মতন বলিতেন—

"If thy mind fail thee,
do not climb at all"

বিজনের বাড়ীর মেয়েরা নিমন্ত্রণে যাইবার সময় কত জরীজড়াও কিংখাপ বস্ত্রে, কত রাশি রাশি রত্নালঙ্কারে ভূষিত হইয়া ওঠেন, আজ জ্যোতির্ম্ময়ীর সাজ-সজ্জার অনাড়ম্বর বিজনের চক্ষে ভারী নূতন বলিয়া ঠেকিল। বালিকা পরিয়াছে একখানি জরী-কিনার নীলাম্বরী বারাণসী সাড়ী, তদুপযোগী একটি জ্যাকেট ও ওড়না। অলঙ্কার দু'চারিখানি যাহা পরিয়াছে, বসনের মধ্যে সেগুলি একরূপ ঢাকাই পড়িয়া গিয়াছে। দেখা যাইতেছে কেবল তাহার শিরোভূষণ—ওড়নার উপরিস্থিত হীরক-টায়রা—রাজা আজ তাহার জন্মদিনে এই উপহারটি প্রদান করিয়াছেন। এই মুকুটচ্ছটায় তাহাকে চিত্রাঙ্কিত দেবীমূর্ত্তির ন্যায়ই জ্যোতির্ম্ময়ী করিয়া তুলিয়াছিল।

ভারত-কন্যা এত সুন্দরী! ইংরেজগণ মুগ্ধনেত্রে দেখিয়া বঙ্গান্তঃপুরের মহিমা কল্পনা করিতেছিলেন। আর বিজনকুমার? এই জ্যোতির নিকট কিরূপে পৌঁছিবে, কখনও পৌঁছিতে পারিবে কি না, তাহাই ভাবিয়া একান্ত ম্রিয়মান হইয়া পড়িয়াছিল।

ব্যায়াম-ক্রীড়ার ১৫ মিনিট কাল বিরাম অবসরে ভিন্ন ভিন্ন দল ভিন্ন ভিন্ন তাম্বুতে আহারে আহূত হইলেন।

দেশী বিলাতি কোনরূপ ভোজায়োজনেরই ত্রুটি ছিল না। রাজা ম্যাজিষ্ট্রেটপত্নীকে করদানপূর্ব্বক মঞ্চ গৃহে লইয়া গেলেন। ম্যজিষ্ট্রেট সাহেব কর-প্রসারণপূর্ব্বক জ্যোতির্ম্ময়ীকে বলিলেন,—May I have the pleasure of - তাঁহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই জ্যোতির্ম্ময়ী তাঁহাকে আস্তে আস্তে কি বলিল—তিনি হাসিয়া বলিলেন,—"Very well, let the Will be done, my queen" বলিয়া আর এক জন ইংরাজপত্নীকে হস্তদানপূর্ব্বক মঞ্চে লইয়া গেলেন।

ইংরাজরা সকলেই এবং অনেক বাঙ্গালীও ইহাদের অনুসরণ করিলেন। বাকী সকলকে ছেলেরা দেশী ভোজের ঘরে লইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে স্থান প্রায় জনশূন্য হইয়া পড়িল, কিন্তু বিজনকুমার উঠিল না—জ্যোতির্ম্ময়ী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"তাম্বুতে গিয়ে খেতে কি আপনার আপত্তি আছে ?" বিজন কি উত্তর দিবে যেন ভাবিয়া পাইল না। জ্যোতির্ম্ময়ী তাহার সঙ্কোচ দেখিয়া বলিলেন—"বেশ, আপনি তবে এইখানেই কিছু খান—"

এক জন যুবক ভলন্টিয়ার মঞ্চের নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল, তাহাকে বলিলেন, "সন্তোষ, কিছু খাবার এখানে আন্‌তে ব'লবে ?"

তাহার মুখের কথা শেষ না হইতে হইতেই শরৎকুমার পুরোবর্ত্তী হইয়া আর একটি ছেলের সহিত মিষ্টান্নের থালা লইয়া উপস্থিত হইলেন। বালিকা হাসিয়া বলিল,—"ডাক্তার-দা নিজেই যে খাবার নিয়ে হাজির।"

শরৎ হাতের থালা টেবিলে রাখিয়া কহিল, "আশা করি অন্যায় কাজ করি নি ?" বালিকা কহিল "অন্যায়! খুবই ন্যায় কাজ করেছেন। নইলে আমার অতিথি অভুক্ত থাকিতেন, সে পাপ লাগতো আমাকে।"

"বেশ আপনারা খান। চল অনাদি, আমরা লেমনেড আর আইসক্রিম নিয়ে আসি।"

এই বলিয়া শরৎকুমার চলিয়া গেলেন, থালার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বিজন দেখিল,—কত রকমের খাদ্য! স্যাণ্ড-উইচ, প্যাটি, নানাবিধ কেক; নানা-রকম মিষ্টান্ন! অন্য সময় হইলে এ সকলের লোভ সংবরণ তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিত। কিন্তু আজ আতিথ্যকারিণী স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী! তাঁহার দিকে চাহিয়া তাঁহার কেমন যে বিভ্রম উপস্থিত হইল—সহজভাবে সে কোন খাদ্যই উঠাইয়া লইতে পারিল না। জ্যোতির্ম্ময়ী আবার বলিল—"খান না বিজনবাবু! এখনি ত আবার সভা পূর্ণ হ'য়ে উঠবে।"

শরৎ সম্ভাষিত হয়—দাদারূপে—আর বিজন যে ব্যক্তি যথার্থই রাজকুমারীর এক জন আত্মীয়, সে হইল বাবু-পদবাচ্য—হায় রে!

কিন্তু আর খাইতে দেরী করাটা সত্যই ভাল দেখায় না; মনের জ্বালা মনে চাপিয়া বিজনকুমার একটা 'ম্যারাং' হাতে তুলিয়া লইল। মুখে তুলিতে গিয়া তাহার মনে হইল—আদব-কায়দার ত্রুটি হইতেছে না ত? রাজকুমারীকে তাহার কি প্রথমে খাইতে অনুরোধ করা উচিত ছিল না? সে সহজ-ভাবে বলিতে চেষ্টা করিল - "আপনি খাবেন না?" বলিয়া হাতটা তাঁহার দিকে বাড়াইবামাত্র 'ম্যারাং'টা হস্তচ্যুত হইয়া জ্যোতির্ম্ময়ীর পদবস্ত্রের উপর পড়িয়া তাহা ফাটিয়া গেল; মধ্যস্থিত ক্রিমে তাহার নীলাঞ্চল শাদা হইয়া উঠিল। এমনি বিজনের দুর্গ্রহ,—ঠিক এই সময় কি শরৎকুমার আসিয়া পড়িবেন! তাহার সহচর ভলেন্টিয়ার এই ঘটনায় কষ্টে হাস্য সংবরণ করিয়া লইল; শরৎকুমার নিঃশব্দে হাতের ট্রে-খানা টেবিলে রাখিয়া, তাড়াতাড়ি পকেট হইতে রুমাল একখানা বাহির করিয়া লইয়া বেশ সচ্ছন্দ স্বাভাবিক ভাবে বালিকার কাপড়ের ক্ষীরটা মুছিয়া তুলিয়া দিল। বিজনকে অপ্রস্তুত দেখিয়া তাহার লজ্জা দূর করিবার অভিপ্রায়ে জ্যোতির্ম্ময়ী মধুর হাস্যে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"কিছু মনে করবেন না - বিজনবাবু, সে দিন আমিও এক জন মেয়ের কাপড়ে কাফি ফেলে দিয়েছিলুম—তাড়াতাড়িতে অনেক সময় এমনতর হয়েই থাকে।" কিন্তু বিজনকুমারের মন এ বাক্যে প্রবোধ মানিল না। লজ্জায় তাহার শিরা-উপশিরা কাঁপিয়া উঠিল। আর শরৎকুমারের সহজ নিঃসঙ্কোচ ভাবে ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া মনে মনে তাহাকে শত সহস্র অভিশাপ দিতে লাগিল। বিজন যদি জানিত, কিছুদিন পূর্ব্বে হাসিকে একটি ফুল দিতে গিয়া শরৎকুমারের কিরূপ অবস্থা হইয়াছিল, তাহা হইলে বোধ হয়—তাহার মনের জ্বালা একটু নিবৃত্তি হইতে পারিত।

শরৎ পুনরায় কাজে চলিয়া গেলেন। বিজনের আহারান্তে পার্শ্ববর্ত্তী ভলেন্টিয়ারগণ ট্রে-গুলি লইয়া গেল। মঞ্চে আর জনপ্রাণী নাই, জ্যোতির্ম্ময়ী ও বিজনকুমার। বিজন ভাবিতে লাগিল, এমন অবসর কি সে বৃথা যাইতে দিবে? সে কি পুরুষ নহে?—এক জন নারীকে প্রসন্ন করিবার মত একটি

কথাও কি সে কহিতে জানে না? তাহার ব্যায়াম-দক্ষতার পরিচয় পাইলে রাজকুমারী যে সন্তুষ্ট হইবেন --ইহা সে বুঝিল। কিন্তু কি করিয়া এ কথা পাড়িবে, কি করিয়া জানাইবে যে, সে ফুটবলে, ক্রিকেটে, লাঠিখেলায় দক্ষ।

প্রথম ঘণ্টা পড়িল; খেলার স্থানে লোকজন আসিতে আরম্ভ করিল; দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়িলেই মঞ্চ পূর্ণ হইয়া উঠিবে। বিলম্বের সময় নাই, ভাবিবার অব সর নাই; বিজনকুমার সহসা জ্যোতির্ম্ময়ীকে জিজ্ঞাসা করিল, "রাজকুমারি, বাহিরের লোক কি কেহ এ খেলায় যোগ দিতে পারে?" জ্যোতির্ম্ময়ী কিছু না ভাবিয়া আনমনেই এক রকম বলিল, "পারবে না কেন?"

"আমি কি লাঠিখেলায় যোগ দিতে পারি?"

জ্যোতির্ম্ময়ী তখন সজাগ হইয়া কহিল—"কিন্তু আজকে পরীক্ষার দিন; আমার নূতন খেলোয়াড়-দের সঙ্গে আপনার মত দক্ষ লোকের প্রতিদ্বন্দ্বিতা কি ঠিক হবে?"

"না, আমি কোন সর্দ্দারের সঙ্গেই খেলতে চাই।"

শরৎকুমার ঠিক এক মিনিট আগে এখানে আসিয়া পরিত্যক্ত চৌকাগুলি সাজাইয়া রাখিতে-ছিলেন,—নিকটে আসিয়া বলিলেন,—"আমি বিজন-বাবুর সহিত খেলিতে প্রস্তুত আছি।"

শরৎ যে এক জন নিপুণ খেলোয়াড় তাহা জ্যোতির্ম্ময়ী জানিত না তবু তাহার মান রক্ষা হইল ভাবিয়া সে আনন্দবোধ করিল। অবশ্য খেলাতে ত হার-জিত আছেই, - শরৎ না হয় হার-য়াই যাইবেন।

শরতের এই প্রস্তাবে বিজনও অসন্তুষ্ট হইল না শরৎকে হারাইয়া আপনার পৌরুষ-গৌরবে সে যে রাজকুমারীর নিকট সম্মান লাভ করিবে, সে বিষয়ে সে খুবই আশ্বস্ত ছিল।

বালক এক দলের খেলা হইয়া গেলে--প্রেসি-ডেন্টের আদেশমত শরৎ ও বিজনকমার রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলেন। গৎকা খেলায় তাঁহারা প্রতিদ্বন্দ্বী হইবেন, ইহাই স্থির হইয়াছিল।

উভয়েরই ইংরাজী সাজ, উপরের কোটটা মাত্র খুলিয়া রাখিয়া তাঁহারা হাতের আস্তিন গুটাইয়া লইয়া গৎকা ও শৃঙ্গহস্তে খেলার স্থলে প্রতিদ্বন্দ্বী-ভাবে দাঁড়াইলেন। দু'জনেই দেখিতে সুপুরুষ, শরৎ একটু দীর্ঘকায় এবং দৃঢ়পেশী,- বিজনকুমার ধনিপুত্র, তাহার ক্ষীর নবনী-গঠিত দেহ অপেক্ষাকৃত কোমল, সুকুমার ও লাবণ্যপূর্ণ। বিবাহ-সভায় সৌকুমার্য্যে বিজনকুমার নারী-সমাজে যে একচেটিয়া প্রশংসা লাভ করিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু জ্যোতি-র্ম্ময়ীর রুচি একটু অদ্ভুত বলিতে হইবে। শরতের মাংসপেশীবহুল দেহগঠনে একটা পৌরুষিক-ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার নারীবক্ষ সহসা একটা অভাব-নীয় অভূতপূর্ব্ব মোহময় সুখে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল - তাহার সম্মুখে সত্যই কি একটা জীবনোপন্যাস অভি-নীত হইতেছে! এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী যেন কোন অনামিকার তুষ্টিসাধন উদ্দেশ্যে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ। মনের অজ্ঞাতসারে তাহার মন উপলব্ধি করিল, সেই অনামিকা সে নিজে। একটা মোহময়, সুখময় চাঞ্চল্য-আবেগে তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল।

উভয়ের যুদ্ধ চলিল, —পরস্পরে আত্মরক্ষা করিয়া পরস্পরকে পরাজয় করিবার জন্য কত ছলে কত কৌশলে তাহাদের লাঠি ও শৃঙ্গ পরিচালিত হইতে লাগিল। মুগ্ধ-দৃষ্টিতে জ্যোতির্ম্ময়ী তাহা দেখিতে লাগিল।

একবার শরৎকুমার সহসা ওষ্ঠে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া শোণিতাক্ত হইয়া উঠিলেন। সে আঘাত-ব্যথা নিজের বক্ষে জ্যোতির্ম্ময়ী অনুভব করিয়াও তাহাতে কাতর হইল না,- বরঞ্চ এই শোণিত পাতেও সে একটা সুখ অনুভব করিল। এমন কি তাহাকে মুমূর্ষু দেখিতেও সে প্রস্তুত—কিন্তু পরাজিত দেখিতে চাহে না।

দর্শকগণের দারুণ ঔৎসুক্য-আবেগের মধ্যে যুদ্ধ শেষ হইল। শরৎকুমার বিজনের হস্তের লাঠি— বিনা আঘাতে হস্তগত করিয়া লইলেন, বিজনের সহিত যে সকল দলবল আসিয়াছিল, তাহারা নতমুখ হইয়া রহিল; -আর এ পক্ষে বন্দে মাতরম্ শব্দে সভা ফাটিয়া উঠিল- ইংরাজগণও সেই সঙ্গে হুর্‌রে বলিয়া রুমাল ঘুরাইতে লাগিলেন।

জ্যোতির্ম্ময়ীর মোহ তখনও ভাঙ্গে নাই, শরৎ-কুমার বিজিত-গৎকা মঞ্চে আনিয়া তাঁহাদের পদতলে রাখিয়া উন্নত-মস্তকে দাঁড়াইলেন। ইহাদের জন্য আগে হইতে পুরস্কার ঠিক ছিল না, রাজা নিজের অঙ্গুলি হইতে একটি অঙ্গুরী খুলিয়া তাহার হস্তে পরাইয়া দিলেন,— আর জ্যোতির্ম্ময়ী টেবিলে রক্ষিত একগাছি ফুলমাল্য লইয়া সহাস্য বদনে তাহার কণ্ঠে অর্পণ করিল।

ইহার পর বালকদিগের পুরস্কার বিতরণান্তে সভা ভঙ্গ হইল।

* * * * *

মহারাণী পরদার মধ্য হইতে সব দেখিলেন।

তিনি আশা করিয়াছিলেন,--বিজনের গলায় এই মালা পড়িবে। তাহা হইলেই তিনি প্রকৃতভাবে সুখী হইতেন,—কিন্তু তাহা হইল না,—তবুও নিতান্তই যে অসন্তুষ্ট হইলেন, তাহাও নহে। জহরীর নিকট জহরের অনাদর হয় না। শরৎকুমারের বীরত্বে মনে মনে তিনি তাহাকে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

নাতনীকে পরে ঠাট্টা করিয়া বলিলেন,—"স্বয়ম্বরা হলি নাকি রে? সন্ন্যাসী বই আর কি কোন বর মিলল না—আমার নাতনীটির?"

জ্যোতির্ম্ময়ীর মুখ লজ্জায় লাল না হইয়া মলিন হইয়া গেল। এই মাল্যদানের অর্থ কি লোকে এইরূপ করিবে না কি! ইহা ত তাহার স্বপ্নেরও অগোচর! আর শরৎকুমার? তিনি কি ভাবিয়াছেন? অন্যে যে যাহাই ভাবুক—শরৎকুমার কখনই এরূপ ভুল বুঝিবেন না।

তথাপি জ্যোতির্ম্ময়ী মনে মনে ভারী একটা অস্বস্তিকর লজ্জা, বেদনা অনুভব করিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

উন্মেষণা

প্রসাদপুরের ব্যায়াম-উৎসব দর্শন শচীন্দ্রের ভাগ্যেও ঘটিয়া গেল। জন্মাষ্টমীর ছুটী উপলক্ষে বিজনকুমারের অতিথিরূপে সে সময়ে সে বিষাদপুরেই বাস করিতেছিল। বাড়ী ফিরিয়া আসিতে হাসি ধরিয়া পড়িল "দাদা, কি দেখে এলে গল্প কর না? কাগজে ত পড়লুম, খুব সেখানে ঘটা হয়ে গেছে।"

হাসি অপেক্ষা শচীন বয়সে বৎসর দুই মাত্র বড়। ছেলেবেলা ৬।৭ বৎসর পর্য্যন্ত একত্রে খেলাধূলা করিয়াছে, এক পণ্ডিতের কাছে পড়িয়াছে; কিন্তু যখন হইতে রীতিমত ভাবে শচীনের পাঠ্য-জীবন আরম্ভ হইয়াছে, স্কুলের ছেলেদের সহিত ভাবটা জমিয়া উঠিয়াছে, তখন হইতে হাসিকে সে বেশ একটু খাট নজরে দেখে; মস্ত মুরুব্বিয়ানা চালে চলিয়া—দরকারে অ-দরকারে পদে পদে জানান্ দেয় যে, সে তাহার শ্রদ্ধাভাজন দাদা-বয়স্য বন্ধু নহে। হাসি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেই—বিশেষতঃ যদি সে কথা তাহার স্কুল বা বন্ধু-বান্ধব সম্বন্ধীয় প্রশ্ন হয়—তাহা হইলেই ধমক দিয়া বলিয়া উঠে,—"তোর সে খবরে কাজ কি?" হাসির এমন রাগ ধরে! সেদিন পর্য্যন্ত দু'জনে মায়ের কোল অধিকার করিবার জন্য ঝগড়া করিয়াছে, রূপকথা শুনিবার জন্য দিদিমাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে, বাবার দুই হাত দু'জনে অধিকার করিয়া লইয়া দু'পাশে চলিতে চলিতে নিজের গল্পের স্রোতে অন্যের মুখ বন্ধের চেষ্টা করিয়াছে। বাগানে ফুল তুলিয়াছে, তারা গণিয়াছে, পরস্পরকে হারাইবার অভিপ্রায়ে মুখস্থ কবিতা আবৃত্তি করিয়াছে। আর আজ হঠাৎ দাদা যে কি করিয়া এতটা বাড়িয়া উঠিল সে তাহা বুঝিতেই পারে না। দেহায়তনে শচীন চিরদিনই শ্রেষ্ঠ, সুতরাং দাদার শরীরের বাড়টা হাসির নজরে পড়ে না,—মুখের নবীন গোঁপ-দাড়ির রেখাকেই সে ইহার মূলীভূত কারণ বলিয়া মনে মনে ঠাওরাইয়া লইয়া রাগ করিতে করিতেও হাসিয়া বলে—"ইস্, ভারী যে মুরুব্বি-আনা, —তবুও ত এখনও শর-দার মত গোঁপ-দাড়ি হয় নি!" শর-দা এ সম্বন্ধে বুঝি তাহার আদর্শ পুরুষ! এক দিন দেখা গেল,—এই সামান্য শ্মশ্রু-রেখাও শচীনের বালক-বদন হইতে অন্তর্দ্ধান করিয়াছে, সম্ভবতঃ হাসির—হাসির জ্বালাতেই ইহার উপর সে বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তবুও ত বোনের হাসি শচীন থামাইতে পারিল না। দাদার শ্মশ্রুহীন চেহারা দেখিয়া আরো বেশী করিয়া হাসিয়া হাসি বলিল,—"বেশ হয়েছে ছোড়্‌দাদা! দেখ ভাই একবার আয়না দিয়ে নিজের মুখখানা। ঠিক আমার মতই তোমার মেয়েলি চেহারা হয়েছে! বিজনদাও এইরূপ কামায়,—না?"

শচীনের অসহ্য হইল, সে রাগিয়া মুখ গোম্‌সা করিয়া চলিয়া গেল।

আজ মা গিয়াছেন নিমন্ত্রণে, ছোড়দাদার সান্ধ্য-ভোজনের সময় পরিবেশন করিতেছিল হাসি। সে যে চুপ করিয়া বসিয়া তাহাকে খাওয়াইবে—এমন প্রত্যাশা করা যায় না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে—আজ হাসির প্রশ্নে শচীন ধমক দিয়া উঠিয়া তাহাকে নিরুত্তর করিল না। প্রসাদপুরের উৎসব-দৃশ্যের তরঙ্গাঙ্কিত স্মৃতি, তাহার মুরুব্বিয়ানার বাঁধ ঠেলিয়া আজ উপরে উঠিতে চাহে, সে তাহা রোধ করিতে অসমর্থ। তাই প্রসন্নভাবেই কহিল—

"শুধু একটি জিনিষ দেখলুম।"

"কি জিনিষ?"

"প্রসাদপুরের রাজকুমারীকে!"

হাসি আগ্রহে বলিয়া উঠিল—"দেখেছ তাঁকে? আমার বড় দেখতে ইচ্ছা করে। শুনেছি, খুব সুন্দরী তিনি?"

"সুন্দরী! অতুলনীয়া তিনি। শুধু রূপে না গুণেও। আমাদের দেশে এমন মেয়ে আছে, তা না দেখলে মনেই করা যায় না!"

হাসি হাসিতে লাগিল। কথায় কথায় এরূপ অকারণ হাসি শচীনের কখনই ভাল লাগে না। সে রাগ করিয়া বলিল—"তুই কেবল হাসতেই জানিস্! তাঁর গুণের যদি একটি কাণাকড়াও পেতিস! জানিস তোর চেয়েও বয়সে রাজকুমারী ছোট, কিন্তু অত বড় একটা ব্যায়াম-সমিতি তিনিই গ'ড়ে তুলেছেন। আর ছেলেরা সৈনিকের মত উৎসাহে তাঁর ইঙ্গিতে অস্ত্র-চালনা করছে।"

বিস্ময়ে হাসির হাসি থামিয়া গেল; বিস্ফারিত নেত্রে কহিল, "সত্যি না কি?"

"সত্যি না ত কি মিথ্যা বলছি? প্রসাদপুর যেন একটা সেনানিবাস, আর সেই ছোট্ট বালিকা জ্যোতির্ম্ময়ী সেখানে সেনাপতি।"

হাসি বলিল,—"শর-দাও ত সেখানে আছেন? তিনিও বোধ হয় এক জন সেনা হয়েছেন? দেখা হোল তাঁর সঙ্গে?"

"হ্যাঁ, আমি দেখেছি তাঁকে,—কিন্তু তিনি আমাকে দেখেন নি!"

"তোমাকে দেখেন নি?"

"কি ক'রে দেখবেন? তিনি যে আজ কাল মস্ত লোক? আমার মত লোক তাঁর নজরে পড়ে কি এখন?"

শরৎ শচীনকে দেখেন নাই সত্য - কিন্তু অপরাধ তাঁর নহে শচীনেরই। শর-দার ঋণ যে এখনো শোধ দেওয়া হয় নাই, এ কথা শচীন ভোলে নাই। এই লজ্জায় সে নিজেই শরৎকে এড়াইয়া চলিয়াছিল, এমন কি, সেই জন্য সে বিজনের পাশে মঞ্চে আসিয়াও বসে নাই।

দাদার কথার উত্তরে হাসি যেন তাহার প্রতিধ্বনির মতই বলিল "মস্ত লোক!"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ। রাজকুমারী যে তাঁর গলায় মালা দিয়েছেন?"

"রাজকুমারী তাঁকে মালা দিয়েছেন? তিনি কি স্বয়ম্বরা হ'লেন না কি? সেই জন্যেই কি প্রসাদপুরের এ উৎসব?"

শচীন অধীর চিত্তে কহিল, "থামবি একটু! সেই জন্যেই ত তোকে কোন কথা বলতে ইচ্ছা করে না। একটা কথা শুনতে শুনতে দশটা কথা তোর মুখ দিয়ে ছোটে। জানিস্ ওটা ভারী বদ-এটিকেট।"

"আচ্ছা আচ্ছা, বল বল, আমি আর কথা কব না।"

"বিজন-দাতে শর-দাতে গৎকা খেলা হোল, শর-দা জিত্‌লেন, তাই রাজকুমারী তাঁকে মাল্যোপহার দিয়েছেন।" হাসি আহ্লাদে করতালি দিয়া উঠিল, "শর-দা জিতেছেন!"

"অত আহ্লাদের আমি ত কোন কারণ দেখিনে, বিজন-দাই আসলে best player, কিন্তু এর মধ্যে শর-দা একটু কারচুপি খেলেছিলেন। ধারাল শিংটা নিজে বেছে নিয়ে ভোঁতা শিংটা বিজন-দাকে দিয়েছিলেন।"

বলা বাহুল্য, বিজনের দল এইরূপ রটনা করিয়াছিল। হাসি রাগিয়া গেল, বলিল, "কক্ষণো না। শর-দা কখনোই এমন অন্যায় করেন না, আমি তাঁকে বেশ জানি।"

"তুই ত সব জানিস!"

"নিশ্চয় জানি!"

"বেশ, জানিস্ ত জানিস্, শর-দা এখন আর আমাদের বন্ধু নেই এটাও জেনে রাখ্। শুন্‌লি ত রাজকুমারি তাঁর গলায় মালা দিয়েছেন।"

শচীন ভগিনীর মুখ বন্ধ করিবার জন্য ইচ্ছা করিয়াই তাহাকে এইরূপ খোঁচা দিল। হাসি নীরব হইয়া গেল, শচীন তাড়াতাড়ি আসন হইতে উঠিয়া, চটিজুতার ভিতরে আধখানা, বাহিরে আধখানা পা রাখিয়া জুতাজোড়ার সহিত পাজোড়া টানিতে টানিতে হাত ধুইবার অভিপ্রায়ে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। দাসী ঘটি গামছা লইয়া সেখানে অপেক্ষা করিতেছিল; তাহার হাত হইতে ঘটিটা কাড়িয়া লইয়া দুই একটা কুলকুচা করিয়াই চটপট গৃহ-নিষ্ক্রান্ত হইল।

রাজকুমারীর গুণের কথা শুনিয়া হাসির হৃদয় শ্রদ্ধাভক্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল; ঘরে আসিয়া হৃদয়ের উপলিত সেই শ্রদ্ধানুরাগে পূর্ণ করিয়া তাঁহাকে একখানি চিঠি লিখিল। চিঠিখানি খামে বন্ধ করিয়া তাহার মনে হইল, রাজকুমারীর ঠিকানা ত তাহার জানা নাই। শুধু প্রসাদপুর ঠিকানায় পাঠাইলেই কি তাঁহার হাতে পৌছিবে? না শচীনের নিকট ঠিকানাটা ভাল করিয়া জানিয়া লইবে? কিন্তু তাহা হইলেই ত দাদা কারণটা ধরিয়া ফেলিবে? তাহাকে কথাটা জানাইতেও ত ইচ্ছা করে না! সমস্যায় পড়িয়া ভাবিতে ভাবিতে সে গাড়ী-বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। শরতের বিদায়-দিনের কথা মনে পড়িল।

আজ কৃষ্ণচতুর্দ্দশী। সে দিনের মত জ্যোৎস্নাধারায় চারি দিক হাস্যোজ্জ্বল নহে। অবসর পাইয়া আজ আকাশের স্থানে স্থানে তারকারাশি গুচ্ছে গুচ্ছে দীপ্তি বিকাশ করিতেছিল,—কোন কোন গুচ্ছস্থিত এক-একটি অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র দীপ্ত মহিমায় অন্য সকলকে হীন-প্রভ করিয়া চন্দ্রের স্থল আজ অধিকার করিয়া লইয়াছিল।

পশ্চিম দিকে জ্বলিতেছিল শুক্রতারা; মাথার উপর জ্বলিতেছেন বৃহস্পতি; কিন্তু হাসি উত্তরমুখে দাঁড়াইয়া খুঁজিতেছিল সপ্তর্ষিকে। কিন্তু এই সাতটি তারা যে এলোমেলো ভাবে কোথায় এখন হারাইয়া পড়িয়াছে, হাসি তাহাদের সঙ্কেতে ধ্রুবতারাটির নির্দ্দেশ পাইল না। আকাশ হইতে বাগানের দিকে তখন সে দৃষ্টিপাত করিল, গাছপালার মধ্যে শতসহস্র জোনাকি পোকা একই সঙ্গে তাহার নয়নে জ্বলিয়া উঠিয়া আবার মুহূর্ত্তে নিবিয়া গেল। হাস্নুহানার গন্ধরাশি তাহার নাসিকার উপর প্রবল তরঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়িল। সে দিনও এই গন্ধে দিক ভরিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ইহার সহিত যে সঙ্গীত-ধারা উথলিয়া উঠিয়াছিল, আজ তাহা নীরব। সইসের বোন—জোয়ানীর অনেক দিন বিবাহ হইয়া গিয়াছে। আর শর-দা? তিনি এখন কোথায়? সম্ভবতঃ রাজকুমারীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া প্রেম-সম্ভাষণ করিতেছেন। দুই ফোঁটা অশ্রু তাহার নয়নে সঞ্চিত হইয়া উঠিয়া ক্রমশঃ কপোল বাহিয়া নীচে পড়িল।—কেন? হাসি ত তাঁহাকে ভালবাসে না, তাঁহার প্রেম ত সে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে—তবে?

ভালবাসে না—ইহাই কি ঠিক? না—সে ভালবাসে,—কিন্তু সে ভালবাসা ত তার প্রেম নয়, তাহা সখ্যতা, তাহা শ্রদ্ধা, তাহা মহৎ হৃদয়ের প্রতি আকর্ষণ। যদি সে মাতার মনের ভাব না জানিত, সম্ভবতঃ এই সখ্যতা, এই শ্রদ্ধা কোন দিন প্রেমে পরিণতঃ হইতে পারিত, কিন্তু মাতৃ ইচ্ছার মধ্যে সে আত্মবিলুপ্ত করিয়া দিয়া চিরদিনই শরৎকুমার হইতে আপনাকে দূরে রাখিয়াছে এবং চিরদিনই রাখিবে—তবে? তবু ত অধিকার বলিয়া একটা জিনিষ আছে! চিরদিন যাহাকে আপনার বলিয়া জানে—সে আজ পরের হইয়া গেল—এক-বিন্দু অশ্রুও কি সে জন্য পড়িবে না!

দাদার নিকট আর হাসির রাজকুমারীর ঠিকানা জানিয়া লইতে হইল না।

মাতার পীড়ার সংবাদ পাইয়া কুন্দবালা প্রসাদপুরের ব্যায়াম-উৎসবের পুর্ব্বেই কলিকাতায় আসিয়াছিল। মাতা সুস্থ হইয়া উঠিয়াছেন. এখন সে প্রসাদপুরে ফিরিয়া যাইবে। যাইবার আগে সে হাসিকে দেখিতে আসিল। হাসি ও কুন্দ দুইজনেই বেথুন স্কুলের ছাত্রী। ছোট্ট মেয়েটি হাসি প্রথম যে দিন হাস্যপ্রফুল্ল মুখে দৈনিক ছাত্রীরূপে স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছিল, সেই দিন হইতেই সেখানকার উচ্চ শ্রেণীর বোর্ডার বালিকা কুন্দের হৃদয় অনেকখানি সে অধিকার করিয়া লইয়াছিল। যত দিন হাসি স্কুলে ছিল, কুন্দ আপনার স্নেহাঞ্চল-ছায়াতলে বালিকাকে রক্ষা করিত। স্কুল ছাড়িবার পরেও উভয়ের মধ্যে এই ভালবাসার বন্ধন একেবারে ছিন্ন হইয়া পড়ে নাই। কুন্দ প্রসাদপুরে কাজ লইয়া পর্য্যন্ত তাহারা একটু দূরে পড়িয়াছে সত্য, দেখা-শুনাও নাই, চিঠিপত্র লেখাও একরকম বন্ধ; তথাপি কলিকাতা আসিলেই কুন্দ একবার হাসিকে দেখিতে আসিতে ভোলে না। দৈববশতঃ ঠিক পরদিনই কুন্দ হাসিকে দেখিতে আসিল। রাজকুমারীকে দিবার জন্য তাহার চিঠিখানি হাসি কুন্দকে দিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

রাজা ভাল হইয়াছেন; ব্যায়াম-উৎসবও শেষ হইয়া গিয়াছে। শরৎকুমারের আর কলিকাতায় যাইবার বাধা নাই, তিনি আজ বিকালে বাহিরে না গিয়া জিনিষ-পত্র প্যাক্ করিতেছিলেন, অভিপ্রায়, আজ সন্ধ্যাবেলা রাজাকে এ কথা জানাইয়া পরদিনই বাটী যাত্রা করিবেন।

মেজের উপর ট্রাঙ্ক দুইটা খোলা, কাপড়-চোপড় তাহার মধ্যে সাজান হইয়া গিয়াছে। টেবিলের উপর যে দুএকখানা বই ও ছোটখাট দুই-একটা জিনিষ পড়িয়াছিল তাহা পোর্টম্যাণ্টে উঠাইয়া লইয়া তিনি দেয়ালের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন।

দেয়ালের গায় রাজকুমারী-দত্ত মালাগাছি টাঙ্গান ছিল, কুন্দ-ফুলের গড়েমালা, মাঝে মাঝে তাহাতে চাঁপা ও গন্ধরাজের মিলান। মালাগাছি দু'দিনের বাসিমালা—পাছে স্পর্শে একটি ফুলও ঝরিয়া পড়ে—হাত দিতে শরতের সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল। নিকটে আসিয়া আঘ্রাণ লইবামাত্র একটি মনোহর সুগন্ধে তাহার নাসিকা যেন ভরিয়া উঠিল,—শরতের—মনে হইল—এ বুঝি স্বর্গেরই পারিজাত-মালা।

যাঁহার হস্তস্পর্শে ইহা এত পুণ্যময় গন্ধময় হইয়া উঠিয়াছে—তাঁহাকে স্মরণ করিয়া শরৎ শ্রদ্ধাপূর্ণচিত্তে মস্তক অবনত করিলেন।

আর যেই যাহা বুঝুক, শরৎ রাজকুমারীকে ভুল বুঝেন নাই। এ মাল্য যে রাজকুমারীর বরমাল্য নহে, জয়মাল্যোপহার, তাহা তিনি ঠিকই বুঝিয়াছিলেন। ভুল বুঝিবার জন্য যেরূপ কাণ্ডজ্ঞানশূন্য আত্মম্ভরিতার প্রয়োজন—শরতের স্বভাবে সেরূপ হাস্যকর গর্ব্ব-ভাবের বিশেষ অভাব। জ্যোতির্ম্ময়ী রাজকুমারী, —জ্যোতির্ম্ময়ীর আকাঙ্ক্ষা বাসনাও অসাধারণ; মহৎকার্য্যেই তাঁহার সমস্ত মনঃপ্রাণ উৎসর্গীকৃত; শরতের মত এক জন নগণ্য সাধারণ লোকের প্রতি তাঁহার যে প্রেমোদ্রেক হইতে পারে ইহা তাঁহার কল্পনারও অগোচর, ইহার উপর তাঁহার নিজের হৃদয়েও এ ক্ষেত্রে প্রেমের চাঞ্চল্য নাই। অতএব রাজকুমারীর প্রতি তাঁহার ব্যবহার এক দিকে শ্রদ্ধা-সম্মান-পূর্ণ, অন্য দিকে বেশ নিঃসঙ্কোচ, স্বাভাবিক। এই শক্তিময়ী রমণীর সান্নিধ্য তাঁহার সখ্যতা, তাঁহার প্রশংসা শরতের ক্ষত হৃদয়ে যে মহৌষধ-সুধা ঢালিয়াছিল, সে জন্য রাজকুমারীর প্রতি তিনি আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞ।

হাসিকে কি শরৎ ভুলিয়াছেন? এত শীঘ্র কি ভোলা যায়? কিন্তু তাঁহার উপেক্ষিত হৃদয় বিশ্বনাথ দেবের নিকট যে কাতর প্রার্থনা জানাইয়াছিল, তাহা একেবারে অগ্রাহ্য হয় নাই। রাজকুমারীর সখীত্বের আশ্রয়ে তিনি বল পাইয়াছেন, ভুলিবার নূতন পথ চিনিয়াছেন। উপেক্ষিত প্রেমিকেরও জীবন বৃথা যায় না, কর্ম্মের পথে তাহা সার্থক হইয়া উঠে;—রাজকুমারী তাঁহাকে এই শিক্ষা দিয়াছেন—তিনি তাঁহার নমস্যা দেবী।

বিদায়ের দিনে হাসি যে বনফুলটি শরৎকে পরাইয়া দিয়াছিল, সেটি শরতের বুকের পকেটেই থাকিত, —তাহা বাহির করিয়া লইয়া তিনি দেখিলেন, বুকের চাপে ফুলটি পেষিত হইয়া গিয়াছে—তবু যেন ঠিক তেমনটিই আছে, একটিও দল ইহার খসে নাই। রাজকুমারী-দত্ত ফুলমাল্যের দোলনগুচ্ছের সহিত সেই ফুলটি তিনি সযত্নে বাঁধিয়া লইলেন। তাহার পর মালাগাছি—অতি সাবধানে দেয়ালের হুক হইতে খুলিয়া একটি শূন্য কাগজের বাক্সে পুরিলেন। বাক্সটি যখন নিরাপদে ট্রাঙ্কে উঠিল, তখন তাঁহার প্যাকিংও শেষ হইল, তিনি বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন।

রাজকক্ষের পার্শ্বেই শরতের ঘর—রাজকুমারী থাকেন অন্তঃপুরে—অন্তঃপুরপ্রাসাদের চূড়ামাত্র এখান হইতে নজরে পড়ে; সেই চূড়ার দিকে চাহিয়া, মন্দিরমধ্যে বিরাজিত দেবীমূর্ত্তির মহিমা তিনি কল্পনা করিলেন। তখন কি আর কাহাকেও তাঁহার মনে পড়িয়াছিল? যেখানে ব্যথা—সেই-খানেই প্রথমে হাত পড়া স্বাভাবিক—কিন্তু তবুও হৃদয় সাবধানতা অবলম্বন করিতে চায়।

রাজকুমারী কিন্তু তখন অন্তঃপুরে ছিলেন না। তিনি শরতের ঘরের পাশেই—রাজার নিভৃত উপবেশন কক্ষে জানালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া পিতার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। রাজা মধ্যাহ্নের পর যেখানেই গমন করুন, যে কাজেই ব্যস্ত থাকুন—এই সময় প্রায়ই ফিরিয়া আসিয়া কন্যাকে লইয়া মোটরে বেড়াইতে যান। আজ তিনি এখনও ফেরেন নাই—রাজকুমারী একটু উৎকণ্ঠিত চিত্তে পথ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। সে দিনকার সেই আকস্মিক বিপদের পর হইতে—রাজার আসিতে বিলম্ব দেখিলেই জ্যোতির্ম্ময়ীর মনে একটু ভাবনা জন্মে।

বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। অপরাহ্নকাল প্রভাতের মতই অরুণ-রাগে সুরঞ্জিত করিয়া সূর্য্য-গোলক গাছপালার মধ্য দিয়া পশ্চিমপ্রান্তে ঢলিয়া পড়িতেছে। ভাদ্রের ভরা নদীর বক্ষে—লাল আলোর বিদ্যুৎ-লহরী চমকিয়া যাইতেছে। মধ্যাহ্নে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে—গাছপালা মাঠ এখনও আর্দ্র; মাঠের ধারে, গাছের শাখায়, আটচালার গায়ে সজ্জিত উৎসবের শুষ্ক ফুলমালা সহসা যেন নবীন হইয়া দুলিয়া উঠিয়াছে। মাঠে আজ খেলা চলিতেছে না, ব্যায়াম-উৎসবের পর দুইদিন ছেলেরা ছুটি পাইয়াছে। তবুও মাঠ শূন্য নহে, ছেলের দল—মাঠ, তাম্বু, আটচালা অধিকার করিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে। হারমোনিয়মের সঙ্গে হঠাৎ সেই গানটি আটচালার ভিতর হইতে ধ্বনিত হইয়া উঠিল

ভিক্ষাং দেহি জননী গো ভরিয়ে দে ঝুলি

বোধ হয় সেদিনকার মত তাহারা আবার অভিনয় আরম্ভ করিল। গানটি শুনিতে শুনিতে রাজকুমারী ক্ষণকালের জন্য অন্য চিন্তা ভুলিয়া গেলেন। সার্থকতার আনন্দে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু মাঠে সাজান শুষ্ক ফুলগুলির মত সে আনন্দ পরমুহূর্ত্তেই ম্লান হইয়া পড়িল। জ্যোতির্ম্ময়ীর বাসনা পূর্ণ হইয়াছে সত্য,—তাহার ব্যায়াম-সমিতিতে আজ কত লোক, কত যুবক, কত সুনিপুণ, —খেলোয়াড়। কিন্তু তথাপি কয়জন ইহারা?—

দেশের পক্ষে কয়জন? বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র যখন এই-রূপ আয়োজন হইবে—তখনই না একদিন তাহার মনোগত আশা-অভিলাষ পূর্ণ হইতে পারে!

ভারতের সর্ব্বদেশের লোক বীর বলিয়া পরিচিত,—সৈনিক শ্রেণীভুক্ত, কেবল বঙ্গবাসী এই অধিকার-বিচ্যুত। একটা জনরব—বাঙ্গালী ভীরু, বাঙ্গালী কাপুরুষ—এই অখ্যাতি অপবাদ কেমন করিয়া রটিল—কে রটাইল? যেদিন বাঙ্গালীর এই মিথ্যা কলঙ্ক অপনীত হইবে—স্বয়ং রাজা ইহাদিগের বীরত্ব স্বীকার করিয়া লইয়া ইহাদিগকে সেনার অধিকার দান করিবেন—সেইদিন—সেইদিনই জ্যোতির্ম্ময়ীর অন্তরতম আশা পূর্ণ হইবে,—তাহার আত্মা প্রসন্ন হইয়া উঠিবে,—তৎপূর্ব্বে নহে।

কিন্তু জ্যোতির্ম্ময়ী কি একলাই এরূপ করিয়া ভাবিতেছে? নহে, নহে, তাহা নহে, বাঙ্গালার দিন আসিয়াছে—সম্ভবতঃ দেশের অনেকেই তাহার মত করিয়া ভাবিতেছেন, এই অভিপ্রায়ে কাজ করিতেছেন—তাহার চিন্তা তাহার চেষ্টা—তাহার কার্য্য সেই শত সহস্রের মধ্যে একটি কণা মাত্র। "তাহাই হউক—তাহাই হউক—হে ভগবান্ তাহাই হউক। তুমি দেশের সকল লোকের মনের আকাঙ্ক্ষা-বাসনার সহিত আমার এই শক্তিকণাকে মিলিত সংযোজিত করিয়া ইহাকে মহান্ করিয়া, বিরাট করিয়া তোল।"

অস্তগামী সূর্য্যের দিকে চাহিয়া সে সর্ব্বান্তঃকরণে এই প্রার্থনা করিল। সূর্য্যদেব তাঁহার রক্তিম করমালা জ্যোতির্ম্ময়ীর মস্তকোপরি নিক্ষেপ করিয়া যখন তাহাকে আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক নদীর পরপারে অন্তর্হিত হইলেন, তখন বালিকা গৃহনিষ্ক্রান্ত হইয়া সম্মুখের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। এই সুবিস্তৃত বারান্দারই একধারে শরৎ দাঁড়াইয়াছিলেন, রাজকুমারীকে দেখিয়া তিনি নিকটে আগমন করিলেন।

জ্যোতির্ম্ময়ী বলিলেন "ডাক্তার-দা! আপনিও বুঝি বাবার জন্য অপেক্ষা করছেন? বেড়াতে যান নি যে কোথাও?"

"কাল বাড়ী যাব মনে করে', জিনিষপত্র প্যাক্ করছিলুম।"

"বাড়ী যাবেন? এত শীঘ্র?"

"শীঘ্র আর কই—প্রায় দু-মাস ত আপনাদের অতিথি হয়ে আছি—"

"এমন শীঘ্র শীঘ্র সময় চ'লে যায়। মনেই হয় না যে, আপনি এতদিন এসেছেন! আপনার বোধ হয় অনেক কাজের ক্ষতি হচ্ছে?"

"কাজের ক্ষতি!—না তা ঠিক বলতে পারিনে—"

শরৎ একটু থামিয়া থামিয়া কথাগুলা বলিলেন,—রাজকুমারী হাসিয়া কহিলেন—

"আপনি দেখছি আদর্শ বিনয়ী—"

দূরে অশ্বের পদশব্দ হইল উভয়েই সেইদিকে মনোনিবেশ করিলেন,—কিন্তু ক্রমশঃ সে শব্দ দূরে মিলাইয়া গেল। রাজকুমারী বলিলেন "ডাক্তার-দা—বাবা এখনও এলেন না—আমার একটু ভাবনা

"ভাবনার কি কারণ? তিনি যে অবস্থাতেই পড়ুন, আত্মরক্ষা করতে পারবেন—আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।"

"তা ঠিক। আচ্ছা বাঙ্গালীদের ভীরু ব'লে একটা অপবাদ আছে—না?"

শরৎ হাসিলেন—বলিলেন, "মেকলে এইরূপ ব'লে গিয়েছেন—"

"কিন্তু এমন মিথ্যা কথাটা আপনারাও ত অম্লান-বদনে মেনে নিচ্ছেন? বাঙ্গালী যদি ভীরু জাত হ'তো, তা হ'লে তাদের জমীদারী থাকত না। প্রত্যেক জমীদারীতে ত সারাদিন লাঠালাঠি চল্‌ছে—আর লাঠিয়ালেরা ত অকাতরে প্রভুর জন্য প্রাণ দিচ্ছে। এরা যদিও সামান্য লোক, তবু বীরত্বে কি এরা কোন শিক্ষিত রাজসৈন্যের চেয়ে কম?"

"গভর্ণমেণ্ট তা বোঝেন কই?"

"আপনারাও ত বোঝাবার চেষ্টা করেন ব'লে মনে হয় না। আমি কলকাতায় গিয়ে স্বদেশী চিত্র-মেলায় একখানা ছবি দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলুম! ছবিখানি বৃদ্ধ লক্ষ্মণসেনের; তিনি প্রাণভয়ে অন্তঃপুরের রাস্তা দিয়ে লুকিয়ে পালাচ্ছেন! ভীরুতার বীভৎস প্রতিমূর্ত্তি! আর এই চিত্রকল্পনার জন্য নবীন চিত্রকর নাকি দেশের নামজাদা চিত্রকরদের কাছে ভূয়সী প্রশংসা পেয়েছেন! দুঃখে আমার চোখ দিয়ে জল এসেছিল; ইচ্ছা হচ্ছিল, ছবিখানা টেনে নিয়ে ছিঁড়ে কুটি কুটি ক'রে ফেলি।"

ক্রোধের আবেগে জ্যোতির্ম্ময়ীর মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল! শরৎকুমার নীরব হইয়া রহিলেন। বালিকা পুনরায় উত্তেজিত ভাবে কহিল, "মিথ্যা কথা! মিথ্যা কলঙ্ক! কক্ষণো লক্ষ্মণসেন প্রাণভয়ে অমন ক'রে চোরের মতন পালান নি।"

"অসম্ভব ব'লেই ত মনে হয়। কিন্তু মুসলমান ঐতিহাসিকেরা নাকি ঐ রকম বলেছেন?"

"আর সেই মিথ্যা ইতিহাসকে আমরা অমর

অক্ষরে ধ'রে রেখে নিজেদের ভীরুতার প্রচারে প্রশংসা আদায় ক'রে গর্ব্ব অনুভব করছি। উঃ, আমার সমস্ত রক্ত আগুন হয়ে ওঠে! আচ্ছা—গণেশদেব, প্রতাপাদিত্য, সীতারাম প্রভৃতি বীরগণের চিত্র আমাদের চিত্রশালায় নেই কেন? চিত্রকরের কল্পনা-তুলিতে কেবল পলাতক লক্ষ্মণসেনই চিত্রিত হ'লেন?"

শরৎকুমার লজ্জিতভাবে মুখ নত করিলেন। বালিকা কহিল, "আসবেন ডাক্‌দা একবার ঘরের ভিতর" বালিকার অনুবর্ত্তী হইয়া শরৎ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে, বিচিত্রা দেবীর চিত্রের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া রাজকুমারী কহিলেন,—"ইনি বাবার প্রমাতামহ; বর্গির উপদ্রবের সময় ইনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। দেখুন, কেবল রাজপুতানায় নয় বাংলাদেশেও বীরাঙ্গনা আছে। আর আমি বেশ বলতে পারি, দরকার হ'লে এখনও অনেক মেয়ে দেশের জন্যে প্রাণ দেবে। আমাকে গর্ব্বিত ব'লে মনে করছেন—বোধ হয়?"

"মোটেই না। আপনি যথার্থই বীরাঙ্গনা।"

এই প্রশংসালাভে একটা নূতন রকম আনন্দে জ্যোতির্ম্ময়ীর হৃদয়-প্রাণ যেন ভরিয়া উঠিল। একটা বিদ্যুৎপ্রবাহের চমক তাহার সর্ব্বাঙ্গে প্রবাহিত হইয়া গেল। পণ্ডিত মহাশয় তাহাকে ত কত প্রশংসা করেন ম্যাজিষ্ট্রেট-দম্পতি ত আদর করিয়া কত কথা বলেন,—পিতার চক্ষেও ত জ্যোতির্ম্ময়ী সর্ব্বদা সুখ্যাতির আবেগ দেখিতে পায়, কিন্তু কাহারও প্রশংসায় তাহার হৃদয় ত ইতিপূর্ব্বে কোনদিন এমনতর একটা আত্মপ্রসাদে ভরিয়া উঠে নাই।

মনের অজ্ঞাতসারে তাহার মন যেন একটু লজ্জিত হইল। কথাটা চাপা দিবার অভিপ্রায়ে সে সলজ্জভাবে কহিল "আচ্ছা— ডাক্তার-দা আপনার ত একটা ambition আছে?"

শরৎ কোন উত্তর না দিয়া হাসিলেন, বালিকা বলিল—

"আপনার ambition যে কি, তা কিন্তু আমি বলতে পারি; ভাল ডাক্তার হওয়া না?"

"নিশ্চয়ই!"

"আমার কি ambition শুনবেন? আমাদের জাতকে সৈনিকপদে প্রতিষ্ঠিত দেখা। আচ্ছা, আমাদের দেশের মুখপাত্র যাঁরা—তাঁরা কেন এজন্যে চেষ্টা করেন না?"

"করেন বই কি? কত লেখালেখি করেন।"

"কাগজে ওরকম ক'রে এক কলম মাঝে মাঝে লিখলে কি কাজ হয়? দেশের সর্ব্বসাধারণের মনে এ ভাব জাগিয়ে তোলা চাই; সে রকম চেষ্টা কি করছেন তাঁরা?"

"তা ঠিক জানি না। এইটুকু জানি, যে কিছুদিন থেকে দেশের মুরুব্বির বঙ্গবিভাগ আইন নিয়েই ব্যস্ত আছেন।"

"হ'লোই বা বঙ্গবিভাগ,—তা নিয়ে এত গোলোযোগ কেন? ক্ষতি কি তাতে?"

"একেই আমাদের মধ্যে একতা নেই; তাতে আমরা আরও তফাৎ হ'য়ে পড়ব,—সকলে এই আশঙ্কা করেন।"

"বৃথা আশঙ্কা। ভিতরে একতা থাকলে বাইরের লোকে কি তা ভাঙ্গতে পারে?— যদি দেশের লোকে বঙ্গবিভাগ না চায়, তা হ'লে গভর্ণমেণ্টের এ কাজে একতা বাড়বে তবু কমবে না।"

"আপনার বাণীই সফল হোক্!"

ইঁহারা ঘর হইতে পুনরায় বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। সহসা হারমোনিয়মের সঙ্গে ধ্বনিত গান বন্দেমাতরম্ শব্দে ডুবিয়া গেল। জ্যোতির্ম্ময়ী হাসিয়া বলিলেন "পণ্ডিত মহাশয় দেখছি ছেলের দলে ঢুকলেন।"

"উনি ত আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র।"

"উনি আমার গুরুদেব। ওঁর মধ্যে যে খাঁটি জিনিষ আছে, তা সংসারে বড় দুর্লভ। কুন্দ যখন ওঁকে নিয়ে হাসি-বিদ্রূপ করে, আমার এমন রাগ ধরে।"

শরৎ হাসিলেন—হাসিয়া বলিলেন—"জানেন ত খাঁটি জিনিষ মাত্রেরই ভার বেশী; হাল্কা জিনিষের পক্ষে সেটা স'য়ে নেওয়া ত সব সময় সহজ নয়। বিশেষ যখন আধার বস্তু balast হারিয়ে নিজেই টলমল করতে করতে চারিদিকে একটা laughing গ্যাসের সৃষ্টি করেন—তখন দর্শক বেচারাদের অবস্থা কি দাঁড়ায়, একবার ভেবে দেখুন দেখি? আমাকেও এইরূপ অবস্থায় কোন কোন সময় পড়তে হয়েছে! জানেন ত মানুষ স্বভাবতঃই পাপী; আমাদের পাপ বংশানুক্রমে আমাদের মধ্যে সংক্রামিত হ'য়ে আসছে, আমার এই অজ্ঞানকৃত পাপের জন্যে আশা করি মার্জ্জনা পাব।"

বলিতে বলিতে শরতের মনে পড়িল, হাসিকে। পণ্ডিত মহাশয়ের ধরণ-ধারণ কথাবার্ত্তায় হাসি যে কিরূপ হাসিত—তাহা তিনি কল্পনার চক্ষে প্রত্যক্ষ করিলেন,আর জ্যোতির্ম্ময়ীর মনের সর্ব্বাপেক্ষা নিকট স্তরে যে কথা জাগিতেছিল—তাহার মনে পড়িল

সেই কথা। শরতের কথায় রাজকুমারী হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা ডাক্তার-দা' ভেবে দেখুন দেখি, পণ্ডিত মহাশয়ের সে দিন কি আহ্লাদ হবে—?"

"কোন্ দিন ?"

"যে দিন তিনি বাঙ্গালীদের সৈনিকবেশ দেখবেন—অবশ্য যদি এমন দিন কখনও আসে! আচ্ছা, আমরা যে পথ ধরেছি - এটা কি ঠিক পথ ডাক্তার-দা? ব্যায়াম শিক্ষাতে ছেলেদের মনের তেজও কি বাড়বে? আর গভর্ণমেণ্টের চোখে— এক দিন সেই তেজ সূর্য্যচন্দ্রের মতই এমন প্রত্যক্ষ হ'য়ে উঠবে যে, তখন আর এদের বীরত্ব অগ্রাহ্য করতে পারবেন না?"

"গভর্ণমেণ্ট কি বুঝবেন না বুঝবেন বলতে পারিনে,—তবে ছেলেরা এতে যে তেজস্বী হ'য়ে উঠবে,—তাতে সন্দেহ নাই।"

"কে জানে এক এক সময় আমার মনের মধ্যে এমন একটা নৈরাশ্য জমাট বাঁধে—মনে হয় এ যেন আমার ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে সাগর বাঁধার প্রয়াস হচ্ছে!"

"না রাজকুমারী, আপনি ক্ষুদ্র শক্তি নন, শক্তিতে আপনি মহীয়সী; আপনার কার্য্যের ফল যে এক দিন খুব বড় হ'য়ে উঠবে, তাতে সন্দেহ করবেন না।"

অতিরিক্ত উৎসাহের সহিতই শরৎকুমার এ কথা বলিলেন, তাঁহার বাক্যে সত্যের একটি মূর্ত্তি প্রতিভাত হইল। আবার পূর্ব্বের ন্যায় একটা আনন্দ-প্রবাহ রাজকুমারীর হৃদয়ে উথলিয়া উঠিল। জ্যোতির্ম্ময়ী সেই স্রোতে চালিতা হইয়া কহিলেন—"আপনি জানেন না - ডাক্তার-দা—আমি কতটা দুর্ব্বল। এক এক সময় কাজ করবার কোন শক্তিই থাকে না আমার। আচ্ছা ডাক্তার-দা—আপনি আমার সহায় হবেন?"

"যদি অধিকার দেন,—সর্ব্বপ্রাণে।"

এই উত্তরে সহসা যেন জ্যোতির্ম্ময়ী সচেতন হইয়া উঠিল। ঠাকুরমার ঠাট্টা মনে পড়িয়া গেল। শরৎ-কুমার তাহাকে ভুল বুঝিলেন না ত?—

অকারণে সহসা অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া উঠিয়া বালিকা বলিল—

"মাপ করবেন—শরৎবাবু, কি বাজে বকৃছি!— আমার সহায় বন্ধু আর কেউ হ'তে পারবে না— আমি নিজেই—"

পিতার কণ্ঠস্বর তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল— রাজা সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে ডাকিলেন—"রাণি!" জ্যোতির্ম্ময়ী চমকিয়া উঠিল উভয়ে কথাবার্ত্তায় এত তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিল যে, কখন যে রাজা ঘোড়া হইতে নামিয়া উপরে উঠিয়াছেন—তাহা কেহই জানিতে পারে নাই। মুখের কথা অসমাপ্ত রাখিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী বলিয়া উঠিল—"বাবা এসেছেন!" বলিয়া তাঁহাকে স্বাগত করিয়া লইবার জন্য সিঁড়ির নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। শরৎ অপরাধীর মত বারান্দাতেই দাঁড়াইয়া রহিলেন;—হঠাৎ কি কথায় কি ব্যবহারে রাজকুমারীকে তিনি অপ্রসন্ন হইবার কারণ দিলেন—তাহা তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না।

রাজকুমারীও বোঝেন নাই কোন্ ভাবের এ উন্মেষণা। কেন তিনি বিরক্ত হইলেন? কাহার প্রতিই বা বিরক্ত হইলেন? নিজের প্রতি না শরতের প্রতি?

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

দুর্ঘটনা

খেলায় হারিল বিজনকুমার, শরৎকুমারের কণ্ঠে উঠিল রাজকুমারীর ফুলমাল্য; ইহার প্রতিশোধ গ্রহণে বদ্ধপরিকর হইলেন সুজন রায়। জ্যোতির্ম্ময়ীকে পুত্রবধূ করিবেন—এই সংকল্পে কিছুদিন যে উপদ্রব-বাণ কার্ম্মুকাবদ্ধ রাখিয়াছিলেন, আবার রীতিমত ভাবে তাহার বিক্ষেপণ আয়োজন আরম্ভ হইল। নদীতে একটা নূতন চড়া পড়িতেছিল; সে চড়া যে রাজার জমীদারীভুক্ত, তাহাতে কোন সংশয়ই নাই; আইন আদালত বুঝিয়া এত দিন সুজন রায় নিজেই তাহা মানিয়া লইয়াছিলেন, হঠাৎ এক রাত্রে রাজ-প্রজাদিগের সহিত যুদ্ধ বাধাইয়া এই চরের একাংশ নিজ এলাকাভুক্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। চেষ্টা নিষ্ফল হইল; জিতিল রাজদলই,—কিন্তু উভয়পক্ষেই জখম হইল অনেক লোক। ইহার মধ্যে রাজসর্দ্দার বলবন্ত সিং গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হইল। এই সংবাদ পাইয়া দেওয়ানের সহিত পরামর্শে ব্যাপৃত থাকায় আজ বিকালে যথাসময়ে রাজা গৃহে ফিরিতে পারেন নাই।

পিতাকে স্বাগত করিয়া লইতে সিঁড়ির ঘরে আসিবামাত্র তাঁহার চিন্তা-বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী অন্য সব কথা ভুলিয়া গেল। তাহার সৌৎসুক কণ্ঠ হইতে ধ্বনিত হইল - "বাবা!"

এই ক্ষুদ্র সম্বোধন-শব্দের মধ্যে একটা মর্ম্মান্তিক আকুল প্রশ্ন অভিব্যক্ত হইয়া উঠিল। রাজা কহিলেন—"চল রাণি, ঘরে গিয়ে সব কথা বলছি।" বলিয়া কন্যার স্কন্ধে স্নেহ হস্ত সংস্থাপনপূর্ব্বক পার্শ্ববর্ত্তী চরকরাকে কহিলেন—"ডাক্তারকে ডেকে আন।" জ্যোতির্ম্ময়ী কহিল,—"ডাক্তার-দা তোমার অপেক্ষায় বারান্দাতেই আছেন। তিনি কাল বাড়ী যেতে চান।"

পিতা, কন্যা গৃহে প্রবেশ করিয়া আসন গ্রহণ করিবার পর শরৎকুমার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রাজা তাঁহাকে উপবিষ্ট হইতে ইঙ্গিত করিয়া কহিলেন—"বোসো ডাক্তার। তুমি আমাদের ছেড়ে যেতে যাও, কিন্তু আমরা তোমাকে ছাড়তে পারি কই!" শরৎকুমারের মুখ হাস্য-প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, তিনি কহিলেন—"আমি ত যাবার কথা এখনো আপনাকে জানাই নি।"

—"মনের কথা মুখের অপেক্ষায় সব-সময় যে অব্যক্ত থাকে না, এই ত দায়। কিন্তু আপাততঃ একটা যে মহা দায়ে পড়া গেছে, তা থেকে তোমাকে উদ্ধার করতে হবে।"

বলিয়া রাজা সংক্ষেপে তাঁহার লাঠিয়ালগণের জখম হওয়ার বৃত্তান্ত বলিলেন। শরৎ কহিলেন—"রোগীর চিকিৎসা ত আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম; আপনি যদি সে জন্য আমাকে অমন ক'রে অনুরোধ করেন ত লজ্জায় পড়তে হয়। আপনার হাসপাতালে এত প্রবীণ চিকিৎসক থাকতেও আপনি যে আমার মত নবীন চিকিৎসকের উপর এতদূর বিশ্বাস স্থাপন করেছেন, এতে ত আমিই কৃতজ্ঞ।"

জ্যোতির্ম্ময়ীর মন হইতে কিছু-পূর্ব্বের অপ্রসন্নভাব একেবারেই মুছিয়া গিয়াছিল; সে তাহার আনন্দপূর্ণ দৃষ্টি শরতের মুখের প্রতি স্থাপন করিয়া কহিল—"ডাক্তার-দা, আপনার বিনয়ের এক কড়াও যদি পেতুম আমি!"

"বিনয় না রাজকুমারি, সত্যই আমি আপনাদের সদয় ব্যবহারে সর্ব্বপ্রাণে—"এই পর্য্যন্ত বলিয়া শরৎ সহসা থামিয়া গেলেন; ক্ষণপূর্ব্বে এইরূপ ভাষার পর রাজকুমারীর নয়নে, স্বরে, কথায় যে বিরক্তি প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা মনে পড়িয়া গেল,—কথাটা অসমাপ্ত রাখিয়াই—রাজার দিকে চাহিয়া শরৎ কহিলেন "ঘটনাটা ঘটেছে কোন্ সময়? আঘাত পেয়েছে তারা কখন্?" রাজা কহিলেন—"শেষ-রাত্রি থেকে মারামারি সুরু হ'য়ে আজ সকাল আটটা পর্য্যন্ত চলেছিল।"

—"এ পর্য্যন্ত তাদের ক্ষতস্থানে কোন ডাক্তারের হাত পড়েনি বোধ হয়?"

—"না। তবে লাঠিয়ালরা সাধারণতঃ নিজের চিকিৎসা নিজেরাই করে। অনেক ডাক্তারের চেয়ে তাদের মধ্যে কেহ কেহ এ-রকম ডাক্তারিতে বরঞ্চ বেশী পটু। তবে এবারকার দাঙ্গায় আমার লোকজনেরা তেমন প্রস্তুত ছিল না; তাই বেশী লোকও জখম হয়েছে আর দু'এক জন বেশী রকম চোটও পেয়েছে। সর্দ্দারের অবস্থা এতই খারাপ যে, তুমি আছ ব'লেই ভরসা হচ্ছে যে তবুও হয় ত বেঁচে যাবে।"

—"কিন্তু এ-রকম আঘাতের চট্‌পট্ প্রতিবিধান আবশ্যক। আমার কি সেখানে যেতে হবে?"

—"না। পাল্‌কী ক'রে তাদের আনা হচ্ছে। এখনি তারা এসে পড়বে।"

বলিতে বলিতে খবর পাওয়া গেল,—আহতেরা হাসপাতালে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, নীচে মোটর প্রস্তুত ছিল—শরৎকে সঙ্গে লইয়া পবন-বেগে অবিলম্বে রাজাবাহাদুর হাসপাতালে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

অন্যান্য আহতদিগের শুশ্রূষা-ভার হাসপাতালের চিকিৎসকগণের উপর দিয়া শরৎ সর্দ্দারের ক্ষতস্থান পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন—তাহার এক-দিকের কণ্ঠাস্থি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে,—মনে হয় যেন ভোঁতা খড়্গের আঘাতে স্কন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে; রোগী অর্দ্ধ অচেতন। শরৎকুমার ক্লোরাফর্ম্ম দ্বারা তাহাকে সম্পূর্ণ সুপ্ত করিয়া ক্ষতস্থান ছেদনপূর্ব্বক সতর্কতা এবং তৎপরতার সহিত ভগ্নাস্থিগুলি যথাস্থানে পুনঃসংযোজিত করিয়া ঔষধাদি লেপনপূর্ব্বক সুনিপুণভাবে বাঁধিয়া দিলেন। রাজা মুগ্ধনেত্রে তাঁহার হস্ত-নৈপুণ্য দেখিতে লাগিলেন।

শরৎকুমারের কার্য্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই দ্বারদেশে একটা গোলযোগ উত্থিত হইল; রাজা তাড়াতাড়ি বারান্দায় আসিয়া দেখিলেন, হাসপাতালে প্রবেশ-উদ্যত এক জন বৃদ্ধ লোককে প্রহরী বাধা দিতেছে। রাজাকে দেখিয়া প্রহরী সেলামপূর্ব্বক স্থির হইয়া দাঁড়াইল; সেই অবকাশে বৃদ্ধ ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার পদতলে পড়িয়া কাঁদিয়া কহিল "হুজুর, ধর্ম্মাবতার! রক্ষা করেন, আমার ছাঁইলার মুখের চাপা (চোয়াল) ভাঙ্গা গেছে—ডাকতরের নামডাক শুইনা আইনি।"

রাজা বুঝিলেন, ইহারা বিপক্ষ-দলের লোক। কহিলেন—"কোথায় তোমার ছেলে?"

—"ঐ ডুলির মধ্যে গাছের তলায়; হুকুম হইলেই আনি।"

এক জন কম্পাউণ্ডার একটু দূরে বারান্দারই এক অংশে দাঁড়াইয়াছিল, সে রাজার পেছন হইতে বৃদ্ধকে মুখ-খিঁচাইয়া চাপাকণ্ঠে কহিল—"তোর জমীদারের কাছে যা না। যার শিল যার নোড়া—তার ভাঙ্গ লেন মাথা,—আবার এখানে ডাক্তর দেখাতে এসেছেন—ম'লো যা!"

তাহার সকল কথা রাজার কর্ণে প্রবেশ করিল না, তবে সে যে বৃদ্ধকে ভর্ৎসনা করিতেছে—ইহা বুঝিয়া বলিলেন, "চুপ কর হে! মনুষ্যধর্ম্মের নিকট পক্ষবিপক্ষ শত্রুমিত্র নাই। যাও সর্দ্দার, তোমার ছেলেকে নিয়ে এস।"

দুর্মুখ কম্পাউণ্ডার রাজাদেশেও আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া মুখের কথাগুলা চিবাইয়া অস্পষ্ট স্বরে কহিল—"হ্যাঁ, তার পর আরাম হ'য়ে আবার আমাদের রাজার বিরুদ্ধে লড়।" এই কথা বলিয়া রাজাকে তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ কটাক্ষ নিক্ষেপের অবসর না দিয়াই সরিয়া পড়িল। বৃদ্ধ ব্যক্তি রাজার পা ধরিয়া কহিল,—"রামাবতার! আপন এলাকায় আমাগো একরত্তি ভিটা দিতে আজ্ঞা হয়,—আমরা আর কোনখানে যামু না—চিরদাস হইয়া থাকিমু।"

রাজাজ্ঞায় তাহার পুত্র তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে আনীত হইল।

রাজ-সর্দ্দারের কণ্ঠের বাঁধন শেষ করিয়া শরৎকুমার বিপক্ষদলের লোকেরও চোয়াল ঠিক করিয়া বাঁধিয়া দিলেন। কার্য্য শেষ হইলে হস্তাদি প্রক্ষালণের পর রাজাকে বলিলেন,—"এদের ব্যাণ্ডেজ দু'দিনের আগে আর খোলার দরকার হবে না। ইতিমধ্যে আমার একবার কলকাতা থেকে ঘুরে এলে ভাল হয়। ব্যাণ্ডেজ খোলার পর যে-রকম ঔষধাদির দরকার—সে সব প্রায়ই এখানে কিছু নেই। আমি নিজে গিয়ে সে সব দেখে শুনে আনতে চাই। আজই রাতে যদি ছাড়ি তা হ'লে জিনিষ-পত্র নিয়ে ঠিক সময়েই আবার ফিরে আসতে পারব।"

তাহাই স্থির হইল, অনাদি নামে একটি বালককে সঙ্গে লইয়া সেই রাত্রেই শরৎকুমার কলিকাতা যাত্রা করিলেন।

রাত্রিকাল,—ফার্ষ্ট ক্লাশ ট্রেণের একটি কামরায় তাঁহারা দুই জন মাত্র আরোহী। অনাদি এক-প্রান্তের শয্যায় অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় বসিয়া, ষ্টেশন হইতে কেনা আট আনা মূল্যের ডিটেক্‌টিভ নভেল একখানা পাঠে মগ্ন; অন্য-প্রান্তের শয্যায় শুইয়া শরৎকুমার মুক্ত বাতায়ন-পথে আকাশ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। কত পরিচিত অপরিচিত, একই তারকারাশি ট্রেণের গতির সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া-ফিরিয়া বারবার তাঁহার নয়নের উপর ভাসিয়া উঠিতেছিল। গতির দ্রুততায় চেনা তারাগুলিকেও সহসা তিনি চিনিতে পারিতেছিলেন না। 'ওরায়নে'র রাজ-সিংহাসনের অর্দ্ধেকখানা একবার তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন, তাহার দুইটি নক্ষত্র পরিচিত সহাস্য দৃষ্টিতে তাঁহাকে যেন সম্ভাষণ করিয়া গেল। শরতের নেত্র তখন ঘুমে ভরিয়া আসিতেছে। ঘুমের ঘোরে তাঁহার মনে হইল, উহার মধ্যে জ্বলজ্বলে বড় তারাটি জ্যোতির্ম্ময়ী, আর ছোটটি হাসি। দেখিতে দেখিতে তাঁহার তন্দ্রানিমীলিত নেত্রে সেই দুইটি তারা মিলিয়া-মিশিয়া এক হইয়া গেল; শরৎ নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন।

অর্দ্ধরাত্রে একটা ছোট ষ্টেশনে ট্রেণ থামিবামাত্র এক জন স্থূলকায় পাশ্চাত্য মূর্ত্তি সজোরে দ্বার খুলিয়া ভৃত্যের সহিত কামরায় উঠিয়া পড়িল। মূর্ত্তিটি এতই রৌদ্রদগ্ধ যে, তিনি যে কোন্ জাতীয় জীব—অর্থাৎ খাঁটি ইয়োরোপীয় বা ফিরিঙ্গি—তাহা ঠিক বুঝা যায় না। তাঁহার ভৃত্য কামরার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া নিম্নস্থ কুলির নিকট হইতে সাহেবের আসবাব-পত্র উপরে তুলিতে লাগিল। সাহেব দৃষ্টি দিতে লাগিলেন—নীচের শয্যা দুইটার উপর। বিজুলি-আলোকে দুইটা 'বার্থ ই' নিগার-অধিকৃত দেখিয়া তাঁহার মেজাজ অত্যন্ত গরম হইয়া উঠিল। ইচ্ছা হইতে লাগিল—ইহাদের একটাকে অন্ততঃ বজ্রবলে ধরিয়া জানালার বাহিরে নিক্ষেপ করেন। সুখের বিষয় এই যে, এ যুগে—ইচ্ছামাত্রেই সুরাসুরেরও মনস্কামনা পূর্ণ হয় না। পরিচিত ষ্টেশনমাষ্টারকে বলিয়া এ দুইটাকে যে গৃহ-বহিষ্কৃত করিবার চেষ্টা করিবেন,—তাহারও সময় নাই। তখনই গাড়ী ছাড়ার ঘণ্টা পড়িল। ভৃত্য জিনিষপত্রগুলা কামরার এক পার্শ্বে স্তূপাকৃতি করিয়া রাখিয়া শয্যাটা উপরের বার্থের উপর ফেলিয়া তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িল। সাহেবের নিজের হাতে ছিল একটা গ্লাডষ্টোন ব্যাগ। তিনি সেটাকে অনাদির পায়ের কাছে খালি জায়গার উপরে রাখিয়া—তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহাকে একবার ভাল করিয়া দেখিলেন, তাহার পর পুনরায় খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া উপরের বেঞ্চ দুই হাতে ধরিয়া স্খলিত বাক্যে বলিলেন—Sir Babooneau—will you get down." তাঁহার মুখ হইতে তখন ভুরভুর্ করিয়া মদের গন্ধ বাহির হইতেছিল। অনাদি জ্যোতির্ম্ময়ীর ব্যায়াম-সমিতির মেম্বার, ইংরাজ ফিরিঙ্গি দেখিয়া সে দমিবার পাত্র

নহে, সাহস দেখাইবার এমন সুযোগও কদাচিৎ ঘটে, সুতরাং সে নভেলখানা বন্ধ করিয়া—সাহেবের ব্যাগটার উপরে বেশ ভাল রূপেই পা লম্বা করিয়া দিয়া বলিল,—"Why should I get down, you sir pigledy? You may go out if you like!" বানরটার স্পর্দ্ধায় সাহেব অবাক হইয়া গেলেন। উপরের বেঞ্চ হইতে হাত নামাইয়া বিকৃত কণ্ঠে—"all right sir" বলিয়া তাহার প্রতি ঘুষি বাগাইলেন, অনাদি লাফাইয়া শয্যা ত্যাগ করিল. কিন্তু সোজা হইয়া দাঁড়াইবার পূর্ব্বেই সাহেবের এক ঘুষি তাহার মাথায় পড়িল। যদি সেই উদ্যত বজ্রমুষ্টি সুরাপানের ফলে হীনবল হইয়া না পড়িত, তবে অনাদির প্রাণরক্ষা দায় হইয়া উঠিত। কিন্তু এই স্খলিত মুষ্ট্যাঘাতের বিনিময়ে সাহেবের মাথায় অনাদির যে সবল ঘুষি দুইটি পড়িল, তাহাতে সাহেব বেশ সচেতন হইয়া উঠিলেন।

তখন বাম হস্ত ঢালরূপে মুখের সম্মুখে রাখিয়া ডান হস্ত বাড়াইয়া কহিলেন,—"Beg your pardon sir—We are quits now, let us be friends." পদানত শত্রুকে ক্ষমা করা হিন্দুর পক্ষে সহজ ধর্ম্ম, সাহেবের আহ্বান-বাক্যে অনাদি প্রফুল্লভাবেই হাত বাড়াইয়া দিল।

গোলমালে ইতিপূর্ব্বেই শরতের নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু উভয়ের দ্বন্দ্বযুদ্ধে অনাবশ্যক তৃতীয় হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছা না করিয়া তিনি নীরবে পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছিলেন। যেমন মিটমাট হইয়া গেল, অমনি তিনি অনাদিকে রুমাল ভিজাইয়া আনিতে আজ্ঞা করিয়া সঙ্গের ব্যাগটা খুলিয়া ঔষধ বাহির করিলেন। সাহেব এ সময়েও নিজের ব্যাগটার কথা ভোলেন নাই; তাড়াতাড়ি সেটা অনাদির বেঞ্চ হইতে টানিয়া লইয়া পাশে রাখিয়া, শরতের পরিত্যক্ত শয্যায় বসিয়া হাঁপাইতে লাগিলেন—আর শরৎ সুনিপুণ হস্তে তাঁহার আহত মস্তকে পটি বাঁধিয়া দিলেন। কার্য্য শেষ করিয়া তাহাকে কহিলেন—"আমি বরঞ্চ উপরে যাইতেছি, আপনি এইখানেই শয়ন করুন।"

শরৎ উপরে উঠিলেন; নভেল পড়িবার প্রবৃত্তি আর অনাদির তখন ছিল না,—বইখানা বালিসের নীচে গুঁজিয়া সেও শুইয়া পড়িল। সাহেব বিনা বাক্যব্যয়ে কিছুক্ষণ সেইভাবেই বসিয়া রহিলেন। তাহার পর ব্যাগটা খুলিয়া একটা শিশির তীব্র উপাদান—একনিশ্বাসে পান করিয়া শয্যাগ্রহণ করিলেন। কামরা আবার নীরব হইয়া পড়িল।

খানিক পরে অনাদির মনে হইল,—তাহার বুকের উপর যেন পাথরের ভার চাপিয়াছে—নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছে। অতি কষ্টে ঘুমের ঘোরেই সে চোখ মেলিয়া দেখিল, সাহেব দুই হাতে তাহার বক্ষ চাপিয়া বলিতেছেন,—"You savage, you niggard, you dared to insult me! Don't you know who I am! My nick-name is Satan!"

অনাদির তখন সকল শক্তি অবসিত, মূর্চ্ছার পূর্ব্বে লোকের যেরূপ অবস্থা হয়, সেইরূপ অবস্থা,—দারুণ কষ্টের একটা চেতনা ছাড়া অন্য কোনরূপ জ্ঞান নাই। সেই অবস্থায় সে অস্ফুট কণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। শরৎকুমার সে শব্দে সহসা জাগরিত হইয়া—লাফাইয়া নামিয়া পশ্চাৎ হইতে সাহেবের কোট ধরিয়া সজোরে টানিলেন। সাহেব পড়িতে পড়িতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অদূরে দরজার কাছে তাহার ফুলগাছের টুক্‌রিতে একখানা কুক্‌ড়ি বেঁধান ছিল; সেই কুক্‌ড়িখানা তুলিয়া লইয়া বাঘ যেমন মুখের শীকার ফেলিয়া আক্রমণকারীকে দেখে, সেইরূপ ভীষণ দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। তখনও নেশায় তাঁহার পা টলমল করিতেছিল, হাতেরও জোর ছিল না। সুতরাং কুক্‌ড়িখানা কাড়িয়া লওয়া শরতের পক্ষে কঠিন হইল না। তবে পিঁপড়ারও মরণ-কামড়ের জোর আছে, সাহেবের স্খলিত হস্তের আক্রমণও একেবারে ব্যর্থ হইল না। টানাটানির সময় কুক্‌ড়ির অগ্রভাগ শরতের হাতের কব্‌জার উপর একটু বিঁধিয়া গিয়া দু'এক ফোঁটা রক্ত পড়িল। কুক্‌ড়িখানা জানালার বাহিরে নিক্ষেপ করিয়া শরৎ বাথরুমে গিয়া হাতটা জলের নীচে রাখিতেই রক্তপড়া বন্ধ হইয়া গেল। ঘরে আসিয়া দেখিলেন,—সাহেব তাঁহার শয্যায় শুইয়া স্খলিত বচনে অশ্রাব্য গালিবর্ষণ করিতেছেন, আর অনাদি যেন তখনও ঠিক সচেতন হইয়া উঠে নাই; কেমন যেন মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া আছে। তাঁহার ভয় হইল—হয় ত বা বক্ষে সে বিশেষ আঘাত পাইয়াছে। নিজের হাতের কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়া তিনি তাহাকে পরীক্ষা করিতে বসিলেন। তাঁহার স্পর্শে অনাদির সে মোহভাব কাটিয়া গেল; তিনি তখনও প্রফুল্লচিত্তে তাহার কপালে আর্দ্র হাত বুলাইতে লাগিলেন।

প্রাতঃকালে ভৃত্য আসিয়া সাহেবের নিদ্রাভঙ্গ করিল। প্রসাদপুরের একটা ষ্টেশন আগে বিষাদপুর—সেইখানে তাহারা নামিয়া গেল। শরৎ পরে

জানিলেন—এই ফিরিঙ্গিপুঙ্গব বিষাদপুর সরকারের আসাম-টি-ষ্টেটের দুর্দ্দান্ত ম্যানেজার।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

অনাদি বাড়ী আসিয়া, ট্রেণের বিপদের ঘটনা বেশ মজাইয়া জমাইয়া যখন তখন রাজকুমারীর নিকট গল্প করে। সেই এক কথা কতবার শুনিয়াও রাজকুমারীর বিরক্ত ধরে না; তিনি শুনিয়া হাসেন, কৌতুক অনুভব করেন; অনাদির গল্পের ভাষায় প্রতিবারই তিনি একটু নূতন রং দেখিতে পান।

আজও সেই কথাই হইতেছিল। রাজকুমারী কহিলেন—"তুমি যে অনাদি-দা রাঙা মুখ দেখে ভয় পাও নি,—তার অব্যর্থ মুষ্টিকেও ব্যর্থ করেছ—এতে আমার এত আহ্লাদ হচ্ছে—কি বলব।"

অনাদির বয়স অষ্টাদশ, কিন্তু ধরণ-ধারণে, ভাবে, সে আরও ছোট। রাজকুমারীর প্রশংসায় সে আহ্লাদিত হইয়া কহিল—"দেখ রাজকুমারী ভাই—তোমার উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি কি না?"

"তা যদি না করতে ত তোমার সঙ্গে জন্মের আড়ি হ'তো। কোন সাহসের কাজে আমার ভাইদের আমি মরতে দেখলেও খুসী হব—কিন্তু—"

"তোমার ভাগ্যে সে সুখটা ঘটতে ঘটতে রয়ে গেছে দিদি; যদি ডাক্তার-দা না থাকতেন ত নিশ্চয়ই সে সাপটা আমাকে মেরে ফেলত। দেখ ভাই রাজকুমারী, ডাক্তারকে যতই আমি দেখছি, চিনছি, ততই তাঁর প্রতি আমার ভালবাসা বাড়ছে। একটা কথা বলব ভাই?"

"বল না অনাদি-দা।"

"তুমি কিন্তু হাসবে। বল হাসবে না?"

"বেশ হাসব না,—বল তুমি।"

"আমার মনে হয় কি জান? আমি যদি স্ত্রীলোক হতুম ত ডাক্তারকে নিশ্চয়ই বিয়ে করতুম।"

জ্যোতির্ম্ময়ী শপথ-সত্ত্বেও হাসিয়া কুটিকুটি হইল। অনাদি সলজ্জে কহিল—"আমি জানি তুমি হাসবে! আচ্ছা তবে ও কথা যাক, সেই সাপটার কথা শোন। সত্যি সত্যি এত দিন পরে ইভের direct বংশধরের আমি দেখা পেয়েছি। যেই ঘুষি চালালুম অমনি beg your pardon, তার পর যেই ঘুমিয়ে পড়েছি, অমনি ছোবল্। এ রকম লোক সংসারে আছে, না দেখলে ঠিক বিশ্বাস করা যায় না।"

"সাহেব কিন্তু তোমাদেরই অপরাধী ক'রে নালিস করেছে শুনছি!"

"সত্যি না কি? রাজা মামা নালিস-ফরীদ ভালবাসেন না—নইলে আমাদেরই ত নালিস করবার কথা। সে সাপের বাচ্ছা নালিস করে কোন সাহসে?"

"সাপের বাচ্ছা এই সাহসেই।"

"তা বেশ! মরবার আগেই পিপড়ার পালক গজায়। যখন ঢেটোয় কাঁটা মাথায় কাঁটা দিয়ে তাঁকে শ্রীঘর গর্ত্তে চালান দেবে, তখন আমরা ঘরে এসে পিক্‌নিক্ করব,—কি বল ভাই রাজকুমারি?"

রাজকুমারী হাসিয়া এই বাক্যের অনুমোদনপূর্ব্বক আগে হইতেই সে মকদ্দমার ডিক্রি ডিশমিশ জারি করিয়া সেদিনকার মত এ গল্পের উপসংহার করিলেন।

সেই ফৌজদারী মকদ্দমা দুই চারিদিনের মধ্যেই শেষ হইল; কিন্তু ফল দাঁড়াইল, ঠিক বিপরীত। বিচারে অনাদি পক্ষেরই হার হইল। বিচারক সবডিভিজনের মুন্সেফ স্বজন রায়েরই সম্পর্কীয় লোক। তাঁহার রায়ের প্রধান যুক্তি ইংরাজ মিথ্যা বলে না। এই যুক্তি সমর্থক প্রমাণও তিনি যথেষ্ট দেখাইলেন। প্রথমতঃ সাহেব অনাদিকে বিছানা হইতে উঠিতে বলায় অনাদি যে তাঁহাকে ঘুষি মারিয়াছিল, তাঁহার স্ফীত কপাল এখনও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। দ্বিতীয়তঃ, যে কুকড়িখানা তিনি শরৎকুমারের হাত হইতে টানিয়া গাড়ীর বাহিরে ফেলিয়া দিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন, সে কুকড়িখানাও যথাস্থানে পাওয়া গিয়াছে। এ কথাও যে সাহেবের ব'নানো কথা নহে—ইহা দ্বারা তাহাই প্রমাণ হইতেছে। অতএব ইহারা দুই জনেই যে অপরাধী, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এই রূপ যুক্তির বলে মুন্সেফ মহাশয় সামান্য মারামারির (assaulting charge) অপরাধে অনাদির সশ্রম এক মাসের কারাবাস ব্যবস্থা করিলেন; আর শরৎকুমারকে খুন অভিপ্রায় জনিত (culpable homicide) গুরুতর দোষে দোষী করিয়া সশ্রম পাঁচ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। জামিনে অবশ্য তাঁহারা উভয়েই আপাততঃ মুক্তি লাভ করিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট পুনর্বিচারের জন্য তাঁহাদের দরখাস্ত পড়িল।

মুন্সেফের বিচারে রাজা আশ্চর্য্য হইলেন না,—কিন্তু বালিকা জ্যোতির্ম্ময়ীর ক্ষোভ বিস্ময় এবং ক্রোধের সীমা রহিল না। বিচারক যিনি, তিনি ত নিরপেক্ষরূপে সত্য বিচার করিবেনই—ইহাই তাহার

বিশ্বাস। ক্রাউডেন সাহেবের আদর্শে এ সম্বন্ধে তাহার মতামত রচিত হইয়াছে। আর নিজের দেশের লোক হইয়া মুন্সেফ মহাশয় এরূপ অবিচার করিলেন!

কেবল ক্ষোভ নহে—ইহার সহিত একটা লজ্জার ব্যথা, একটা নৈরাশ্য তাহাকে পীড়ন করিতে লাগিল।

ব্যায়ামশিক্ষার কি ফল, যদি দেশের লোকের নৈতিকবল, ধর্ম্মবল না থাকে? যে দেশের কাব্য-গাথা, পুরাণ-ইতিহাস সত্যের, ন্যায়ের জয় ঘোষণা করিতেছে, সেই দেশের লোকের আজ এত অধোগতি! তাহার প্রাণের মধ্যে একটা নিদারুণ হাহাকার উঠিল। দুরাশা! দুরাশা! তাহার চারিদিকে কর্ম্মনাশা দুর্ভেদ্য অন্ধকার! দুষ্কৃতি-তরঙ্গময় সাগর দুস্তর! সাধ্য নাই, তাহার সাধ্য নাই, তরণী রক্ষা করিতে সাধ্য নাই তাহার!

রাজা-লাইব্রেরীতে থিয়সফিষ্ট পত্র স্তূপীকৃত হইয়া পড়িয়াছিল। আজকাল জ্যোতির্ম্ময়ী ক্রমাগত তাহাই পড়ে, পড়িয়া এক জন জাগ্রত গুরু পাইবার জন্য মর্ম্মান্তিক আকাঙ্ক্ষা তাহার প্রাণে জাগে।

সে আজ কাতর প্রার্থনায় আকাশের দিকে চাহিয়া করযোড়ে মনে-মনে কহিল,—"ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্ কর্ণধার, কোথায় তুমি কোথায়? আলোক দেখাও, গুরুবেশে ধ্রুব-তারারূপে উদয় হইয়া পথ দেখাইয়া লইয়া চল তুমি—এই দুর্ব্বলা শক্তিহীনা ক্ষুদ্র নারীকে।" শয়নের পূর্ব্বে রাত্রিকালে বাতায়নে দাঁড়াইয়া জ্যোতির্ম্ময়ী এইরূপ প্রার্থনা করিতেছিল। নিশীথগগনের অন্ধকার মেঘ ভেদ করিয়া একটি জ্যোতির্ম্ময় রেখা যেন সহসা তাহার নয়নে চমকিয়া উঠিল। বিছানায় শুইয়াও সেই আলোক দেখিতে দেখিতে বালিকার নেত্র নিমীলিত হইয়া পড়িল।

কিন্তু এ কি! সহসা সে কিরণ-রেখা কোথায় লুকাইয়া পড়িল! একি দারুণ অন্ধকার! কিছুই যে দেখা যায় না! কোথায় তাহারা? আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধব, স্বজাতি-বিজাতি কোথায় সকলে? আকাশ কোন্ দিকে? পাতাল কোন্ পথে? কোথা, কোথা! আমি কোথা! এ কি গভীর, এ কি নিবিড়, এ কি দুর্ভেদ্য অন্ধকার! আশে পাশে অতি নিকটে নরনারীর ঘন বেষ্টন—তাহাদের উষ্ণ নিশ্বাস-বায়ু অঙ্গে আসিয়া লাগিতেছে; কিন্তু নয়ন বিস্ফারিত করিয়াও কাহাকেও আর দেখা যায় না। শুধু চতুর্দ্দিক হইতে আর্ত্তনাদ উঠিতেছে, "রক্ষা কর—রক্ষা কর!"

কাহার অমন কাতর স্বর? পিতা না ডাকিতেছেন?

হায় হায়! রক্ষা করিব কি করিয়া?—অপেক্ষা কর—অপেক্ষা কর—বল পাইয়াছি—মহাবল! মহাশক্তি আমাতে অধিষ্ঠিত; আমাতে অবির্ভূত! এই খড়্গ নিক্ষেপ করিলাম—অন্ধকার দূর হৌক্—বিপদ-মেঘ কাটিয়া যাউক!

কিন্তু হায়! এ কি করিলাম? কি হইল এ?

অন্ধকার ফাটিয়া গেল, বিদীর্ণ তিমিরোদ্গীর্ণ আলোকপুঞ্জ ঝলকে কাহার মূর্ত্তি ও বিভাসিত হইয়া উঠিল? কে ও ধরালুণ্ঠিত? সেই সুশাণিত অস্ত্র অন্ধকার ভেদ করিয়া কাহার বক্ষ বিদ্ধ করিয়া রহিয়াছে; ও না শরৎকুমার? জ্যোতির্ম্ময়ীর বিস্ফারিত আকুল দৃষ্টি সহসা নিমীলিত হইল। পুনরায় চক্ষু খুলিয়া বালিকা দেখিল, আর সে দৃশ্য নাই। ভীষণ রবে মুহুর্মুহুঃ বজ্র ধ্বনিত হইল! সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাকাশব্যাপী উল্কাপিণ্ডরাশি ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে, নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধে ছুটিতে লাগিল! এ কোন নিষ্ঠুর অদৃশ্য দেবতা অগ্নি গোলক লইয়া লুফালুফি খেলিতেছে! গেল গেল সৃষ্টি বুঝি ধ্বংস হইয়া গেল? আকাশ-পাতাল জ্বলিয়া উঠিল; দৈত্য-দানব, নরনারী জীবজন্তু পুড়িয়া ঝলসিয়া উঠিল,—তবু তাহাদের মৃত্যু নাই; সেই অনন্ত দাহ লইয়া তাহারা শুধু আর্ত্তনাদ করিতেছে—"ত্রাহি ত্রাহি!" জ্যোতির্ম্ময়ীর নেত্র দিয়া অগ্নিময় অশ্রুজল উথলিয়া উঠিল, সে সকরুণ স্বরে চীৎকার করিয়া কহিল "আসিতেছি আমি আসিতেছি—এই অশ্রুর অনল দিয়া আমি বজ্রানল নির্ব্বাপিত করিব। অপেক্ষা কর অপেক্ষা কর—আমি আসিতেছি।"

কিন্তু এ কি! তাহার যে নড়িবার ক্ষমতা নাই, —পদ নিশ্চল! দেহ অবশ! অসীম ক্রোধে আস্ফালিত করিয়া দুই বাহু সে ঊর্দ্ধে তুলিবামাত্র তাহা পক্ষাকার ধারণ করিল,—দেহ সহসা লঘু হইয়া গেল, —জ্যোতির্ম্ময়ী উড়িল,—অগ্নির মধ্য দিয়া উড়িল, উড়িতে উড়িতে জ্বলিয়া যাইতে লাগিল—জ্বলিতে জ্বলিতে নিস্তেজ হতচেতন হইয়া নিম্নে পড়িয়া গেল।

পুনরায় সচেতন হইয়া দেখিল, অভ্রভেদী শিখর-তলে দাঁড়াইয়া আছে। নিম্নে মনোমোহন সুশ্যামল ভূমি, তরুরাজি, ফল-ফুলে সমাচ্ছন্ন, পুঞ্জে পুঞ্জে সুগন্ধ উত্থিত হইয়া বায়ুবাকাশ পূর্ণ করিতেছে, বিহঙ্গকুলের ঐক্যতানগীতিতে দিগ্‌দিগন্ত পুলক-শিহরিত, তটিনী সুখকল্লোলে প্রবাহিত, সমুদ্র নিস্তরঙ্গ মহা স্থির! তীরে দাঁড়াইয়া আলোকরূপী

নরনারী করযোড়ে উর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া আছে। কাতরে বন্দনা করিতেছে তাহারা কাহাকে? জ্যোতির্ম্ময়ী সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, সুরঞ্জিত আকাশ-সাগর-তলে অপূর্ব্ব আলোক-তরণী-আরূঢ়া এক শান্তিরূপা স্মিতবদনা দেবী। নয়নে তাহার প্রেম-করুণ দৃষ্টি, হস্তে সাম্য ক্ষেপণী! সবিস্ময়ে জ্যোতির্ম্ময়ী জিজ্ঞাসা করিল, কে ও অপরূপা ছটাময়া মূর্ত্তি!

উত্তর হইল, 'দেবী বিচিত্রা!'

"দেবী বিচিত্রা! কে তিনি?"

"তিনি বিশ্বমাতা সাম্যমৈত্রী, ভবিষ্যৎযুগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।" জ্যোতির্ম্ময়ী বিস্ময়ে নীরব হইল, সহসা সহস্র কণ্ঠে বন্দনা-গীতি উঠিল –

প্রণাম করি, তোমায় প্রণাম করি,—
দেবি বিচিত্রা, জননী, মিত্রা,
নিখিলকালে বাহ সাম্য তরী, প্রণাম করি।
একি রূপ তব! ও কি যুগ নব!
একি বৈভব— আহা মরি,—প্রণাম করি।
কিবা সম্প্রীতি, কিবা সন্নীতি—
কিবা শুভগীতি উঠে দিক ভরি,—প্রণাম করি।

*   *   *   *   *

জ্যোতির্ম্ময়ী জাগিয়া উঠিল। সে কি স্বপ্ন দেখিতেছিল? কি স্বপ্ন মনে করিতে চেষ্টা করিল —কিন্তু পারিল না। শয্যা-ত্যাগ করিয়া বালিকা বাতায়নে আসিয়া দাঁড়াইল,—পূর্ব্বাকাশ তখন অরুণরাগে রক্তিম হইয়া উঠিয়াছে; সেই দিকে দৃষ্টিস্থাপন করিতেই সহসা তাহার কণ্ঠে মৃদু গুঞ্জনে ধ্বনিত হইয়া উঠিল—

আহা মরি মরি,— তোমায় প্রণাম করি।

আপনার গানে সে আপনি অবাক্ হইয়া গেল।

জাগরিত অবস্থায় আবার তাহার মনে প্রশ্নোদয় হইল -"সে তুমি কে? কাহাকে প্রণাম করিব?"

অন্তর্যামী সেই একইরূপ উত্তর দিল—"বিচিত্রা দেবীকে।"

"কে সে বিচিত্রা?"

"সাম্যমৈত্রীর অধীশ্বরা দেবী"

"সত্যই কি সে যুগ আসিতেছে? অথবা ইহা আমার কল্পনা! স্বপ্নমাত্র?

এ প্রশ্নের আর কোন উত্তর শুনিতে পাইল না।

ইতি প্রথম খণ্ড

স্বপ্নবাণী

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত

স্বপ্নবাণী

(বিচিত্রার পরিসমাপ্তি)

প্রথম পরিচ্ছেদ

রজনীর স্বপ্ন প্রভাতে মিলাইয়া যায়, মানসিক কল্পনা দিবসের কর্ম্মসংঘাতে মনের কোণে চাপা পড়িয়া থাকে; কিন্তু স্বভাবজাত আদর্শ আকাঙ্ক্ষা বারংবার প্রতিহত হইয়াও লক্ষ্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া রাখে।

এ কয়েক দিন স্বপ্নের কথা জ্যোতির্ম্ময়ী একরকম ভুলিয়া গিয়াছেন; কিন্তু যে আকাঙ্ক্ষাভাব-প্রসূত তাঁহার ঐ স্বপ্ন, সেই ভাবটি যথেষ্ট কর্ম্মনিবিড়তা সত্ত্বেও তাঁহার অন্তর নিভৃতে অন্তঃশিলারূপে প্রবাহিত। "এই বৈষম্যময় জগতে,—মানবের এই স্বার্থপূর্ণ জীবন-সংগ্রামে সাম্যময় প্রেমনীতি কি সম্ভব?" এই প্রশ্নটি যখন তখন তাঁহার মনে উঠা-পড়া করিতে থাকে। যুক্তি উত্তরে কহে-"সম্ভব নহে, সম্ভব নহে!" কিন্তু তাঁহার অন্তরাত্মার মধ্য হইতে তৎক্ষণাৎ বিশ্বাসবাণীর প্রতিবাদ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠে—"সম্ভব, সম্ভব, এ যুগে না হউক, কোন ভবিষ্য-যুগেও সম্ভব, তাহার জন্য প্রস্তুত হও। ঝড় ত চিরস্থায়ী নহে, ঝটিকাঝঞ্ঝা শান্তিরই বাহক, বৈষম্য সাম্যেরই সূচনা। গতি তরঙ্গসঙ্কুল, পথ কষ্টকর, কিন্তু লক্ষ্যস্থান সুন্দর প্রেম-নিকেতন!"

"তবে হে পথপ্রদর্শক ধ্রুবজ্যোতি, অন্ধকার গগন ভেদ করিয়া দর্শন দাও তুমি, দর্শন দাও!"

তখন প্রত্যূষকাল, জ্যোতির্ম্ময়ী পাঠগৃহে, বাতায়নপার্শ্বে টেবিল-পার্শ্বে চৌকিতে বসিয়া পিতার একটি কবিতা নিজের খাতায় তুলিতেছিলেন।

সম্মুখভাগে স্নিগ্ধ-করোজ্জ্বল তটিনী প্রবাহিত, তরুবেষ্টনীর মধ্য হইতে বিহঙ্গের গীতিঝঙ্কার উথলিয়া উঠিতেছে, মৃদু সমীরহিল্লোলে বাতায়ন-নিম্নের প্রস্ফুটিত মাধবীলতা-কুঞ্জোত্থিত ফুলগন্ধ মাঝে মাঝে তাঁহার নাসিকাবিবরে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছিল, বালিকা অনন্যমনে গানটি লিখিতেছিলেন।

সহসা বাতায়ন-পার্শ্বের নারিকেল-তরুশীর্ষ হইতে একটি ছোট পাখী পরিচিত কণ্ঠে শিশ্ দিয়া যেন ডাকিল—"জ্যোতির্ম্ময়ী জাগো।" বালিকা চমকিয়া নতমুখ উন্নত করিবামাত্র পাখীটি উড়িয়া দূরবর্ত্তী আমবাগানের ঝোপের মধ্যে লুকাইয়া পড়িল। রাজকুমারী তখন আমগাছের দিকে নেত্রপাত করিয়া দেখিলেন, কি সুন্দর বর্ণরঞ্জন! সুবর্ণ লোহিতের মৃদুঘনবৈচিত্র্যে পূর্ব্ব-দক্ষিণ গগন কোথাও স্তরে স্তরে, কোথাও রেখাকারে, কোথাও অপূর্ব্ব ছাপে সুরঞ্জিত। এই উজ্জ্বল লোহিতাভ অম্বরতলে একখানা প্রকাণ্ড কৃষ্ণমেঘ ভাসিয়া চলিয়াছিল। সূর্য্যদেব দিঙ্মণ্ডল হইতে উর্দ্ধে উঠিতে উঠিতে বার বার তাহার মধ্যে আত্মগোপন করিতেছিলেন, বালিকার দৃষ্টি যখন আকাশের দিকে পড়িল, তখন সবিতৃদেব মেঘাচ্ছন্ন। জ্যোতির্ম্ময়ী যেন কোন বন্ধুর আশায় নিরাশ হইয়া একটা ক্লান্ত নিশ্বাস সহকারে আবার লেখনী মসীপূর্ণ করিয়া লইয়া লিখিতে আরম্ভ করিলেন। লেখা শেষ করিয়া গানটি একবার পড়িয়া দেখিলেন,—

মনটি ওরে, ভাল ক'রে
ভাসতে শেখো ভাসতে শেখো;
সাঁৎরে উঠতে হবে কূলে
এই কথাটি মনে রেখো।
জলের পথ লম্বা বাঁকা,
হেথায় নাইক নৌকা নাইক সাঁকো!
চলতে গিয়ে গায়ের জোরে,
এলিয়ে পড়বে জলের ঘোরে
হারিয়ে ফেলবে সকল শক্তি,
ঠিক দেখো ভাই ঠিক দেখো।
উঠতে যদি চাও রে কূলে,
ভাসতে শেখো ভাসতে শেখো।
ঐ দেখা যায় নদীতীরে ঘরখানি;
দেখতে কাছে, বয় যে মাঝে জোর পানি।

ঘনিয়ে আসবে আঁধার যখন,
পিছিয়ে পড়বে শতেক যোজন,
ঘূর্ণিপাকে পড়বে ঘুরে যদি একটুও বাঁকো!

আবৃত্তি শেষ করিয়া গানটি গুণ গুণ করিয়া গাহিতে গাহিতে আবার আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া এবারও জ্যোতির্ম্ময়ী সূর্য্যের দর্শন পাইলেন না। ভাস্করদেব তখন বাতায়ন-উর্দ্ধে উঠিয়া পড়িয়াছেন। বালিকা নিমীলিত নয়নে অন্তর্জ্যোতিকে ধ্যান করিয়া মনে মনে কহিলেন, "হে ধ্রুবজ্যোতিঃ! প্রচ্ছন্ন থাকিও না তুমি, প্রকাশ হও প্রকাশ হও। হে আমার অন্তর্দেবতা, হে কর্ণধার! এই তরঙ্গাকুল অকূলে হাল ধরিয়া কূলপথে লইয়া চল তুমি।"

আকাশ তখন আর লোহিত সমুদ্র নহে, শুভ্র মেঘস্তূপে সমুজ্জ্বল নীলাম্বর বক্ষ; তাহার দু'একটি স্থান কৃষ্ণবর্ণ মেঘবেষ্টনে অতি রমণীয় দেখাইতেছিল। জ্যোতির্ম্ময়ী তাহা দেখিয়া ভাবিলেন, "হায় রে! এইরূপ প্রেমালিঙ্গনে আমাদের আন্তর্জাতিক মিলন মহিমাময় হইবে কবে? দুরাশা কি?" আবার সেই পাখীটি সহসা ডাকিয়া উঠিল। এবার বাতায়ন-নিম্নের মাধবীলতাবল্লী হইতে সে শিস্ দিল।

জ্যোতির্ম্ময়ী বলিল—"পাখি, তুমি বল ত ভাই, আমার আশা সফল হইবে কি না?" পাখী উড়িল, উড়িতে উড়িতে উত্তর দিয়া গেল "কে জানে, কে জানে!"

বালিকা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলেন, "হায় রে! আন্তর্জাতিক মিলন! জগতের সাম্যমৈত্রী ভাব! সত্যই বড় দুরাশা! আমাদের নিজেদের মধ্যেই আগে মিলন হোক। উচ্চস্তর প্রত্যাশা করিবার পূর্ব্বে নিম্নস্তর গঠনের আবশ্যক। এই যে বঙ্গবিভাগ ঘটনা, হে ভারতের ভাগ্যনিয়ন্তৃ পুরুষ, ইহা দ্বারা যেন সেই মিলন-সোপান গঠিত হয়।"

হঠাৎ চটিজুতার শব্দ শোনা গেল, অনাদি একখানা খবরের কাগজ হাতে করিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে উপস্থিত হইয়া কহিল, "দিদিমণি, রাণীদিদি, রাজকুমারী ভাই প'ড়ে দেখ!"

বলিয়া কাগজখানা টেবিলের খাতাপত্রের উপর ফেলিয়া জ্যোতির্ম্ময়ীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। রাজকুমারী সেখানা সরাইয়া রাখিয়া সহাস্যে কহিলেন, "ব্যাপারখানা কি তুমিই বল না ওগো গেজেটাবতার! চতুর্ম্মুখের দর্শন পেয়ে আমি কি দুর্ম্মুখের আশ্রয় নিতে যাব! ব'লে ফেলো সব খবরগুলো?"

অনাদি একটু চিন্তিতভাবে বলিল, "বঙ্গবিভাগ ত হয়ে গেল দিদি?"

"সে খবর ত পুরান হয়ে গেছে,—নতুন কিছু বল?"

অনাদি তাহার কেশহীন গুম্ফে তা দিবার ভাণ করিয়া কহিল, "আরে আরে—কি বল্‌ছিস্ দিদি! এ কথা কি কখনও পুরান হয়? এই মহাকাণ্ডের উপর দিন দিন নতুন নতুন ফ্যাক্ড়া গজিয়ে এটাকে যে চিরনবীন ক'রে তুলেছে। বটানিকেলের বটগাছ কি কারো চোখে পুরান ব'লে ঠেকে, এইটে বল দেখি? অথচ গাছটার না জানি আদি, না জানি অনাদি! পড় পড় ভাই কাগজখানা, উপাধ্যায়ের বক্তৃতাটা একবার প'ড়ে দেখ। এ লেখা কোনো মা পড়লে তাঁর কোলের ছেলেরও রক্ত টগবক ক'রে ফুটে উঠবে।"

কাগজখানা টেবিল হইতে উঠাইয়া জ্যোতির্ম্ময়ীর হাতের কাছে অনাদি তুলিয়া ধরিল, জ্যোতির্ম্ময়ী আড় নয়নে নামটা দেখিয়া লইয়া সেখানা নিয়ে নিক্ষেপ পূর্ব্বক কহিলেন, "এ রকম মারকাটের কথায় তোমাদের তেজ বাড়ে, আমি ভাই নিস্তেজ, হতাশ হয়ে পড়ি। কিছু দিন থেকে আমার মনে কি কথা তোলাপাড়া করছে জান অনাদি?"

অনাদি শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া উঠিল। জ্যোতির্ম্ময়ী বলিলেন, "আমরা ভাই অভিশপ্ত জাত, নৈতিক বল হারিয়েই আমাদের এই দুর্দ্দশা! তুমি কি ভাব অত্যাচার দ্বারা আমরা জাতীয় জীবন লাভ করব? কখনই না। যাঁরা রক্তপাতের উপদেশ দিয়ে ছেলেদের বিপথে নিয়ে যাচ্ছেন—তাঁরা দেশের সর্ব্বনাশ করছেন।"

অনাদি ভূমিনিক্ষিপ্ত কাগজখানা উঠাইয়া ক্ষুদ্রাকারে ভাঁজ করিতে করিতে কহিল, "না গো না—রক্তপাতও চাই বই কি, ফ্রান্সের দৃষ্টান্ত দেখ না ভাই, ওরা কি সহজে দাসত্বমুক্ত হয়েছে?"

জ্যোতির্ম্ময়ী উত্তেজিত স্বরে কহিলেন, "সে দৃষ্টান্ত আমাদের আদর্শ হ'তে পারে না। সেই ভীম বীভৎস নিষ্ঠুরতা মনে করলেও কষ্টে-আতঙ্কে দেহের রক্ত জল হয়ে যায় আত্মা করুণায় বিগলিত আর্দ্র হয়ে ওঠে। ও রকম বিজাতীয় অনুকরণের কথা ভুলেও মনে এনো না ভাই। আমাদের বলীয়ান্ হ'তে হবে ধর্ম্মের বলে, নৈতিক বলে। দৈহিক বলের সার্থকতা সেইখানেই, যেখানে এই শক্তি আধ্যাত্মিক বলের সহায়স্বরূপ। ইংরাজকে

'মারা-কাটা' দূরে থাক, বিপন্ন হ'লে তাদেরও রক্ষা করতে হবে আমাদের।"

"আরে তুমি যে যীশুখৃষ্ট হয়ে উঠলে? কিন্তু তাঁর follower নামধেয় যাঁরা তাঁরাও ত ও কথা মানছেন না দিদি।"

"তাঁদের অধঃপতন সুরু হয়েছে। কিন্তু আমরা পুরাতন যুগ ফিরিয়ে আনতে পারব তখনই, যখন এই সত্য আমাদের মনে আবার জেগে উঠবে। যুদ্ধ-বিদ্রোহ তখন তোমাদের কিচ্ছু করতে হবে না —সাম্যমৈত্রীর পতাকার নীচে তখন জাতি-বিজাতি এক হয়ে যাবে, ভারতবর্ষ বিনা রক্তপাতে, অঙ্গুলি-তাড়নে তখন স্বরাজলাভ করবে।"

অনাদি অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া কহিল, "আচ্ছা ভাই, তখন আমি সর্ব্বাগ্রে নিশানহস্তে সেই পতাকার তলে গিয়ে দাঁড়াব। এখন এস রাণীদিদিজি, তোমার হাতে রাখী বেঁধে দিই, দেশশুদ্ধ লোক এই রাখী প'রে 'ভাই ভাই এক ঠাঁই' হচ্ছে।"

অনাদি পকেট হইতে এক গোচ্ছা রাখী বাহির করিয়া টেবিলে ফেলিল এবং তাহার মধ্য হইতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট একগাছি বাছিয়া জ্যোতির্ম্ময়ীর হাতে বাঁধিতে লাগিল। জ্যোতির্ম্ময়ী পরিতে পরিতে বলিলেন, "বাংলা দেশের এই রাখীবন্ধন সমস্ত ভারতের পক্ষে যেন শুভ হয় ভাই।" অনাদি তাড়াতাড়ি রাজকুমারীর হাতে রাখীটা কষিয়া দিয়া দুই হাত পকেটে পুরিয়া দুই নেত্র বিস্ফারণপূর্ব্বক জ্যোতির্ম্ময়ীর দিকে চাহিয়া কহিল, "নিশ্চিন্ত হও দিদি। সে বিষয়ে এই শর্ম্মা গ্যারাণ্টি। তুমি যে পথটা বাৎলালে, সেটা যে কি এবং কোথায়—তা যদিও আমি ঠিক বুঝতে পারি নি, —কিন্তু তুমি ভাই দেখে নিও, আমাদের সংকল্পিত উপায়ে অল্পদিনের মধ্যেই ভারত বিদেশীবিবর্জ্জিত হয়ে যাবে। দেশে হুলস্থূল বেঁধে গেছে,— বিদেশী যা কিছু— সব বয়কট"—

"এই যে পণ্ডিত মশায়।"

"বন্দে-মাতরম্" ধ্বনি করিতে করিতে পণ্ডিত মহাশয় গৃহ-প্রবেশ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

"নমস্তে পণ্ডিতমহাশয়, আস্‌তে আজ্ঞা হোক্।"

জ্যোতির্ম্ময়ী এবং অনাদি উভয়েই এক সঙ্গে এই কথা বলিয়া পণ্ডিত মহাশয়কে স্বাগত করিয়া লইলেন। পণ্ডিত মহাশয় প্রত্যুত্তরে হাত তুলিয়া স্বস্তিবাচন করিবামাত্র অনাদি একগাছি রাখি-হস্তে অগ্রসর হইয়া কহিল, "হাতটা আর নামাবেন না পণ্ডিত মশায়; আরো একটু বাড়িয়ে দিন, আপনার হাতে রাখী বেঁধে ধন্য হই।"

জ্যোতির্ম্ময়ী তাড়াতাড়ি চৌকি হইতে উঠিয়া বলিলেন, "না পণ্ডিত মশায়, আপনার হাতে রাখী পরাব আগে আমি।"

বলিতে বলিতে পণ্ডিত মহাশয়ের নিকটবর্ত্তী হইলেন; কিন্তু অনাদি ততক্ষণ ভট্টাচার্য্যমহাশয়ের হাতটা অধিকার করিয়া লইয়া বাধন-সূত্র কষিতে আরম্ভ করিয়াছে, তিনি গ্রেপ্তার অবস্থাতেই বামহস্তে আপনার দাড়ী টানিতেছেন। অনাদি রাজকুমারীর দিকে ব্যঙ্গকটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া কহিল, "তুমি বাহু-বল মানতে চাও না দিদি, তোমার নৈতিক বল এখানে পরাস্ত কি না তুমিই বল।" পণ্ডিত মহাশয় উত্তরে কহিলেন, "তবে কিনা বাহুবলের কার্য্য পদ্মপত্রস্থিত জলবৎ ক্ষণস্থায়ী। এস রাজ-কুমারি, তুমি না হয় আমার এই বাঁ হাতটাতেই রাখী পরাও।" দাড়ীতে হাত বুলাইবার এ হেন আয়েস হইতেও আপনাকে বঞ্চিত রাখিয়া পণ্ডিত মহাশয় রাজকুমারীর দিকে বাম হাতটা বাড়াইয়া ধরিলেন; জ্যোতির্ম্ময়ী হাসিয়া হাতটা ধরিয়া রাখী পরাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। পরাইতে পরাইতে বলিলেন, "দেখলে অনাদি, নৈতিক বলের আকর্ষণ?"

অনাদির রাখী-বন্ধন তখন শেষ হইয়াছে, পণ্ডিত মহাশয়ের ডান হাতটা ছাড়িয়া দিয়া সে কহিল, "আচ্ছা, বেশ গো বেশ! কিন্তু একটা সূত পরাতে তুমি দিনটা কাবার করবে নাকি? থাক্ তোমার সূত বাঁধা, তুমি ততক্ষণ গান লেখ, সময়ের সদ্ব্য-বহার হোক্।"

জ্যোতির্ম্ময়ী বলিলেন, "তোমারই দোষ, এমন ছোট্ট রাখী এনেছ যে, টানাটানিতে এর ক্ষীণ জীবন-টুকু বুঝি বা ছিঁড়ে যায়!"

"দাও তবে আমাকে, এ রকম tug of war তোমার কর্ম্ম নয়। দেখ আমার হাতের জোরে এই খাট সূতও কি রকম লম্বা হয়ে পড়ে!"

অনাদি সবলে পণ্ডিত মহাশয়ের হাতখানা টানিয়া লইয়া রাখী কষিতে প্রবৃত্ত হইল। জ্যোতি-র্ম্ময়ী হাল ছাড়িয়া দিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, অনাদি ওগাছা আপনার হাতে বেঁধে দিক্, আমার গাছা আমি পরে পরিয়ে দেব, কি বলেন পণ্ডিত মশায়?"

তোমার হাতের রাখী না প'রে আমি এখান থেকে উঠব না মা, তবে হাতটা যদি—আরে আরে

কর কি বাপু—এখানা যে একটা প্রাণবন্ত জীবের, এ কথাটা যে দেখছি একেবারেই ভুলে যাচ্ছ!"

এমন বিকৃত মুখভঙ্গীতে পণ্ডিত মহাশয় এই আর্ত্তনাদ করিলেন যে—কারুণ্যরস হাস্যরসে পরিণত হইল। জ্যোতির্ম্ময়ী হাসিয়া উঠিয়া কহিলেন —

"বাহুবলের পরীক্ষায় অনাদি দেখছি আপনার নিকট সার্টিফিকেট আদায়ের চেষ্টায় আছে—"

অনাদি আরো একটু জোরে সূতা কষিয়া কহিল, "নিশ্চয়। পণ্ডিতজী হচ্ছেন—আমাদের ব্যায়াম সমিতির সেক্রেটারী, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ যদি কখনো বাংলা দেশে বাধে, তবে আমাদের যে দ্রোণাচার্য্যের অভাব হবে না, এই আশায় আমরা বুক বেঁধে আছি, বুঝলেন ত পণ্ডিত মহাশয়!"

"বুঝেছি বাবা, তা হ'লে হাতটাকে অবিলম্বে রেহাই দিতে হচ্ছে; নইলে তোমাদের তথাকথিত সম্মান-আসন শূন্যই প'ড়ে থাকবে!"

"এই নিন্ আপনার হাত, দেখে নিন্ ভাল ক'রে কোথায় একটু টোস্‌কায় নি পর্য্যন্ত।" অনাদির নিকট হইতে অব্যাহতিলাভে পণ্ডিত মহাশয় এইবার তাঁহার মুক্ত হস্ত দাড়ী-পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিয়া হাঁফ ফেলিয়া একখানা আরাম কেদারায় বসিয়া পড়িলেন। জ্যোতির্ম্ময়ীও তাঁহার পূর্ব্ব-পরিত্যক্ত চৌকিখানা পুনরধিকার করিলেন, কেবল অনাদি বসিল না। পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট দাঁড়াইয়া কহিল—

"পণ্ডিত মহাশয়, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বে-আদপী মাপ করবেন, বলুন ত আপনি স্বদেশী কিংবা বিদেশী?"

পণ্ডিত মহাশয় দক্ষিণ হস্ত দাড়ী হইতে মুক্ত করিয়া বাড়াইয়া ধরিয়া এবং বাম হস্ত টিকিতে বুলাইয়া বলিলেন, "এই শিখা এবং চর্ম্মই ত তোমার প্রশ্নের উত্তর বাবাজি!"

অনাদি ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "উঁহু, শুধু টিকিতে আর কালো রঙে আজকাল স্বদেশী হওয়া যায় না! স্বদেশীর ভাবার্থ এখন বদল হয়ে গেছে। বিদেশী জিনিষ ব্যবহার করবেন না ব'লে শপথ করেছেন কি?"

"কই তা ত করি নি বাপু।"

"করুন তবে। এই যে আপনার হাতের ক'গাছি কালো সুতো, শব-জাগান মন্ত্রে যেগুলি তৈরী—এই সুতো হাতে বেঁধে আপনি স্বদেশী তন্ত্রে বাঁধা পড়েছেন, বুঝলেন ত? এখন পয়লা নম্বরে—আপনার গলার ঐ পৈতার গোচ্ছাটা আপনাকে ছিঁড়ে ফেলে দিতে হচ্ছে।"

পণ্ডিত মহাশয় কহিলেন,—"এ কেমন কথা বাবাজি! আমি ত ব্রহ্মজ্ঞানী নই; কিংবা সিদ্ধ-পুরুষও হয় নি এখনো।"

"এ ওজরে পার পাবেন না গুরুজী? সিদ্ধ-অসিদ্ধ সকলের পক্ষেই এখন বিদেশী পণ্য নিষিদ্ধ।"

খুব জোরে জোরে ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে সে এই কথা বলিয়া চলিল, "জানেন ত, জার্ম্মাণি দেশের সূতা থেকেই আমাদের দেশের সব পৈতা তৈরী হয়। আপনি যতই কেন হা-হুতাশ করুন না, স্বদেশী কালাপাহাড়দের হাত থেকে কিছুতেই এ সূতাকে রক্ষা করতে পারবেন না; শেষে আপনার গলাটায় পর্য্যন্ত টান পড়তে পারে।"

পণ্ডিত মহাশয় এতক্ষণ এক হাতেই দাড়ী টানিতেছিলেন, এইবার দুই হস্তই দাড়ী-রক্ষণে নিযুক্ত করিয়া বিস্মিত স্বরে কহিলেন, "জার্ম্মাণি সূতার উপবীত! সে গুলো তা হ'লে বাবাজী তোমাদের রাজারাজড়ার গলায় শোভা পাবার উদ্দেশ্যেই প্রস্তুত হয়। কিন্তু আমার গলার এই গোচ্ছাটুকু খুড়ীমার চারকাকাটা ধন।"

"তাই নাকি? আপনি দেখছি তবে ভাগ্যবান্! হতভাগ্য আমাকেই তা হ'লে দেখছি আত্মহত্যার পাপে লিপ্ত হ'তে হোল!"

অনাদির নয়বুদ্ধি-নিয়োজিত হস্ত তৎক্ষণাৎ নিজের কণ্ঠোপবীতগুচ্ছ আক্রমণ করিল।

"আরে করিস্ কি করিস্ কি অপগণ্ড বালক!"

কিন্তু পণ্ডিত মহাশয়ের এই চীৎকার-প্রতিবাদ ব্যর্থ করিয়া অনাদির ধর্ম্ম এবং বর্ণব্যঞ্জক সূত্র বাতায়ন-পথে মাধবীলতা-জালের মধ্যে গতিলাভ করিল। জ্যোতির্ম্ময়ীও প্রথমটা একটু আশ্চর্য্য হইলেন; কিন্তু সহাস্যে কহিলেন, "বাহা রে! ব্রাহ্মণ-পুত্র হ'য়ে অসঙ্কোচে পৈতা ত্যাগ করলি! ত্যাগ-স্বীকারের এ হাতে খড়ি নাকি?"

অনাদির মনের গুপ্তকথা যেন রাজকুমারী প্রকাশ করিয়া দিলেন; সে তাড়াতাড়ি সে কথা চাপা দিয়া কহিল, "রাণীঠাকরুণ, এবার ভাই তোমার পালা! কাঁচের চুড়ি ও বিলাতি ফিতা মেয়ে-মহল থেকে একবারে উঠিয়ে দাও। তোমার ইস্কুলের মেয়েরা চরকা কাটে বটে; কিন্তু তাতেই শুধু হবে না, গাঁয়ে গাঁয়ে চরকা ধরাও, তাঁত বোনার ব্যবস্থা কর—অধিকন্তু এ রাজ্যে বিলিতি জিনিষ আদৌ স্থান না পায় দোকানদারদের উপর এইরূপ কড়া হুকুমজারী ক'রে পাঠাও।"

অনাদির উৎসাহে জ্যোতির্ম্ময়ীও এতক্ষণ একটা

আনন্দমত্ততা অনুভব করিতেছিলেন ; কিন্তু অনাদির শেষ কথায় তিনি একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হতাশার সুরে কহিলেন, "আমাদের ব্যবহার্য্য সমস্ত জিনিষ যে দিন দেশ থেকেই পাওয়া যাবে—সে দিন সত্যই সত্যযুগ ফিরে আসবে। আসবে, সে দিন আসবে ভাই—এ আশা আমিও করি—কিন্তু এখনো বিলম্ব আছে। সেজন্য প্রস্তুত হ'তে এখনো আমাদের অনেকটা সময় লাগবে।"

অনাদি কহিলেন, "অর্জ্জনে বিলম্ব থাকিলেও বর্জ্জনে ত আমি কোন বাধা দেখিনে। এক কাঁচের চুড়িগুলো থেকেই কোটি কোটি টাকা বিলাতে চ'লে যাচ্ছে। এমন কত সখের জিনিষ,—ফিতা, পাউডার, সেণ্ট—"

পণ্ডিত মহাশয় অনাদিকে বাধা দিয়া কহিলেন, "বাবাজি,—সখের জিনিষকে তোমরা যতটা হেয়জ্ঞান কর, সহজ-ত্যজ্য ভাব, আসলে তা মোটেই নয়। এই যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপ মহাসৃষ্টি, এটা বিধাতার সখ্ ছাড়া আর কি বল ত হে বাপু? এই সৃষ্টির মূলে প্রয়োজনটা যে কি ছিল, আজও পর্য্যন্ত কোন মুনি ঋষি তার সন্ধান পান নি!"

জ্যোতির্ম্ময়ী কহিলেন, "তা সত্যি, সংসারে প্রয়োজনীয় খরচের চেয়ে সখের খরচই বেশী, তাতে সন্দেহ নেই।"

এই অনুমোদন বাক্যে পণ্ডিত মহাশয়ের আনন্দ, তাঁহার দাড়ীর টানকে দ্বিগুণিত করিয়া তুলিল। তিনি কহিলেন, "দেখেছ ত মা, হাড়ি ডোমের মেয়েদের অঙ্গে কাঁসার গহনার চাপ! সেই সখের ভারকে তারা পালকের মতই লঘু জ্ঞান করে!"

অনাদি বলিয়া উঠিল, "ফিনফিনে বিলিতি কাঁচের চুড়ির চেয়ে কাঁসার চাপও ঢের ভাল মশায়, সে যে আমাদের মাতৃভূমির দান!"

"আমিও বলি সে ঢের ভাল!" পণ্ডিত মহাশয় উত্তেজিত স্বরে কহিলেন, "কিন্তু জননী যার প্রতি বিমুখ, তাঁর দান যে হতভাগ্য পায় নি, তারও ত প্রাণে সখ আছে, তখন তার সখ মেটাবার সহজ উপায়—স্বল্পমূল্য বিলিতি জিনিষ ব্যবহার করা।" —জান ত বাবাজি, সন্ন্যাসী ফকীরদেরও সখের হাত থেকে অব্যাহতি নেই। লালা বাবুর গল্প শুনেছ বোধ হয়? তিনি সংসারের মায়া ত্যাগ ক'রেও ভোগসুখ একেবারে ত্যাগ করতে পারেন নি। গাছতলায় শুয়েও ইটের উপর মাথা রেখে নিদ্রা দিচ্ছিলেন, তার পর পথিক স্ত্রীলোক দুইজনের ব্যঙ্গোক্তিতেই নাকি এ ঘুম তাঁর ভেঙ্গে যায়।"

অনাদি কহিল, "আপনিও এ সম্বন্ধে টোলের পণ্ডিতের নাম রাখতে পারবেন। দেখেছ দিদি, পণ্ডিত মহাশয়ের দাড়ীটা দিন্‌কে দিন কি রকম চক্‌চকে হচ্ছে? বিলিতি ব্রসের টানটা এর উপর যে ভাল ক'রেই পড়ছে, তাতে সন্দেহ মাত্র নেই।" পণ্ডিত মহাশয় দেয়ালের আরশীর দিকে সচকিত দৃষ্টিপাত করিলেন, কিন্তু তাঁহার মাথার অর্দ্ধেকখানা ছাড়া আকাঙ্ক্ষিত প্রতিবিম্ব তাহাতে দেখিতে পাইলেন না। তিনি একটু অপ্রস্তুত ভাবেই উত্তর করিলেন, বাবাজি, আমরা লঘু খড়, তোমাদের ইঙ্গিতেই আমরা চলি ফিরি, দৃষ্টান্ত দেখাও, গতি আপনা হ'তেই ফিরবে।"

অনাদি বলিয়া উঠিল, "সেই কথাই ত এতক্ষণ ধ'রে রাণীদিদিকে বলছি।" রাজকুমারী ভাই, দোকানদারদের ভাল ক'রে জানিয়ে দাও যে, বিলিতি জিনিষ রাখলে তাদের বিপদে পড়তে হবে।"

রাজকুমারী উত্তর করিলেন, "না অনাদি, বিলিতি জিনিষ একেবারে বর্জ্জন করার সময় এখনো আসে নি। সেইজন্য কিছু দিন ধ'রে এখনো আমাদের প্রস্তুত হ'তে হবে। ভেবে দেখ দু' বেলা দু' মুষ্টি অন্ন যে সব লোকের মেলে না, তাঁতের দামী কাপড় কিনে পরা কি তাদের সাধ্য? তাঁত-শিল্পকে উদ্ধার করবার সঙ্গে সঙ্গে কলকারখানারও বিস্তৃত আয়োজন চাই, নইলে বিলিতি সস্তা জিনিষের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমরাই হেরে যাব।"

অনাদি দমিবার পাত্র নয়; এই কথার উত্তরে সমান উৎসাহে কহিল, "তা বুঝি হচ্ছে না ভাবছ? বঙ্গলক্ষ্মী মিলের বিজ্ঞাপনটা প'ড়ে দেখ, তা ছাড়া সাবান, দেশলাই, কাঁচের বাসন প্রভৃতি প্রস্তুতেরও আয়োজন হচ্ছে।"

আশানন্দে জ্যোতির্ম্ময়ীর হৃদয় ভরিয়া গেল। তাহার সেই অকাল-আনন্দ ম্লান করিয়া দিয়া পণ্ডিত মহাশয় কহিলেন, "আরে অর্ব্বাচীন, একটা বঙ্গলক্ষ্মী মিল দেশের কত কাপড় যোগান্ দেবে বল্ দেখি?

অনাদি রাগিয়া কহিল, "দেশের কোনো খবর জানেন না আপনি, অথচ একটা কথা ব'লে বসেন? কেন, বোম্বাই অঞ্চলের কাপড়ের মিলগুলো কি ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয় না কি?"

কৃষ্ণশ্মশ্রুরাজির মধ্য হইতে পণ্ডিত মহাশয়ের শ্বেত দন্তরাজি প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গে বিকশিত হইয়া উঠিল,— তিনি হাসিয়া কহিলেন, "ভারতের কোটি কোটি

লোকের কাপড় যোগানো—বাংলা বোম্বায়ের দু' চারটি মিলের কর্ম্ম নয় গো !"

অনাদি চড়া মেজাজে কহিল, "ক্রমশঃ আরো হবে।"

"আশা ত সেইরূপই করি। কিন্তু যতক্ষণ তা না হয় অনাদি, ততক্ষণ!"—এ কথা বলিলেন, জ্যোতির্ম্ময়ী আশাভঙ্গের সুরে। উত্তর হইল, "তত-ক্ষণ বিলিতি কাপড়গুলোকে কর্ম্মনাশা-জলে নিক্ষেপ কর। ধ্বংসের উপর গঠন আরম্ভ চিরদিনই হয়ে আসছে। এর মধ্যেই এ কাজ সুরু হয়েছে। কল-কাতার ছেলেরা পথ দেখিয়েছে, বিষাদপুরেও শুনছি ইতিমধ্যে অগ্নিকাণ্ড—লুটপাট হয়ে গেছে। বিজন-কুমার এ দলের এক জন গুপ্ত নেতা, তিনি এখন ঘোর স্বদেশী। এবার আমাদের পালা, আমরা সব ক্লাবের ছেলেরা এ জন্য প্রস্তুত আছি। দোকান-দারদের একবার কেবল নোটিশ দিতে বাকী—আর রাজকুমারী দিদির হুকুমের অপেক্ষা ”

জ্যোতির্ম্ময়ীর মুখমণ্ডল সহসা আরক্তিম হইয়া উঠিল, তিনি ক্রোধদীপ্ত স্বরে কহিলেন,—"অনাদি, ভুলে গেছ কি তোমাদের শপথ ? অত্যাচার নিবা-রণ করাই তোমাদের ব্রত, তার পরিবর্ত্তে অযথা পীড়নে, পৈশাচিক উন্মাদনা কাণ্ডে তোমরা প্রবৃত্ত হ'তে যাচ্ছ ! আর এ কার্য্যে আমার অনুমোদন প্রত্যাশা কর ?"

পণ্ডিত মহাশয় "বন্দে মাতরং" ধ্বনিতে সংক্ষেপে জ্যোতির্ম্ময়ীর পোষকতা করিয়া কহিলেন, "বৎসে, আয়ুষ্মতী হও—!"

এই সময় এক জন দাসী আসিয়া সংবাদ দিল—"ডাক্তারবাবু আসিতেছেন।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শরৎকুমার গৃহাগত হইয়া অন্য দিনের ন্যায় সাদর অভ্যর্থনা লাভ করিলেন না। এমন কি, তৎকর্ত্তৃক নমস্কৃত হইয়া রাজকুমারী তাঁহাকে প্রত্যভিবাদন করিতে পর্য্যন্ত ভুলিয়া গেলেন। গৃহের এই অস্বাভা-বিক মৌনভাব লক্ষ্য করিয়া শরৎকুমার প্রথমটা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। কিন্তু পর-মুহূর্ত্তেই প্রকৃতিস্থ ভাবে অনাদিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ঘরের আবহাওয়াটা বড় Stuffy ব'লে মনে হচ্ছে; ব্যাপারটা কি হে অনাদি ?"

রাজকুমারীর ভর্ৎসনাঘাত একেবারে ব্যর্থ হয় নাই। কিন্তু বীর বালক অনাদি মৌনতায় সে অভি-মান-জ্বালা গোপন রাখিয়া দেয়াল-উর্দ্ধে সূর্য্যোদয়-তৈলচিত্রের নিম্নদেশে রক্ষিত বিবেকানন্দ স্বামীর সুন্দর প্রতিমূর্ত্তিখানির দিকে গুমভাবে চাহিয়াছিল এবং এই অপ্রকাশ্য জ্বালার যত কিছু চাপভার, সবটা ডান পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে চাপিয়া ধরিয়া প্রতিশোধ-স্পৃহা-পরতন্ত্র মার্জ্জার-শাবকের ন্যায় তদ্দ্বারা মেজিয়ার বহুমূল্য কোমল কার্পেটের পশমগুলিকে আক্রমণ-বিধ্বস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। গৃহে ঢুকিয়াই দেশী চটি জুতা জোড়াটাকে চৌকির তলায় সে বিশ্রাম প্রদান করিয়াছিল। আজকাল অনাদি বিলাতি জুতা ত্যাগ করিয়াছে।

অনাদির অভিমানে দুঃখ অপেক্ষা ক্রোধের ঝাঁজটাই ছিল বেশী। "স্ত্রীলোকের কি একটুও মতি-স্থিরতা নাই ! এত দিন ধরিয়া স্বদেশানুরাগে হৃদয় জ্বালাইয়া তুলিয়া, দেশের কাযে জীবন উৎসর্গ করিতে শিখাইয়া আজ যখন ঠিক কায করিবার সময়টি আসিয়া দেখা দিল, তখন কি না জ্যোতির্ম্ময়ী বলিয়া বসিলেন, 'বিলিতি জিনিষ ধ্বংস কোরো না।' হে চাণক্যদেব, কি সার কথাই তুমি বলিয়া গিয়াছ ! তোমার বুদ্ধিকে নমস্কার ! স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী বলিয়া প্রলয়ঙ্করী ! বিশ্বাস করিও না তাহাকে,—কেহ বিশ্বাস করিও না, কখনো না,·এ জীবনে না, পর-জীবনেও না।"

শরৎকুমারের প্রশ্নে তাহার ক্রুদ্ধ চিন্তায় বাধা পড়িল। তাঁহার দিকে চাহিয়া কি উত্তর দিবে—ভাবিয়া ঠিক করিয়া লইবার পূর্ব্বেই রাজকুমারী উত্তরস্বরূপ কহিলেন, "এঁরা বিদেশী অনুকরণে পীড়ন-নীতি অবলম্বন ক'রে স্বদেশী হ'তে চান। দোকান-দারদের যত বিলিতি পণ্য এঁরা জ্বালিয়ে দেবার মতলব এঁটেছেন। জুলুম ক'রে এঁরা দেশোদ্ধার ক'রবেন, হায় রে ! কার উপর যে আশা বাঁধব ! আপনিও কি এই অত্যাচার অনুমোদন করেন ডাক্তার-দা ?"

উত্তর হইল,—"মোটেই না।" উচ্চারণে বেশ জোর দিয়াই শরৎকুমার এই কথা বলিলেন। হঠাৎ যেন দক্ষিণা বাতাসের একটা ঝাপটা আসিয়া গৃহের উত্তপ্ত রুদ্ধবায়ুকে ছিন্নভিন্ন করিয়া উড়াইয়া দিল, সেই স্বাস্থ্যপূর্ণ স্নিগ্ধ বায়ু হৃদ্‌রোগীর ন্যায় সজোরে নিশ্বাসে গ্রহণ করিতে করিতে হৃত-আশা পুনর্লাভ করিয়া রাজকুমারী অনাদির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। সে দৃষ্টির অর্থ—"শুনিলে ত অনাদি, কি বল তুমি ইহাতে ?"

ডাক্তারের এই জোর কথায় অনাদির মনটাও যেন ডিগবাজি খেলিয়া ঠিক স্থানটির উপর গিয়া পড়িল।

শরৎকুমারের বিদ্যাবুদ্ধির উপর তাহার সুগভীর শ্রদ্ধা। তিনিও যখন তাহাদের কল্পিত কার্য্যকে দেশের পক্ষে অহিতকর বলিয়াই জ্ঞান করিতেছেন, তখন অপর যে যাহাই বলুক, সে কার্য্য তাহার পরিত্যজ্য। এই ভাব মনে আসিবামাত্র পাথরের মত শক্ত রাগটাও তাহার জল হইয়া পড়িল। টেবিলের ঘড়ীটা ঠুং করিয়া উঠিয়া জানান্ দিল—"সময় বহিয়া যায় যে, ভাবনায় এই দিন কাটাইলে চলিবে না ত!"

অনাদি ঘড়ার দিকে চাহিয়া অতঃপর সহজ ভাবেই বলিল. "দিদি ভাই, চারটা বাজলো, স্কুলে যাবার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে নিই গে। আমাদের কর্ত্তব্য, রাণীদিদি, তোমরা দু'জনে মিলে মীমাংসা ক'রে রাখ।"

রাজকুমারী বুঝিলেন, অনাদির মনের গতি ফিরিয়াছে। শরৎকুমারকে এজন্য স্বগত ধন্যবাদ দিয়া প্রকাশ্যে হৃষ্টচিত্তে অনাদিকে কহিলেন, "তুমি ভাই স্কুলে গিয়ে ব্যায়াম-সমিতির ছেলেদের আজ বিকালে বাগানে আস্‌তে ব'লো। ব্যায়াম খেলার দিন আজ নয়; না ডাকলে কেউ এ দিকে আসবে না। আমার রাখি-বন্ধনের নিমন্ত্রণ সবাইকে জানিয়ে দিও।"

"যে আজ্ঞা" বলিয়া অনাদি তাহার চটি জুতা জোড়ার খোঁজে প্রবৃত্ত হইল। এই সসম্মান স্বীকারোক্তিতে রাজকুমারীকে সে নিরুত্তর করিয়াছে বলিয়াই মনে করিয়াছিল—কিন্তু তাহার ভুল ভাঙ্গাইয়া জ্যোতির্ম্ময়ী আবার কহিলেন, "যে আজ্ঞে' নয়!—আমার হাতের 'রাখী' প'রে আজ তোমাদের আর একবার শপথ করতে হবে যে; দেশের নামে তোমরা কোন অত্যাচার করবে না। ব্যায়াম-সমিতির উদ্দেশ্য যদি তোমরা কেউ ভুল বুঝে থাক ত সে ভুল আজ ভেঙ্গে যাক্। বুঝলে ত অনাদি?"

"বুঝেছি, বুঝেছি আর বেশী বলতে হবে না।" আর একটা কি কথা সে বলিতে যাইতেছিল—কিন্তু চাপিয়া লইয়া করায়ত্ত জুতা জোড়াকে পদায়ত্ত করিয়া চট্‌পট্ গৃহ-নিষ্ক্রান্ত হইল। পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "আমায়ও এখনি যেতে হবে, ন'টা বাজলেই উঠব। মায়ের কাছে এলে আর যেতে ইচ্ছে করে না।" শরৎকুমার বলিলেন, "যেতে হবে সকলেরই এক সময়ে—ব্যস্ত হচ্ছেন কেন।"

রাজকুমারীর এতক্ষণে হুঁস হইল, শরৎকুমার আসিয়া পর্য্যন্ত বসেন নাই, অনুশোচিত চিত্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন. "ডাক্তার-দা, বসুন, কি বর্ব্বর আমি! অতিথিকে অভ্যর্থনা করতে পর্য্যন্ত ভুলে যাই। মাপ কর্ব্বেন।"

শরৎকুমার একটা চৌকির মাথায় হাত রাখিয়া যেমন দাঁড়াইয়া ছিলেন, তেমনি রহিলেন; বসিবার কোন লক্ষণই প্রকাশ না করিয়া সহাস্যে কহিলেন, "ভয়ে কব, না নির্ভয়ে, আজ্ঞা করুন।"

উত্তর হইল—"অবশ্য নির্ভয়ে!"

আশ্বস্ত হইয়া শরৎকুমার কহিলেন, "আমাদের শাস্ত্রকারগণ যেহেতু শিষ্টাচার প্রয়োগে সাধারণ আলাপের মধ্যে ক্ষমা প্রার্থনার যুক্তি দিয়ে যান্ নি, সেই হেতু বর্ত্তমানে আপনার ভাষাকে বিদেশী অনুকরণভাব-দুষ্ট বলা যায় কি না? পণ্ডিত মহাশয় তাহার বিচার করুন।"

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "এ বিচারের ভার এখনি আমি গ্রহণ করতে অপারক। মনুসংহিতা এবং পাণিনি—এই উভয়বিধ শাস্ত্র আয়ত্ত ক'রে নিয়ে তবে এ প্রশ্নের উত্তর দান করা যেতে পারে, একটু অপেক্ষা করতে হবে বাবাজী।"

জ্যোতির্ম্ময়ী সহাস্যে কহিলেন, "আচ্ছা, ক্ষমা করতে হবে না, বসুন ডাক্তার-দা?"

ডাক্তার বলিলেন, 'ক্ষমা করবার অধিকারও ত আমাদের নেই রাজকুমারি। মানুষে দোষ করে—দেবতারা ক্ষমা করেন, আমরা মানুষ—আপনারা দেবী—ক্ষমা করতে হয় যদি, সে-ও আপনারাই কর্ব্বেন—"

পণ্ডিত মহাশয় লোকটি রসগ্রাহী; ডাক্তারের বাক্যে প্রীত হইয়া হস্তোত্তোলনপূর্ব্বক কহিলেন, "সাধু—সাধু!"

ডাক্তার মস্তক-আনতিতে তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক জ্যোতির্ম্ময়ীর দিকে চাহিয়া আবার কহিলেন, "আমায় এখনি যেতে হবে রাজকুমারী, বসবার ত বেশী সময় নেই; তা ছাড়া গৃহকর্ত্রী যখন দাঁড়িয়ে আছেন—তখন—"

জ্যোতির্ম্ময়ী বলিলেন, হ্যাঁ, তখন আপনি বসেন কি ক'রে? আপনি যে মূর্ত্তিমান বিনয়—সে কথাটা ভুলে যেতে হয়।"

কথা কহিতে কহিতে একগাছি 'রাখী' তুলিয়া লইয়া জ্যোতির্ম্ময়ী দুই এক পদ অগ্রসর হইলেন; মনের ইচ্ছা 'রাখী' গাছটি শরৎকুমারের হাতে বাঁধিয়া দেন। কিন্তু সে ইচ্ছাটা কার্য্যে পরিণত করিতে

মনের মধ্যে কি যে একটা সঙ্কোচ আসিয়া বাধা দিল ; তিনি রাখীগাছা ডান হাতের অঙ্গুলি দ্বারা বাম হস্তের তর্জ্জনীতে পাকাইতে পাকাইতে কহিলেন—

"ডাক্তার-দা তবে কি—?"

. তাঁহার কথা অসমাপ্ত রহিয়া গেল —এই সময় নয়টার প্রথম ঘণ্টা পড়িবামাত্র পণ্ডিত মহাশয় তাড়াতাড়ি জ্যোতির্ম্ময়ীর কাছে আসিয়া হাতটা বাড়াইয়া কহিলেন —

"তোমার হাতের রাখী না প'রে যেতে পারছিনে মা।"

মনের আবেগে এই তৃতীয় ব্যক্তিটির অস্তিত্ব জ্যোতির্ম্ময়ী সহসা ভুলিয়া গিয়াছিলেন, সচকিত লজ্জিত ভাবে হাসিয়া বলিলেন —

"আসুন পণ্ডিত মহাশয়, রাখী পরিয়ে দিই।"

হাতের সে রাখী গাছটি টেবিলে রাখিয়া তিনি আর এক গাছি রাখী তুলিয়া লইয়া পণ্ডিত মহাশয়ের হস্তে বাঁধিয়া দিতে দিতে কহিলেন—

"উপদেশ দিন এখন গুরুজী, আমার কায কি ?"

রাখী ধারণ করিয়া পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "মা, তোমাকে উপদেশ দিই এমন সাধ্য আমার কি ! তুমি স্বয়ং শক্তিরূপা ভগবতী। তুমিই আমাকে আদেশ করিবে, আমি পালন করিয়া চলিব।"

গুরুদেব গম্ভীরভাবেই এই কথাগুলি বলিলেন। জ্যোতির্ম্ময়ী হাস্য-পরিহাসে এই গুরুগম্ভীর বাক্যভার লঘুতরল করিবার উদ্দেশে খুব খানিক হাসিয়া লইয়া কহিলেন, "দেখুন ত ডাক্তার সাহেব, গুরুজীর কথার শ্রী !"

ডাক্তার তাঁহার মনের ভাবটা ধরিয়া লইয়া পরিহাসপূর্ব্বক কহিলেন, "গুরুজী ত ঠিক কথাই ব'লেছেন। আপনি কি মনে করেন, আপনার গুরুজী তিব্বত-বিহারী মহাত্মা—উপদেশের অতীত ?"

পণ্ডিত মহাশয় দুইগাছা রাখীতে কিরূপ শোভা হইয়াছে, তাহা দেখিতে বাম হাতটা দাড়ী হইতে নামাইয়া ছিলেন, পুনরায় হস্ত যথানিয়োজনে নতমুখ উন্নত করিয়া বলিলেন, "মায়ের উপদেশ বাবাজি, মহাত্মাদেরও শিরোধার্য্য। আদেশ কর মা তুমি আমাকে, কি করিব ?"

শরৎকুমার কহিলেন, "ওঁকে তবে আদেশ করুন রাজকুমারী, উনি যেন ঘরের পোষা পাখীটাকে পাড়া-পড়সীর নাম ডাকতে না শেখান্।"

পণ্ডিত মহাশয় হঠাৎ 'থ' হইয়া গেলেন, দাড়ী হইতে হাতটা সহসা নামিয়া পড়িল। জ্যোতির্ম্ময়ী হাসিয়া কহিলেন, "ডাক্তার-দা—কি যে বলেন আপনি ?"

"আচ্ছা, পণ্ডিত মহাশয়কেই জিজ্ঞাসা করুন, কথাটা ঠিক কি না ?"

পণ্ডিত মহাশয়ের কথা ফুটিল—কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিলেন, "পাড়া-পড়সীর নাম ডাক্‌তে শেখাই আমি। এ কি বিশ্বাসের কথা মা ? কে বল্লে বল ত হে ?"

উত্তর হইল—"যা'র নামে পাখী বুলি ধরেছিল, সেই বল্‌ছিল।"

"সেই বল্‌ছিল ! লোকটা কে শুনি ! নামটাই বল না !"

"সে কথা আমার চেয়ে আপনিই ভাল জানেন।"

পণ্ডিত মহাশয়ের অতঃপর ধৈর্য্যচ্যুত হইল, চড়া মেজাজে কহিলেন,"আমি কিছু জানি টানিনে বাপু, তুমি কি জেনেছ, শুনেছ তুমিই বল্‌তে পার।"

"নিতান্তই শুনবেন সে কথা।" বেশ গম্ভীর হইয়া শরৎকুমার এ কথা বলিলেন,—"শুনুন তবে। কাল সকালে আমি যাচ্ছিলুম যখন আপনার বাড়ীর পাশ দিয়ে হাসপাতালে, আপনার পাখীটি তখন মনের সুখে বুলি ধরেছে—আর রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে এক জন স্ত্রীলোক গালে হাত দিয়ে বলছে—কি ঘেন্না গো কি আক্কেল, দেবদেবীর নাম রইল শিকেয় তোলা —আর পাখী ধরেছে বিন্দুর নাম।"

শরৎকুমার যে সরস অভিনয়ে কিরূপ গল্প জমাইতে পারেন, রাজকুমারী আজ তাহার প্রথম পরিচয় পাইলেন ; হাস্যোল্লাসে গৃহ পূর্ণ হইল। কিন্তু পণ্ডিত মহাশয় ইহাতে যোগ দিতে পারিলেন না, তিনি ক্রুদ্ধ স্বরেই কহিলেন, "দেখেছ বিন্দু ময়রাণীর স্পর্দ্ধা ! পাখীকে আমি কি না তার নাম গান করতে শেখাব !"

"কিন্তু আমারও মনে হোল, পাখী বিন্দু বিন্দু বলেই যেন ডাক্‌ছে।" এই সমর্থন বাক্য পণ্ডিত-মহাশয়ের অসহ্য হইয়া উঠিল। সক্রোধে বলিলেন, দাঁড়াও না গলা টিপে পাখীটাকে মেরে ফেল্‌ছি গিয়েই।"

শরৎকুমার পূর্ব্ববৎ গম্ভীর ভাবেই বলিলেন, "কি বলেন গুরুজী ! রাখীবন্ধনের উপদেশ এক মুহূর্ত্তেই ভুলে গেলেন।"

পণ্ডিত মহাশয়ের ওষ্ঠাধর এইবার হাস্যরেখায় উন্মীলিত হইল, সহাস্যে কহিলেন, "জানেন ডাক্তার সাহেব,—আমি শেখাচ্ছিলুম পাখীটাকে ফলের নাম !"

"ফুলের নাম!" শরৎকুমার ব-অক্ষর আদি ফুলের নাম মনে করিতে চেষ্টা করিলেন—"বকুল, বেলা, বন-তুলসী, বংশীবট, কই ব-ওয়ালা ফুলের নাম ত বেশী মনে আসছে না গুরুজী? তবে বধূ ব'লে অভিধানে একটা কথা আছে, কাব্যকারগণ ফুলের সঙ্গে তার তুলনা ক'রে থাকেন বটে!"

পণ্ডিত মহাশয় যে বিপত্নীক, তাহা শরৎকুমার জানিতেন না। গুরুজী একটু অপ্রতিভ হইয়া উত্তরে কহিলেন,—

"কেন, বন্ধু শব্দ! আসল ব্যাপারটাও বাবাজি তাই। এই—এই—ধর অরবিন্দ। আমি তা'কে হৃদয় বন্ধু ব'লে মনে করি কি না—তার প্রতি আমার অসীম শ্রদ্ধাভক্তি। কে জানে তা থেকে এমন উল্টো উৎপত্তি হবে! উপর অংশ বাদ দিয়ে পাখী হতভাগাটা কি না শেষটুকুই ধরলে!"

"ভবিষ্যতে সাবধান হবেন,—দেখছেন ত কোথাকার জল কোথায় গড়ায়! কোন দিন শেষে সাগরিকার সারির মত আপনার পাখী একটা কাণ্ডকারখানা ক'রে বসবে!" এই কথা বলিয়া শরৎকুমার জ্যোতির্ম্ময়ীর দিকে চাহিয়া বিনয়পূর্ব্বক বলিলেন, "আপনার গুরুজীকে উপদেশ দিতেও সাহসী হচ্ছি রাজকুমারী, দেখছেন ত—ডাক্তারেরও মতিভ্রম হয়!"

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "মতিভ্রম নয়, ঠিক বলেছ বাবাজি,—আমার মনের মধ্যে একটা ভাবনা ধ'রে গেল! দেখো মা, এ কথাটা যেন কুন্দের কানে না যায়। তিনিও ত এ থেকে উল্টো বুঝতে পারেন।"

তাঁহার এই অনুনয়-ভঙ্গীতে কণ্ঠাগত হাস্যোচ্ছাসকে বহু কষ্টে চাপিয়া লইয়া রাজকুমারী কহিলেন, "কুন্দদিদির বাড়ী থেকে আসতে এখনো দেরী আছে, তিনি যত দিনে আসবেন, তত দিনে এ' কথাটা চাপা প'ড়ে যাবে।"

রাজকুমারীর এ প্রসঙ্গ ভাল লাগিতেছিল না, তিনি অতঃপর ইহা বন্ধ করিবার অভিপ্রায়ে শরৎকুমারের দিকে চাহিয়া গম্ভীরভাবে কহিলেন,—

"ডাক্তার দা, আপনি এখানে হঠাৎ এ সময় কেন এলেন, তা ত এখনও বল্লেন না!"

পণ্ডিত মহাশয় একবার ঘড়ীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আমারও যে কৌতূহল জন্মাল,—এখনো পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করতে পারি, কথাটা শুনেই যাই।"

সকলের কৌতূহল নিবারণ করিয়া শরৎকুমার উত্তর করিলেন, "রাজাবাহাদুরের দৌত্য নিয়ে এসেছি। আগামী সপ্তাহের রবিবারে প্রসাদপুরে বঙ্গবিভাগ-প্রতিবাদ-কন্‌ফারেন্স হবে; অতিথি-সম্বর্দ্ধনার জন্য আপনি প্রস্তুত হয়ে নিন্। সভার প্রোগ্রামও আপনাকেই ঠিক করতে হবে।"

জ্যোতির্ম্ময়ী সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, সত্যি! বেশ বেশ! অতিথিসৎকারের জন্য ভাবিনে ডাক্তার-দা। সে বন্দোবস্ত ত আপনারাই করবেন, কিন্তু গানের রিহার্সেল জন্য সময়টা যেন একটু সংক্ষেপ মনে হচ্ছে।"

শরৎকুমার বলিলেন, "আজ শুক্রবার, এখনো পূর্ণ ১০টা দিন হাতে আছে; তার মধ্যে আপনার রিহার্সেল খুব হয়ে যাবে।"

পণ্ডিত মহাশয় এইবার প্রস্থানোদ্দেশে পদ বাড়াইয়া বলিলেন, "ভাবিত হয়ো না মা, আমরা তোমার সহায় আছি। এখন আসি তবে, বিকালে সর্ব্বাগ্রে ছুটে আসব।"

পণ্ডিত মহাশয় চলিয়া গেলেন। জ্যোতির্ম্ময়ী বলিলেন, "আমার বড় আহ্লাদ হচ্ছে ডাক্তার-দা; অনেকদিন ধ'রে এখানে একটা জাতীয় সভা আহ্বান করবার কথা আমি বাবাকে বলছি। দেশের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বিশেষতঃ সুরেন্দ্র বাবুর সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছা বহুদিন ধ'রে আমার মনে জেগেছে, তা বোধ হয় আগেই একদিন আপনাকে বলেছি। খুব সু-খবর ডাক্তার-দা!"

"আরও একটি সু-খবর আছে রাজকুমারি! মকদ্দমায় আমরা বে-কসুর মুক্তিলাভ করেছি।"

রাজকুমারীর মুখকান্তি জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিল, তিনি পূর্ণানন্দে কহিলেন, "ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সত্যই ন্যায়াবতার। কালই বিকালে গিয়ে আমি তাঁদের রাখী পরিয়ে ধন্যবাদ দিয়ে আসব। আর দেখব যদি এই প্রতিবাদ-কন্‌ফারেন্সের প্রেসিডেণ্ট তাঁকেই করতে পারি। ডাক্তার-দা, আজ বিকালে রাখীবন্ধনের সময় আপনিও আসছেন ত?"

"নিশ্চয়। কিন্তু না, সম্ভবতঃ আসতে পারব না, হাসপাতালে আজ বিকালে একটা অস্ত্রচিকিৎসা আছে।"

রাজকুমারী একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িলেন, দু-এক মুহূর্ত্ত সময় লইয়া বলিলেন, "তবু চেষ্টা করবেন, আমি অপেক্ষা করব—ফিরতে যদি সন্ধ্যা হয়ে যায়—তবুও আমি অপেক্ষা করব!"

এ কি মধুরতা! এ কি মাদকতা! এই দুই চারিটি কথায় শরৎকুমারের মনঃপ্রাণ সহসা

অমৃতধারার ভরিয়া গেল। তিনি ধীরে ধীরে মুগ্ধের ন্যায় কহিলেন; "Caseটা বড় কঠিন, আমার মনে হচ্ছে ফিরতে রাত হয়ে যাবে, অপেক্ষা করবেন না রাজকুমারী।"

রাজকুমারী বলিলেন, "বেশ, অপেক্ষা করব না তবে। তবুও পারেন ত আসবেন ডাক্তার-দা। অনাদির ভাব দেখে আমার মনে ভারী একটা আতঙ্ক উপস্থিত হয়েছে। আমি যদি ভাল ক'রে ছেলেদের বোঝাতে না পারি, আপনি একটু বুঝিয়ে বলবেন যে, তারাই যথার্থ দেশভক্ত, সাধক, যারা—" জ্যোতির্ম্ময়ী হঠাৎ থামিয়া পড়িলেন, কি বলিয়া এই বাক্য সমাপ্ত করিবেন, যেন ভাষা খুঁজিয়া পাইলেন না। শরৎকুমার সে অভাব পূরণ করিয়া কহিলেন, "তাহারাই যথার্থ দেশভক্ত-সাধক,—যাহাদের মূলমন্ত্র রক্তপাত নহে আত্মপাত। শোণিতার্ঘ্য —মাতৃভূমি সুখে গ্রহণ করেন না, তাহাতে তাঁহাকে কলঙ্কিত করা হয়।"

কি সুন্দর কথা! জ্যোতির্ম্ময়ী কি স্বপ্নবাণী শুনিলেন!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অনাদি স্কুলে গিয়া দেখিল, ব্যায়ামসমিতির অনেক ছেলেই অনুপস্থিত। শুনিল, ন্যাসন্যাল শিল্পের প্রতিষ্ঠা উৎসবে যোগদান করিতে তাহারা কলিকাতায় গিয়াছে। অগত্যা স্বল্পসংখ্যক মাত্র বন্ধুবান্ধব লইয়াই বিকালে অনাদি জ্যোতির্ম্ময়ীর নিমন্ত্রণ-রক্ষায় আসিল।

অতিথিগণ আসিবার বহু পূর্ব্ব হইতেই আতিথ্যকারিণী বাগানে আসিয়া আয়োজন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। দাসদাসীগণ তাঁহার আদেশে ও উপদেশে খাদ্যসম্ভার তরুকুঞ্জে টেবিলে সাজাইয়া রাখিতেছে, কর্ত্রী স্বয়ং স্বহস্তে সরবৎ প্রস্তুতভার গ্রহণ করিয়াছেন। এতই নিবিষ্টচিত্তে তিনি এ কার্য্য করিতেছিলেন যে, ইতিমধ্যে হরিরাম কখন যে নিকটের তরুপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা তিনি জানিতেও পারেন নাই।

হরিরামের স্কন্ধে এক বৃহৎ লৌহ-ধনুক ছিলা; আসিবার পথে ইহার ঘুন্টিগুলা সজোরে নাড়াইয়া আপনার আগমন-সংবাদ জ্ঞাপন করিতে সে ত্রুটি করে নাই। কিন্তু এ শব্দেও রাজকুমারীকে তাহার অস্তিত্বে সচেতন করিতে পারে নাই দেখিয়া অতঃপর নিঃশব্দেই কিছু দূরে দাঁড়াইয়া কার্য্যরতা সেই লক্ষ্মী-মূর্ত্তিকে প্রীতিনয়ন ভরিয়া দেখিতেছিল। এই অসামান্য রূপলাবণ্যময়ী বালিকা শিশুকালে তাহারি ক্রোড়ে মানুষ হইয়াছে—ইহা ভাবিয়া গর্ব্বানন্দে তাহার বক্ষঃ জোয়ারের জলের মতই ফাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। জ্যোতির্ম্ময়ী কার্য্যান্তে হাত ধুইয়া আর একবার উত্তমরূপে টেবিল-সজ্জা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া লইয়া একখানি লৌহ-চৌকিতে আসিয়া যখন বসিলেন, তখন হরিরাম নিকটে আসিয়া নমস্কারপূর্ব্বক কহিল, "এই দেখ রাণি-মা, তোমার আস্ত পুরুষের সেই নামজাদা ধনুক।"

জ্যোতির্ম্ময়ী আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "এত দিনে খুঁজে পেয়েছ, হরিরাম?"

"পাব না? মা আমার আজ্ঞা করলেন—খুঁজি আন সে পুরাতন ধনু; হরিরাম কি আর চুপ করি থাক্‌তি পারে? বলব কি মা দুখের কথা, তোমাখানার হইচে যেডা নব কর্ম্মকর্ত্তা, সেটা আস্ত জাম্বো।

জ্যোতির্ম্ময়ী হাসিয়া বলিলেন, "জাম্বো কি হরিরাম!"

"এই তোমরা যানারে কও জাম্বুবান্, আমরা তানারেই কই জাম্বো! সেডা কি বোঝে—মতির মালা আর ইট্টপাট্টকেলের তফাৎ! এই ধনুছিলাটা কি না ফেলি রাখচে কতক ভাঙ্গা-চোরা জিনিষ পত্তরের মদ্দি—"

"তা পেয়েছ ত, সেই ভাল।"

"হাঁ তা পাইচি। না পালি বড় খারাবি হোত। ঠাউর মশাই লিখি থুইচে যে, এ ধনুতে রাজ্যি বদ্‌লি হইবে। রাম—ধনুক ভাঙ্গি তবে ত সীতারে পাইচিলেন মা!"

জ্যোতির্ম্ময়ী হরিরামকে এ বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যা হইতে নিবৃত্ত করিবার অভিপ্রায়ে কহিলেন, "হরিরাম, তুমি এতদিন ছেলেদের লাঠিখেলা শিখিয়েছ, এইবার তোমার কাজ বাড়লো, এবার ধনুর্ব্বাণ ছড়তে শেখাও।"

"তা শিখাব বই কি! কিন্তু তা হ'লে ধনুক তৈরী করাও মা, এ ধনু-ছিলা তুলতি পারে এমন জন ত এহ্যানে দেহি নে। এ ধনুক হইচে সনাতন চৌধুরীর হাতের ধনুক; এই ছিলায় যহন বাণ ছুট্‌ত, তহন বন-জঙ্গলের কোন জানোয়ারই রেহাই পাত না।"

কৌতূহলপরায়ণা শশিদাসী রাজকুমারীর পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে বলিয়া উঠিল—"সত্যি

রাণীদিদি, ঠিক কথা! পাঁড়ের মুখেও এই কথা শুনেছি।"

হরিরাম বলিল, "পুঁথির কহন কি মিথ্যা হয়! শোন ত বাক্যি! গণক ঠাউর রাজপুঁথিতে এই সব লিখি থুইচে। দুটো কুঁদো বাঘ গাঁ উজোর করি যহন ফ্যামে, তহন প্রজারা কাঁদি কাটি রামপুরের রাজার পা চাপি ধরলো; ঠিক কি না তুই ক?"

শশিদাসী কহিল, "রামপুর নয় গো—রাজপুর।"

হরিরাম রাগিয়া বলিল,"রামপুর হইল জিলা আর রাজপুর হইল—রাজার পাটস্থান! মেয়েজাত এমন আহ্মক তা ত এই দেহি। রাজা পাটে বসি হুকুম দিলেন, এ বাঘ যে মারি আনবে, সে প্রসাদপুর বক্-সিস পাবে। সনাতন চৌধুরী খবর শুনিত ভারী খুসী—রাজদরবারে আসি কইলেন—আমারে দান-পত্র লিখিয়া দেওয়া হোক।"

এতক্ষণ জ্যোতির্ম্ময়ী নীরব হাস্যমুখে তাহার দীর্ঘকাহিনী শুনিয়া যাইতেছিলেন। এইবার তাহার উপন্যাস সংক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "তারপর সনাতন চৌধুরী বাঘ শীকারের পুরস্কারস্বরূপ রাজ্য এবং রাজকন্যা এক সঙ্গে লাভ করিলেন? এই না হরিরাম?"

কিন্তু এত সহজে হরিরাম নিবৃত্ত হইবার নহে; সে কহিল, "কহন কথা আরো কইচে যে, সনাতন চৌধুরী হাতীর পিঠে চড়ি—রাজপুরীতে আইলেন!"

রাজকুমারী বলিলেন, "শ্বেত হাতীর পিঠে অবশ্য।"

"হাঁ মা! রাজা বাঘ দু'টারে মাইরা ছিলায় বাঁধবার কালে—ধনুকের ঘুন্টির রবে জঙ্গল ভইরা উঠ্‌লো; আর অমনি—"

দাসী বলিল, "ঘুন্টির রবে না বংশীধ্বনীতে? সবাই কয় রাজা খুব বাঁশি বাজাতে পারতেন।"

"শোন বাক্যি! ঘুন্টির রব বংশীধ্বনির চেয়ে কম না কি?"

হরিরাম ধনুকের ঘুন্টিগুলা ঝন্‌ঝন্ করিয়া বাজা-ইয়া দিল—রাজকুমারী হাসিয়া কহিলেন, "আমার ত এ ধ্বনি বাঁশির সুরের চেয়েও সুমধুর মনে হচ্ছে।"

আহ্লাদে হাস্যবিকশিত হইয়া হরিরাম কহিল, "এই ঘুন্টির রবে শ্বেতহস্তী বনের বাহিরে আইসা, চৌধুরী মশায়কে শুঁড়ে তুইলা পিঠে চড়ায়ে রাজার কাছে আইনা হাজির করলেন, রাজা ত দেইখা শুইনা অবাক্, তিনি কইলেন—ওগো সনাতন চৌধুরী, তুমি ত দেহি ব্রাহ্মণ-সন্তান—তোমারেই আমি কন্যাদান করব। রাজমাতা আপুনি আইসা তহন বরণ কইরা হাতী থে নামাইলেন। পুঁথিখান একবার পইড়া দেহ মা!"

"পুঁথি পাওয়া যাচ্ছে না, হরিরাম!"

"পুঁথি পাওয়া যায় না!—" আশ্চর্য্য প্রকাশ করিতে গিয়া হরিরামের চক্ষু জলে ভরিয়া গেল, সে বলিল,—

"এ সেই দুর্জ্জন বেটার কীর্ত্তি! চুরিয়ে রাখ্‌ছে। আজ্ঞা কর মা, তার ভিটে পুড়িয়ে পুঁথি আনি।"

জ্যোতির্ম্ময়ী বলিলেন, "না, সে সব কিছু করতে হবে না; তাঁর কাছেই থাক না; ক্ষতি কি তাতে। হরিরাম তুমি ধনুকটা কাঁধ থেকে নামাও ত, দেখি আমি তুলতে পারি কি না?"

হরিরাম "হা হা" করিয়া হাসিয়া ধনুক নামাইয়া ভূমে রাখিল। জ্যোতির্ম্ময়ী উঠাইতে চেষ্টা করিয়া বিফলপ্রযত্ন হইয়া কহিলেন,"তাই ত ভয়ানক ভারী! ব্যায়ামের দিনে এবার এর দ্বারা আমার ছেলেদের শক্তি পরীক্ষা করতে হবে।"

হরিরাম বলিল, "মা জননি, ঠাউরের সে আজ্ঞে নেই; এ ধনুক যারে তারে ধরতে দিতে নিষেধ। এমন কহন আছে, রাজার ঘরে যদি পুত্র সন্তান না হয় ত এই ধনুক যে বেটা ধারণ করবে—"

এ কাহিনী শোনার দায় হইতে নিস্কৃতিলাভের অভিপ্রায়ে রাজকুমারী তাড়াতাড়ি বলিলেন, "আচ্ছা হরিরাম, এ ধনুক তুমি নিয়ে গিয়ে হাতিয়ারশালার দেয়ালে সাজিয়ে রাখগে—আমার এখন একটু কাজ আছে।"

হরিরাম আর কোন কথা না কহিয়া ভূমিপতিত ধনুক সজোরে স্কন্ধে ধারণ করিল। এই সময় রূপসিংহ দ্বারবান আসিয়া সৈনিক-প্রথায় সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক রাজকুমারীর নিকট একখানি পত্র-পাত্র ধরিল। রাজকুমারী পত্রখানি তুলিয়া হস্তে গ্রহণ করিবামাত্র সে আর একবার কায়দাসহকারে তাঁহাকে সেলাম করিয়া চলিয়া গেল। পত্রখানি পণ্ডিত মহাশয়ের। লিখিয়াছেন, আজ বিকালে তিনি সম্ভবতঃ জ্যোতির্ম্ময়ীর নিমন্ত্রণে আসিতে পারিবেন না। কারণ, দুপুরের পর হইতে তাঁহার পাখীটির বুলি সহসা বন্ধ হইয়া পড়ায় তিনি বড়ই ভাবিত আছেন। যতক্ষণ তাহার বুলি না ফোটে —ততক্ষণ তাঁহার গতিবিধি সমস্তই অনিশ্চিত।

এই সংবাদে জ্যোতির্ম্ময়ীও ভাবিত হইয়া পড়িলেন,—তিনি জানেন পাখীটি পণ্ডিত মহাশয়ের প্রাণের ধন, তাহার মৃত্যু হইলে পণ্ডিত মহাশয়ের বড়ই কষ্ট হইবে। তিনি গমনোদ্যত হরিরামকে

ডাকিয়া কহিলেন,"পণ্ডিত মহাশয়ের পাখীটাব অসুখ করেছে—তুমি ত হরিরাম এক জন শিকারী, পাখীর চিকিৎসা জান বোধ হয় ?"

হরিরাম মাথা নাড়িয়া বলিল,—"উহুঁ ; আমি জানিনে ; হাতেম মিঞা জানে। সে আমার বাড়ীর কাছেই থাকে।" জ্যোতির্ম্ময়ী সানুনয়ে কহিলেন, "যাও হরিরাম, এখনি তাকে নিয়ে গিয়ে পণ্ডিত মশায়ের পাখীটিকে দেখাও। ব'লো সারাতে পারলে খুব বক্‌সিস্ পাবে।"

হরিরাম 'যে আজ্ঞা' বলিয়া অভিবাদনপূর্ব্বক ঘুন্টি বাজাইতে বাজাইতে চলিয়া গেল।

অপরাহ্ণে যথাসময়ে নিমন্ত্রিত বালকগণ আম বাগানে আসিয়া সমবেত হইল। জ্যোতির্ম্ময়ী স্বয়ং তাহাদিগকে রাখী পরাইবেন, তাহাদের আনন্দ-উৎসাহ দেখে কে ? বন্দে মাতরম্ ধ্বনি তুলিয়া তাহারা প্রবেশ করিল ; বন্দে মাতরম্ ধ্বনিতে রাখী পরিয়া আনত-মস্তকে তাঁহাকে নমস্কার অভিবাদন করিল। জ্যোতির্ম্ময়ীর জীবন মাতৃভাবে সার্থক হইয়া উঠিল। তিনি রাখীবন্ধন শেষে প্রত্য-ভিবাদনে আর একবার তাহাদিগকে নমস্কার করিয়া কহিলেন, "আজকের রাখীবন্ধন-উৎসব আমাদের ব্যায়াম উৎসবেরই একটি অঙ্গ। সমিতির প্রতিষ্ঠা দিনের শপথ তোমাদের মনে আছে ত ?"

ইহার উত্তরে বহু কণ্ঠ একই কণ্ঠের মত ধ্বনিত হইয়া উঠিল—"মনে নেই সে শপথবাক্য! কি বলেন রাজকুমারি ?" সকলে থামিলে, বসন্তকুমার নামে সমিতির এক জন তেজস্বী বলবান্ যুবক উত্তর করিল, "দেশের কাজে যদি কোন দিন এই বাহুবল সার্থক করতে পারি, তবেই সে শপথ ভোলার দিন আস্‌বে ; তার আগে নয়।"

রাজকুমারী নীরব হইয়া পড়িলেন, বসন্তকুমারের এ কথার অর্থ তিনি ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। কিছু পরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "বাহুবলের সার্থকতাই ত আমাদের কার্য্যের উদ্দেশ্য নয়—বসন্ত ; আমাদের পথ ত অত্যাচারের পথ নয়। আমাদের জীবনের সার্থকতা, কার্য্যের সফলতা আত্মপাতে ; রক্তপাতকে কখনো যেন আমরা গৌরবের কার্য্য ব'লে বিবেচনা না করি।"

সহসা সুপ্তিভঙ্গে অতিথির দল যেন চমকিয়া উঠিল। ব্যায়াম-সমিতি-প্রতিষ্ঠার দিনে তাহারা কি শপথ করিয়াছিল, অক্ষরে অক্ষরে তাহা কাহারো স্মরণ ছিল না, দেশের জন্য কাজ করিতে তাহারা শপথবদ্ধ—এই কথাই মাত্র তাহাদের মনে জাগরূক ছিল। অনাদি কেবল প্রাতঃকালে তাহার বিস্মৃত স্মৃতি পূর্ণমাত্রায় ফিরিয়া পাইয়াছে। অন্য কেহ কোন কথা কহিবার পূর্ব্বেই সে জ্যোতির্ম্ময়ীর নিকটে আসিয়া নতমস্তকে বলিল, "যথাদেশ রাজকুমারী ; রক্তপাতকে অবজ্ঞা করিয়াই আমরা চলিব।"

"কিন্তু যদি আবশ্যক হয় !"

একটি ক্ষীণদেহ অল্পবয়স্ক বালক পশ্চাৎ হইতে এই প্রশ্ন করিল।

জ্যোতির্ম্ময়ী উত্তরে কহিলেন, "আত্মরক্ষার জন্য, দুর্ব্বলরক্ষার জন্য বাহুবলের আশ্রয় গ্রহণ ত অনি-বার্য্য,---কিন্তু—"

রাজকুমারী এই পর্য্যন্ত বলিয়া সহসা থামিয়া গেলেন—অনাদি তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ কহিল, "কিন্তু রক্তপাতে দেশব্রত-উদ্‌যাপন-সঙ্কল্প আমাদের মনে যেন না জাগে। রাজকুমারী এই কথাই ব'ল-ছেন আর এই ভাবের শপথেই আমরা পূর্ব্ব হ'তে নিজেদের আবদ্ধ করেছি। 'অযথা বলপ্রকাশ বা দ্বন্দ্ব করিবে না।' ইহা আমাদের নিয়মাবলীর একটি সূত্র।"

সকলেরই মনে সুপ্ত স্মৃতি পুনর্জ্জাগরিত হইয়া উঠিল,ব্যায়াম-সমিতি-প্রতিষ্ঠাদিনের আনন্দ উচ্ছ্বাসের কথা মনে পড়িল,— উৎসাহ ভাবে নীয়মান হইয়া সম্মুখের বালকশ্রেণী অবনত-মস্তকে বলিল, "আমরা রাজকুমারীকে গুরু বলিয়া জানি, গুরু বলিয়া মানি, তাঁহার আদেশ সর্ব্বসময়েই শিরোধার্য্য।"

এই বলিয়া বন্দে মাতরম্ ধ্বনিতে তাহারা জয়-ধ্বনি তুলিল, পশ্চাতের দুই চারি জন বালকের নীরবতা সেই জয়ধ্বনির মধ্যে কেহ লক্ষ্য করিল না।

ইহার পর বালকগণ আনন্দ কোলাহল করিতে করিতে ভোজের দিকে মনোনিবেশ করিল। যখন বিহঙ্গ বৈতালিকগণ সন্ধ্যাবন্দনায় কানন মুখরিত করিয়া তুলিল, পান-ভোজনাদি শেষ করিয়া বালক-গণও তখন বন্দে মাতরম্ গীতে আগমনী গাহিল। বন্দনাগীতি-স্বাগত সন্ধ্যারাণী, শান্তিময়ী আশিসা-লোকে ভুবন ভরাইয়া তুলিয়া ধরণীতে পদার্পণ করি-লেন। এই কল্যাণরূপিণী জননীর স্নেহ-ক্রোড়ে রাজকুমারীকে সংরক্ষিত করিয়া বালকগণ প্রসন্নমনে বিদায় গ্রহণ করিল।

সন্ধ্যা বহুক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। জনশূন্য কানন-তলে লোহাসনে আসীনা রাজকন্যা আকাশের দিকে চাহিয়া চিন্তামগ্ন। সন্ধ্যা পূর্ব্ব হইতে দ্বিতীয়ার চন্দ্রকলা দিব্যরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া এখন আত্ম-গোপন প্রয়াসে আকাশের শেষপ্রান্তে প্রায় নামিয়া

পড়িয়াছে; ঐ ডুবিল, ঐ নিবিল! সন্ধ্যাতারার উজ্জ্বল রূপ সহসা উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল, পার্শ্বের ক্ষীণকান্তি মঙ্গলগ্রহ অপেক্ষাকৃত সুস্পষ্টভাবে নেত্র-গোচর হইল। তাহার দিকে চাহিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী ভাবিতে লাগিলেন, "মঙ্গলগ্রহে বার্ত্তা-প্রেরণের জন্য কত জ্যোতিষী প্রাণপণ প্রয়াস করিতেছেন, চিরদিন কি তাঁহাদের চেষ্টা নিষ্ফল রহিবে! না কোন সৌভাগ্যশালী একদিন এই বহু চেষ্টাগঠিত সোপানাবলী চড়িয়া মঙ্গলে পৌঁছিতে পারিবেন?" জ্যোতির্ম্ময়ীর দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল।

অদূরে শুক্‌নো পাতা দলিত জুতার মচমচধ্বনির মধ্যে, তাঁহার নিশ্বাসের মৃদু ধ্বনি ধীরে মিশাইয়া গেল। জ্যোতির্ম্ময়ী সেই দিকে আকুল প্রত্যাশায় কর্ণপাত করিলেন, ডাক্তার-দা কি এতক্ষণে আসিতেছেন! তাঁহার হাতে এখনো রাখী বাঁধা হয় নাই; বিকালের আনন্দ তাই অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। পদশব্দ যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ততই তাহার হৃদয়-শোণিত বেগে উঠিতে-পড়িতে লাগিল, একটা লজ্জা-চাঞ্চল্যের আবেগে মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল! জ্যোতির্ম্ময়ী প্রকৃতিস্থ হইবার চেষ্টায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া লতামণ্ডপ হইতে ফুলগুচ্ছ চয়নে রত হইলেন।

মূর্ত্তি নয়ন-গোচর হইল, "ইনি ত ডাক্তার নহেন, —পিতা যে!"

রাজা আসিয়া কহিলেন, "আমি জানতুম এখানে এলেই রাণীর দেখা পাব।"

রাজকুমারী লজ্জাবনত দৃষ্টিতে ফলগুলি তাঁহার হাতে দিয়া বলিলেন, "আজকে বাবা আমি ছেলেদের রাখী পরিয়ে দিলুম।"

রাজাবাহাদুর কন্যার পিঠে অন্য হাত রাখিয়া আদরে বলিলেন, "শুনেছিস ত সব কথা! এখানে কন্‌ফারেন্স হবে; খুসী ত রাণী!"

রাজকুমারী সমুৎসাহে কহিলেন, "খুব!" পূর্ব্বের নৈরাশ্য-বেদনা তাঁহার হৃদয় হইতে মুছিয়া গেল। রাজা বলিলেন, "চল রাণি ঘরে; প্রোগ্রাম ঠিক করি গে। ম্যানেজার আবার আমাকে জোর তলব করেছেন, কাল আর হবে না, পরশু নাগাদ আমাকে দু'চার দিনের জন্য এক বার কলকাতায় যেতেই হবে।"

দু'জনে হাত ধরাধরি করিয়া গৃহাভিমুখী হইলেন। যাইতে যাইতে রাজকুমারী কহিলেন, "তা হ'লে কাল একবার ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ী চল না বাবা।"

রাজা কহিলেন, "আমার খুকীটির মনের ভাব বুঝে আমি আগে থাকতেই সেই প্রোগ্রাম ঠিক করেছি। ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নী জানেন যে, কাল আমরা তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে যাব।"

জ্যোতির্ম্ময়ী হাসিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "ম্যাজিষ্ট্রেটকে আমি কিন্তু কন্‌ফারেন্সের প্রেসিডেণ্ট হ'তে নিমন্ত্রণ কর্ব্ব বাবা—"

রাজা কহিলেন,—"তিনি প্রেসিডেণ্ট হ'লে ত খুবই ভাল হয়। কিন্তু তা কি হবেন?"

"নিশ্চয়ই হবেন, তুমি দেখে নিও।"

বলিতে বলিতে হাস্যোজ্জ্বল মুখখানি তুলিয়া মঙ্গল গ্রহের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বহুদূর বিস্তৃত জনশূন্য পতিত প্রান্তর; ত্রিসীমা দিয়া প্রায় লোক যাতায়াত করে না। ইহারই এক স্থলে বন্য গাছপালা-প্রচ্ছন্ন বহু পুরাতন একটি মন্দিরের ভগ্নস্তূপ। ইষ্টক-আবর্জ্জনারাশি-নির্ম্মিত প্রাকার-বেষ্টনে মধ্যের অঙ্গনভাগ এমন গুপ্ত গুহাকারে পরিণত হইয়াছে যে, ইহার ঠিক বহির্দ্দেশে আসিয়া দাঁড়াইলেও কেহ অন্তর্ব্বিভাগের পরিচয় পায় না। এই গুপ্তস্থান বিদ্রোহী যুবকদলের দুর্গ—নাম মাতৃমন্দির। অন্তর্ব্বিভাগ দুইটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত; একটি নব বালকদিগের শপথগৃহ এবং এইখানেই মাটীর নীচে চোরাই অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি সংরক্ষিত থাকে; অন্যাংশ বিস্ফোটক-পরীক্ষাগার। এ মন্দিরে প্রবেশ-অধিকারীর নাম সেবাধারী। শনি-রবিবারেই এখানে ছেলেদের আমদানী অধিক, অস্ত্র-শস্ত্রের কসরৎ এবং রাসায়নিক পরীক্ষাকার্য্য এই দু' দিন বেশ রীতিমত ভাবে এখানে চলে। পূর্ব্বকথিত রাখীবন্ধনের পর দিন পড়িয়াছে একটি শনিবার, কিন্তু তথাপি আজ এখানে সেবাধারীর সংখ্যা খুবই কম। বিবেকানন্দ স্বামীর শিষ্যদলের অনুকরণে গৈরিক পরিচ্ছদধারী দলপতি মহাশয়ের হস্তে এক খানি প্রণালী-পুস্তক; পরীক্ষাকার্য্যে রত কয়েকটি বালকের নিকটে দাঁড়াইয়া প্রকরণে ভুল চুক দেখিলে তিনি মাঝে মাঝে তাহা সংশোধন করিয়া দিতেছেন এবং অবসর মত গুহার বাহিরে প্রাকারনিম্নে আসিয়া কণ্ঠসংলগ্ন ক্ষুদ্র বাঁশি বাজাইয়া অনাগতদিগকে জানাইয়া দিতেছেন যে, পথ নিরাপদ। এখানে দলবদ্ধভাবে আসিবার নিয়ম নাই, এক সময়ে দুই এক জন মাত্র সতর্কতা অবলম্বনে প্রাকার-দ্বারে

আসিয়া দাঁড়ায়, তাহার পর গুপ্ত পথে ভিতরে প্রবেশ করে।

রাজবাড়ীর বড় ঘড়িতে সজোরে চারিটার ঘণ্টা পড়িল, শূন্য প্রান্তরস্থিত ভগ্নদুর্গে সে আওয়াজ তোপের ন্যায় প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। আশ্বিনের বেলা অবসানপ্রায়। দলপতি উৎসুকভাবে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। "আর কি কেহ তবে আসিবে না! যে দুই জন নূতন বালকের আজ মন্দিরে আসিবার কথা আছে—তাহারাও ত কই এখনো আসিল না! ভয়ে পিছাইল না কি!" তিনি বেশ একটু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। সহসা অদূরে সাঙ্কেতিক বংশীধ্বনিতে আগমন-বার্ত্তা বিজ্ঞাপিত হইল। অল্পক্ষণের মধ্যেই অনাদি ও বসন্তকে সঙ্গে লইয়া এক জন সেবাধারী আসিয়া উপস্থিত হইল এবং দুর্গ-বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান দলপতির নিকটে ইহাদিগকে পৌঁছিয়া দিয়া সরিয়া পড়িল।

দলপতি প্রফুল্ল হইয়া উঠিলেন। ইহাদের সহিত পরিচয়ে ইনি বুঝিয়াছিলেন যে, এই উৎসাহী যুবকদ্বয়কে দলভুক্ত করিতে পারিলে, তাহারা অসাধ্য-সাধনে কুণ্ঠিত হইবে না, দেশের নামে প্রাণপাত করিতে ইহারা পা বাড়াইয়া আছে! তিনি উৎসাহ-বচনে কহিলেন, "বহুক্ষণ থেকে তোমাদের অপেক্ষায় আছি। এত দেরী যে? যাক্ তাতে ক্ষতি নেই—আজ ত কেবল ভর্ত্তির দিন; দেশের কাযে মায়ের চরণে জীবন উৎসর্গ ক'রে আজ তোমরা নব-জীবন-লাভে ধন্য হবে।"

দলপতি তাহাদিগকে অনুবর্ত্তী হইতে সঙ্কেত করিয়া দুই এক পদ অগ্রসর হইলেন। অনাদি নির্ব্বাক্ নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, বসন্ত সাহস পূর্ব্বক কহিল, "গুরুজী, আমাদের ক্ষমা করবেন, এ মন্দিরের সেবাধারী হ'তে আমরা পারব না।"

অনাদির জড়তা ঘুচিয়া গিয়াছে, সে বলিয়া উঠিল, "আর সেই কথা বলতেই কেবল আমরা এখানে এসেছি।"

"বটে।"

দলপতির এই ক্ষুদ্র বাক্যে নৈরাশ্য বা বিস্ময়ের সহিত ভয়-প্রদর্শনের সুরও মিশ্রিত ছিল।

বসন্ত বলিল, "সন্তোষ ইচ্ছা করলেই যদিও আমাদের হয়ে আপনাকে এ কথা জানাতে পারত, কিন্তু আপনাদের সমিতির খাতায় না কি এ নিয়ম লেখে না, তাই আমাদেরই এ কথা বলতে এখানে আসতে হ'ল।"

অনাদি বলিল, "নইলে খুব সম্ভবতঃ আপনি ভাবতেন—ভয় পেয়েই আমরা এলুম না।"

দলপতি উথলিত নৈরাশ্য-ক্রোধ সবলে দমন করিয়া যথাসম্ভব ধীরভাবে বলিলেন, "কিন্তু তোমরা জান না বোধ হয় যে, একবার এ চক্রের মধ্যে পা দিলে আর পিছু হটার যো নেই।"

বসন্তের মত সাহসী বালকের মুখও সহসা পাংশু-বর্ণ হইয়া গেল—এ কথা ত তাহাদের মনে হয় নাই! সে ঢোক গিলিয়া শুষ্ক কণ্ঠ ভিজাইয়া লইয়া কহিল, "কিন্তু আমরা ত চক্রে পা দিই নাই, শপথে নিজেদের বাঁধি নি এখনও!"

দলপতি উত্তেজিত কণ্ঠে উত্তর করিলেন, "যে দিন এই মাতৃ-মন্দিরের সংকল্প শুনে, বুঝে এ দলে মেশবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেছ—সেই দিনই চক্রে পা দেওয়া হয়েছে। বিশেষ আজ ত আমাদের আড্ডা পর্য্যন্ত দেখলে, এখন আর ফেরার পথ নেই; দল-ভুক্ত হ'তে হবে—না হয় দণ্ড গ্রহণ করতে হবে।"

দলপতি কটিবন্ধবস্ত্রে হস্তার্পণ করিলেন। অনাদি-বসন্ত উভয়েই ইহার অর্থ বুঝিল; কিন্তু জ্যোতির্ম্ময়ীর শিক্ষাদান নিষ্ফল হয় নাই। পূর্ব্বের ক্ষণিক ভয়-অবসাদ ইতিপূর্ব্বেই তাহাদের মন হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিল; এখন সম্মুখ বিপদে উভয়েরই তেজ শতগুণে বাড়িয়া উঠিল। ব্যায়াম-সমিতির প্রণালী অনুসারে উভয়েই উভয়কে রক্ষা-সংকল্পে—আক্রান্ত ব্যাঘ্রী যেমন শাবককে আশ্রয়দানে শিকারীর সম্মুখে দাঁড়ায়—সেই রূপ ভাবে দাঁড়াইল। সশস্ত্র দলপতি এই নিরস্ত্র বালকদিগের শৌর্য্যে এমনি বিস্মিত হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহার নিজের অজ্ঞাত-সারে হাত কটিবন্ধ বস্ত্র হইতে নীচে নামিয়া পড়িল।

বসন্ত সদর্পে কহিল, "প্রাণভয় দেখিয়ে আমাদের দলভুক্ত করতে পারবেন না।"

অনাদি বলিল, "আর এ কথাটাও মনে রাখবেন যে—আমাদের মেরেও কখনও নিস্তার পাবেন না; ফলে তাতে আপনার দলের সমূল উচ্ছেদসাধন হবে।"

"উঃ, এই অপগণ্ড বালকদিগের কি প্রতাপ! বলে ত ইহাদের পাওয়াই যাইবে না, ছলে-কৌশলে কি হয় দেখা যাক্।"

দলপতি নরম সুরে বলিলেন, "খুন করাই ত আমার জীবনের ব্রত নয়, তবে মঙ্গল উদ্দেশ্যে যদি তা করতে হয়, তাতে আমি পিছপাও নই। আর কারও তা' হওয়া উচিত না, এই উপদেশই আমি দিয়ে থাকি। তোমরাও দেশসেবক, আমরাও

দেশ-সেবক। আমাদের উভয়ের ইচ্ছা ও সঙ্কল্প একই। এ অবস্থায় আমরা যদি মিলে-মিশে কায করি, তবেই ত মায়ের মলিন মুখ এক দিন উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।"

বসন্ত বলিল, "কিন্তু আমাদের মিলনের আশা নেই—আমাদের পথ একেবারেই স্বতন্ত্র। রক্তপাতে আমরা দেশসেবা করতে পারব না।"

অনাদি বলিল, "কারণ, আমরা অনুরূপ শপথে আবদ্ধ।" দলপতি তাঁহার ক্রোধাবেগ চাপিতে মুহূর্ত্তকাল সময় গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "কিন্তু ইতি-পূর্ব্বে ত তোমাদের মুখে এ রকম কথা শুনি নাই। আমার কথায় তখন তোমরা ত পূর্ণভাবেই সায় দিয়ে গেছ?"

বসন্ত বলিল, "আপনার উত্তেজনায় আমরা জ্ঞান-হারা হয়ে পড়েছিলুম।"

অনাদি বলিল, "গুরুর কৃপায় আমরা পুনরায় চেতনালাভ করেছি। তিনি আমাদের সাবধান ক'রে দিয়েছেন।"

প্রশ্ন হইল—"কে তোমাদের গুরু!"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া অনাদি বলিল, "রাজ-কুমারী।"

দলপতি গম্ভীর হইয়া গেলেন, কিছু পরে বলিলেন, "হ্যাঁ, শুনেছি তিনি স্বদেশ-ব্রত গ্রহণ করেছেন। আচ্ছা, আমি যদি তাঁর মত পরিবর্ত্তন ক'রে দিতে পারি?"

অনাদি কহিল, "তা হ'লে আমাদেরও মত পরি-বর্ত্তন হ'তে পারে, আমরা তাঁরই শিষ্য।"

দলপতি অল্পক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন, পরে গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "একটি কড়ারে তোমরা মুক্তি লাভ করতে পার।" উভয়ে একই সঙ্গে সোৎসুক কণ্ঠে প্রশ্ন করিয়া উঠিল—"কি কড়ার?"

"রাজকুমারীর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেবে —এই শপথে তোমাদের অব্যাহতি দিতে পারি।"

অনাদির মনের বিপদ-পাষাণ মুহূর্ত্তে যেন তুলার ন্যায় হাল্কা হইয়া গেল। সে উচ্ছ্বাসভরে বলিয়া উঠিল, "সে ত সহজেই হ'তে পারে। আগামী কন্-ফারেন্স দিনে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব।"

দলপতি বলিলেন, "না, আমি নিরিবিলি একলা তাঁর দর্শন পেতে চাই, নইলে কথা কবার সুবিধা হবে না।"

অনেক দিন হইতে দলপতির মনে যে ইচ্ছা জাগিয়া উঠিয়াছে, হঠাৎ তাহা পূর্ণ করিবার সুযোগ তিনি দেখিতে পাইলেন।

অনাদি বলিল, "আচ্ছা, বেশ তাই হবে।"

আহ্লাদে দলপতির শ্যামলবর্ণে লালের আভা ফুটিল। তিনি শ্যামসুন্দর হইয়া সহাস্যে কহিলেন—

"কড়ার ভঙ্গের শাস্তি কিন্তু ভয়ানক; এ কথা আগে থেকে ব'লে রাখছি। আর এক কথা, চ'লে যাবার আগে মায়ের নামে শপথ করতে হবে যে, এখানকার কোন কথাই কোন দিন তোমরা প্রকাশ করবে না।"

বালক দুই জন শপথ করিয়া বিদায় হইয়া গেলে সন্তোষ দলপতির নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। দলপতি তাহাকে বলিলেন, "এখানে এদের নিয়ে এসে বড়ই বুদ্ধির কাজ করেছিলে। নইলে একেবারেই এরা আমাদের হাতছাড়া হয়ে যেত। দলবৃদ্ধি করতে না পারলে, আমাদের উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। যা হ'ক্ ছোক্‌রা দুটোর উপর চোখ রেখো—যদি তেমন তেমন বোঝো—তবে বুঝ্‌লে ত সন্তোষ?"

"আজ্ঞে হাঁ বুঝেছি; আর বেশী বল্‌তে হবে না।"

অতঃপর নীরবে তাঁহারা ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে বসন্ত ও অনাদি মুক্তিলাভ করিয়া ঊর্দ্ধ-শ্বাসে ছুটিল, পশ্চাতে একবার চাহিয়া দেখিতেও তাহাদের সাহসে কুলাইল না। প্রেতরাজ্য ছাড়াইয়া একেবারে ক্রোশখানেক পথ দূরে আসিয়া তবে যেন একবার হাঁপ ফেলিবার তাহারা অবসর পাইল। তাহার পর আরো খানিকটা চলিয়া নদী-কিনারে আসিয়া বাঁধাঘাটের উপর দুই জনে বসিয়া পড়িল। নদী, আকাশ, জীবজন্তু, গাছপালা সহসা তাহাদের নেত্রে এক অপূর্ব্ব মহিমায় প্রকাশিত হইয়া উঠিল, নবজীবনের চক্ষু দিয়া আজ তাহারা এ সকল প্রত্যক্ষ করিল; তাহারা ত মৃত্যুমুখ হইতে—যমপুরী হইতেই ফিরিয়া আসিতেছে। অনাদি খানিকক্ষণ পরে বলিয়া উঠিল—

"এসব কথা কাউকেই বল্‌তে পারব না, বসন্ত-দা?"

"অবশ্যই না।"

"রাণীদিদিকেও না?"

"না। আমরা যে শপথে আবদ্ধ।"

"আমার বড় দুঃখ হচ্ছে বসন্ত-দা।"

বসন্ত বলিল, "আমার দুঃখ হচ্ছে যে কত ছেলেকে ওরা সর্ব্বনাশের পথে নিয়ে যাচ্ছে, তাদের সাবধান ক'রে দেবার উপায় নেই।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পরদিন রাজাবাহাদুর জ্যোতির্ম্ময়ীকে সঙ্গে লইয়া যথাসময়ে ম্যাজিষ্ট্রেট-ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাগানে টেবিল চৌকি পাতা, চায়ের আয়োজন, বাহিরের লোকও আজ এখানে কেহ নাই, পিতা-কন্যাকে দেখিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট-দম্পতি সাতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিলেন। মেমসাহেব নূতন বাংলা শিখিতেছিলেন,—জ্যোতির্ম্ময়ীকে আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ করিয়া মুখচুম্বনপূর্ব্বক কহিলেন, "তোমাকে বড় অধিক দেখ্‌তে ইচ্ছা কর্‌ছিলাম, আমার প্রিয়তম সন্তান। (My Dearest Child) ঠিক হইল কি ?"

জ্যোতির্ম্ময়ী হাসিয়া কহিল, "খুব ঠিক হয়েছে, মাদার।"

জ্যোতির্ম্ময়ী ইঁহাকে মাদার বলিয়াই সম্বোধন করিত। মেমসাহেব জ্যোতির্ম্ময়ীকে বাহুপাশ হইতে মুক্তিদানপূর্ব্বক সকলকে আসন গ্রহণ করিতে বলিয়া পেয়ালাতে চা ঢালিতে ব্যস্ত হইলেন। সাহেব জ্যোতির্ম্ময়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার সমিতি কেমন চলছে, My dear girl."

জ্যোতির্ম্ময়ী বলিল, "ভালই। কাল, ছেলেদের হাতে আমি রাখী বেঁধেছি ; আজ আপনাদের জন্য এনেছি।" জ্যোতির্ম্ময়ী দুইগাছি রাখী নিজের করপ্রকোষ্ঠে বাঁধিয়া আনিয়াছিল ; তাহার একটি খুলিয়া প্রথমে ম্যাজিষ্ট্রেটকে পরাইল। পরাইতে পরাইতে বলিল, "আমি বিপদে পড়িলেই আপনাকে কিন্তু উদ্ধার করিতে হইবে। বুঝিলেন ত ?"

ম্যাজিষ্ট্রেট হাসিয়া বলিলেন, "All right, এই অধিকারে নিজেকে সৌভাগ্যবান ব'লেই মনে করছি।"

জ্যোতির্ম্ময়ী আহ্লাদের হাসি হাসিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া মাদারের কাছ ঘেঁসিয়া বসিয়া তাঁহার হাতে রাখী বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইল। তিনি রাখী পরিয়া তাহাকে চুম্বনদানপূর্ব্বক তাহার হাতে চা-পূর্ণ একটি পেয়ালা উঠাইয়া দিলেন।

রাজা পূর্ব্বেই মিসেস্ ক্লাউডেনের টেবিলের কাছে বসিয়া চা পান আরম্ভ করিয়াছিলেন। ক্লাউডেন সাহেবও পাশের চৌকিখানি অধিকার করিয়া, এক পেয়ালা চা হাতে তুলিয়া লইয়া রাজার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—

"By the bye রাজা, ডাক্তার চৌধুরী—উৎসব দিনের সেই hero তিনি কি এখনো এখানে আছেন ? ইচ্ছা ছিল তাঁকে এক দিন ডাকি, কিন্তু এই আপিলটা হাতে আসায় তা পারি নি। He is a fine fellow and has got nice manners."

এই কথায় রাজকুমারীর মুখ ঈষৎ রক্তিম হইয়া উঠিল। কিন্তু সে লজ্জা-রাগ অপর কেহই লক্ষ্য করিল না ; সকলেই তখন নিজেকে লইয়া ব্যস্ত।

রাজা হাতের পেয়ালা হইতে সন্তর্পণে বেশ সুন্দর কায়দার সহিত একটুখানি চা মুখে গ্রহণ করিলেন। ইংরাজী দস্তুরে পেয়ালার চামচখানা এ সময় এক রকম অনাবশ্যক শোভাস্বরূপ। চিনি ঘাঁটার কাজে লাগা ছাড়া ইহা চা-পানের কাজে লাগে না। তাহার পর ম্যাজিষ্ট্রেটের কথার উত্তরে কহিলেন, –

"ডাক্তার এখনো এখানেই আছেন ; মকদ্দমায় নিষ্কৃতি লাভ ক'রে তিনি আপনাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ প্রদান করেছেন।"

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন, "এমন পচা মকদ্দমা আমার জীবনে আসে নাই! কি ক'রে যে মুন্সেফ বাদীকে জিতিয়ে দিলেন!"

রাজা আর দুই এক ঢোক চা গলাধঃকরণ করিয়া কহিলেন, "কিন্তু সুজন রায়ের দল আপনার নামে নানা কথা রচনা করবে।"

"Indeed! কিন্তু সে ভয়ে ত আমি ন্যায়বিচার পরিত্যাগ করতে পারিনে!"

জ্যোতির্ম্ময়ীর মুখকান্তি একটি অপ্রাকৃত জ্যোতিঃ-সৌন্দর্য্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে গম্ভীর ভাবে কহিল, "আপনার এই ন্যায়পরতা জগতের অস্থিমজ্জায় স্থান পাক্, আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ইহাই প্রার্থনা করি।"

জ্যোতির্ম্ময়ীর বালোচিত সরল উৎসাহে মুগ্ধ হইয়া ক্লাউডেন সাহেব তাহার পিঠে হাত রাখিয়া আদর করিয়া কহিলেন,—

"Thank you dear girl" বলিয়া পত্নীর দিকে চায়ের পেয়ালাটা বাড়াইয়া দিলেন। মেমসাহেব স্বামীর শূন্য পেয়ালাটি পূর্ণ করিয়া দিয়া রাজাকে কহিলেন,—

"আর এক পেয়ালা রাজাবাহাদুর ?" রাজার পেয়ালা তখন নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছিল—তিনি মেমসাহেবের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিলেন না।

তাঁহাকে চা ঢালিয়া দিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নী জ্যোতির্ম্ময়ীকে বলিলেন,—

"তোমার আধ পেয়ালা চা-ও ত এখনো শেষ হোল না, আর কখনো যে শেষ হবে না, তাও জানি।"

তিনি কতকগুলি চকোলেট-মিষ্ট জ্যোতির্ম্ময়ীর 'পিরিচে' তুলিয়া দিলেন। সাহেব বলিলেন, "ঠিক হয়েছে; sweets to the sweet."

জ্যোতির্ম্ময়ী হাসিয়া কহিল, "আমি কি এখনো ছেলেমানুষ আছি মিষ্টার ক্লাউডেন?"

সাহেব কহিলেন, "By love, তুমি কখনই ছেলেমানুষ ছিলে না—তুমি এক জন born sage, একটি ক্ষুদ্র লামা।"

রাজা বলিলেন, "ঠিক বলেছেন মিষ্টার ক্লাউডেন। জানেন ত ও যখন তিন বছরের মেয়েটি, তখন আমাকে কি রকম জব্দ করেছিল?"

শৈশবে নৃত্য করিতে অনুরুদ্ধ হইয়া কিরূপ অটল ভাবে জ্যোতির্ম্ময়ী রাজার সে অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়াছিল, রাজা সেই গল্পটি পুনর্ব্বার করিলেন।

জ্যোতির্ম্ময়ী হাসিয়া কহিল, "জানেন মিষ্টার ক্লাউডেন, আমি আমাদের দেশের স্ত্রী-জাতির 'প্রেষ্টিজ' রক্ষা করেছিলুম।"

"হ্যা ঠিকই করেছিলে, বিজ্ঞব্যক্তির (sage) মতই কাজ হয়েছিল।"

জ্যোতির্ম্ময়ী কহিল, "হ্যা, যেমন দেশের লোকের সহস্র অনুরোধ অগ্রাহ্য ক'রে গভর্ণমেণ্ট বঙ্গবিভাগ সম্বন্ধে নিজের প্রেষ্টিজ রক্ষা করলেন।"

কথার গতি ফিরিল; ম্যাজিষ্ট্রেট কহিলেন, "বঙ্গবিভাগের ত আমি ক্ষতি দেখি না। তবে দেশের লোক যখন এই বিভাগের বিরোধী, তখন গভর্ণমেণ্টের এ থেকে নিরস্ত হওয়াই উচিত ছিল।"

রাজা কহিলেন, "আমাদেরও ত আপত্তির প্রধান কারণ আপাততঃ তাই। জানেন মিষ্টার ক্লাউডেন, প্রসাদপুরেই এবার প্রতিবাদ-কনফারেন্স হচ্ছে?"

জ্যোতির্ম্ময়ী বলিয়া উঠিল, "আর আপনাকেই প্রেসিডেণ্ট হতে হবে মিষ্টার ক্লাউডেন। বলুন হবেন?"

ক্লাউডেন সাহেব একখানা "স্যাণ্ডউইচ্" মুখে পুরিয়া দিয়া পেয়ালার চিনিটা চামচ দিয়া নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "তোমার কথা রাখিতে পারিলে খুবই খুসি হইতাম, dear girlie, কিন্তু আমরা হচ্ছি রাজভৃত্য, তাঁদের মতলবের বিরুদ্ধে কোন কাজ করতে পারিনে। প্রেসিডেণ্ট হওয়া আমার কর্ত্তব্য হবে না।"

জ্যোতির্ম্ময়ী নিরাশ হইয়া চুপ করিয়া গেল! বুঝিল, তিনি যাহা বলিলেন, তাহার উপর আর কথা চলে না।

অতঃপর সকলের চা-পান শেষ হইলে, খানসামা টেবিল-সরঞ্জাম উঠাইয়া লইয়া গেল, ক্লাউডেন সাহেব ও রাজবাহাদুর উভয়ে "হোম-পলিটিক্স" প্রভৃতি নানা প্রসঙ্গ ধরিলেন; এই অবসরে মেম সাহেব জ্যোতির্ম্ময়ীকে তাঁহার বাগান দেখাইতে লইয়া গেলেন।

স্থান নির্জ্জন দেখিয়া ক্লাউডেন সাহেব রাজাকে বলিলেন,—"একটি কথা বলি রাজা, যেন প্রকাশ না হয়। সম্ভবতঃ প্রসাদপুর থেকে আমার বদ্‌লি হবে, আমার কার্য্যকলাপ গভর্ণমেণ্টের মনের মত হচ্ছে না।"

রাজা নীরব হইয়া গেলেন; বজ্রাঘাতের মত কথাটা তাঁহার প্রাণে গিয়া বাজিল। উভয়ে অনেকক্ষণ ধরিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

আশ্বিনের প্রায় শেষ। বাগানের কেয়ারিতে, রাস্তার পটিতে রকম বিরকম বিলাতি ফুলের বসন্ত-বাহার এখন জমিয়া নাই। জিনিয়া, দোপাটি প্রভৃতি দুইচারি রকমের ফুল সবে মাত্র এখন অল্প স্বল্প ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে! গোলাপফুলই এখন ফুলবাগানের প্রধান শোভা। কিন্তু জয় এ সময় সব্‌জি বাগানেরই। কপি, শালগম, বিট, গাজর, পেঁয়াজ, মটর প্রভৃতি নানাবিধ তরকারীতে মিসেস্ ক্লাউডেনের সবজি-বাগান ভরপুর। ফুল-বাগান ও সবজি-বাগানের মধ্যস্থিত বাঁশের খিলান-দরজার উপরে 'মাসে'ল-নিল' গোলাপ-লতা ফুলে ফুলে ভরা। এই লতা-গাছ দুটি রাজকুমারীর উপহার। রাজবাগানের দুইটি কলম আনিয়া একবৎসর পূর্ব্বে নিজের হাতে জ্যোতির্ম্ময়ী খিলানের দুই প্রান্তে পুঁতিয়া দিয়াছিল। মেমসাহেবের যত্নে এত শীঘ্র সেই কলম দুইটির এখন এমন মধুর রূপ। এখনো প্রত্যহ তিনি এই গোলাপ গাছে স্বহস্তে জল-সিঞ্চন করেন।

তাঁহার বাগানে আসিবামাত্র মালী ছোট জলপাত্র একটি আনিয়া ধরিল। এই জলপাত্র লইয়া তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। মালী বেগতিক দেখিয়া আর একটি পাত্র আনিয়া দিল। বয়স্যার মতই হাসি-গল্পে, বিবাদ-কৌতুকে উভয়ে বাগানে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বাগানের আশে পাশে ক্রমশঃ হাসনুহানা ও রজনীগন্ধার দলও খুলিতে আরম্ভ হইল। সুবাসপূর্ণ মুক্ত-বায়ুর সহিত মিসেস্ ক্লাউডেনের স্নেহাদর এক নিশ্বাসে গ্রহণ করিয়া জ্যোতির্ম্ময়ীর বালসুলভ হৃদয় মুক্তির ছন্দে নাচিয়া উঠিল।

কিছু পরে রাজাবাহাদুরের সহিত ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবও এইখানে আসিয়া দেখা দিলেন। রাজা

বলিলেন, "রাণি, আজ একটু সকাল সকাল বাড়ী ফিরতে চাই।"

জ্যোতির্ম্ময়ী একবার আকাশের দিকে চাহিল। পশ্চিমে নদীর পরপারে সূর্য্যদেবের ধ্যানমগ্ন প্রশান্ত তপস্বী-মূর্ত্তি, তৎবিকীর্ণ আলোকে দিগ্‌দিগন্ত লালে লালে সমুজ্জ্বল; নদীর জল বিদ্যুৎকণায় প্রবাহিত। জ্যোতির্ম্ময়ী ধীরে ধীরে একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিল, কে জানে কেন!

মেমসাহেব ক্ষুণ্ণমনে বলিলেন, "এখনি যাবেন রাজা-সাহেব?"

রাজা আবার ঘড়ি দেখিয়া বলিলেন, "কাল কলকাতায় যেতে হবে মিসেস্ ক্লাউডেন, নইলে এমন সঙ্গ ত্যাগ করতে চাই এখনি!"

ম্যাজিষ্ট্রেট-দম্পতি উভয়েই গাড়ী পর্য্যন্ত আসিয়া তাঁহাদের বিদায় দিলেন। মেমসাহেব জ্যোতির্ম্ময়ীকে পুনরায় সস্নেহে আলিঙ্গনপূর্ব্বক চুম্বন করিলেন।

এবার রাজা নিজে মোটারের কল ধরিলেন। শরতের বেলা—সূর্য্য এখন দিগন্তনিম্নে, তবুও সায়াহ্ন-গগন উজ্জ্বল আলোকে দীপ্তিমান! বিলাতের twilight কি এই রকমই?

ম্যাজিষ্ট্রেটের কম্পাউণ্ড ছাড়াইয়া রাজা ঘড়ি দেখিয়া বলিলেন, "মিনিট পাঁচেক আমরা আস্তে যেতে পারি।"

নদীর ধার দিয়া তাঁহারা ধীরে ধীরে চলিলেন। ওপারে কাশফুলের কি সুন্দর শোভা! মাঝে মাঝে বাতাস শেফালি ফুলের গন্ধ বহন করিয়া আনিতে লাগিল। এক জন মালী কেতকীফুল মাথায় লইয়া মন্দিরের দিকে যাইতেছিল, তাহার সৌরভ পথে ছড়াইয়া দিয়া গেল। নদীর ধারে একটি বটগাছের তলায় একখানা সিন্দূরলেপিত প্রস্তরমূর্ত্তি। এ মূর্ত্তি কাহার স্থাপনা, কেহ জানে না; পথিকজন অন্নপূর্ণার মূর্ত্তি বলিয়া ইহাকে প্রণাম করিয়া যায়।

এই প্রস্তর-সন্নিধানে বসিয়া এক জন ভিখারী খঞ্জনী বাজাইয়া গান করিতেছিল,—

মঙ্গল-শঙ্খ বাজে ঘরে ঘরে,
এলেন আনন্দময়ী ভুবন আলো ক'রে!
আজি আলোকে ঝলকে আনন্দ,—
বহে কুসুমে মধুর গন্ধ,
উথলে দিকে দিকে গীতিছন্দ—
বরষ দিবস পরে।

রাজা গাড়ী থামাইয়া চাপরাশিকে দিয়া তাহাকে পারিতোষিক পাঠাইলেন।

গানটি রাজারই রচিত। প্রথম যে আশ্বিনে তাঁহার দুই কন্যা শ্বশুরগৃহ হইতে পিতৃভবনে আসিয়াছিল, সেই সময় তিনি এই গানটি রচনা করেন। পুরাতন কত স্মৃতি ইহার সহিত জড়িত, তাঁহার চক্ষু জল-পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। জ্যোতিম্ময়ী পাশ হইতে তাহা দেখিতে পাইল না। গানটি শুনিতে শুনিতে সে বলিয়া উঠিল, "আশ্বিন মাস পড়েছে বুঝি!"

রাজা চক্ষুর জল চক্ষেই ধরিয়া বলিলেন, "রাণীর কাছে সে খবর পৌছয় নি এখনও? মাস যে শেষ হ'তে চ'ল্লো।"

রাণী হাসিয়া পিতাকে আদরের বাহুপাশে জড়াইল, রাজা পুরাতন দুঃখ ভুলিয়া গেলেন। চাপরাশি ফিরিয়া আসিলে এবার তিনি সতেজে মোটার চালাইয়া দিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শ্যামাচরণের কনিষ্ঠা কন্যা অণুভার সহিত বর্ষাদিক কাল হাসির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নরেন্দ্রের বিবাহ ঠিক হইয়া আছে,—কিন্তু কার্য্য-সমাধার জন্য কন্যাকর্ত্তার নিকট হইতে এ পর্য্যন্ত কোন দিনই তাগিদ আসে নাই। বরপক্ষ (অর্থাৎ মুখোপাধ্যায়-গৃহিণী,) তাহাতে সন্তুষ্ট বই অসন্তুষ্ট নহেন, মনে করিতেছেন, 'সে ভালই, হাসির বিবাহটা আগে হইয়া যাক্ না।'

অণুভা ষোড়শী, অথচ পিতা কেন যে এ সম্বন্ধে নীরব, তাহা পাঠক অবগত আছেন। তিনি মনে আঁচিয়াছিলেন—আরও দুই বৎসর কাল এজন্য তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে হইবে, কারণ শরৎ বিলাত হইতে ফিরিয়া না আসিলে তিনি বিবাহের ব্যয়-ভার বহনে সক্ষম হইবেন না। কিন্তু মানবের এবং দেবতার সঙ্কল্প যে এক নহে, ইহা পুরাণ-প্রবচন।

রাজভবনে শরতের প্রতিষ্ঠা দেখিয়া শ্যামাচরণ হাওয়ার গতি বুঝিয়া লইয়াছেন। রাজার নিকট এমন চিঠি আসে না, যাহার মধ্যে শরতের বিদ্যা-বুদ্ধির প্রশংসা না থাকে। রাজকন্যার মাল্যদান-বিবরণও ইতিমধ্যে বিচিত্র ছন্দোবন্ধে তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছে। অতএব, তাঁহার পুত্রতুল্য প্রিয় ভাগিনেয় যে অবিলম্বে রাজা অতুলেশ্বরের জামাতা হইবে, ইহাতে তিনি সংশয়-রহিতচিত্ত। এই বিশ্বাসে তাঁহার হৃদয়-মন আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। যে শক্তিরূপ ঘটকপুরুষ এইরূপ অসম্ভাবিত যোগাযোগ ঘটাইয়া, সংসারের কণ্টকসঙ্কুল

পথ পরিষ্কার করিয়া দেন, শ্যামাচরণের 'পজিটিভিজম' আপনার অজ্ঞাতে তাঁহার দিকে মস্তক অবনত করিল।

এত দিনে অণুভার পিতা বিবাহের কথা ভাবিবার অবসর পাইলেন। এত দিনের পর কন্যার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সহসা আবিষ্কার করিলেন যে, তাইত, অণুভা যে বড় হইয়া উঠিয়াছে! ইহার পর একদিন গাঙ্গুলি মহাশয় বেশ খোস মেজাজে মনের প্রস্তাব মুখে প্রকাশ করিবার জন্য মুখোপাধ্যায়-ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

নরেন্দ্র কলিকাতায় থাকে না। ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করিবার পরই সে বোম্বাই সহরে টাটা মিলে কাজ লইয়াছে। এখন নরেন্দ্র সেখানে হেড ওভার-সিয়ার;—কিন্তু কর্তৃপক্ষগণ তাহার কার্য্যদক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া আশ্বাস দিয়াছেন যে, আগামী জানুয়ারী-তেই মোটা বেতনে আসিষ্টাণ্ট ম্যানেজারের পদে তাহাকে উন্নীত করিবেন। আগামী আশ্বিনে ১০।১২ দিনের ছুটিতে যখন নরেন্দ্র বাড়ী আসিবে—খুব সম্ভব তখনই এই নিয়োগপত্র সঙ্গে আনিতে পারিবে, এইরূপই সকলে আশা করিতেছেন।

কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রীই বাড়ীর প্রকৃত কর্ত্রী। তাঁহার ইচ্ছাতেই মুখুয্যে-সংসার কেন্দ্রে ধৃত এবং কক্ষে ঘূর্ণ্যমান। দিদিমা আপনার তপ-জপ, পুরাণাদি পাঠ এবং হাসিকে লইয়াই থাকেন, সংসারের কোন কথায় পারত পক্ষে যোগ দেন না। আর কর্ত্তা, এ বাড়ীর বরেণ্য যিনি,—প্রয়োজনে মাত্র তিনি শরণ্য - অন্য সময় সাক্ষিস্বরূপ নগণ্য মধ্যে গণ্য।

তবে বাহিরের লোকে ঘরের কথা অতশত কি জানে; শ্যামাচরণ সর্ব্বাগ্রে গেলেন দিদিমার নিকট, হিন্দু-বাড়ীর প্রথানুসারে কর্ত্রীর সম্মান সর্ব্বাগ্রে তাঁহারই ত প্রাপ্য। দিদিমা তখন প্রাতঃস্নানান্তে—তপজপ শেষ করিয়া নিরামিষ হেঁসেলে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। তাঁহার হাতে জলে-ভেজান বাদাম পেস্তার একটি বাটি,—আর তাঁহার দাসীর হাতে তালের মাড়ীসহ একখানা থালা,—উভয়ে দালান পার হইয়া নীচের সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন।—ভাদ্র মাস আরম্ভ হইতেই দিদিমার রান্নাঘরে সপ্তাহে অন্ততঃ দুই তিন দিনও তালবড়া, তাল-ক্ষীরাদি হয়। কেন না ছানার মিষ্টান্ন হইতেও দিদিমার হাতের তাল-মিষ্টান্ন হাসি অধিক তারিফ করিয়া খায়।

সহসা জুতার শব্দ কানে গেল,—সেই দিকে চাহিয়া দালান-প্রান্তে শ্যামাচরণকে দিদিমা দেখিতে পাইলেন, তিনি দাসীকে তখন রান্নাঘরে যাইতে আদেশ করিয়া তাঁহার অপেক্ষায় দালানেই দাঁড়াই-লেন। শ্যামাচরণ নিকটে আসিয়া প্রণাম করিলে—তিনি আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক কহিলেন,—

"এত সকালে যে বাবা!" শ্যামাচরণ হাস্যমুখে বলিলেন,—

"একটু কাজে এসেছি মা!" দিদিমা অনুমান করিয়া লইলেন, কি কাজ। তিনিও হাস্যমুখে বলিলেন, "এস বাবা,—বসবে এস।"

এই বলিয়া দিদিমা তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় নিজের গৃহ-বারান্দায় আসিয়া পৌঁছিলেন। এই বারান্দা-ঘর বাড়ীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় দালান। ভোজপর্ব্বের সময় সর্ব্বাগ্রে এখানে আসন পড়ে। কিন্তু অন্য সময় ইহাই দিদিমার বৈঠকখানা। মুখুয্যেবাড়ীর কর্ত্রীপদবাচ্যা পরমপূজ্যা মহিলার এই ড্রয়িং রুমের সাজসজ্জা দেখিলে কোন ইংরাজ মহিলা সম্ভবতঃ চমকিয়া উঠিবেন। এই দালানের সর্ব্বপ্রধান আসবাব একখানিমাত্র নাতিবৃহৎ পরী-বাহন তক্তাপোষ,—ইহাই দিদিমার রাজ এবং অতিথি-সিংহাসন। ইহা ছাড়া আরও যে দুইটি গৃহদ্রব্য এখানে দেখিতে পাওয়া যায়,—তাহা হই-তেছে—হাসির একটি সেতার এবং বহির ক্ষুদ্র সেল্‌ফ্। এ দুইটির কোনটিই মেজিয়া ভুক্ত নহে, দুইটিই দেয়ালে আলম্বিত। হাসি যখন এখানে আসে—তখন দিদিমার ইচ্ছামত, কখনও বা সেতার বাজাইয়া, কখনও বা কোন বই পড়িয়া তাঁহাকে শুনায়।

দিদিমার পরী-সিংহাসনে বিছাইবার জন্য নিজের হাতে হাসি একখানা পশমের গালিচা ও দুইখানা রেশমের কুসন প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে। কিন্তু অধি-কাংশ সময়েই এ সকল দ্রব্য পুঞ্জীকৃত অবস্থাতে তক্তা-প্রান্তের শোভা বর্দ্ধন করে। "ছিঃ, এত বাহারে জিনিষ ব্যবহার করা তোর বুড় দিদিমার কি সাজে না!" হাসি উপদ্রব করিলে দিদিমা এই শাস্তিবাক্যে তাহাকে প্রবোধ মানাইতে চাহেন।—কিন্তু হাসি ত এ কথা মানিবার পাত্র নহে, সে যখন এখানে উপস্থিত থাকে, তখন গালচে এবং বালিশগুলা একটু আরামে হাত পা ছড়াইয়া বাঁচে,—কিন্তু সে চলিয়া গেলেই আবার তাহারা পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

অতিথি অভ্যাগত কেহ আসিলে, যখন দিদিমা তাঁহার সম্মানার্থ নিজের হাতেই তক্তার উপর গালিচা বিছাইয়া দেন—তখন সুদশায় পরিবর্ত্তে

তাহাদের দশা সমধিক বিষম হইয়া উঠে। অতিথিকে গালিচার উপর বসিতে বলিয়া নিজের বসিবার স্থানটা যখন তিনি গালিচাশূন্য করিতে থাকেন-তখন অতিথিও তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুকরণ করে। উভয় পক্ষের ঠেলাঠেলিতে সেখানা তক্তার প্রান্তদেশের পরিবর্ত্তে মধ্যদেশে পুঁটুলি বাঁধিতে থাকে। যদি ইতিমধ্যে হাসি আসিয়া উপস্থিত হয়—তবেই তাহার হাসির সঙ্গে সঙ্গে এই সব বিশৃঙ্খলা অবিলম্বে শৃঙ্খলায় পরিণত হয়।

সৌভাগ্যবশতঃ আজ তক্তার গালিচা ও কুসন রৌদ্রে দেওয়া হইয়াছিল—সুতরাং তাহাদের আর ঠেলাঠেলির মধ্যে পড়িতে হইল না। দিদিমার ইচ্ছা ছিল—শ্যামাচরণ তক্তার উপর বসেন, আর তিনি পাশে দাঁড়াইয়া তাঁহার বক্তব্য শোনেন,—কিন্তু শ্যামাচরণকে সেই আদেশ মানাইতে না পারিয়া অবশেষে তাঁহার অনুরোধই তিনি মানিতে বাধ্য হইলেন। দিদিমা তক্তায় বসিলে পর শ্যামাচরণও বসিয়া—কন্যার বিবাহের কথা পাড়িলেন।

দিদিমা শুনিয়া বলিলেন, "হ্যা, তোমার মেয়েটি ত বড় হ'য়ে উঠেছে, অঘ্রাণে বিয়ে হ'লেই ভাল হয় এই কি। তবে কি জান বাবা শ্যামাচরণ, হাসির বিয়েটাও সঙ্গে সঙ্গে হ'য়ে গেলেও যেন ঠিক হতো।"

শ্যামাচরণ বলিলেন, "তাতে আর বাধা কি! শুনেছি ত বিজনের সঙ্গে সম্বন্ধ পাকা হয়ে আছে।"

দিদিমা একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "গুজব কথা শ্যাম! দিনকতক বিজনকুমার এখানে যাতায়াত ক'রত—তাই কথাটা উঠেছিল, কিন্তু আজকাল ত তাকে দেখতেই পাইনে। তবে বৌমার সেই ইচ্ছে এখনও চার পোয়া।"

শ্যামাচরণ বলিলেন, "মন্দ ইচ্ছা ত নয়; হ'লে ত ভালই হয়।"

"হ্যা, আমার এই ইটের বারাণ্ডা যদি সোনার হ'য়ে যায়—তা হ'লে কি আমি মন্দ বলব। কিন্তু সম্ভব অসম্ভব ত একটা আছে। রাজা-রাজড়াকে মনে পোষা কি আমাদের মত লোকের সাজে! বৌমার যদি এতটুকু বুদ্ধি আছে। অমন সোনার ছেলে শরৎ, তাকে কি না অগ্রাহ্য করলে! সেই পাপেই এখন এত নিগ্রহ।"

বলিতে বলিতে দিদিমার যেন কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল।

শ্যামাচরণ মাথা চুলকাইতে লাগিলেন,—মনে মনে কথাটার সত্যতা অনুভব করিলেন,—কিন্তু নিজের ভাগনের প্রশংসার কথায় ত আর নিজে সায় দিতে পারেন না!

দিদিমা আবার কাতর অনুনয়-ভরা কণ্ঠে কহিলেন, "এখনো কি তা হয় না বাবা? তুমি যদি বল ত তোমার ভাগনে কি সে কথা ঠেলতে পারে?"

শ্যামাচরণ বলিলেন, "আমি যত দূর বুঝতে পারছি, তা হবে না মা। সম্ভবতঃ রাজবাড়ীতেই তার বিয়ে হবে! আর সেইটেই তার পক্ষে মঙ্গল,—আমি ত তাতে নারাজ হ'তে পারিনে মা!" দিদিমার সদাপ্রফুল্ল মুখকান্তি নৈরাশ্যম্লান হইয়া পড়িল। মনের কোণে তিনি শরৎকেই নাতজামাইরূপে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন,—এই কথায় আশাহত হইয়া তাঁহার অন্তরতল হইতে বেদনার দীর্ঘনিশ্বাস উঠিল। কিন্তু সে নিশ্বাস-হাহাকার সবলে চাপিয়া ধরিয়া তিনি প্রশান্ত ভাবেই বলিলেন, "তাই হোক তবে,—আশীর্ব্বাদ করি শরৎ সুখী হোক। আহা পিতৃমাতৃহীন বালক,—ভগবান তার মঙ্গল করুন। চিরদিনই আমি মনে জানি—এক দিন সে বড়লোক হবে,—বাছার যেমন বুদ্ধি, তেমনি তেজ। এমন হীরার টুকরো ছেলে হাসির অদৃষ্টে হোল না। হায় রে!"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও এইরূপ দুঃখের উক্তি দিদিমার মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িল। শ্যামাচরণ সান্ত্বনা বাক্যে কহিলেন, "ভাবছেন কেন মা; হাসির ভাগ্যে ভাল বরই মিলবে। সংসারে যোগ্যতর বরও ত ঢের আছে;—দেখবেন একটি মিলে যাবে।"

"সেই আশীর্ব্বাদই কর বাছা! তোমার উপরই এ ভার রইলো, একটি ভাল ঘর বর দেখে দু'হাত এক ক'রে দাও। এই কাজটি তোমায় করতেই হবে।" বলিতে বলিতে আগ্রহে নিকটে আসিয়া দুই হাতে শ্যামাচরণের হাত ধরিলেন। শ্যামাচরণ ধীরে ধীরে আক্রান্ত হাতখানি ছাড়াইয়া লইয়া যুক্তকরে শিরস্পর্শ করিয়া কহিলেন, "গুরুজনের হাত ছুঁয়ে শপথ করতে ভয় পাই মা, কিন্তু আপনার আদেশ মাথায় রাখলুম।"

শ্যামাচরণ দিদিমার নিকট হইতে বিদায় লইয়া গৃহিণীর মহলে গেলেন। গৃহিণীর তরকারী কোটা তখন শেষ হইয়া গিয়াছে। তিনি বারান্দায় বঁটির উপর বসিয়া ঠাকুরকে থালায় রক্ষিত বিভিন্ন ব্যঞ্জন-বিভাগ বুঝাইয়া দিতেছেন, আর অদূরে তোলা উনুনে ঝি রাবড়ী করিতেছে; তাহারই দিকে বারবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। শ্যামাচরণ দূর হইতেই হুঙ্কার ছাড়িলেন, "বলি বৌঠাকরুণ—ঘরে আছেন ত?"

কুঞ্জলাল সম্পর্কে শ্যামাচরণের শ্যালকশ্রেণীভুক্ত,

তাই তিনি গৃহিণীকে বৌ-ঠাকরুণ বলিয়াই ডাকেন। বামুনকে থালা উঠাইয়া লইয়া যাইতে ইঙ্গিত করিয়া গৃহিণী তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া যখন বলিলেন—"এস ভাই" তখন শ্যামাচরণের মস্তক তাঁহার পায়ের দিকে অবনত হইয়াছে। গৃহিণীকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাসীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি বলিলেন, "ঘরে আসবেন বোঠান, কথা আছে একটু।"

পাশেই অন্তঃপুরের বসিবার ঘর, ঘরের এক ধারে নীচে গালচে পাতা, অন্যধারে দুইচারি খানা চৌকি-কৌচের ব্যবস্থা। গৃহিণী শ্যামাচরণকে ঘরে আনিয়া একখানি গদি-আঁটা বড় চৌকিতে বসিতে অনুরোধ করিলেন। শ্যামাচরণ না বসিয়া চৌকির পিঠে একখানা হাত রাখিয়া বলিলেন, "আর ব'সব না বোঠান, দাঁড়িয়েই কথাটা সেরে নিই, বেলা হ'য়ে গেছে; এখনি যেতে হবে।"

"কথাটা কি শুনি?"

"আপনার হুকুম নিতে এসেছি বোঠান; হুকুম পেলেই আগামী অঘ্রাণেই বিয়ের একটা দিন স্থির করে ফেলতে পারি।" গৃহিণী এক হাতে আলম্বিত অঞ্চলের খুঁটটা ধরিয়া অন্য হাতে তাহা পাকাইতে পাকাইতে নতদৃষ্টি হইয়াই কহিলেন, "আর একটু দেরী কর না ভাই, হাসির বিয়েটা হ'য়ে যাক্ না আগে।"

শ্যামাচরণ কহিলেন, "পাত্র কি ঠিক আছে?"

গৃহিণী মুখ তুলিয়া তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, সে দৃষ্টি ক্রোধপূর্ণ। তিনি রুদ্ধ স্বরে কহিলেন,—

"কি ক'রে ঠিক হবে? কত দিন থেকে কর্ত্তাকে বলছি বিজনকুমারের বাপের কাছে একটি বার যাও, গিয়ে বিয়েটা ঠিক ক'রে এস; তা ওঁকে কি বাগাতে পারছি? তুমি ভাই যদি এ ভারটি গ্রহণ কর।" শ্যামাচরণ সর্পভীতের ন্যায় সহসা সবেগে দুই হাত তফাতে সরিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "বাস্ রে! তাঁর কাছে কি আমি এগোতে পারি? সে ক্ষমতা আমার নেই, মাপ করবেন বোঠান, আর যা বলবেন—তা বরঞ্চ আমি ঘাড় পেতে মেনে নেব।"

গৃহিণী নিরাশ হইয়া বলিলেন, "কি বলব আর ঠাকুরজামাই তবে,—হাসির অদৃষ্টে যা আছে হবে। তবুও ব'লে রাখছি, একটি ভাল পাত্রের চেষ্টায় থেকো ভাই।"

"সে কথা আর আমাকে অধিক বলতে হবে না বোঠান, হাসিকে নিজের মেয়ের তুল্যই দেখি।"

এই কথা এইরূপে শেষ করিয়া শ্যামাচরণ নিজের মেয়ের বিবাহ-প্রসঙ্গ তুলিলেন। বলিলেন, "অঘ্রাণে বিয়ে দিতেই হবে বোঠান; আপনারা পাঁজি-পুঁথি দেখে দিনটা স্থির ক'রে আমাকে ব'লে পাঠালেই আমি প্রস্তুত হ'য়ে নেব। নরেন্দ্র আশ্বিন মাসে এখানে ত আসছে,—সেই সময় আমি একদিন এসে আশীর্ব্বাদ ক'রে যাব। এই কথা রইল, কেমন?"

এতদিন বিবাহের সম্বন্ধ হইয়া আছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত আশীর্ব্বাদ পানপত্রাদিও হয় নাই। যথাসময়ে হইবে এইরূপ মনে করিয়া উভয়পক্ষই নীরব ছিলেন।

গৃহিণীর সম্মতি আদায় করিয়া লইয়া শ্যামাচরণ আর একবার গেলেন কর্ত্তার নিকট। এ বাড়ীতে আসিয়া প্রথমে যখন তিনি কর্ত্তার ঘরে যান, তখন তিনি ছিলেন স্নানের ঘরে। শ্যামাচরণ কাজের লোক, তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া না থাকিয়া ইতিমধ্যে অন্তঃপুরটা ঘুরিয়া আসিলেন।

এখানে আসিয়া দেখিলেন, কর্ত্তা তাঁহার লেখার টেবিলের নিকট বসিয়া ওঁ-শব্দ-চিত্রিত একখানি কাগজ হস্তে ধরিয়া পার্শ্বে উপবিষ্ট হাসিকে দর্শনতত্ত্ব বুঝাইতে ব্যস্ত আছেন।

শ্যামাচরণকে দেখিয়া তিনি অস্বস্তি বোধ করিলেন, তাঁহার নমস্কারটা পর্য্যন্ত ফিরাইয়া দিতে ভুলিয়া গিয়া অধীর ভাবে বলিলেন।

"একটু কাজে আছি ভাই, বাড়ীর ভিতরটা একবার বেড়িয়ে এস না।"

শ্যামাচরণ হাসিয়া বলিলেন, "বাড়ীর ভিতর থেকেই আসছি। অঘ্রাণেই অণুভার বিয়ে।"

কর্ত্তা কাগজের দিকেই দৃষ্টি রাখিয়া বলিলেন, "বিয়ে! নিমন্ত্রণ ক'রতে এসেছ বুঝি! তা বিয়েতে কিন্তু অর্থও আছে, অনর্থও আছে।"

বাবার কথায় হাসি হাসিয়া অস্থির হইল; তখন কৃষ্ণলাল মুখ তুলিয়া নিজেই হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। শ্যামাচরণ হাসিয়া বলিলেন, "শুধু নিমন্ত্রণ করতে নয়, নিমন্ত্রণ নিতেও এসেছি। অঘ্রাণে তোমার ছেলের সহিত আমার মেয়ের বিয়ে ঠিক হ'য়ে গেল, বুঝলে ত?"

কৃষ্ণলাল বলিলেন, "এত শীগ্‌গির! তা গিন্নি কি বল্লেন!"

"তাঁর মত না নিয়ে কি তোমার কাছে এসেছি?"

কর্ত্তা অধীর অনুনয়ে কহিলেন, "গিন্নি মত দিয়েছেন, তা হ'লেই হোল। আজ একটু ব্যস্ত আছি

বুঝলে ভাই, আর একদিন এস, এ-কথা হবে এখন। বোস্ হাসি!"

হাসি ইতিমধ্যে উঠিয়া শ্যামাচরণকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। শ্যামাচরণ বলিলেন, "বোস হাসি—তোমার বাবার শাপের পাত্র ক'রো না আমাকে। আমি চল্লুম—আচ্ছা আর এক দিন আসব।"

বলিয়া শ্যামাচরণ দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন, কৃষ্ণলাল নিশ্চিন্তচিত্তে হাসিকে তাঁহার দর্শন-তত্ত্ব বুঝাইতে লাগিলেন।

কৃষ্ণলাল যতই ভাবিতেছেন, যতই শাস্ত্রালোচনা করিতেছেন, ততই ওঙ্কারশব্দের মাহাত্ম্য তাঁহার মনে বদ্ধমূল হইয়া বসিতেছে। ঋষিদের এই ওঙ্কার-প্রতিপাদ্য লুপ্ত জ্ঞান যদি তিনি জন-সমাজে পুনঃপ্রচার করিতে পারেন—তবেই তাঁহার জীবন-জন্ম সার্থক। কিন্তু তাঁহার এই মহদুদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে বাধা-বিঘ্ন বিস্তর। প্রথম বাধা - বিষয়কার্য্যের জঞ্জাল, কিছু না করিলেও কাগজ-পত্রগুলাও ত সই করিতে হয়। দ্বিতীয় এবং চূড়ান্ত বাধা—স্বয়ং তাঁহার গৃহিণী। কর্ত্তা যখনই বেশ সংযতচিত্তে তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে কোন একটি জটিল সমস্যা পূরণ করিতে বসেন—আশ্চর্য্য! তখনই কি গৃহিণীর মাথায় টনক নড়ে! ভূষণ-ঝঙ্কারে অবিলম্বে তাঁহার আগমনবার্ত্তা ঘোষিত হইয়া উঠে, আর কর্ত্তার আমূল চিন্তা--বিকারগ্রস্ত, বিপর্য্যস্ত, বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে।

এক দিন বড় দুঃখে তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছিলাম, "এমন কার্য্য জীবনে যদি আর কক্ষণো করি ত আমার নামই মিথ্যা।"

আমি সভয়ে সঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি কার্য্য করবেন না আর মুকুয্যে-ম'শায়? এবার কি লেখনী ছাড়বেন?"

মুকুয্যে-ম'শায় রাগিয়া আগুন হইয়া উঠিলেন। তাঁহার এমন রাগ আমি জীবনে কখনও দেখি নাই;—মুখ লাল করিয়া কহিলেন, "আরে মূর্খ! তা নয়! লেখা ছাড়লে বাঁচব কি নিয়ে?"

"তবে?"—

"তবে কি একটুকু বুঝিসনে রে নির্ব্বুদ্ধি, জীবনে আর কখনও দারপরিগ্রহ করব না!"

উত্তরে বলিলাম, "ধন্য—ধন্য! সাধু—সাধু! এতদিনের পর একটা কথার মত কথা শোনা গেল!"

কিন্তু মনের ভিতরকার সংশয় তব মিটিল না। অবস্থান্তরে সর্ব্বদাই ত লোকের মতান্তর ঘটিয়া থাকে। এই ত সে দিন পত্নীপ্রেমগদ্‌গদচিত্ত আমাদের সদাই ভক্ত—নাতির জন্য ক'নে খুঁজিতে গিয়া নিজেই—যাক্ সে কথা!

সকাল বেলাটা কর্ত্তা একরূপ নিরাপদ। কাজকর্ম্ম ফেলিয়া গিন্নি বড় একটা এ দিকে ঘেঁসেন না—তাই এ সময়টা তাঁহার দর্শনতত্ত্বের মীমাংসায় বুদ্ধিটা বেশ খেলিতে থাকে। কিন্তু এই সময়ে তিনি এক জন শ্রোতার বড় অভাব অনুভব করেন। কিছুদিন হইতে হাসি তাঁহার অভাব দূর করিয়াছে। তাহাকে বেশ একটি সমজদার সহিষ্ণু শ্রোতারূপে তিনি পাইয়াছেন। ইহার নিকট ব্যাখ্যা করিতে করিতে তাঁহার জটিল তত্ত্বসূত্রও সহজে উন্মুক্ত হইয়া আসে। তাই প্রাতঃকালটা এ কার্য্যে বাধা পড়িলে—তিনি বড়ই উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠেন।

আপাততঃ কাগজে লিখিত ওঁ-শব্দটি লেখনীর অগ্রভাগ-নির্দ্দিষ্ট করিয়া হাসিকে বলিতেছিলেন, "বুঝলে ত হাসি?"

হাসি অক্ষরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াই কহিল, "কতক কতক।"

"আচ্ছা, তা হ'লে গোড়া থেকে বলছি, ভাল ক'রে বোঝ মা। শাস্ত্রমতে পরমাত্মার হৃদয়-আকাশ হইতে উৎপন্ন অ, উ, ম্ এই ত্রিবর্ণের সন্ধিজাত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই ত্রিগুণাত্মক ব্রহ্মবোধক ওম্ শব্দ, বেদের সনাতন বীজমন্ত্র এবং জীবাত্মার হৃদয়ে স্বতঃ বিরাজমান ও স্বতঃ প্রকাশমান। এখন বিচার ক'রে দেখ, অ উ এই শব্দ দু'টি কি? স্বরবর্ণ, কেমন?"

"হ্যাঁ।"

"আর ম?"

"ব্যঞ্জনবর্ণ।"

"আচ্ছা বেশ,—ব্যঞ্জনের কি স্বরবর্ণ ছাড়া পৃথক্ অস্তিত্ব আছে?"

"না, তাদের আলাদা উচ্চারণ হয় না।"

"সেই জন্য পরমাত্মা স্বর এবং জীবাত্মা ব্যঞ্জনবাচক এবং পৃথক হইয়াও পরস্পর সংযুক্ত। অন্য ভাষায়, - বিন্দুর সমষ্টিতেই যেমন এই বিশাল পরিদৃশ্যমান জগৎ, সেইরূপ পরমাত্মারূপ বিশ্ব-কোষে অবস্থিত সৃজনশক্তির বশবর্ত্তী এই জীবাত্মা-বিন্দু মানবদেহে স্বাতন্ত্র্য লাভ করিবামাত্র ওম্ শব্দের উচ্চারণে ভগবানের সহিত আপনার একাত্মতা প্রতিপাদন দ্বারা তাঁহার বশ্যতাস্বীকার করে। বুঝলে ত হাসি?"

হাসি হাসিয়া বলিল, "মনে ত হচ্ছে এইবার বুঝেছি!"

কৃষ্ণলাল সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "ওম্ অক্ষরের প্রথম গ্রন্থিবিন্দু পরমাত্মাবাচক চিহ্ন, মধ্যবিন্দু পরমাত্মা ও জীবাত্মার মিলনগ্রন্থি চিহ্ন। আর যদি ওঁকারশব্দের আদ্যোপান্ত এইরূপে মিলিত কর, তখন ইহা চক্ররূপ ধারণ করে। এই চক্রান্তের মধ্যে নিখিল বিশ্ব স্থিত, রক্ষিত, ঘূর্ণ্যমান। বুঝলে হাসি ?"

"হ্যা বাবা! আমার বড় ভাল লাগছে।"

"আর ওঁ-শব্দের মাথার উপর এই যে চন্দ্রবিন্দু, এর অর্থ কি জান? জীবাত্মা-আমরা যখন পরমাত্মাকে আপনাতে অনুভব করি—তখন তিনি ওঙ্কার পুরুষ—আর যখন তা করিনে, তখন আমরা তাঁহার অর্দ্ধরূপই দেখিতে পাই। তখন তিনি চন্দ্রবিন্দু আকারে সাক্ষিস্বরূপ রূপে আমাদের ঊর্দ্ধে বিরাজিত থাকেন। বুঝলে মা ?"

"কিন্তু জীবাত্মা ও পরমাত্মার এই একাত্মতা অনুভব করব কিরূপে?"

এই প্রশ্নে কৃষ্ণলাল অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন,—কহিলেন,

"আঃ সেই ত কথা। গার্গীও ঠিক তোমারই মত এইরূপ প্রশ্ন করেছিলেন! আমার ইচ্ছা কি জান—হাসি? তুমি যদি গার্গীর মত—"

ঠিক এই সময় কি গৃহিণী সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবেন! তাঁহার অন্ধকার মুখ দেখিয়া কর্ত্তার বাক্‌রোধ হইয়া গেল। হাতের কলমটা টেবিলে ফেলিয়া শোচনীয় দৃষ্টিতে পত্নীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু এ দৃষ্টিতে গিন্নীর পাষাণ হিয়া গলিল না। তিনি হাসিকে চলিয়া যাইতে অনুজ্ঞা করিয়া দৃঢ় গম্ভীরস্বরে স্বামীকে কহিলেন, "অঘ্রাণেই নরেন্দ্রের বিয়ে ঠিক হ'য়ে গেল—কিন্তু তার আগে হাসির একটি পাত্র ঠিক করা চাই-ই চাই। সুজন রায়ের ওখানে আজ তোমাকে যেতেই হবে।"

কর্ত্তা মুখটি চূণ করিয়া বলিলেন, "সে কথা কি আমার মনে নেই? আমি সে জন্য দিনের মধ্যে পঞ্চাশবারের জায়গায় একশবার হেমকে তাগিদ দিচ্ছি।"

গৃহিণী চড়াসুরে কহিলেন, "হেমটেম আমি জানিনে—তোমাকেই নিজে আজ সেখানে যেতে হবে।"

যেন কর্ত্তার সুজন রায়ের বাড়ী না যাওয়াতেই বিবাহটা বন্ধ আছে!

"আচ্ছা বেশ, তাই যাব—কিন্তু একটু সময় দাও, লক্ষ্মীটি,—একলা ত যেতে পারিনে,—হেম আসুক।"

"আবার বলছি, হেম আসবে কি না আসবে —আমি জানিনে—আমি শুধু জানতে চাই—তুমি আজ সেখানে যাবে কি না? বিকাল পর্য্যন্ত আমি সময় দিচ্ছি,—আর যদি না যাও ত—"

কর্ত্তা ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বলিলেন, "আর বলতে হবে না—আমি ঠিকই যাব, আজই যাব, নিশ্চয়ই যাব। শশী—শশে—শশধর, শশাঙ্কলাঞ্ছন —কোথায় তুমি!"

কর্ত্তাবাবুর ডাক হাঁকে তাঁহার ভৃত্য শশী আসিয়া উপস্থিত হইল—ক্রুদ্ধ গৃহিণী কষ্টে হাস্য সংবরণ করিয়া এই সময় সরিয়া পড়িলেন।—শশীর প্রিয় মুখদর্শনে কৃষ্ণলালের রুদ্ধ জ্বালামুখী উচ্ছ্বাস হৃদয়ে উথলিয়া উঠিল; তিনি চীৎকার করিয়া কহিলেন, "কোথায় ছিলি এতক্ষণ অজবুদ্ধি গজানন?"

"এজ্ঞে এইখানেই ত আছি।"

"এইখানেই ত আছিস্, তবে ডাকলে সাড়া পাওয়া যায় না কেন? হেমকে ডেকে নিয়ে আয়!"

"এজ্ঞে, তিনি এখনো আইসেন নি।"

"এখনও আসে নি! আজকাল ত দেখছি তার বড় গাফেলি হয়েছে। তুই তবে যা—"

"এজ্ঞে চল্লাম—"

"অমনি চল্লাম! কি বলছি আগে শোন্।"

"বলতে আজ্ঞে হোক্—"

"এখনি গিয়ে তাকে ধ'রে নিয়ে আয়,—বুঝলি ত? খবরদার দেরী করিসনে।"

"যে আজ্ঞে" বলিয়া সে দ্রুতপদে অদৃশ্য হইয়া গেল এবং ইহার পর বার বার—কর্ত্তাবাবুর উচ্চ কণ্ঠনিঃসৃত আদরের এবং অনাদরের ডাক-হাঁকেও তাহার সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না; তিনি হতাশচিত্তে দ্রুত নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে চৌকিতে বসিয়া চক্ষু মুদ্রিতপূর্ব্বক ধ্যানমগ্ন হইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

হেম কৃষ্ণলাল বাবুর প্রথম পক্ষের স্ত্রীর ভ্রাতা—অতএব স্মৃতি এবং সম্পর্কের বন্ধনীস্বরূপ। এক সময় কর্ত্তাবাবু ইহার অভিভাবক ছিলেন—এখন কর্ত্তারই ইনি সর্ব্বেসর্ব্বা দক্ষিণহস্ত। হেম নহিলে ত তাঁহার বিষয়কর্ম্ম চলেই না,—তাহা ছাড়া অন্য অনেক কাজেই হেম তাঁহার নির্ভরস্থল,—এক কথায় হেম তাঁহার সর্ব্ববিষয়ের ম্যানেজার।

লোকটি যেমন কর্ম্মিষ্ঠ তেমনি খাঁটি, হিসাবনিকাশে এক আধলার গরমিল হইলে সে দিন তাঁহার

আহার-নিদ্রা বন্ধ হয়। এইরূপ কাজের লোককে কাজে পাইয়া কৃষ্ণলাল কিন্তু একেবারেই অকেজো হইয়া পড়িয়াছেন। চেকের ফরম্ পর্য্যন্ত তিনি নিজে লেখেন না, সই করিয়া দিয়াই নিশ্চিন্ত হন।

বাবুকে বিষয়-কর্ম্মে 'ওয়াকিভ' করিতে হেমের পক্ষ হইতে কিছুমাত্র ত্রুটি নাই। কিন্তু তাঁহার দর্শন-চিন্তার নিগড়বাঁধা মনের মধ্যে বৈষয়িক চিন্তাকে ঠেলিয়া প্রবেশ করান একরূপ দুঃসাধ্য ব্যাপার। ব্যাঙ্কে কত টাকা আছে না আছে,—ভাড়াটে বাড়ীর কোন্‌টার ভাড়া আছে,কোন্‌টা বা খালি, ধার দেওয়া টাকার মধ্যে কোনস্থলে কত সুদ বাকী পড়িল - কখন বা কোন্‌টার নালিসের সময় আসিল,—এই সকল খবর জানাইয়া নানা কার্য্য সম্বন্ধে আদেশ ও উপদেশ লইবার জন্য খাতা-পত্র এবং চিঠি-পত্রাদিসহ যথা-সময়ে হেম প্রতিদিন দ্বিপ্রহরের পর তাঁহার নিকট আসিয়া হাজির হয়—কিন্তু কোনদিনই প্রায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কোন বিষয় শুনিয়া কিংকর্ত্তব্য ঠিক করিবার অবকাশ তাঁহার ঘটে না। কোন বিষয়ের আধখানা পর্য্যন্ত না শুনিয়াই—অধীরচিত্তে কৃষ্ণলাল বলিয়া উঠেন, "বুঝেছি বুঝেছি, আর বলতে হবে না,—আমার আদেশ এবং উপদেশ এই যে এ সম্বন্ধে তোমার বুদ্ধিতে যা ভাল মনে হয়, তাই করো।" হেম হতাশভাবে গোঁপে তা দিতে দিতে,—খাতাপত্রের তাড়াগুলা বহিয়া দপ্তরখানায় পুনঃ প্রবেশ করে। গোঁপে তা দেওয়াটাই হেমের জীবনের মধ্যে একটা বদ অভ্যাস—ইহাই তাহাকে সুখে উত্তেজিত এবং দুঃখে সান্ত্বনা প্রদান করে। কারণ, মদ্যপান বা তামাকু সেবনে পর্য্যন্ত সে অনভ্যস্ত।

কখনও কোন দুর্দ্দিনে বা দুঃসময়ে সহসা যখন কর্ত্তাবাবুর সুপ্তি ভাঙ্গিয়া যায়, তখন হেমের আরও বিপদ। এই চেতনারূপ আধিভৌতিক ঘটনাকে দুঃস্বপ্ন-বোধে, ইহা হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য তখন সমধিক ব্যাকুলভাবে তিনি হেমের শরণাপন্ন হন। যেন হেমই সেই ঘটনার সংঘটক—এবং ইহার প্রতি-বিধানও তাহার হস্তে। আজও গৃহিণীর নিকট কর্ত্তব্যভঙ্গের অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া তিনি দায়ী করিলেন—হেমকে!

হেম আসিবামাত্র চীৎকার-ভর্ৎসনায় তাহাকে কহিলেন, "কি রকম এ কাণ্ড-কারখানা তোমার হে? কত দিন থেকে বলছি, বিজনকুমারের সঙ্গে হাসির বিবাহটা ঠিক ক'রে ফেলো,—তা করছ না কেন বল ত? সে দিকে ত তোমার একবিন্দু চেষ্টাও দেখতে পাইনে।"

হেম হাসিতে লাগিল। বাবুর ভর্ৎসনায় কেহ রাগ করে না,—তাহা নির্ব্বিষ; বরঞ্চ তাহার মধু-টুকুই লোকে উপভোগ করে। কৃষ্ণলাল বলিলেন, "তুমি ত হেসে নিশ্চিন্ত—আর এ দিকে যে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত।" হেম আবার হাসিয়া কহিল,—"আমি ইতিমধ্যে দুই তিন দিন সেখানে গিয়েছিলুম,—কিন্তু রায়ম'শায়ের দেখা পাই নি—শুনলুম, তিনি বাড়ী নেই। আবার না হয় আজ খবর নেব।"

"ও সব ওজরে আমি ভুলিনে, তোমার উপর এতটুকুও বিশ্বাস আর আমার নেই! খবর নিলেই বুঝি কার্য্যসিদ্ধি হ'য়ে গেল! শরীরটা দিন দিন যেমন সূক্ষ্ম হচ্ছে, বুদ্ধিটাও তেমনি সূক্ষ্মতর দাঁড়াচ্ছে। আজই চল,—এই মুহূর্ত্তে,—আমার সঙ্গে তোমায় এখনি সেখানে যেতে হবে—বুঝলে ত?"

"আজ্ঞে তাই যাব। কিন্তু এখন ত সকলের আহারের সময় হ'য়ে এল—এখন ১২টা বেলা, এখন সেখানে গিয়ে হয় ত শুনবেন—বাবু খেতে বসেছেন,—এখন দেখাই হবে না।"

"তা নাই হোল দেখা! সে জন্য ত তোমাকে ভাবতে বলি নি?

"তবে চলুন,—আমি প্রস্তুত আছি।"

কৃষ্ণলাল গাড়ী প্রস্তুত করিতে বলিয়া শুনিলেন, —কোচম্যান হাজির নাই, সে বাসায় খাইতে গিয়াছে!

এ সংবাদে একটু আরামও বোধ করিলেন, এখনি যাইবেন বলিয়া ফেলিয়া পরমুহূর্ত্তেই অনুতপ্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

কিন্তু এ যাত্রা তবুও রক্ষা পাইলেন না, অন্তঃপুরে আহারে যাইবামাত্র আবার এক দফায় গৃহিণীর তাড়া খাইয়া বিকালবেলা অগত্যা কোমর বাঁধিয়া সেনাপতিরূপে রণযাত্রায় নির্গত হইয়া পড়িলেন। তাহা ছাড়া আর গত্যন্তর কি?

গাড়ীতে বসিয়া সারা পথটা মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—আজও যেন সুজন রায় বাড়ী না থাকেন। গৃহিণীর নিকট কৈফিয়ৎ দিতে পারিলেই ত তাঁহার কর্ত্তব্যের শেষ।—কিন্তু হায় রে! এমনি অদৃষ্ট! খোলা ল্যাণ্ডোখানা রায়-ভবনের কম্পাউণ্ডে প্রবেশ করিতে না করিতে রায় মহাশয়ের জীর্ণ দেহ শীর্ণ মুখ তাঁহার নেত্রগোচর হইল। সুজন রায় তখন ছাতে রাস্তা-অভিমুখী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, যেন কাহারও আগমন-প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। কৃষ্ণলালকে দেখিয়া তিনি তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া আসিলেন। "এই যে দাদা, আসতে

আজ্ঞা হোক্, আসতে আজ্ঞা হোক্"—বলিতে বলিতে নমস্কার-অভিবাদন সহকারে গাড়ী হইতে নামাইয়া ড্রয়িং রুমে আনিয়া বসাইয়া বলিলেন, "আজ আমার পরম সৌভাগ্য! দাদার পদধূলিতে গৃহ পবিত্র হ'য়ে গেল। বাড়ীর মঙ্গল ত? হেম ভাল আছ ত?"

কর্ত্তার এইরূপ সৌজন্য-সমাদরে কৃষ্ণলাল এরূপ মুগ্ধ অভিভূত হইয়া পড়িলেন যে, ইহার প্রতি-ব্যবহারে তাঁহার মুখ হইতে যেরূপ ভদ্রতার কথা শোভনীয় হইত,—সেরূপ কিছুই এ স্থলে বলা হইল না। তবে তিনি এখানে আসিয়া সঙ্কোচের পরিবর্ত্তে ক্রমশঃ বেশ স্ফুর্ত্তির ভাবই বোধ করিতে লাগিলেন এবং মাঙ্গলিক শেষ করিয়া সুজন রায় যখন অন্য কথা পাড়িলেন, তখন ক্রমশঃ তাঁহার কথাও যোগাইতে লাগিল।

সুজন রায় কহিলেন, "নরেন্দ্র ত বোম্বাই গিয়াছে শুনেছি—শচীন কি করছে এখন।" কৃষ্ণলাল বুঝিলেন—বিজনকুমারের নিকট হইতে সুজন রায় তাঁহার ঘরের অনেক খবর পান।

তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে তিনি কহিলেন, "শচীন এখন বি-এ পাশ দিয়েছে।"

"বি-এ পাশ দিয়েছে! তা বেশ বেশ! শুনলেও আহ্লাদ হয়। আমার ছেলেটা ত একেবারেই অকালকুষ্মাণ্ড! আমি তাই গিন্নীকে বলি- তোমার ছেলের বৌ মিলবে না।"

হেম সেই অবসরটা বৃথা যাইতে দিল না - বলিল, "তার পাশের কি দরকার বলুন? বাপের জমীদারীই তার পাশ, বিজন ত আমাদের বাড়ীতে প্রায়ই যাওয়া আসা করে—বৌঠাকরুণ ত তার রূপেগুণে মুগ্ধ- তাঁর ভারী ইচ্ছা তাকে জামাই করেন।"

সুজন রায় বুঝিয়া লইয়াছিলেন—ইহাদের আগমনের উদ্দেশ্য কি; সুতরাং তিনি এজন্য প্রস্তুত ছিলেন। হেমের কথার উত্তরে বিনয় সহকারে বলিলেন, "আমার ছেলে দাদার, তাঁর মেয়ে আমার আপনার হবে, এর চেয়ে আর কি সৌভাগ্য হ'তে পারে বল? তবে ছেলেটাকে কোন একটা কাজে ঢুকিয়ে দিয়ে তবে এ কাজ করব ভাবছি।" সুজন রায়ের মনো-নয়নে তখন জ্যোতির্ম্ময়ীর জ্যোতিঃ জাগিতেছিল।

দাদা ইহাতে সায় দেওয়া ছাড়া আর কি বলিতে পারেন? হেম এই সময় কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিল, তৎপুর্ব্বেই সুজন রায় আবার বলিলেন, "আগে ইচ্ছা ছিল ওকে বিলাত পাঠাব—কিন্তু এখন মনে হয়, দেশে থেকেও কাজ করা যায়। দেশের industryর দিকে লক্ষ্য দেওয়াই আপাততঃ আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। একটা দেশলাইয়ের কাটিও আমাদের বিদেশ থেকে আসছে। বঙ্গবিভাগ নিয়ে দেশের লোক ক্ষেপে উঠেছে,—কিন্তু এ সব কার্য্য নিয়ে ক্ষেপেছে ক'জন বল ত দাদা? অথচ এই পথই আমাদের দেশের প্রকৃত মুক্তির পথ।"

কৃষ্ণলাল প্রশংসাপূর্ণ দৃষ্টি তাঁহার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া কহিলেন, "সে ত ঠিক কথা!"

"তুমি ত দাদা বল্লে ঠিক কথা; আমাদের জমীদার ভায়ারা এদিকে মোটেই ঘেঁসতে চান না: তাঁরা পলিটিকস্ নিয়েই ব্যস্ত।"

অতুলেশ্বরকে লক্ষ্য করিয়াই তিনি এই কথা বলিলেন।

হেম বলিল, "হ্যাঁ, আপনি শুনেছি পলিটিক্সের ভেতরে যেতে চান না।"

"আমি মনে করি,—ও-সবের মধ্যে যাওয়াটা নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতা,—লাভ কিছু নেই, লোকসান সমূহ।"

কৃষ্ণলাল বলিলেন,"কথাটা আমি সঙ্গত বিবেচনা করি। আজকালকার ছেলেরা পলিটিক্স্ নিয়ে কেন যে এত মাথা ব্যথা করে, বুঝতেই পারিনে। আমরা বল্লেই কি ইংরাজরা ভারতবর্ষ আমাদের ছেড়ে দিয়ে চ'লে যাবে?"

হেম বলিল, "না, তা কেউ ত চায় না। আমরা ত ইচ্ছা করিনে যে, ইংরাজেরা যাক্;—রাজ্য-শাসনে সমক্ষমতা আমরা পেতে চাই,—যে সব অন্যায় রাজনৈতিক নিয়ম দেখতে পাই—তার প্রতিবিধান চাই,—এই মাত্র।"

কৃষ্ণলাল বলিলেন,"হ্যাঁ, সে ত হওয়া উচিতই,—তাতে ত ইংরাজদেরও আপত্তি হবার কোন কারণ দেখিনে।"

সুজন বলিলেন, "তোমার মত সরল মন তাদের কি দাদা! তারা ভাবে বেশী ক্ষমতা আমাদের হাতে দিলে ক্রমশঃ একেবারেই তাদের ক্ষমতা চলে যাবে—তাদের দিকটাও বুঝে দেখ।"

হেম বলিল, "তাদের দিক ত তারা খুব বেশী ক'রেই দেখছে, আমাদের দিক যে একটুও দেখতে চায় না।"

"কিন্তু ভায়া, আমরা বল্লেই কি তারা দেখবে?"

"সে কথা পলিটিসান্‌রাই বলতে পারেন, তবে

আমাদের মত আনাড়িরা এইটুকু বোঝে যে, বলাতেও ত সুখ একটা আছে।"

"আমি বলি, ওতে সুখবোধ না হ'য়ে দুঃখবোধ হওয়াই উচিত। বেশী কথার দরকার কি—কাজেই যোগ্যতা দেখাও না?"

হেম এ কথার সত্যতাটা মনে মনে বুঝিয়া গোঁপে তা দিতে প্রবৃত্ত হইল। সুজন বলিলেন, "আমি ত আগেই বলেছি, যাতে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শ্রম-শিল্পের বৃদ্ধি হয়, এই সব দিকে দৃষ্টি দেওয়াই আমাদের এখন প্রধান কর্ত্তব্য। আর আমার সাধ্যমত শক্তি আমি এই দিকে অর্পণ করেছি। একটি চা-বাগানে আমি সহস্র সহস্র মুদ্রা ঢাল্‌ছি—তবুও আশানুরূপ শ্রীবৃদ্ধি করতে পারছিনে। এ সব কার্য্য ব্যাঙ্কের সাহায্য ব্যতীত চলতে পারে না। কিন্তু বলব কি দুঃখের কথা, এক জন এক বস্ত্র ইংরাজকেও তারা যেরূপ সাহায্য করে, আমাদের মত লোককে তার শতাংশের একাংশও করে না! আমার চা-ব্যাঙ্কের নাম শুনেছ বোধ হয়? দাদা, বড় দুঃখে আমি ঐ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা করেছি। কিন্তু দেশের লোকই বা ক'জন এ সম্বন্ধে আমাকে সাহায্য করছেন?"

হেম বলিল, "কয়েকবার দেশী ব্যাঙ্ক ফেল হ'য়েছে কি না, তাই প্রথমটা সবাই ভয় পায়। দিন কতক চালিয়ে যদি সুনাম রক্ষা করতে পারেন—তখন আপনা হ'তেই কত লোক যেচে এসে আপনার ব্যাঙ্কে টাকা রাখবে। বাস্তবিক এরকম ব্যাঙ্ক একটার বড়ই অভাব আমাদের দেশে। এ সম্বন্ধে আমিও ভুক্তভোগী। রাণীগঞ্জে কর্ত্তা মহাশয়ের একটা সম্পত্তি আছে—জানেন ত? তাতে মাঝে মাঝে কয়লার টুকরাও পাওয়া যাচ্ছে। লাখ চার টাকা হ'লেও আমরা কাজ আরম্ভ করতে পারি, কিন্তু অনেক চেষ্টাতেও কোন ব্যাঙ্কারকে হাত করতে পারছিনে। তারা সকলেই একবাক্যে জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী খুলে কাজ আরম্ভ করতে বলে।—আসল কথা, কৃতকার্য্য হ'লে তখন এরা টাকা দিবে।"

সুজন রায়ের লোভ-রসনা লালায়িত হইয়া উঠিল। রাজা অতুলেশ্বরের রাণীগঞ্জে সম্পত্তি আছে, আর তাঁহার নাই, এ হীনতাটা তাঁহাকে বড়ই আঘাত দেয়। এই অভাব দূর করিবার জন্য রাণীগঞ্জে দু' একবার জমী দেখিতেও তিনি গিয়াছিলেন। কৃষ্ণলালের জমীটা তাঁহার বড়ই পছন্দ হইয়াছিল। কিন্তু সন্ধান লইয়া জানিয়াছিলেন—ও জমী বিক্রয় হইবে না। হেমের কথার উত্তরে তিনি কহিলেন, "এ স্থলে কোম্পানী খোলার আমি ত সার্থকতা বিশেষ কিছু দেখিনে। জমী তোমাদের, অথচ লাভ যা হবে—তা পঞ্চভূতে মিলে খাবে। তার চেয়ে আমাকে যদি lease দাও ত আমি খনন ব্যয়ভার সব বহন করব—তার পর লাভ যখন হবে, তখন খরচটা উঠিয়ে নিয়ে আধাআধি আমরা ভাগ নেব।"

কৃষ্ণলাল বলিলেন, "বাঃ, সে ত বেশ কথা—জমীটা ত এখন বলতে গেলে পড়েই আছে, তার আয় অতি সামান্য। এ রকম সর্ত্তে দিতে আমি এখনি প্রস্তুত; কি বল হে হেম?"

হেম বলিল, "এসব কথার ত এক মুহূর্ত্তে উত্তর দেওয়া যায় না; ভেবে চিন্তে পরে উত্তর দেওয়াই ঠিক।"

সুজন রায় আর অধিক গরজ দেখান বিবেচনা-সঙ্গত জ্ঞান করিলেন না—কহিলেন,—"হ্যাঁ, হেম ঠিক কথাই বলছেন। তবে আমার বলা রইল—জমীটা যদি বিক্রয় করতে চান বা lease দিতে প্রস্তুত থাকেন ত আমাকে জানাবেন; আপনার সুবিধামত সর্ত্তেই আমি বন্দোবস্ত ক'রে নেব।"

কৃষ্ণলাল আবার হেমের দিকে চাহিলেন। সুজন রায় হাসিয়া বলিলেন, "হেমই বুঝি দাদার হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা!"

কৃষ্ণলাল বলিলেন, "ভাগ্যিস ওকে পেয়েছি ভাই, ধড়ে প্রাণ আছে, নইলে যে আমার কি দশা হ'ত; মনে করতেও আতঙ্ক উপস্থিত হয়।"

সুজন রায় মনে মনে বলিলেন, "তবেই বিষয় রেখেছ তুমি।" আত্মবৎ মন্যতে জগৎ! স্বয়ং ধর্ম্মরাজ আসিয়া তাঁহার কর্ম্মচারী হইলেও সুজন তাঁহাকে পরিপূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিতেন না।

হেম বলিল, "দর্শনতত্ত্ব-চিন্তাতেই উনি সমগ্র আপনাকে ঢেলে দিয়েছেন; আমরা যদি তা থেকে এক মুহূর্ত্তও ওঁকে এ দিকে টানি, তা হ'লেও উনি বিরক্ত বোধ করেন।"

সুজন রায় হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ, শুনেছি বটে দাদা কি একটা বই লিখছেন,—এখনও শেষ হয় নি?"

কৃষ্ণলাল বলিলেন, "জটিল তত্ত্ব ভাই, সাধারণের বোধগম্য ক'রে লিখতে একটু সময় চাই। জীবাত্মা ও পরমাত্মার একাত্মবাদই আমার প্রতিপাদ্য বিষয়। ঋষিগণ ওঁ শব্দকে বীজমন্ত্র ক'রে যে ইহাই স্বীকার ক'রে গেছেন, এইটে আমি বোঝাতে চাই।"

সুজন রায় নেত্র বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন,—"দাদা—তুমি এই মর জগতে অমর কীর্ত্তি রেখে যাবে

দেখছি! ঋষিদের আধ্যাত্মিকতা যদি তুমি আবার জাগিয়ে তুলতে পার,—সত্যযুগ ফিরে আসবে!"

কৃষ্ণলাল উৎসাহিত হইয়া কহিলেন, "তোমার এ বিষয়ে এমন interest, তা আমি জানতুম না—এত আহ্লাদ হচ্ছে আমার! আমি তোমাকে দু'কথায় এর মূল তত্বটা এখনি বুঝিয়ে দিতে পারি—একটা কাগজ পেন্সিল যদি আনতে বল।"

সুজন রায়ের প্রশংসার পরিণাম এতদূর গড়াইবে, তাহা তিনি বুঝেন নাই। এখন কিরূপে ইহা হইতে নিস্কৃতি লাভ করিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় তাঁহাকে রক্ষা করিলেন—তাঁহার ম্যানেজার। তিনি এই সময় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুজন রায় অনেকক্ষণ হইতে ইঁহারই আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

সুজন রায় বলিলেন, "দেখ দাদা, পুণ্য কার্য্যে কত বাধা। এস ডিক্রুজ সাহেব, এঁদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।"

এই ডিক্রুজ সাহেব আর কেহ নহেন, শরৎকুমার ও অনাদির ট্রেণের বন্ধু। ডিক্রুজ বেশ বাঙ্গলা বলেন তিনি বাঙ্গলাতেই ইঁহাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। হেমের নিকট ইনি অপরিচিত নহেন, অনেকবার ট্রেণে দেখা শুনা হইয়াছে। সুজন রায় কথা-প্রসঙ্গে বলিলেন, "দেখ দাদা, ইনি এক জন মস্ত ফিলজফার লোক। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সব ফিলজফিই এঁর কণ্ঠস্থ। তোমার দর্শনতত্ত্ব যদি এঁকে দিয়ে ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়ে নিতে পার ত মস্ত একটা কাজ হয়।"

এই বাসনা কৃষ্ণলালের মনেও মাঝে মাঝে উদয় হইয়াছে। সহসা তাহা পূর্ণ হইবার মূর্ত্তিমন্ত উপায় সম্মুখে উদিত দেখিয়া তিনি আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিলেন।

ডিক্রুজ বলিলেন, "আপনারা দুজনেই দেখছি born patriot! এক জন দেশে ধনাগমের চেষ্টা করছেন—আর—এক জন জ্ঞান-বিস্তারের চেষ্টা করছেন। দেশের পক্ষে দুই-ই দরকার। আমার সৌভাগ্য যে, আজ আপনার সঙ্গে পরিচিত হলেম।"

আরও দুই একটা এইরূপ মিষ্ট সম্ভাষণ করিবার পর সুজন রায়কে তিনি বলিলেন, "আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে, আমায় এখনি আবার একবার ব্যাঙ্কে যেতে হবে।" হেম এই ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়া কহিল, "তবে আজ ওঠা যাক মুকুয্যেম'শায়। সন্ধ্যা ত হ'য়ে এল।"

মুকুয্যে-মশায় আসিবার সময় যেরূপ অনিচ্ছার সহিত গাড়ীতে উঠিয়াছিলেন; যাইবার সময়ও সেইরূপ অনিচ্ছাতে চৌকি হইতে উঠিলেন। সুজন বলিলেন, "বসুন না আর একটু; এখনি যাবেন?"

মুকুয্যেম'শায়ের ইচ্ছামত কাজ হইলে তিনি এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেন; কিন্তু এই কথা বলিতে বলিতে গৃহস্বামী স্বয়ং উঠিয়া দাঁড়াইলেন; হেম, ডিক্রুজ সবাই উঠিয়া দাঁড়াইল,—সুতরাং কৃষ্ণলালের মনের ইচ্ছা মনেই রহিয়া গেল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া সুজন রায় কহিলেন, "তুমি তা হ'লে ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর হচ্ছ দাদা? এতে ক্ষতি কিছুই নেই—শুধু নামটা দেওয়া মাত্র। তা হ'লেই লোকে ব্যাঙ্কের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারবে।"

কৃষ্ণলাল উত্তর করিলেন, "অবশ্য অবশ্য, আমার ত সেটা কর্ত্তব্য কাজ।"

সুজন কৃষ্ণলালকে গাড়ীতে পৌছিয়া দিবার সময় নীচে আসিয়া আবার বলিলেন, "ব্যাঙ্কের কথাটা ভুলো না দাদা। টাকাকড়ি এই ব্যাঙ্কে রেখে তুমি বেশ নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে। রাণীগঞ্জের সম্পত্তি সম্বন্ধে যে প্রস্তাব করেছি, সে বিষয়েও ভেবে চিন্তে একবার দেখো। ছেলেটাকে এই রকম কাজে লাগিয়ে দিযে তখন ঘরে বৌ আনব এই মনে ক'রে আছি।'

আশাতীত সফলতা! হাসিকে বৌ করিবেন বলিয়াই সুজন রায় কথা দিলেন। ইহা হইতে স্পষ্ট উক্তি আর কি হইতে পারে! কর্ত্তা বলিলেন, "কবে আসবে ভায়া! তুমি বুঝি হাসিকে দেখ নি?"

"এক দিন অবিলম্বে যাব; তোমার দর্শনতত্ত্বও সেইদিন শুনব, আজ ত আর ভাগ্যে সে আনন্দলাভ ঘটলো না।"

কৃষ্ণলাল আনন্দে গলিয়া গেলেন—তাঁহাদের গাড়ীতে বসাইয়া সুজন শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কখন গেলে কথাবার্ত্তার সুবিধা হবে দাদা?"

কর্ত্তা বলিলেন, "সকালেই আমি লেখা পড়া করি, দর্শনতত্ত্ব শুনতে চাও ত সেই সময়ই এস।"

"আর যদি কাজের জন্য যাই?"

"তা হ'লে বিকালের দিকে আসাই ভাল। হেম আহারান্তে আমার ওখানে আসেন, আজ তোমার কাছে সকালেই আসব ভেবে ধরা-পাকড়া ক'রে ১১টার মধ্যেই ওঁকে আনিয়েছিলুম—শেষে কিন্তু সকালে আর এখানে আসাই হোল না।"

শেষ কথা শেষ হইতে না হইতে কোচম্যান গাড়ী হাঁকাইয়া দিল।

কর্ত্তা বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া গৃহিণীকে সুসংবাদ

দান করিলেন ;—গৃহিণী আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, "দেখলে,—আমি ত বলেছিলুম, তুমি গেলেই কার্য্য-সিদ্ধ হবে। কথা শোন না—এই বড় দুঃখ।"

হাসি ছাড়া আর সকলেই জানিল ; বিজনকুমারের সহিত তাহার শীঘ্রই বিবাহ হইবে।

কৃষ্ণলালের সৌভাগ্যের সীমা নাই। ২৪ ঘণ্টাও অতিবাহিত হয় নাই, কেবল রাত্রিটা মাত্র কাটিয়াছে অমনি প্রাতঃকালে ম্যানেজার ডিক্রুজ সাহেব কৃষ্ণলালের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অভিপ্রায় কি ? না, তাঁহার দর্শনতত্ত্ব শুনিবেন, কৃষ্ণলালের বুঝি এত আনন্দ জীবনে কখনও হয় নাই। তিনি ওঙ্কারশব্দলিখিত কাগজখানি সাহেবের চোখের উপর খুলিয়া রাখিয়া প্রথমে ওঙ্কার-শব্দের অর্থ এবং মাহাত্ম্য ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। সাহেব তাঁহার প্রতি-ব্যাখ্যায় বার বার মুগ্ধতাবাচক শব্দের ব্যবহার করিতে লাগিলেন—এবং তর্জ্জমা করিবার অভিপ্রায়ে নোট লইতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে সহসা ঘড়ি দেখিয়া ব্যস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আজ আর সময় নাই, অন্য কাজে যেতে হবে এখনি। এমন interesting কথা ছেড়ে যেতে ইচ্ছাও করে না—কিন্তু কি করি ? আবার কাল আসব।"

পরে পরস্পরের ধন্যবাদ বিনিময় শেষ হইয়া গেলে বলিলেন, "ব্যাঙ্কে কি টাকা রাখা হবে ? মিষ্টার রায় জানতে চেয়েছেন।"

কৃষ্ণলাল বলিলেন, "অবশ্যই হবে, আজই হ'তে পারত, কিন্তু হেম ত এখানে এখন নেই।"

হেম আসিলে ব্যাঙ্কে যে টাকা দেওয়া হইবে না, তাহা সাহেব বিলক্ষণ জানিত, জানিয়াই সকালে আসিয়াছিল। সে বলিল—"হেম না এলে কি কোন কাজ হয় না—টাকা ব্যাঙ্কে দেওয়া ত কঠিন কথা কিছু নয়। আমাকে যদি একটা চেক সই ক'রে দেন ত—"

"তা দিতে পারি—দিতে পারি ; কিন্তু চেক বই যে হেমের কাছে—সে এলে চেক পাঠিয়ে দেব—"

ডিক্রুজ বুঝিল, এ আশাটা ত্যাগ করিতে হইবে। সে বলিল, "বেশ, হেমকে দিয়েই পরে ব্যাঙ্কে চেক পাঠালে চলবে ; কিন্তু আপনি ত ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর হবেন বলেছেন—তা হ'লে এই কাগজটা যদি সই ক'রে দেন।" কাগজখানা পকেট হইতে বাহির করিয়া সে তাঁহাকে দিল—তিনি টেবিলের উপর রাখিয়া নাম সই করিলেন,—ডিক্রুজ বলিল, "প'ড়ে দেখবেন না ?"

কৃষ্ণলাল বলিলেন, "প'ড়ে আর দেখব কি ? তোমরা কি আর আমাকে ঠকাবে ?"

সাহেবের কঠিন হৃদয়ও সহসা একটুখানি করুণার্দ্র হইয়া উঠিল। এই চিত্তবিকারে মনে মনে একটু হাসিয়া তাড়াতাড়ি কাগজখানা লইয়া সে চলিয়া গেল।

হেম পরে আসিয়া এই সংবাদে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। ইহার পর ম্যানেজার বা সুজন রায়ের টিকিও আর দেখা গেল না। পনের দিন না যাইতেই খবর পাওয়া গেল, সুজন রায়ের ব্যাঙ্ক ফেল হইয়াছে।

নবম পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণলাল প্রত্যহ সকালে একবার দু-চার মিনিটের জন্য খবরের কাগজে চোখ বুলাইয়া লন। আজ বেঙ্গলীখানা খুলিতেই প্রথমে নজরে পড়িল—"রায়-ব্যাঙ্ক ফেল হইয়াছে।"

একটা মুক্তির দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তিনি ভাবিলেন, "ভাগ্যিস্ ও ব্যাঙ্কে টাকা রাখা হয় নাই।" এই সময় হাসি আসায় তিনি সে চিন্তা ভুলিয়া গেলেন। কাগজখানা ফেলিয়া দিয়া হাসিকে দর্শন-তত্ত্ব বুঝাইতে বসিলেন। সবে মাত্র ওঁ শব্দের প্রথম গ্রন্থির সহিত মধ্যগ্রন্থির যোগাযোগ ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়াছেন,—ভৃত্য আসিয়া খবর দিল—"রায়-মশায় এসেছেন।"

বলিতে বলিতে সে ভূপতিত খবরের কাগজখানা কুড়াইয়া ভাঁজ করিতে প্রবৃত্ত হইল। কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "রায় মশায় ! রায় মশায় কে ? কোন্ রায় মশায় ?"

ভৃত্য কোনও উত্তর দিবার পূর্ব্বেই স্বয়ং সুজন রায় মূর্ত্তিমন্ত রূপে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার সমস্যা পূরণ করিয়া দিলেন। ভৃত্য তখন কাগজখানা পাশের টেবিলে রাখিয়া নীরবে সরিয়া পড়িল।

"এ কি, তুমি ভায়া!" আনন্দ-বিস্ময়-গদগদ-চিত্তে কৃষ্ণলাল উঠিয়া দাঁড়াইলেন, হাসি আগে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কর-মর্দ্দনে সুজন রায়কে সাদৃত করিয়া কৃষ্ণলাল কহিলেন, "এই আমার কন্যা হাসি! প্রণাম কর মা।"

সুজন রায় যে হাসিকে দেখিবার অভিপ্রায়েই

এখানে আসিয়াছেন, কর্ত্তার মনে তাহাতে সন্দেহ মাত্র ছিল না। হাসি প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলে—সুজন রায় কহিলেন,—

"বেশ বেশ। বেশ মেয়েটি! তা মা তোমার বাবার সঙ্গে একটু কাজের কথা আছে।" হাসি একটু সলজ্জ হাসি হাসিয়া চলিয়া গেল। হাসির প্রতি এইরূপ সম্বর্দ্ধনা কর্ত্তার কিন্তু ভাল লাগিল না! যদিও তিনি জানিতেন বিবাহের দিন ক্ষণ ঠিক করিবার জন্যই সুজন রায় এইরূপ ব্যস্তভাবে হাসিকে বিদায় করিলেন, তবুও অরসিকের প্রতি নিবেদনের ন্যায়—এই ঘটনায় তিনি ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িলেন। বেশ একটু উত্তেজিত ভাবেই কহিলেন, "এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? জান ত ভায়া,—আমার ঐ একটি মেয়ে, ছাড়তে মন চায় না। তা—একটু দেরী তোমাকে করতেই হবে?"

সুজন রায়ের ওষ্ঠাধরে আগত বিদ্রূপহাস্যকুঞ্চন সরলরেখায় মিলাইয়া পড়িল—তিনি গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "হ্যাঁ, দেরী ত হয়েই পড়লো।—শুনেছ ত দাদা, আমার ব্যাঙ্ক ফেল হয়েছে।"

"এইমাত্র কাগজে দেখলুম।"

সুজন রায় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "বেশী বিশ্বাস কাউকে করতে নাই দাদা, তা হ'লেই ঠকতে হয়। তোমার যেমন হেম, আমার সেইরূপ ছিল ডিক্রুজ সাহেব। আমার আহম্মকিরই এই ফলভোগ!"

কৃষ্ণলাল বিস্ফারিতনেত্রে কহিলেন, "সত্যি!"

"হ্যাঁ, ঠিক কথাই বলছি দাদা। যা হ'ক তুমি ভয় পেয়ো না,—আমি থাকতে তোমার কোন ক্ষতি হবে না,—সেই কথাই তোমাকে বলতে এসেছি—"

কৃষ্ণলাল বলিলেন, "আমার টাকা ত ব্যাঙ্কে দেওয়া হয় নি,—সে কথা বুঝি ডিক্রুজ তোমাকে বলে নি? আমার ত ক্ষতির কোনই সম্ভাবনা নেই?"

"কিন্তু তুমি যে এক জন ডিরেক্টার,—তারও একটা দায়িত্ব আছে ত?"

কৃষ্ণলালের বুকটা ধড়াস ধড়াস করিয়া উঠিল—তিনি ভীতচিত্তে কহিলেন, "তোমার কথায় তখন ত বুঝেছিলাম—টাকা-কড়ি সম্বন্ধে আমার দায়িত্ব কিছু থাকবে না।"

"ঠিকই বুঝেছিলে দাদা। নাম থাকবে তোমার আর দায়িত্ব বহন করব আমি—বরাবরই আমি এই মনে ক'রে আছি!"

কৃষ্ণলাল তাহার সৌজন্য-সাধুতায় মুগ্ধ হইয়া কহিলেন, "তোমার কি খুবই ক্ষতি হলো ভায়া?"

"ক্ষতি সবই। ব্যাঙ্কে যে টাকা রেখেছিলুম, সে সবই গেল, তা ছাড়া অন্য লোকের গচ্ছিত টাকার জন্যেও আমাকে দায়ী হ'তে হচ্ছে।"

কৃষ্ণলাল ইহা শুনিয়া আশ্বস্তভাবে কহিলেন, "তা বাইরের লোকের টাকা ত এখানে বেশী নেই শুনেছি! হেম ত বলছিল ব্যাঙ্ক তোমার টাকাতেই চলছে।

সুজন রায় খনখনে হাসি হাসিয়া কহিলেন, "ব্যাঙ্কিং বিজ্‌নেস্ যে হেম কত বোঝে—এ কথায় তা বোঝা যাচ্ছে। বাইরের লোকের টাকা বেশী নেই এটা ঠিক, তাড়াতাড়ি টাকা অনেকেই তুলে নিয়েছে—তবুও যে টাকার জন্যে দায়ী আমি—সেও ত নিতান্ত কম নয়!"

কৃষ্ণলালের দৃষ্টিতে সহানুভূতি প্রকাশিত হইল। সুজন আবার কহিলেন, "এদানি যেমন ব্যাঙ্কটি জমে আসছিল, অমনি ভিতরে ভিতরে লুঠও চলছিল। আহাম্মকি দাদা! চার পো আহাম্মকি আমার! আমি সুজন রায় কি না—একটা ফিরিঙ্গি বাচ্ছার লাড্ড হলুম! তবে আমি কারো টাকা রাখব না—চিরদিনই ধর্ম্মের পথ ধ'রে চলেছি—এখনও চলব।"

কৃষ্ণলাল তাহার সাধুতায় মুগ্ধ হইয়া বলিলেন, "ধন্য!"

"কিন্তু সাধুতার কি একালে আদর আছে ভাই? আজকাল জিনিষ বিকোয় চটকে,—চক্‌চকে ঝুটোর দরই বেশী। একটি কথা শুনে বড় আশ্চর্য্য হয়েছি; আমাকে কথা দিয়ে তুমিও নাকি অতুলের কাছে রাণীগঞ্জের সম্পত্তি বিক্রী করছ—তুমিও দাদা কথা ভাঙলে?"

কৃষ্ণলাল আকাশ হইতে পড়িলেন, বলিলেন, "কই আমি ত এর বিন্দু-বিসর্গ কিছুই জানিনে? এ দেখছি হেমের কাণ্ড।"

অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া সুজন রায় কহিলেন, "হেম যদি তোমার অমতে এ কাজ ক'রে থাকে ত কাজটা বন্ধ করতে কতক্ষণ? তুমি না সই করলে ত কাজ হবে না?"

কৃষ্ণলাল মুস্কিলে পড়িলেন। হেমের কর্তৃত্বের উপর যে তিনি হস্তক্ষেপ করিতে অক্ষম, এ কথা বিশ্বাস করিবে কে? আর বলিবার কথাও ত নয়! তবুও বলিলেন, "আচ্ছা ভায়া, হেমকে জিজ্ঞাসা ক'রে আমি এ বিষয়ে উত্তর দেব। হেমের অমতে

ত আমি বিষয়কর্ম্ম কিছুই করতে পারিনে। আর সে আমার আমমোক্তারনামার বলে সব কাজই করতে পারে।”

সুজন রায় অনুনয়ের স্বরে কহিলেন, “দেখ ভাই, তোমাকে স্পষ্ট ক’রে বলি—যদি তোমার এই সম্পত্তিটা পাই, তবেই আমার উদ্ধার, নচেৎ আমাকে সর্ব্বস্বান্ত হ’তে হবে। তোমার দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করার শক্তিও আমার থাকবে না, এটাও বুঝো।”

এতক্ষণ সুজন রায়ের বাক্যে প্রকাশিত সাধুতার পরিচয়ে কৃষ্ণলালের মন ভক্তি-আর্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু এই কথায় রায় বাহাদুরের মনের আসল রূপ যেন ধরা পড়িল; কৃষ্ণলালের বিশ্বাসে সহসা সন্দেহ ছিদ্র প্রবেশ করিবামাত্র সুজনের অনুরোধ অনুনয় আর তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিল না, তিনি অটল ভাবেই কহিলেন, “আমি ত বল্লেম ভাই, হেম যা করেন, তার বিরুদ্ধে আমি কিছুই করতে পারিনে।”

সুজন জানিতেন, হেম ইহাতে আপত্তি করিবেন; যদি এখনি কাজ বাগাইতে পারেন ত ভাল, নচেৎ আশা নাই। এই ভাবিয়া তিনি বায়নানামা লিখিয়া পর্য্যন্ত সঙ্গে আনিয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণলালের অটল ব্যবহারে তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল; তাঁহার ভিতরের সর্প ফণা বাহির করিয়া কহিল, “আচ্ছা বেশ। সুজন রায় সুজনের সঙ্গে সুজন বোলে যে দুর্জ্জনের সঙ্গে দুর্জ্জন হ’তে জানে না, তা মনে ক’রো না। তোমার দুর্ব্বুদ্ধিতার ফলে দেখো তোমার ঘরের কড়িকাঠখানাও থাকবে না।”

সুজন রায় চলিয়া গেলেন, তাঁহার ক্রোধে উদ্গীরিত গরলে কৃষ্ণলালের শাদা মন ঘৃণায় কালো হইয়া উঠিল। উঃ, এই কালসর্পকে তিনি কি না দেবতা মনে করিতেছিলেন! মোহমুক্ত হইয়া মনে মনে তিনি ভগবান্‌কে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। হেম থাকিতে সুজন তাঁহার সর্ব্বনাশ করিতে পারিবেন না, ইহাতে তিনি বেশ আশ্বস্ত রহিলেন! হেমের প্রতি এইরূপ বিশ্বাস তাঁহার বৃথা হইল না!

ব্যাঙ্ক যে ফেল হইবে, বিশ্বস্তসূত্রে আগেই হেম সে খবর পাইয়াছিলেন এবং এজন্য যাহাতে কৃষ্ণলালকে কোন ক্ষতি সহ্য করিতে না হয়, শ্যামাচরণ গাঙ্গুলির সহিত পরামর্শ করিয়া তাহারই উপায় অবলম্বনে তিনি সচেষ্ট ছিলেন। রাণীগঞ্জের সম্পত্তি অতুলেশ্বরকে lease দিবার পরামর্শ তিনিই দান করেন। এই জন্যই শ্যামাচরণ রাজাকে কলিকাতা আসিতে লেখেন। ব্যাঙ্কের কোন দায়িত্ব কৃষ্ণলালের উপর আসিবার পূর্ব্বেই তাঁহার এ সম্পত্তি হস্তান্তর করা উচিত বলিয়া তিনি মনে করিলেন। বাড়ী-ঘর প্রভৃতি অন্যান্য সম্পত্তি কৃষ্ণলালের পিতা পৌত্র-দিগের নামে রাখিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং কৃষ্ণলালকে ডিরেক্টারের দায়িত্বে লিপ্ত করিয়া মকর্দ্দমায় আনিলেও যে সুজন রায় তাঁহার বিশেষ ক্ষতি করিতে পারিবেন না,—বরঞ্চ এরূপ মকর্দ্দমায় তাঁহার নিজের প্রতারণাজাল প্রকাশিত হইয়া পড়িবে, উকীল ব্যারিষ্টারগণ একবাক্যে কৃষ্ণলালকে এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

রাজা অতুলেশ্বরের কলিকাতা নিবাস মাণিকতলায়। ইহা একটি বিচিত্র উদ্যান-ভবন। বাড়ীর চারিদিকেই সবুজ ঘাসের ময়দান; আশেপাশে ফুলের কেয়ারি; স্থানে স্থানে প্রস্তর-মূর্ত্তির বিচিত্র শোভা, ফোয়ারার উৎস এবং যত্রতত্র বসিবার আসন। উদ্যানের পশ্চিমপ্রান্তে স্বচ্ছসলিল সুবিশাল একটি হ্রদ; জ্যোতির্ম্ময়ী ইহার নামকরণ করিয়াছেন ‘কিন্নরহ্রদ’। এই নামানুযায়ী এ হ্রদে কিন্নরবাহন জলিবোট একখানি স্থানলাভ করিয়াছে।

উদ্যানের মধ্যস্থলে রাজপ্রাসাদ; আর উদ্যানপ্রান্তে একটি ছোট দ্বিতল ভবনে বাস করেন ম্যানেজার। এতৎ-সংলগ্ন একটি স্বতন্ত্র একতল গৃহ ম্যানেজারের অফিস। রাজা আসিয়াছেন; দ্বিপ্রহরের পর হইতে আজ আফিসে লোকসমাগম চলিতেছে। কৃষ্ণলালের রাণীগঞ্জের সম্পত্তির লেখাপড়া হইয়া গেল। কার্য্য সমাপ্তিতে হেম নিশ্চিন্ত মনে কাগজের তাড়া লইয়া উকীলের সহিত গাড়ীতে উঠিলেন, রাজা ও শ্যামাচরণ প্রাসাদ-অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অপরাহ্নকাল—আশ্বিনের দিবসান্তে কনক রৌদ্র তরুশীর্ষ হইতে শীর্ষান্তরে লুকোচুরি খেলিতে খেলিতে কিন্নরহ্রদে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছিল। ইচ্ছা—ডুব সাঁতারে হ্রদপারে যাইবে। কিন্তু কিন্নরনৌকার দাঁড়াইত বারি-কণিকাপুঞ্জ পথিমধ্যে সহসা তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া ফেলিয়া সকৌতুকে তাহার কনক কান্তি রজত-উচ্ছ্বাসে ভাসাইয়া তুলিতেছিল। নৌকা বাহিত হইতেছিল আজি কাহার হস্তে? কে উহারা, মানবী বা কিন্নরী?

অণুভা ধরিয়াছিল হাল আর দাঁড় বাহিতেছিল হাসি।

হাসি প্রায়ই এই উদ্যান-ভবনে বেড়াইতে আসে

কিন্তু তাহাকে এখানে টানিবার পক্ষে কাহার আকর্ষণ-বল অধিক—অণুভার বা এই কিন্নর-নৌকার, তাহা ঠিক বলা যায় না। অণুভা যখন অভিমান-ভরে সখীকে এইরূপ অনুযোগ প্রশ্ন করে, তখন হাসি উত্তর না দিয়া—কখনও বা মৃদুমধুর হাসিতে কখনও বা চুল টানিয়া কখনও বা চুম্বনে তাহার মুখ বন্ধ করে।

নাবিকতায় উভয়েই সুদক্ষ। প্রথম প্রথম এক জন মাঝি তাহাদের সঙ্গে থাকিত—আজকাল মাঝিকে তাহারা নৌকায় লয় না;—বেলা শেষে নৌকা কূলে ভিড়িলে মাঝি নৌকা টানিয়া যথাস্থানে লাগায়।

হাসি দাঁড় টানিতে টানিতে গান ধরিয়াছিল;—

আহা মরি মরি আজি জোয়ারে লেগেছে ঢল!
ওরে স্রোত তরী মোর চল্ বেগে ছুটে চল্।
একি রঙ্গ কি কৌতুক ক্ষুদ্র আমি বারিটুক
ধরেছি তরঙ্গ রূপ—যৌবনে টলমল!
চল্ স্রোত তরী মোর বেগে চল্ ছুটে চল্।
নভ আজ রঙে ভরা—কি সুন্দর বসুন্ধরা
কনক ভাদরে ক্ষণে—চমকে বাদল জল!
চল্ স্রোত তরী মোর চল্ বেগে ছুটে চল্!
ঐ যে মেঘের নীচে, ঘাটের সীমানা পিছে—
কদম্ব কি কৃষ্ণতরু? কিবা ওর নাম বল?
শাখা-ঢাকা ফুলে ফুলে, ডাকে রোজ দুলে দুলে
জানে না কি বন্দী আমি? বলহীন কণা-জল!
আজি মুক্ত প্রাণ দেহ, রাখিতে কি পারে কেহ!
এখনি উচ্ছ্বাসনীরে লুটিব চরণ-তলে—!
স্রোত ওরে তরী মোর চল্ বেগে ছুটে চল্।

রাজা তখন শ্যামাচরণের সহিত এই পথে প্রাসাদে যাইতেছিলেন; গান শুনিয়া তীরে দাঁড়াইয়া শ্যামাচরণকে বলিলেন—

"বেশ ত মিষ্টি গলা! তোমার মেয়ে গাচ্ছে বুঝি? আমি ত জানতাম না অণুভা গাইতে পারে?"

শ্যামাচরণ বলিলেন, "না অণুভা নয়, গান করছে হাসি—কৃষ্ণলালের মেয়ে—ও গান-বাজনা বেশ শিখেছে।" এই সময় বোটের মুখ ফিরিল,—হাসির চোখ পড়িল তীরদেশে রাজার দিকে,—সহসা তাহার গান থামিয়া গেল।—রাজা তাহার লজ্জা বুঝিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন! অণুভার চোখ ছিল তীরের বিপরীত দিকে, সে কহিল, "গান বন্ধ করলে যে?" হাসি এ প্রশ্নের উত্তর না করিয়া কহিল, "কে ভাই উনি?" অণুভা তখন ঘাড় ফিরাইয়া তীরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "কই, কাউকে ত দেখছিনে?"

"চ'লে গেলেন যে,—তোমার বাবাও সঙ্গে ছিলেন। কে উনি ভাই?"

"হ'তে পারেন রাজা—জান না? প্রসাদপুরের রাজা—এসেছেন যে।"

"রাজকুমারীর বাবা? তিনি হ'তেই পারেন না,—এ এক জন পুরুষ মানুষ।"

অণুভা হাসিয়া কহিল, "রাজা কি স্ত্রীলোক হয় নাকি?"

হাসি এ-কথায় খুব খানিকটা হাসিল; তার পর কহিল, "না গো না, তা নয়, আমি বলছি, ইনি এক-জন যুবাপুরুষ।"

"রাজা হ'লেই বুঝি বুড়ো হ'তে হয়?"

"আঃ, তা কে বলছে—! তবে রাজকুমারীর বাবা নন ইনি নিশ্চয়ই, দেখতে এঁকে অনেক ছোট।"

"তবে বোধ হয় কুমার অনাদি-দা, রাজার সঙ্গে প্রতিবারই ত উনি আসেন, এবারেও বোধ হয় এসেছেন। এঁর সঙ্গে তোর বিয়ে হ'লে ভাই বেশ হয়। রাজকুমারী এখনো বিয়ে করলেন না, রাজা বোধ হয় অনাদি-দাকেই পুষ্যি নেবেন,—এইরূপ ত গুজব। বিয়ে করবি ভাই তাঁকে?" এবার যে অনাদি রাজার সঙ্গে কলিকাতায় আসেন নাই—সে খবরটা অণুভা রাখে নাই।

হাসি সে কথায় মন না দিয়া কহিল, "কি রং ভাই?" অণুভা কহিল, "রাজবাড়ীর সকলেই সুন্দর! রাজার রংও চমৎকার! তুই অনাদি-দাকে বিয়ে কর ভাই, আমরা সম্বন্ধ করি। রাণী হবি তুই, আমরা বলব রাণী দিদি।"

অণুভা দূরে বসিয়াছিল—তাহার গাল টিপিতে পারিল না হাসি;—কিন্তু হাসির চুলে অণুভা যে ফুলগুচ্ছ পরাইয়া দিয়াছিল, তাহা খুলিয়া সে ছুঁড়িয়া মারিল। অণুভা আবার সেই ফুলে তাহাকে বিঁধিবার চেষ্টা করিল। এইরূপ ফুলসন্ধানে তাহারা বেশ যখন মাতিয়া উঠিয়াছে—তখন তীর হইতে শ্যামাচরণ ডাকিলেন, "অণু? সন্ধ্যা হয়ে আসছে—ফের এবার।"—

মুহূর্তে তাহাদের হাসি-কৌতুক বন্ধ হইল এবং নৌকাও কূলের দিকে ফিরিল। অল্পক্ষণের মধ্যে সংযত শিষ্ট-শান্ত মেয়ে দুইটি ঘাসের উপর শ্যামাচরণের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। শ্যামাচরণ কহিলেন,

"রাজা বাইরে যাচ্ছেন—আমায়ও সঙ্গে যেতে হবে, —একটা কথা বলতে এলুম হাসি! তোমার মাকে ব'লো মা, পরশু আমি নরেনকে আশীর্ব্বাদ করতে যাব।" হাসি বলিল, "আচ্ছা বলব। আপনি তা হ'লে বোধ হয় শীঘ্র ফিরবেন না; প্রণাম ক'রে নিই।" হাসি প্রণাম করিল।

শ্যামাচরণ আর একবার বলিলেন, "হাসি, তা হ'লে ব'লো মা তোমার মাকে যে, পরশু বিকালের দিকে আমরা যাব। বেশী আয়োজন যেন না করেন। আশীর্ব্বাদে সমারোহ পর্ব্ব কিছু থাকবে না,—বড় জোর দু-একটি বন্ধুকে মাত্র সঙ্গে নিতে পারি—"

হাসি যথাসময়ে বাড়ী আসিয়া সকলকে এই খবর দিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

শ্যামাচরণ আজ নরেনকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিবেন, অন্তঃপুরে রন্ধনের ধূম লাগিয়াছে। যদিও শ্যামাচরণ বলিয়াছেন, সঙ্গে বেশী লোকজন আনিবেন না, তবুও গোণাগুন্তি গোটাকতক করিয়া বাজারে জলখাবারেই ত আর পাত সাজান যায় না।—আর শ্যামাচরণকে বিশ্বাসই বা কি? শেষ প্রহরে যদি মত পরিবর্ত্তন করিয়া স-বন্ধুবান্ধবেই আসিয়া হাজির হন? তখন মুখুয্যে-বাড়ীর সুনাম রক্ষা হইবে কিরূপে? বিশেষতঃ রন্ধনকলার পরিচয়প্রদানের এই ত উত্তম অবসর—এ বাড়ীর মেয়েরা এমন নির্ব্বুদ্ধি কেহ নহেন যে, শ্যামাচরণের কথায় এই সুযোগটি খোয়াইবেন!

দ্বিপ্রহরের পর হইতে মুখুয্যে-ঘরণী পোলাও কালিয়া কোপ্তা প্রভৃতির আয়োজনে ব্যস্ত—আর মিষ্টান্ন প্রস্তুতের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন হাসি ও হাসির দিদিমা। দু'জনে মিলিয়া, রসগোল্লা, খাজা, পান্তুয়া, সন্দেশ, সরভাজা, মালাইভোগ, এ সকল প্রস্তুত করিয়া ফেলিয়াছেন, বাকি কেবল বাদসাহী মিঠাই। বেশনের বড় বড় দানা তপ্ত কড়া হইতে ঝাঁঝরিযোগে উঠাইয়া সবে মাত্র এখন দিদিমা তাহা রসে ফেলিতেছেন। পরে ইহার সহিত সর ক্ষীর প্রভৃতি নানা মসলা মিশাইয়া রন্ধন-কার্য্য সমাধা করিবেন। এই মিষ্ট ভোগ মুখুয্যে-বাড়ীর নিজস্ব কলা। এই বিদ্যালাভ-পিপাসায় অনেক ঘরণী ইহাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু কেহই এ পর্য্যন্ত গুরুমর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারেন নাই।

এক এক রকম মিষ্টান্ন যেমন প্রস্তুত হইতেছে, অমনি নাতনির রসনারূপ কষ্টিপাথরযোগে দিদিমা তাহার ভাল-মন্দ যাচাই করিয়া লইতেছেন। মিষ্ট চাকিতে চাকিতে বেচারী হাসির আকণ্ঠ পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। বিদ্রোহী হইয়াও ফল নাই, অনুযোগ অনুরোধের দায়ে তাহাকে শেষে বশ মানিতেই হইবে। তবে এই ঝগড়া-ঝাঁটির মধ্যে পড়িয়া তাঁহাদের হাতের মিষ্টগুলা কিন্তু অধিকতর মিষ্টতা লাভ করিয়াছে।

বেলা যখন প্রায় ছয়টা, তখন শচীন রন্ধনশালায় গিয়া মাকে বলিল, "গাঙ্গুলি মহাশয় এসেছেন।"

মুখুয্যে-ঘরণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ক'জন তাঁরা?"

শচীন উত্তর করিল, "তা আমি দেখি নি। তোমার কথামত তাঁর গাড়ীখানা বাড়ী ঢুকতেই আমি খবর দিতে এলুম। মোট দেখলুম একখানা গাড়ী; তা হ'লে চার জনের বেশী লোক ত নয়ই।"

মা বলিলেন, "তুই যা শচীন, দৌড়ে তোর দাদাকে পাশের বাড়ী থেকে ডেকে নিয়ে আয়, লক্ষ্মী-ছেলে। অমলের সঙ্গে সে দেখা করতে গেছে। ডাকলেই আসবে বলেছে।"

রান্নাঘরের ঠিক পাশেই মিষ্টান্নের ঘর। শচীনের গলা শুনিয়া দিদিমা ডাকিলেন, "শচীন এসেছিস্? আয়, আয়, মিষ্টি গোটাকতক চেকে যা।"

হাসির মা শাশুড়ীর উদ্দেশে একটু উচ্চ গলায় কহিলেন, "ঠাকুর জামাই এসেছেন মা, শচীন্ যাক্—নরেনকে ওবাড়ী থেকে ডেকে আনুক। ফিরে এসে মিষ্টি চাকবে এখন।"

কিন্তু শচীন লোভ-সংবরণে কর্ত্তব্য পালন করিবার ছেলে নয়। সে তাড়াতাড়ি দিদিমার কাছে হাজির হইল। তখন চুলা হইতে মিঠাইএর খোলা নামিয়াছে, তিনি রন্ধনের ভার হাসিকে অর্পণ করিয়া সরভাজা,রসগোল্লা ও পান্তুয়া এক একটা শচীনের হাতে দিয়া বলিলেন, "শ্যামাচরণ এসে পড়লো, এখনও নরেনের দেখা নেই! আচ্ছা ছেলে যা হ'ক! খেয়ে নিয়ে শীঘ্র যা, ডেকে নিয়ে আয় তাকে।"

শচীন বলিল, "যাচ্ছি যাচ্ছি—এত তাড়াতাড়ি কি! বাবা ত ঘরে আছেন; জলে ত পড়েন নি তাঁরা। আমাকে আর দুখানা সরভাজা আর দুট পান্তুয়া দাও।"

দিদিমা তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া বলিলেন, "এইবার যা, ডেকে নিয়ে আয় দাদাকে। একখানা

রেশমী কাপড়, একটু ফোঁটা চন্দনও ত তার পরতে হবে।”

শচীন অবশিষ্ট পান্তুয়াটা মুখে পূরিয়া দিয়া বলিল, “দাদা কক্ষণো ও সব পরবে না।”

“না, পরবে না! তুমি সবজান্তা! দাদা না পরে তোমাকে পরিয়ে ছাড়ব! এখন যাও তাকে ধ’রে নিয়ে এস।”

শচীন গামলার জলে হাতটা তাড়াতাড়ি চুবাইয়া চলিয়া যাইতে যাইতে দিদিমার কথার উত্তরে বলিল, “আমি বাড়ী থাকলে ত! আমি যাচ্ছি এখনি বায়স্কোপ দেখতে, দাদাকে ডেকে দিয়েই চ’লে যাব।”

বলিয়া সে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

দিদিমা রুষ্ট স্বরে আপন মনেই বলিলেন, “আজ-কালকার ছেলেরা যে সব কি রকম হয়েছে! শ্বশুর এসে ব’সে রইল—আশীর্ব্বাদ নেবেন যিনি, তিনি যে কোথায়, তার ঠিক নেই! আর ভাইটিও তেমনি! ঘরে যাহোক একটা ক্রিয়া-কর্ম্ম—অতিথি-অভ্যাগতকে আদর-অভ্যর্থনা করতে হবে—তা না, চল্লেন তিনি —বায়স্কোপ দেখতে! বেশ সব শিক্ষা হচ্ছে! যা হাসি দিদি, মিঠাইগুলো বেঁধে কাপড় ছেড়ে নে। তোকেই পরিবেষণ করতে হবে—জানিস্ ত। উৎ-সবের দিনে আজ লাল কাপড় এক খানা পরিস্।”

হাসি উঠিয়া দাঁড়াইল, দাসী একথালা ফুলের মালা আনিয়া বলিল,—“মালী দিয়ে গেল গো।”

দিদিমা বলিলেন, “বাইরে আলাদা একথালা দিয়েছে ত? আশীর্ব্বাদের সময় দরকার হবে যে।”

দাসী বলিল, “তা দিয়েছে!”

“দেখদেখি তবে ক’ছড়া গোড়ে ওতে আছে?”

দাসী মালাগুলা একে একে হাতে উঠাইতে লাগিল। দিদিমা দেখিয়া বলিলেন, “মোট একটি ছড়া গোড়ে দেখছি—আর সবই সরু মালা। শ্বশুরের গলায় ঐ ছড়াটা খাবার পরে তুই পরিয়ে দিস হাসি।”

এই সময় হাসির মা পলান্নের জন্য পেস্তা বাদাম লইতে এই ঘরে আসিয়া কহিলেন, “হাসি কেন দেবে —আমিই বুড়োর গলায় মালা পরিয়ে দেব মা?”

দাসী কি শুনিতে কি বুঝিয়া বলিয়া উঠিল, “বুড়োর গলায় কেন মালা দেবে? দিদিমণি আমা-দের রাজরাণী হবে গো, দেখে নিও!”

দিদিমা বলিলেন, “তোরা সেই আশীর্ব্বাদই কর্ সবাই। যা, মালার থালাটা উপরে নিয়ে গিয়ে ছোট কুটরীতে রেখে দে এখন।”

দাসী চলিয়া গেল—দিদিমাও উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাসির হাসিমুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন, “কোন্ রাজা তপস্যা করেছে আমার নাতনির জন্য, কে জানে!”

হাসির মনে পড়িয়া গেল;—হ্রদের ধারের সেই যুবক-মূর্ত্তি,—যাহাকে অণুভা রাজকুমার বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল।

সে প্রফুল্লভাবে কহিল, “আমাকে তবে তোমরা বনে পাঠাও দিদিমা,—তবে ত রাজপুত্র আমাকে উদ্ধার করতে আসবে।”

দিদিমা তাঁর মিষ্টহাতেই মিষ্টভাবে নাতনির গাল টিপিয়া কহিলেন, “ছি রূপসীমণি, ও কথা কি বলে? এই কমল সরোবরে নেমেই তোমার রাজা তোমাকে বুকে তুলে নেবে।”

হাসি হাসিয়া চলিয়া গেল; দিদিমা মিষ্টগুলি থালায় সাজাইতে বসিলেন। কাজ করিতে করিতে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আবার সেই কথাই ভাবিলেন, “বৌমার যদি একটুও বুদ্ধি আছে! অমন সোনার ছেলে শরৎ, তাকে কি না হাতছাড়া করলে! বিজ-নের সঙ্গেও ত আর বিয়ের আশা নেই। সে কিন্তু ভালই হোয়েছে; বাপটা যে ভয়ানক লোক!”

দিদিমার কাজ শেষ হইবার পূর্ব্বেই হাসি যখন একখানি লাল বারাণসী সাড়ী পরিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন তাঁহার মনে হইল, যেন মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীদেবী স্বয়ং তাঁহাকে আসিয়া দেখা দিলেন।

বাহির্বাটীতে বিনাড়ম্বরে নরেন্দ্রের আশীর্ব্বাদ-পর্ব্ব সমাধা হইল। সন্ধ্যার সময় বিদায় গ্রহণ করিয়া নরেন্দ্র পূর্ব্ব বন্দোবস্ত-অনুসারে তাহার একটি বন্ধুর বাড়ী নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গেল; আর অতিথি দুইজনকে সঙ্গে লইয়া কৃষ্ণলাল অন্তঃপুরে আগমন করিলেন।

দিদিমার দালানের আজ বাহার দেখে কে? একটি চন্দনকাষ্ঠ-যবনিকায় বিভক্ত দালানের এক অংশ আজ ভোজন-স্থান—অপর অংশ বসিবার স্থান রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ড্রয়িংরুম বিভাগে দিদিমার তক্তাপোষখানির উপর গালিচা কুসনের সজ্জা, আশেপাশে কয়েকখানি কোচ, চৌকি এবং মাঝে মাঝে এক একটি ক্ষুদ্র টেবিল। টেবিলগুলি ফুলভরা ফুলদানিতে ফ্রেম-আঁটা ছবিতে সাজান—একটি টেবিলে রূপার থালায় কয়েকগাছি ফুলমালা অতিথিগণের সম্মানার্থ রক্ষিত। থামের মাথায় মাথায় কুঞ্চিত রঙিন রেশমী পরদা ঝুলিতেছে, দেয়ালে দেয়ালে সেতার এসরাজ প্রভৃতি যন্ত্রাদির মাঝে মাঝে নানারূপ চিত্রলেখ্য, অধিকাংশই হাসির হস্তাঙ্কিত।

কৃষ্ণলালের অনুবর্ত্তী অতিথি দুই জন মধ্যদ্বার-পথে উপবেশন-গৃহে সমাগত হইলেন। এই সরল সুন্দর অথচ অনাড়ম্বর গৃহ-সজ্জা দেখিয়া নবাগত অতিথি রাজা অতুলেশ্বর মনে মনে গৃহকর্ত্রীর রুচির প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

· শ্যামাচরণ এখানে আসিয়াই অন্তঃপুরিকাগণের সহিত প্রথমে দেখা করিতে গেলেন এবং সেখানে প্রণাম-সম্ভাষণাদি শেষ করিয়া দিদিমা ও হাসিকে লইয়া পুনরায় দালানে প্রবেশ করিলেন। অন্তঃ-পুরের ভোজে পরিবেষণ করা দিদিমার একটি কর্ত্তব্য কাজ ছিল। গৃহিণী দ্বারান্তরালে আসিয়া উঁকি দিতে লাগিলেন।

রাজা তখন চিত্রলেখ্য দেখিতেছিলেন, ফিরিয়া দাঁড়াইবামাত্র শ্যামাচরণ দিদিমার দিকে দৃষ্টিনির্দ্দেশ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, "ইনি কৃষ্ণলালের মাতা, আর এই আমাদের হাসি—ওরফে সুগুপা। প্রণাম কর মা এঁকে,"—

হাসি তৎক্ষণাৎ মুখভরা হাসি হাসিয়া ভূ-নত হইল। রাজা ব্যতিব্যস্ত ভাবে বলিয়া উঠিলেন, "করেন কি,—করেন কি?" কিন্তু তাঁহার মুখের কথা মুখে শেষ হইতে না হইতে হাসি পদধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক উঠিয়া দাঁড়াইল।

আজ পুরাতন ফ্যাসানের ঝাড় লণ্ঠন এবং দেয়ালগিরির মধ্যে বিজুলী বাতি জ্বলিতেছিল। হাসি প্রণামান্তে উঠিয়া চকিত দৃষ্টিদানে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার ন্যায় উজ্জ্বল সেই আলোকে রাজাকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়া লইল। "এ কি, রাজকুমার অনাদি-দা নাকি?" সেই দিন হইতে হাসি ইহাকে এই নামেই স্মরণ করে। সে দিন দূর হইতে যাঁহার প্রতিবিম্ব মাত্র দেখিয়াছিল, আজ তাঁহার প্রকৃত রূপ দেখিয়া স্তম্ভিত হইল! এ ত অল্পবয়স্ক যুবকের মূর্ত্তি নহে! ইনি যে মহামহিম জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ। কি সৌম্য সুন্দর! হাসির কল্পনা প্রকৃতের নিকট পরাজয় মানিল।

বস্তুতঃই রাজা আদর্শ সুপুরুষ;—চিত্রাঙ্কন তুল্য এমন সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর মূর্ত্তি কদাচিৎ নয়নে পড়ে। তাঁহার বর্ণ ইরাণীর ন্যায় স্বর্ণপ্রভ, ক্ষুরধারমুণ্ডিত শ্মশ্রুহীন পরিষ্কার মুখশ্রী রমণীর ন্যায় কমনীয়, দেহ সুগঠিত, অঙ্গুলিগুলি পর্য্যন্ত চম্পককোরক তুল্য সুঠাম —এমন কি কেশরাশিও রেশম-কোমল লালিত্য-পূর্ণ। তাঁহার ললাট বুদ্ধিবৃহৎ, নয়ন ভাবজ্যোতিঃ-পূর্ণ এবং ওষ্ঠাধর কারুণ্যরেখা-গঠিত। এই ত্রিভাবের সম্মিলনে তাঁহার রাজজনোচিত গাম্ভীর্য্য কবি-জনোচিত সরল মাধুর্য্যে এমন স্নিগ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল যে, বয়সে তিনি চল্লিশের কাছাকাছি হইলেও তাঁহাকে দেখিতে পঁয়ত্রিশের অধিক দেখাইত না।

রাজাকে একবার দেখিলে নয়ন পুনঃ পুনঃ সেই দিকে আকৃষ্ট হইত ' বলা বাহুল্য, দিদিমাও তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইলেন। রাজা তাঁহাকে প্রণাম করিবার পর প্রসন্নচিত্তে তিনি কহিলেন, "মঙ্গল হোক।" তাহার পর শ্যামাচরণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কে হন ইনি শ্যামাচরণ? পূর্ব্বে ত এঁকে দেখি নি।"

আত্ম-পরিচয়-দানে ইঁহাদের ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতে রাজার ইচ্ছা ছিল না, তাই আগে হইতেই এ সম্বন্ধে শ্যামাচরণকে তিনি সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। দিদিমার প্রশ্নের উত্তরে শ্যামাচরণ কহিলেন, "ইনি দূর সম্পর্কে আমার একরূপ ভাই হন,—নাম অতুল রায়, বিদেশেই বাস করেন, কার্য্যোপলক্ষে কলকাতায় এসে আমার ওখানেই উঠেছেন।"

"অতুল রায়?" দিদিমা একটু ভাবিয়া বলিলেন. "নিখিল রায়ের কেউ হন কি ইনি? তিনি সম্পর্কে আমার ভাই-পো হন।"

রাজা একটু হাসিয়া কহিলেন, "রায়ে রায়ে একটা সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়। আমাকেও না হয় ভ্রাতুষ্পুত্র ব'লেই মনে করবেন।" কথাটি দিদিমার বড় মিষ্ট লাগিল। কৃষ্ণলাল মাতার কথার প্রতিবাদপূর্ব্বক কহিলেন, "নিখিল রায় তোমার ভাই পো—না আমার ভাই পো? তার ছেলে আমাকে ত দাদা দাদা করে।"

দিদিমা বলিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁ, তাই ত ঠিক। আর বাবা, বুড়ো হয়ে যাচ্ছি—অত শত মনে রাখতে পারিনে।" রাজা হাসিয়া কহিলেন, "তা হ'লে আপনারা সকলেই আমাকে স্নেহ-চক্ষে দেখবেন।" তাঁহার মধুর সৌজন্যে মাতা-পুত্র উভয়েই আপ্যায়িত হইলেন। ব্রাহ্মণ ভৃত্য প্রায় তখনি যবনিকান্তরাল হইতে জানাইয়া দিল যে—আহার্য্য প্রস্তুত। দিদিমার অনুবর্ত্তিতায় সকলে ভোজন-গৃহে উপনীত হইলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

আজ-কাল বাঙ্গালী ধনী-গৃহে বিবাহভোজ অপেক্ষা আশীর্ব্বাদভোজে খাদ্যোপকরণের অধিক

বাহুল্য দেখা যায়। কারণ স্বল্পতর অতিথির তুষ্টি-সাধন পক্ষে বহ্বাড়ম্বর লঘু আয়াস-সাধ্য। এ ক্ষেত্রেও অন্তঃপুরিকাগণ শ্যামাচরণের নিষেধ সত্ত্বেও ভূরি আয়োজনের কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। রৌপ্য-থালের তিনদিকব্যাপী সুবিস্তৃত ব্যঞ্জন ও মিষ্টান্ন-পাত্রের সকল স্তরে নাগাল পাওয়া দীর্ঘহস্ত রাজার পক্ষেও দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। দিদিমা কাছে বসিয়া দূরের বাটিগুলি তাঁহার হাতের নিকটে ধরিয়া দিতে দিতে সকল ব্যঞ্জনই একটু একটু চাকিবার জন্য মৃদুস্বরে অনুরোধ করিতেছিলেন। রাজা যেটি খাইয়া বিশেষ পরিতোষ প্রকাশ করিতেছিলেন, সেটি যে হাসিরই প্রস্তুত, ইহাও অসঙ্কোচে রাজাকে জানাইয়া দিতেছিলেন; আর হাসি দিদিমার প্রতি ক্রুদ্ধ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়াও রাজার প্রশংসা বেশ হাস্য মুখেই আত্মসাৎ করিতেছিল। এ বাড়ীর এই দস্তুর, ভাল রান্নাগুলি মা দিদিমা দু'জনেই হাসির নামে চালাইয়া অধিকতর পরিতৃপ্তি লাভ করেন।

কথোপকথনসুখে বঞ্চিত হাসির মাতা দূরে বসিয়া মূক-বধিরের ন্যায় অতিথি-দর্শনসুখেই আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতেছিলেন। রাজা দক্ষিণ হস্তে সদাসর্ব্বদা বহুমূল্য দুইটি হীরক-অঙ্গুরী ধারণ করিতেন। তিনি যখন পাত্র হইতে পাত্রান্তরে হস্ত-চালনা করিয়া ব্যঞ্জন গ্রহণ করিতেছিলেন, তখন সেই অঙ্গুরী দুইটির জ্যোতিঃ তারকাজ্যোতির ন্যায় ঝলমল করিয়া উঠিতেছিল।

গৃহিণী একবার রাজার মুখের দিকে একবার তাঁহার হাতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে ভাবিতেছিলেন, ঠিক যেন কোন ছদ্মবেশী রাজপুত্তুর! হাসির যদি এই রকম একটি বর হয়! ঠাকুরজামাই এঁকে কি গোপনে ক'নে দেখাইতেই এনেছেন না কি? তাই যেন হয় বিধাতাপুরুষ।"

গৃহিণী যখন এইরূপ তপস্যা করিতেছিলেন, তখন হাসি নিবিষ্টচিত্তে অতিথির আহার সৌষ্ঠব দেখিতেছিল। কিরূপ ধীরে ধীরে স্বল্পমাত্রায় তিনি আহার্য্য মুখে গ্রহণ করিতেছেন! মুখে হাত উঠাইবার কি সুচারু ভঙ্গী! আহার্য্য মুখে লইবার পর ওষ্ঠাধর নিমীলিত হইয়া পড়িতেছে, চর্ব্বণে শব্দ নাই; হস্ত-লেহনের বিকৃত দৃশ্য নাই! আহার-ক্রিয়ার মধ্যে এতটা সৌন্দর্য্য যে লুক্কায়িত আছে—ইতিপূর্ব্বে ইহা তাহার নজরে কখনো পড়ে নাই ত!

অন্ন-ব্যঞ্জন ত্যাগ করিয়া রাজা যখন মিষ্টান্নে হস্ত দান করিলেন, তখন শ্যামাচরণ বলিলেন, "জানেন —রা—রা—রায়মশায়, এ বাড়ীর মিষ্টি খেলে আর কখনও ভুলতে পারবেন না; চিরদিনই মুখে সে মিষ্টতা লেগে থাকবে।"

রাজা বলিলেন, "সে ত উত্তম কথা। এত রকম মিষ্টান্ন রয়েছে এখানে, কোনটি আগে নেব ব'লে দিন ত, আমি এ সম্বন্ধে বড়ই অজ্ঞ।"

শ্যামাচরণ বলিলেন, "আমি ত খাচ্ছি সরভাজা।"

দিদিমা অনুনয় করিয়া কহিলেন, "সবই একটু ক'রে চেকে দেখ বাছা,—নইলে আমাদের দুঃখ হবে!"

কৃষ্ণলাল বলিলেন, "মালাইভোগটা মা ওঁকে আগে দাও। তোমার এত মিষ্টান্ন কি একসঙ্গে লোকে খেতে পারে! পরে বরঞ্চ সঙ্গে ওঁদের কিছু দিও।"

রাজা কহিলেন, "হ্যাঁ, তা হ'লে বিদায় দক্ষিণা-টাও বাকী থাকে না?" ইতিমধ্যে হাসি মালাই-ভোগের বাটিগুলি তিনজনের পাতের কাছে ধরিয়া দিল। শ্যামাচরণ খাইতে খাইতে বলিলেন, "বড়ই উপাদেয় হয়েছে—তুমি তৈরী করেছ বুঝি মা?"

হাসি একটু হাসিল, দিদিমা তাড়াতাড়ি বলিলেন, "হ্যাঁ, হাসিই করেছে ওটা।"

এবার দিদিমা সত্য কথাই বলিলেন; এ জিনিষটা সম্পূর্ণভাবেই হাসির হাতের প্রস্তুত। কারণ, ইহাতে রন্ধন-কার্য্য কিছুই ছিল না, মালাই, ক্ষীর, ছানা, রস প্রভৃতি সংযোগে ইহা একটা কেমিকেল উপাদান মাত্র। রাজা খাইয়া বলিলেন, "যিনি এঁর সুগুণা নাম দিয়েছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই দিব্যদর্শক ছিলেন।"

এইরূপ বিনাড়ম্বর সহজ হাসি-গল্প আদর-আপ্যায়নে অতিথি এবং আতিথ্যকারী উভয়পক্ষই যথোচিত আনন্দ লাভ করিলেন। আহারের পর দিদিমা হাসিকে লইয়া বিদায় গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলে শ্যামাচরণ তাহাতে আপত্তি প্রকাশ করিলেন; কৃষ্ণলাল সেই আপত্তি গ্রাহ্য করিয়া মাতাকে টানিয়া আনিয়া বড় চৌকিখানার উপর বসাইয়া দিলেন। হাসি পাশে বসিল।

শ্যামাচরণ তাঁহাদিগকে লইয়া বিদেশী পণ্য বয়কট সম্বন্ধে গল্প ফাঁদিয়া বসিলেন আর রাজা কৃষ্ণলালের সঙ্গে পুনরায় দেয়ালের চিত্রলেখ্যগুলি দেখিতে লাগিলেন। বড় দরজার মাথার সূচিকার্য্য-রচিত ওঁ শব্দটি প্রথমেই কৃষ্ণলাল তাঁহাকে দেখাইলেন,—রাজার প্রশংসা শুনিতে পাইলে পর তিনি ইহার অর্থ-ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইতে পারেন। কিন্তু তাঁহাকে নিরাশ করিয়া অতিথি আর একখানি ছবি মনোনিবেশ সহকারে দেখিতে দেখিতে কহিলেন, "এই ছবিখানি দেখিতে

বড় সুন্দর, কিন্তু ইহার পরিকল্পনা ঠিক বুঝিতে পারছি নে। কৃষ্ণলাল ডাকিলেন, "হাসি, তোমার ছবিখানির অর্থ রায়মশায়কে বুঝিয়ে দাও ত মা।" হাসি নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল, কৃষ্ণলাল ওঁ শব্দের দিকে চাহিয়া রহিলেন। রাজা কহিলেন, "আপনি ত খুব সুন্দর ছবি আঁকেন? ছবিখান ঠিক স্বপ্ন দৃশ্যের মত দেখাচ্ছে।" হাসি বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল, "ঠিক ত ধরেছেন আপনি! সত্যই ওখান আমার স্বপ্না ত্র। আমি স্বপ্ন দেখেছিলুম—যেন ছোট্ট একখানি নৌকা ক'রে সমুদ্রে ভেসে চলেছি;—হঠাৎ সমুদ্রটা আকাশ হয়ে গেল, আর নৌকাখানা আকাশ পথে উড়ে চলতে লাগলো। চলেছি ত চলেছি, উড়ন্ত নৌকায় ছুটে ছুট চলেছি,—আর থামার সাধ্য নেই,—নামার সাধ্য নেই,—আকাশের তারাগুলো সব আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে;—আমার মাথা ঘুরে উঠলো, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল,—প্রাণ আকুলি ব্যাকুলি করতে লাগলো, হঠাৎ একখানা কাল মেঘের ভিতর থেকে কার বাঁশি বেজে উঠলো, আর আমার ঘুমও ভেঙ্গে গেল।"

রাজা স্বপ্ন-কথা নিবিষ্ট-চিত্তে শুনিতে লাগিলেন, হাসির কাহিনী শেষ হইলে, রাজা সহাস্যে কহিলেন,—

"স্বপ্নটি যেমন বিচিত্র, তারা-জগতের মধ্যে স্বপ্নদেবীর এই মূর্ত্তিটিও সেইরূপ চমৎকার! আপনি বুঝি সেই সন্ধ্যায় কিন্নর-হ্রদে বেড়াচ্ছিলেন?" হাসির মনে পড়িল গত পূর্ব্ব-অপরাহ্নের কথা, সে সলজ্জে কহিল, "ঠিক মনে পড়ছে না।" রাজা কহিলেন, "আপনার ছবিখানি দেখে আমার একটি গান মনে পড়ছে। ছবিটির সঙ্গে গানটির যে বিশেষ মিল আছে তা নয়, কিন্তু ছবিখানি দেখছি আর সেই গানটি আমার মনে আসছে।"

হাসি অনুনয়ের স্বরে কহিল, "আপনি গাবেন সেই গানটি।"

এমন মধুর দৃষ্টিতে চাহিয়া তাঁহাকে হাসি এই অনুরোধ করিল যে, সেই দৃষ্টিতে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া সহসা রাজা আত্মহারা হইয়া পড়িলেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে বহুদিনের বিস্মৃত পুলক-শিহরণ উঠিল। রাজা কোন উত্তর করিবার পূর্ব্বেই শ্যামাচরণ কহিলেন, "রা রা রায়বাহাদুর বেশ গাইতে পারেন। ছেড়োনা মা ওঁকে, ধ'রে পড়।" আজ সহসা শ্যামাচরণ তোতলা হইয়া পড়িয়াছেন, রায়মহাশয়ের নামটা ক্রমাগতই তাঁহার মুখে বাধিয়া যাইতেছে। শ্যামাচরণ কাজের মানুষ, এই কথা বলিতে বলিতে দেওয়ালের বড় তানপুরাটা খুলিয়া তক্তার উপর রাখিয়া দিলেন। হাসি আবার বলিল, "গান্ না আপনার মনের গানটি?" রাজা কহিলেন, "আমারও কিন্তু অনুরোধ আছে, তার পর আপনাকেও গাইতে হবে!" এই সময় শ্যামাচরণ ওঁ শব্দের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া একবার বলিয়া উঠিলেন, "আপনি হাসিকে আপনি আপনি করছেন—বড় বেমানান শোনাচ্ছে, তুমিই বলিবেন ওকে।"

রাজা এ কথার কোন উত্তর না করিয়া তক্তায় আসিয়া বসিয়া তানপুরাটা হাতে তুলিয়া লইলেন। কিছুক্ষণ তাহার কান টেপাটুপি করিয়া সুর মিলাইয়া গান ধরিলেন—

কে আমারে বারেবারে করুণ সুরে
ডাকে সুদূরে?
ভবনবাসী মন আমার ভুবনপানে উড়ে।
চিনেছি গো বাঁশিটি তার,
সুরে শুনি হাসিটি তার,
পারে যেতে বারেক শুধু দেখেছি বঁধুরে,
সেই বিদেশী বঁধুরে;
সে যে স্মৃতির খেয়া বেয়ে চলে
স্বপ্ন নদীর পুরে!
ওগো কেমন ক'রে মিলবে তারে হায়?
যেমন ক'রে সন্ধ্যা-তারা,
পুব গগনে দিশাহারা,
ভোরের বেলা অরুণ-ধারায়
মিলাইয়া যায়;
তেমনি ক'রেই মিলবে, তাহার—
লুটবে পায়ে ঘুরে
সে যে স্মৃতির খেয়া বেয়ে চলে
স্বপ্ন নদীর পুরে।
মিলবে তারে কবে ওগো কখন?
তখন ওগো তখন—
ফাগুন হাওয়া আগুন হ'য়ে,
কাল-বৈশেখের দোলা ব'য়ে
চলবে যখন ঝড়ের আগে আগে,
ঘনঘটা আঁধার মেঘে—
ইন্দ্রধনু চুপে চুপে,
প্রকাশ হবে মোহন রূপে
লুকিয়ে পড়বে যখন পুনঃ
নিবিড় অনুরাগে,—
তখন ওগো তখন—
রুদ্রতালে বন্ধু তোমার নাচবে মধুরে—

বেজে উঠবে তুমি তাহার চরণ-নূপুরে :—
সে যে স্মৃতির খেয়া বেয়ে চলে
স্বপ্ন-নদীর পুরে।

রাজা তালমান দিয়া চক্ষু বুজিয়া গানটি গাহিতে লাগিলেন, হাসি তন্ময় হইয়া শুনিতে লাগিল। রাজা যখন থামিয়া পড়িলেন, তখনও সেই গীততান তাহার কর্ণে বাজিতেছিল!

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

গৃহের কুহকবদ্ধ নীরবতা ভঙ্গ করিয়া শ্যামাচরণ প্রথমে কহিলেন, "এইবার তোমার পালা মা, অতিথি-সম্বর্দ্ধনা কর।" হাসি একেবারেই বাঁকিয়া বসিল, এত ভাল গানের পর আর কি সে গাইতে পারে! সে বলিয়া উঠিল, "আমি আজ মোটেই গাইতে পারব না। রাত্রে ঠাণ্ডা লেগে গলাটা একেবারেই ধ'রে গেছে।"

কিন্তু দিদিমা, কৃষ্ণলাল, শ্যামাচরণ ইঁহাদের সকলেরই ইচ্ছা হাসি গান গায়; গান শিখিয়া হাসি যদি গান শুনাইবার এমন অবসর ছাড়িবে, তবে শিখিয়াই বা লাভ কি!

পিতা বলিয়া উঠিলেন, "গাও হাসি, বলছেন উনি গাও।" হাসি দিদিমার পাশে আসিয়া বসিয়াছিল, তিনি অলক্ষ্যে, তাহাকে বেশ একটু টিপ্ নি দিয়া মৃদু স্বরে কহিলেন, "গাইতে আরম্ভ করলেই গলা খুলবে, দেমাক রাখ।" কিন্তু তথাপি হাসি চুপ করিয়া রহিল, তাঁহাদের আজ্ঞা পালনের কোন লক্ষণই প্রকাশ পাইল না। তখন অতিথি অনুনয়-কণ্ঠে কহিলেন,—

"আপনি না গাইলে কিন্তু বড় দুঃখিত হব।"

হাসি নত মুখ উন্নত করিয়া তাঁহার দিকে চাহিল।

রাজা আবার বলিলেন, "নিশ্চয়ই আপনাকে গাইতে হবে, এত অনুরোধ অগ্রাহ্য করবেন আপনি?" এই দৃঢ়তাপূর্ণঅনুনয়-বাক্য রাজাদেশের ন্যায় তাহার কর্ণে ধ্বনিত হইল। রাজা তক্তা হইতে উঠিয়া বলিলেন, "আপনি এই আসন গ্রহণ করুন।"

হাসি বলিল, "ও তানপুরাটা ত আমার নয়, ওস্তাদের। ছোট তানপুরাতেই আমি গাই।"

রাজা নিজেই তখন দেয়াল হইতে ছোট তানপুরাটি খুলিয়া তক্তার এক ধারে রাখিলেন। হাসি বিনা বাক্যব্যয়ে ধীরে ধীরে তক্তার উপর আসিয়া বসিল, বসিয়া অনবরত তানপুরাটার কান টিপিতে লাগিল। কিছুতেই যে আজ তাহা সুরে মিলিতে চায় না! রাজা হাসিয়া নিজেই তখন তানপুরাটার সুর বাঁধিয়া দিলেন। হাসির হস্তে কিন্তু তবুও তাহার সুর খুলিল না; ম্যাও ম্যাও করিয়া সেটা কাঁদিতে লাগিল। এ কি জ্বালা! কোনও গান ত মনে আসিতেছে না আজ! দিদিমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বল না দিদিমা—কোনটি গাব।" দিদিমা তাহার ধরণ-ধারণ দেখিয়া মনে মনে জ্বলিতেছিলেন, কিন্তু সংযত ভাবেই কহিলেন, "সেই আগমনীটা গাও?"

"কোন্ আগমনীটা? মনে পড়ছে না ত?" শ্যামাচরণ হাসিয়া বলিলেন, "তবে আগমনী থাক, একটা বিসর্জ্জনী গাও।"

কোনও বিসর্জ্জনী গীতও আজ তাহার মনে পড়িল না। কৃষ্ণলাল বলিলেন, "একটি ব্রহ্মসঙ্গীত গাও তবে। 'প্রথম নাম ওঙ্কার' গানটি জান ত?" হাসি ঘাড় নাড়িয়া জানাইয়া দিল যে, "জানি না।"

রাজা বলিলেন, "আপনি কি কোন জাতীয় সঙ্গীত জানেন?" হাসি ইহার উত্তর না দিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা গাচ্ছি, আমার মনে পড়েছে একটা গান!"

বলিয়া গাইতে আরম্ভ করিল,—

আমার বীণা তোমার হাতে
মধুর অতি সাজিছে!
আমার বাণী তোমার
গানে মধুর কিবা বাজিছে—

দুই ছত্র গাইয়াই হাসি গান বন্ধ করিল; কথাও আর মনে পড়িল না, সুরটাও একেবারেই ভুলিয়া গেল, বিরস লজ্জিত ভাবে সে তানপুরা হইতে হাতটা সরাইয়া লইল। রাজা কৃপাপরবশ হইয়া বলিলেন, "থাক্; তবে আজ দেখছি দেবী সরস্বতী আমাদের প্রতি বিমুখ।" বলিয়া রাজা গিলাকুঞ্চিত শুভ্র পিরাণের ক্ষুদ্র পকেট হইতে তাঁহার ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এ কি দশটা বেজে গেছে! আমাকে ত আজ রাত ১১টার ট্রেণ ধরতে হবে। আর আপনারাও নিশ্চয়ই এখনো খান নি; সে কথা ভুলে গিয়ে আত্মসুখেই বিহ্বল হয়ে আছি।"

রাজা দিদিমার দিকে চাহিয়া এই কথা বলিলেন। দিদিমা শশব্যস্তে বলিয়া উঠিলেন, "সে কি কথা, বোসো বোসো, আমরা দেরীতেই খাই।" রাজা দাঁড়াইয়া কহিলেন, "মাপ করবেন, উঠুন শ্যামাচরণ বাবু, বড় দেরী হয়ে গেছে।"

তখন সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। হঠাৎ পাশের টেবিলের দিকে দিদিমার দৃষ্টি পড়িল, এতক্ষণ ফুলের মালার কথাটা একেবারেই তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। শ্যামাচরণের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আজকের দিনে যে, বরের শ্বশুরকে মালা পরাতে হয়—দে না হাসি মালা পরিয়ে!"

হাসি এক গাছি গ'ড়ে মালা উঠাইয়া শ্যামাচরণের দিকে অগ্রসর হইবামাত্র তিনি এক পা দূরে সরিয়া গিয়া কহিলেন, "মোটে ত তোমার খুঁজি দেখছি ঐ একগাছি মালা, আমি ত ঘরের লোক, অতিথিকে ত সর্ব্বাগ্রে সম্মানিত করা উচিত, ওঁকেই দাও মালাগাছি।"

হাসি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাবে মালা-হস্তে তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিল। রাজা নিঃসঙ্কোচে বেশ সহজ ভাবেই স্বয়ং অগ্রসর হইয়া আসিয়া কণ্ঠ বাড়াইয়া দিয়া কহিলেন, "তোমার হাতে ভ্রাতৃবরণ-মাল্য সাদরে গ্রহণ করি। পরিবর্ত্তে কি আর দিব, আর কিছুই ত সঙ্গে নাই—এই আংটিটি আমার স্নেহাশীর্ব্বাদরূপে গ্রহণ কর।"

রাজা আংটি খুলিয়া তাহাকে পরাইয়া দিলেন। শ্যামাচরণ তাহা দেখিয়া মুখ টিপিয়া হাসিলেন। রাজাকে এখানে আনিবার উদ্দেশ্য তাঁহার নিষ্ফল হয় নাই। কৃষ্ণলাল সহসা ওঁ শব্দ ছাড়িয়া এদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, বরকন্যার ন্যায় উভয়কে মাল্যাঙ্গুরিবিনিময় করিতে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, এ ঘটনা তাঁহার মনঃপূত হইল কি না বুঝা গেল না। দিদিমাও হাসিবেন বা কাঁদিবেন, বুঝিতে না পারিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। দ্বারান্তরালে দাঁড়াইয়া গৃহিণীই কেবল আনন্দচিত্তে ভগবানকে স্মরণ করিলেন। মাতার ন্যায় দিব্যদর্শক সংসারে কে আছে!

রাজা যখন বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলেন, দালান শূন্য হইয়া পড়িল, তখন দিদিমার মুখ ফুটিল। তিনি হাসিয়া বলিলেন,—

"অজানা অচেনা কার গলায় মালা দিলি লো রূপসি নাতনি! তোর রাজা এল নাকি?"

আজ আর হাসির হাসি-ঠাট্টা ভাল লাগিল না, —গম্ভীর মুখে বলিল, "দিদিমার সব তাতে ঠাট্টা!"

এই সময় গৃহিণী দালানে আসিয়া দাঁড়াইলেন, আর শচীনও বায়স্কোপ রঙ্গালয়ের রঙ্গদর্শনান্তে এখানে আসিয়া হাজির হইল। দিদিমা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর সঙ্গে ওদের দেখা হোল?"

"হাঁ দেখলুম, তাঁরা গাড়ীতে উঠছেন।"

"কে উনি জানিস?"

শচীন বুঝিল, কাহার সম্বন্ধে এ প্রশ্ন,—আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "জান না নাকি? রাজা যে?"

শচীন প্রসাদপুরে গিয়াছিল তাহা পাঠক জানেন। দিদিমা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন, "রাজা! কোথাকার রাজা রে?"

উত্তর হইল, "প্রসাদপুরের।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

রাজা অতুলেশ্বর কলিকাতা গিয়া ভাগ্যবলে সুখ ও সমৃদ্ধি এই দ্বিবিধ প্রসাদই লাভ করিলেন।

অনেকদিন হইতে তিনি লোকালয়-সংস্পর্শরহিত ভাবে প্রসাদপুরের নির্জ্জন নীড়ে বাস করিতেছিলেন। দেশের রাজনৈতিক বিপ্লব-বারতা সংবাদপত্র হইতে তিনি পাইয়া থাকেন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সমাজবায়ুও যে কিরূপ ঘূর্ণিত-বেগে আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছে, দূর হইতে এতদিন তাহার সুস্পষ্ট স্পর্শ লাভ করেন নাই। হাসিকে দেখিয়া বুঝিলেন যে, তিনি একা নহেন, দেশের ঘরে-ঘরেই সম্ভবতঃ নারী-গঠনের একটা প্রয়াস চলিতেছে। তাঁহার জীবনব্যাপী উদ্দেশ্যের সফলতা যেন হাসিতে তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন। কলিকাতা প্রবাসের এই ক্ষণস্থায়ী ক্ষুদ্র দিনগুলা সুখ-স্মৃতিতে তাঁহার মনে স্থায়িত্ব লাভ করিল!

কিন্তু জ্যোতির্ম্ময়ীর ভাগ্যলিপিতে বিধাতাপুরুষ অন্যরূপ লিখিয়াছিলেন। এ সময়টা রীতিমত কষ্টের ভাবেই তাঁহার কাটিল।

ট্রেণে ডিক্রুজ সাহেবের কুকড়িতে শরৎকুমারের হাতে যে আঘাত লাগিয়াছিল;—তাহার ক্ষত শুকাইবার পরও মাঝে মাঝে সেই স্থানে তিনি বেদনা অনুভব করিতেন।

সম্প্রতি রাখিবন্ধন দিনে হাসপাতালে অস্ত্রচিকিৎসা করিবার সময় দৈবক্রমে ছুরির সামান্য স্পর্শ লাগিবা মাত্র উক্ত স্থান ঈষৎ উন্মুক্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু রাজকুমারী তাঁহার অপেক্ষায় থাকিবেন বলিয়াছেন, যথারীতি ঔষধাদি লাগাইতে গেলে বিলম্ব হইয়া পড়িবে, তিনি হাসপাতালের কার্য্যশেষে তাড়াতাড়ি সামান্য জলপটিতে মাত্র ক্ষত বাঁধিয়া লইয়া চলিয়া গেলেন। বাগানে আসিয়া দেখিলেন যে, কেহই সেখানে নাই। রাজকুমারী গৃহে যাইবার সময় যে গ্রহটির দিকে ফিরিয়া দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, শরৎকুমার না জানিয়াও তাহারি দিকে চাহিয়া

একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, সঙ্গে সঙ্গে আত্ম-তিরস্কারের ক্ষীণ হাস্যরেখা তাঁহার ওষ্ঠাধরে ফুটিয়া উঠিল,—"এত রাত্রি পর্য্যন্ত রাজকুমারী এখানে থাকিবেন, এমন ভুল করিলেন তিনি কি করিয়া ?"

সেই রাত্রেই তাঁহার সামান্য একটু জ্বরভাব হইল; কিন্তু পরদিন সকালে ক্ষতস্থানে যথাবিধি ঔষধাদি লেপনের পর শরীর এতদূর স্বচ্ছন্দ বোধ করিলেন যে, সন্ধ্যাকালে রাজা বাহাদুরকে ট্রেণে পর্য্যন্ত উঠাইয়া দিয়া আসিলেন।

বাড়ী ফিরিয়া কিন্তু অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। রাত্রিকালে জ্বরও বেশ প্রবল হইয়া উঠিল। তখন নিজের চিকিৎসা আর নিজের হাতে রাখা যুক্তিযুক্ত জ্ঞান না করিয়া অন্য ডাক্তারের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সৌভাগ্যক্রমে রাজার এক জন প্রবীন ডাক্তার আত্মীয় এই সময় বায়ু-পরিবর্ত্তন-উপলক্ষে প্রসাদপুরে আসিয়া প্রাসাদেই বাস করিতেছিলেন। তিনি দেখিয়া শুনিয়া শরৎকুমারের সহিত একমত হইলেন। বিষাক্ত কুকড়ির আঘাত হইতেই যে ক্ষতের উৎপত্তি তিনিও এইরূপ অনুমান করিয়া আশ্বাস প্রদানে কহিলেন, 'ক্ষতের লক্ষণে বুঝা যায়' উহা সাংঘাতিক বিষ নহে। সম্ভবতঃ পশুবধের পর কুকড়িখানা ভালরূপ পরিষ্কৃত হয় নাই—প্রধানতঃ এই কারণে, তাহা ছাড়া রোগী সুস্থ সবল বলিয়াও এই বিষয়ে কার্য্যফল প্রকাশে বিলম্ব হইয়া পড়িয়াছে। যাহাহউক ভয়ের কোন কারণ নাই। সামান্য অস্ত্র-চিকিৎসা দ্বারাই রোগী সম্ভবতঃ আরোগ্য লাভ করিবেন।"

অস্ত্রোপচার হইবার পর শরতের অবস্থা প্রথম দিন খুব খারাপ ছিল, দ্বিতীয় দিন অপেক্ষাকৃত ভাল, কিন্তু এখনো আশানুরূপ ভাল নয়। সেবার ত্রুটী নাই.—অনাদির সহিত আরও দুই একটি বালক তাহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত। কিন্তু অনাদি যেরূপ প্রাণপণে সেবা করিতেছে, মাতা ভগিনী স্ত্রী তদপেক্ষা অধিক যত্নে সেবা করিতে পারে না। দ্বিতীয় রাত্রিও কোনরূপে কাটিয়া গেল। তৃতীয় সন্ধ্যায় ডাক্তার প্রফুল্লমুখে ভরসা দিয়া গেলেন।

জ্যোতির্ম্ময়ী অন্যদিনের ন্যায় সে দিনও সেই সময়ে ধীরে ধীরে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। গৃহে তখন অনাদি ছাড়া আর কেহ ছিল না। সে নিকটে আসিয়া বলিল, "আসবে দিদিমণি ঘরে ? কেউ নেই এখন,—এস।"

বালিকা বলিল, "একটু ভাল দেখছ, অনাদি ?"

"নিশ্চয়। আজ আর তেমন ছটফট করছেন না,—তেমন অচেতন-ভাবও নেই, সহজভাবে যেন ঘুম্‌চ্ছেন।—এস না রাণীদিদি ঘরে—আজ দেখে খুসী হবে।"

জ্যোতির্ম্ময়ী শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রোগীর মুখ প্রশান্ত, তিনি যেন কি স্বপ্ন দেখিতেছিলেন.—তন্দ্রাঘোরে বলিলেন, "হাসি তুমি ? আর ঐ তারাটি, ঐ উজ্জ্বল,—তোমার চেয়েও উজ্জ্বল বড় তারাটি—কে ও ? চেন না, হাসি ? জ্যোতির্ম্ময়ী উনি রাজকুমারী।" জ্যোতির্ম্ময়ীর অশ্রুজল সম্বরণ দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়া রোগীর কপালে স্নেহহস্ত বুলাইলেন। সে স্পর্শে শরৎ চক্ষু উন্মীলিত করিলেন, রাজকুমারীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদু-দুর্ব্বল কিন্তু স্বাভাবিক স্বরে কহিলেন, "তুমি রাজকুমারি ?" রাজকুমারী আহ্লাদগদ্‌গদ কণ্ঠে কহিলেন, "চিনিয়াছেন ?" একটু বিস্ময় প্রকাশ করিয়া শরৎ কহিলেন, "চিনব না কেন ? আমার কি হয়েছে ?"

তিনি শয্যায় উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করায় রাজকুমারী তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়া কহিলেন, "কিছু হয় নাই, কিন্তু উঠবেন না, আপনি ঘুমান আমি যাই।"

"যাবেন না রাজকুমারী, বসুন আপনি।" তাঁহার রুগ্ন কণ্ঠ একান্ত অনুরোধপূর্ণ।

অনাদি নিকটে একখানা চৌকি আনিয়া দিল, জ্যোতির্ম্ময়ী বসিলেন। শরৎ বলিলেন, "রাজকুমারি ?"—বলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। জ্যোতির্ম্ময়ী ভীতস্বরে কহিলেন,—"ডাক্তার-দা ?" শরৎ আবার কথা কহিলেন, বলিলেন, "রাজকুমারী বড় দুর্ব্বল, বড় একলা মনে হচ্ছে, আপনার হাতখানি দিন।" রাজকুমারী তাঁহার হাতখানি ধরিলেন, অশ্রুতে সে হাত সিক্ত হইয়া উঠিল; অনাদিও বালকের ন্যায় মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল। জ্যোতির্ম্ময়ীর হাতখানি হাতের মধ্যে ধরিয়া রোগী আবার ঘুমাইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরে হাতখানি আস্তে আস্তে টানিয়া লইয়া জ্যোতির্ম্ময়ী ধীরপদে গৃহত্যাগ করিলেন।

পরদিন শরৎকুমারের জ্বর ত্যাগ হইল;—বিপদ-মেঘ কাটিয়া গেল।

রাজা আসিয়া দেখিলেন, শরৎকুমার সারিয়া উঠিতেছেন। তিনি খবর দিলেন যে, প্রসাদপুরে কন্‌ফারেন্স বসিতে প্রায় মাস খানেক বিলম্ব হইয়া পড়িল। তৎপূর্ব্বে বাঙ্গালার প্রধান প্রধান পলিটিকাল নেতাগণ সকলে এখানে সম্মিলিত হইতে পারিবেন না। শুনিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী খুসীই হইলেন,

তাঁহার মনে হইল, ততদিন শরৎকুমার বেশ সবল হইয়া উঠিতে পারিবেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

জ্যোতির্ম্ময়ী এইবার আপনার দিকে দৃষ্টিপাত করিবার অবসর পাইলেন।—কি দুশ্চিন্তা, কি ঔৎসুক্যের মধ্যে সপ্তাহ কাল কাটিয়া গিয়াছে! এমন কি, ব্যায়ামসমিতি, কনফারেন্স কিছুই এ কয়দিন তাঁহার মনে পড়ে নাই। এ কিরূপ তন্ময়তা! কই পিতার অসুখের সময় ত জ্যোতির্ম্ময়ী এত কাতর হইয়া পড়েন নাই! তাঁহার লজ্জাসঙ্কুচিত মন উত্তর স্বরূপ কহিল, "কোন কারণ ছিল না ত তাহার, পিতার ত জীবনসংশয় হয় নাই।—তবুও—"

ইহার অর্থ,—তবুও এক জন আত্মীয়, পরের জন্য এত কেন ভাবনা! প্রতিদিন ত রোগে-তাপে পৃথিবীর কত লোক মৃত্যু-গ্রাসে পড়িতেছে; কে কার জন্য এত ভাবে? এ স্থলে মৃত্যুর কথাটা মনে আসিবামাত্র বালিকার মনের মধ্যে একটা কষ্টের শিহরণ উঠিল!

তখন দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। আহারাদির পর সোফায় শুইয়া জ্যোতির্ম্ময়ী বিশ্রাম করিতেছিলেন। পাশেই হাতের কাছে একটি টেবিলে. ফলভরা ফুলদানী আর একটির চারিদিকে নানা কাগজ পত্র, বহি সাজান। জ্যোতির্ম্ময়ী তাহার মধ্য হইতে একখানি থিয়সফিষ্ট পত্র টানিয়া লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন। একটা প্রবন্ধ আগাগোড়া শেষ করিয়া তখন তাঁহার হুঁস্ হইল,- এক অক্ষরও মস্তিষ্কে প্রবেশ করে নাই। পাঠিকার স্থূল অক্ষি বহির পাতায় নিবদ্ধ ছিল বটে—কিন্তু সূক্ষ্ম আঁখি ঘুরিতেছিল অন্য ঘরে। আজ ইচ্ছা করিয়াই প্রাতঃকালে শরৎকুমারকে রাজকুমারী দেখিতে যান নাই,—ভাল আছেন ত তিনি! তিনি কি জ্যোতির্ম্ময়ীর প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহাকে দেখিতে চাহিতেছিলেন?

এ কিরূপ প্রশ্ন? রাজকুমারী তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল বলিয়া তিনিও কি ব্যাকুল থাকিবেন? এ কি পিপাসা! এখন ত তিনি আরাম হইয়া উঠিয়াছেন—এখনো তাঁহার চিন্তাতেই জ্যোতির্ম্ময়ী মগ্ন কেন? তাঁহার সন্নিধ্যলাভের জন্য কেন তিনি এত তৃষাতুর? এ কি সর্ব্বগ্রাসী ভাব? ইহাই কি প্রেম?

ক্ষতি কি? প্রেমদেবতাকে মনে মনে পূজা করিতে ক্ষতি কি? কিন্তু ইহার পরিণাম? এই আকাঙ্ক্ষা—এই চিন্তা, এই পূজার পরিণাম? লোকে বলে বিবাহ। জ্যোতির্ম্ময়ী হাতের বহিখানি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন।—"না তাহা হইতে পারে না—পারে না,—আমি জ্যোতির্ম্ময়ী—চিরকুমারীব্রত-গ্রহণ করিয়াছি—দেশের জন্য জীবনদান করিয়াছি—আমি ব্যক্তিবিশেষের পরিণীতা পত্নী!—অসম্ভব,—অসম্ভব!" একবার তিনি অতি চুপে চুপে—স্বগত উচ্চারণ করিলেন, "মিসেস্ চৌধুরী।" "তাঁহার চিন্তা-মলিন মুখে সহসা হাসি ফুটিয়া উঠিল। ঘরের বারান্দায় খাঁচায় রক্ষিত পোষা কোকিলটি এই সময়ে কুহু কুহু করিয়া উঠিল, বাহিরের আম-বাগানে দুই চারিটা কোকিল এক সঙ্গে ইহার উত্তর গাহিল; সহসা—কুহু-কুহুতানে আকাশ ভরিয়া গেল।—জ্যোতির্ম্ময়ী মনে মনে বলিলেন,—"বনের পাখী তোমরা খাঁচার পাখীকে ধরা দিতে চাও ত দাও, আমি কিন্তু ধরা দিব না।" তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, আজ সন্ধ্যাতেও শরৎকুমারকে দেখিতে যাইবেন না। ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনস্কভাবে জ্যোতির্ম্ময়ী ফুলদানীর একটি ফুল তুলিয়া লইয়া আঘ্রাণ করিলেন। ঠিক দুইটার সময় কুন্দ গৃহে আসিয়া হাজির হইল। আজই সকালে সে বাড়ী হইতে ফিরিয়াছে; হাসির চিঠিখানা, রাজকুমারীর হাতে দিয়া কহিল,—

"এই লও রাজকুমারী। চিঠিখানি তোমার হাতে ধ'রে দিতে আমি প্রতিশ্রুত আছি। আজ দায়মুক্ত হলুম।"

জ্যোতির্ম্ময়ী চিঠিখানা গ্রহণ করিলেন, কুন্দ থিয়সফিষ্ট পত্রখানা কুড়াইয়া যথাস্থানে রাখিয়া, আলমারি খুলিয়া রাজকন্যার বৈকালিক সাজসজ্জার আয়োজনে রত হইল। আজ তাঁহাদের ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ী চা-পানের নিমন্ত্রণ।—

হাসির চিঠিখানা পড়িয়া জ্যোতির্ম্ময়ী বলিলেন,—

"সুগুণা দেবী—কে কুন্দ দিদি? আমাকে তিনি এত প্রশংসা ক'রে লিখেছেন—লজ্জা করে যে।"

কুন্দ বলিল, "ও আমাদের হাসি। সকলে ওকে হাসি ব'লেই ডাকে। এমন সুন্দর মেয়েটি, কি বলব! তাকে যদি দেখ রাজকুমারী ত তুমিও ভাল বাসবে।"

শরৎকুমার প্রলাপের ঘোরে যে হাসির নাম উচ্চারণ করিতেন, সেই হাসি নয় ত এ? একটা

কিরূপ অসুখ-চাঞ্চল্য রাজকন্তার মন দিয়া বহিয়া গেল।—ইহা কি ঈর্ষার আন্দোলন?

জ্যোতির্ম্ময়ী বলিলেন, "বিয়ে হয় নি বোধ হয় তাঁর?"

"না। কোন বরকেই যে তার বাপমার মনে ধরে না। যা হ'ক, এ বার শুনছি একটি মনের মত পেয়েছেন, সম্বন্ধ চলছে তার সঙ্গে।"

"কে সে ভাগ্যবান?" জ্যোতির্ম্ময়ীর বক্ষে শোণিতপ্রবাহ সহসা বন্ধ হইয়া গেল—এই প্রশ্নের উত্তরে শরৎকুমারের নাম শুনিবার জন্ম তিনি অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। কুন্দ বলিল, "তিনি আপনাদেরই আত্মীয়, বিজনকুমার রায়।"

বালিকার রুদ্ধনিশ্বাস ধীরে ধীরে মুক্তি লাভ করিল, সে হাসিয়া কহিল, "তা বেশ, মন্দ হয় না! আমি বরণ ক'রে ক'নেকে ঘরে তুলে নেব। তোমাদের হাসি, ডাক্তারদা'র কে হন কুন্দদিদি?"

"জানিনে ঠিক, একটা দূর সম্পর্ক থাকতে পারে। কই তার কথা ত হাসির কাছে কখনো শুনি নি। তবে আমার সঙ্গে হাসির দেখা শুনা খুব কমই হয়, বেশী কথা ক'বার অবসরই ঘটে না।"

"সম্বন্ধের কথা কার কাছে শুনলে?"

কে জানে, কেন জ্যোতির্ম্ময়ীর মন বলিতেছিল—"খবরটা ঠিক নয়।"

কুন্দ কয়েকখানা কাপড় ও জ্যাকেটের সুট মিলাইতে মিলাইতে বলিল—

"ও কথা অবশ্য হাসির কাছে শুনি নি। বিদায় নিতে যাবার সময় দিদিমা বলেছিলেন। বিকালের জন্য কোন্ কাপড়খানা রাখব রাজকুমারি?"

"দেখ কুন্দদিদি, কতবার তোমাকে বলেছি, ও কথা আমাকে জিজ্ঞাসা ক'র না, তোমার যেখানা ইচ্ছে—"

"না না বলতে হবে, কোন্‌খানা রাখব।"

"আচ্ছা, শাদা রঙের যা হয় একখানা রাখ।"

"রাজা বাহাদুর কিন্তু রঙিন্ কাপড়ই পছন্দ করেন।"

"তবে তাই রাখ।"

"ফিকে নীল বা গোলাপী কি দেব?"

"তোমার সঙ্গে আর পারা যায় না—আচ্ছা, নীলই রাখ। চিঠিখানা পড়েছ কুন্দদিদি?"

"না। মতির মালা আর—"

"সে হবে এখন; চিঠিখানা আগে পড় না। কলকাতায় গিয়ে সর্ব্বাগ্রে এবার তোমার হাসির সঙ্গেই দেখা করব।"

"তখন সে তোমারও হাসি হয়ে যাবে।"

"মতির মালা ও ব্রেসলেট জোড়াই তা হ'লে বার ক'রে রাখছি। অন্য কিছু ত তুমি পরতে ভাল বাস না।"

এ কথার কোন উত্তর না দিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী হাসির চিঠিখানা বাড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "এই নেও।"

কুন্দ নিকটে আসিয়া পত্রখানা লইয়া তাহাতে নেত্রপাত করিল। জ্যোতির্ম্ময়ী বলিলেন, "চেঁচিয়ে পড় না কুন্দদিদি।" কুন্দ পড়িতে লাগিল—

সম্মাননীয়া রাজকুমারি—

আপনার সহিত আমার চাক্ষুষ আলাপ নাই, কিন্তু আপনার গুণের কথা এত শুনিতে পাই যে, না দেখিয়াও আপনাকে ভাল বাসিয়াছি। আপনাকে বড় দেখিতে ইচ্ছা করে। যখন কলিকাতায় আসিবেন, একবার দেখা দেন ত পরমানন্দ লাভ করিব। সত্য কথা বলিতেছি, বিশ্বাস করিবেন।

ইচ্ছা করে আপনার নিকট আমিও দেশব্রতমন্ত্র গ্রহণ করি, আমার শক্তি অতি সামান্য, কিন্তু আপনার মত গুরুর উপদেশে সেই ক্ষুদ্র শক্তিও সার্থক হইয়া উঠিতে পারে।

আপনি বয়সে ছোট হইয়াও জ্ঞান-বুদ্ধিতে আমার অনেক বড়, তাই পরিপূর্ণ প্রীতিভক্তি ভরে আপনাকে নমস্কার করিতেছি, আমাকে ছোট বোন বলিয়াই মনে করিবেন।

আপনার গুণমুগ্ধা ভগিনী-
শ্রীসুগুণা দেবী

পুঃ—

শরৎ-দা যদি এখনো সেখানে থাকেন ত আমার নমস্কার দিবেন।

চিঠিখানি পড়া হইলে কুন্দ তাহা রাজকন্যাকে ফিরাইয়া দিয়া কহিল, "সুন্দর লিখেছে. চিঠিখানি প'ড়ে যেন ঠিক চোখের উপর তাকে দেখতে পাচ্ছি।"

"ভাষার ঘনঘটা নেই এইটে আমার বড় ভাল লেগেছে।"

"কেবল তাই কি? চিঠিখানি আগাগোড়া আন্তরিক শ্রদ্ধার ভাবে পূর্ণ, সেইটেই আমার বেশী ভাল লাগছে।"

"এই শ্রদ্ধা দিয়ে—তিনিই আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন।"

"যেমন গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজো সেই রকম আর কি!"

"উপমাটা এখানে ঠিক সঙ্গত হ'ল না কুন্দদিদি, পণ্ডিত মহাশয় শুনলে নিশ্চয়ই প্রতিবাদ করতেন।"

এই সময় এক জন দাসী "পণ্ডিত মহাশয় আইছেন গো!" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে গৃহপ্রবেশ করিল। বাঙ্গালী-ঘরে রাজা সম্রাটের আলয়েও দাসী-চাকরের আদব কায়দার বড় একটা আড়ম্বর দেখা যায় না।

পণ্ডিত মহাশয়ের নাম শুনিয়া কুন্দ বলিয়া উঠিল, "নাম করতেই হাজির তিনি, লোকটার আয়ু দেখছি অনেক।"

জ্যোতির্ম্ময়ী দাসীকে বলিল, "আচ্ছা লক্ষ্মীর মা, তোমাকে কতবার বলেছি অত চেঁচিয়ে কথা কবে না,—কিছুতে কি শিক্ষা হবে না তোমার?"

লক্ষ্মীর মা শিরে করাঘাত করিয়া কহিল, "হায় রে কপাল! তোমারে ঘরে আইনা শিখাইলাম আমি, আর আমারে শিখাইতে চাও এখন তুমি—সেদিন-কার খুকী, পলতে দিয়ে যারে কত দুধ খাওয়াইয়াছি! ঘোর কলিকালই হইছে বটে।"

"বেশ বেশ আর বকতে হবে না, তোমার ও নাকি গান আমার ভাল লাগে না। যাও, পণ্ডিত-মহাশয়কে বল গিয়ে, আমরা আসছি এখনি।"

লক্ষ্মীর মা তবুও বিড় বিড় করিয়া বকিতে বকিতে সোনার তাগা পরা হাত দুলাইয়া চলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সোনার কণ্ঠমালা ও কোমরের রূপার চাবি-শিকলিও দুলিয়া উঠিল।

জ্যোতির্ম্ময়ী পণ্ডিত মহাশয়ের নিকটে যাইবার অভিপ্রায়ে কুন্দের সহিত বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, এই সময় অনাদির আবির্ভাব হইল। তাহাকে দেখিয়া রাজকন্যার বুকটা কাঁপিয়া উঠিল, প্রথমেই মনে হইল,—ভাল আছেন ত তিনি? কিন্তু কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই অনাদি কহিল, "একটা কথা আছে দিদিমণি।"

রাজকন্যা কুন্দকে বলিলেন, "যাও কুন্দদিদি, তুমি পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে ব'সে একটু গল্প কর গে, আমি এখনি আসছি।"

কুন্দ চলিয়া গেলে জ্যোতির্ম্ময়ী কণ্ঠাগত ভাষা রসনামুক্ত করিয়া দিয়া কহিলেন, "ডাক্তার-দা ভাল আছেন ত অনাদি-দা?"

"হাঁ ভাল আছেন,—কিন্তু তুমি আজ সকালে তাঁকে দেখতে যাও নি—তাই তিনি বড় ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন। তিনি ভাবছেন—তোমার বুঝি কোন অসুখ করেছে—তিনি তোমাকে দেখতে আসতে চান।" জ্যোতির্ম্ময়ীর পণ ভঙ্গ হইল—বলিলেন, "না না তাঁর আসতে হবে না—চল, আমিই গিয়ে এখনি তাঁকে একবার দেখে আসি।"

পণ্ডিতমহাশয় যে তাঁহার অপেক্ষায় আছেন, সে কথা জ্যোতির্ম্ময়ী একেবারেই ভুলিয়া গিয়া অনাদির অগ্রবর্ত্তী হইয়া চলিলেন।

রাজকুমারী গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র—তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শনার্থ শরৎকুমার শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অসুস্থতার পর এই প্রথম তাঁহার স্থির হইয়া দাঁড়াইবার প্রয়াস, পা কাঁপিয়া উঠিল; দেহ ঈষৎ টলমল করিতে লাগিল। কিন্তু এই কম্পন কি কেবলই দুর্ব্বলতা-জনিত, কিংবা আনন্দের অধীরতাও ইহার মধ্যে অনেকখানি লুক্কায়িত ছিল? রাজকুমারী উদ্বিগ্নভাবে অনুনয়ের স্বরে বলিলেন, "কি করেন ডাক্তার-দা,—বসুন বসুন—দাঁড়াবেন না?"

"আমি ভাল হয়ে উঠেছি রাজকুমারী।"

"তবুও বসুন; এখনো বিছানা থেকে ওঠবার অবস্থা আপনার ঠিক হয় নি,—পা কাঁপছে আপনার।"

"আপনি বসুন আগে।" প্রত্যুত্তরে এইরূপ অনুরুদ্ধ হইয়া রাজকুমারী আর কথা বাড়াইলেন না; শরৎকুমারের শয্যার নিকটেই তাঁহার জন্য অনাদি একখানি চৌকি আগে হইতেই রাখিয়া দিয়াছিল, সেইখানিতে বসিয়া পড়িলেন। শরৎকুমার তখন শয্যায় উপবিষ্ট হইয়া বলিলেন, "আপনি সকালে আসেন নি—তাই মনে হচ্ছিল—"

শরৎ হঠাৎ থামিয়া গেলেন, রাজকুমারী বলিলেন, "না, আমার কোন অসুখ করে নি,—ভালই আছি;—আপনি ত ভাল হয়ে উঠেছেন—তাই আর—"

রাজকুমারীরও কথাটা এইখানে বাধিয়া গেল—কেন না, যাহা বলিতে যাইতেছিলেন, তাহা সত্য নহে। শরৎকুমার তাঁহার পালায় রাজকন্যার অসম্পূর্ণ কথা সম্পূর্ণ করিয়া দিয়া কহিলেন,—

"তাই আর আসার দরকার মনে করেন নি?" বলিতে বলিতে তাঁহার রুগ্ন মুখ—একটা ব্যথার ভাবে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। জ্যোতির্ম্ময়ীর হৃদয়-তন্ত্রীতেও সে বেদনার সুর ধ্বনিত হইল। তিনি কথাটা চাপা দিবার অভিপ্রায়ে হাসির চিঠিখানা শরৎকুমারের হাতে দিয়া বলিলেন, "দেখুন দেখি চিঠিখানা পড়ে ডাক্তার-দা; আপনার ভাল লাগবে মনে ক'রে এনেছি।"

শরৎকুমার চিঠিখানি গ্রহণপূর্ব্বক পড়িয়া রাজকন্যার হাতে প্রত্যর্পণ করিয়া কহিলেন, "যিনি লিখছেন—তিনি দেখছি গুণগ্রাহী।"

"তিনি আপনাকে নমস্কার জানিয়েছেন—দেখেছেন ত? কি উত্তর দেব?"

"ফিরিয়ে দেবেন নমস্কারটা।" এমন ঔদাসীন্যের সহিত কথাটা শরৎকুমার বলিলেন যে, জ্যোতির্ম্ময়ীর পূর্ব্বগঠিত বিশ্বাস বেশ একটু টলমল করিয়া উঠিল। বলিলেন, "চিঠি প'ড়ে ত মনে হয়—আপনার সঙ্গে তাঁর বিশেষ আত্মীয়তা আছে।"

"ভুল আপনার।—মোটেই না।" বিদায়-দিনে হাসির প্রত্যাখ্যানের কথা মনে জাগিয়া উঠিল,—কিন্তু আজ আর সে স্মৃতিতে তাঁহার দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল না। শরৎকুমার নিজেই যেন তাহাতে একটু বিস্মিত হইলেন। জ্যোতির্ম্ময়ী বলিলেন, "আপনার আত্মা কিন্তু চুপি চুপি অন্য কথাই প্রকাশ করেছে।"

"কি রকম?"

"অসুখের সময় অনেকবারই হাসির নাম আপনার মুখে শুনেছি।"

শরৎকুমারের রক্তহীন পাংশুমুখে সহসা লজ্জার আভা চমকিয়া গেল! "সত্য না কি? প্রলাপের ঘোরে কি কথা না জানি শরৎকুমার বলিয়াছেন—আর রাজকুমারী তাহা শুনিয়া কি না জানি মনে করিয়াছেন, ছিঃ—ছিঃ!" সব কথা রাজকন্যাকে খুলিয়া বলিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল। কিন্তু চন্দ্রালোকে বা ম্লান দীপশিখার নিকট বসিয়া যে সব কাহিনী বলা যায়,—দিনের ফ্যাক্‌-ফ্যাকে উজ্জ্বল আলোক তাহার পক্ষে প্রতিকূল।—তাহা ছাড়া অনাদি ছোকরা ঘরের কোণে বসিয়া আছে, যদিও সে নভেল পাঠে মগ্ন—তবুও ত এক জন তৃতীয় ব্যক্তি ঘরে উপস্থিত।

শরৎকুমার মৌন হইয়া রহিলেন,—তাঁহার ভাষা এই সঙ্কটের সময় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল,—ঘড়িটাও কি ছাই এই মুহূর্ত্তে তাঁহার শত্রুতা করিবে—সশব্দে এই সময় ৪টা বাজিয়া উঠিল। জ্যোতির্ম্ময়ী উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "উঠি তবে আজ, ৪টে বেজে গেল, আমাদের আবার আজ চায়ে যেতে হবে। একটু সাবধানে থাকবেন, এখনও দুর্ব্বল আছেন।"

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই বালিকা চলিয়া গেল। শরৎ চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িলেন। একটা কষ্টের অবসাদে তাঁহার দুর্ব্বল শরীর একান্ত ক্লান্তিপূর্ণ হইয়া উঠিল। যে সত্য এত দিন তাঁহার নিকট লুক্কায়িত ছিল—আজ তাহাতে তিনি সচেতন হইয়া উঠিলেন, বুঝিলেন, অসুখের পূর্ব্বে যে তিনি ছিলেন—আজ সে-তিনি নাই। হাসির যে হাসিটুকু তিনি এত দিন হৃদয়নিভৃতে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, আজ ত আর তাহার সন্ধান পাইতেছেন না। জ্যোতির্ম্ময়ীর জ্যোতিঃসাগরে তাহার শেষ রশ্মিটুকুও যে সহসা মিলাইয়া পড়িয়াছে! কেমন করিয়া কোন্ মুহূর্ত্তে এ ঘটনা ঘটিল, তাহা তিনি বুঝিলেন না, এইটুকু শুধু বুঝিলেন যে, জ্যোতির্ম্ময়ী এখন তাঁহার মনে একমাত্র জাগ্রত দেবতা!

অদৃষ্টের এ কি নিষ্ঠুর উপহাস! তিনি হাসিকে ভুলিতে চাহিতেছিলেন সত্য, কিন্তু এমনি করিয়া তপ্ত হইতে তপ্ততর অনলদাহের মধ্যে ডুবিয়া কি? হাসিকে যখন তিনি ভাল বাসিয়াছিলেন, তখন তাহাকে দুষ্প্রাপ্য মনে করেন নাই, সেই জন্য তাহাকে আত্মসমর্পণ করিতে কখনও তাঁহার কুণ্ঠা বোধ হয় নাই, কিন্তু জ্যোতির্ম্ময়ী যে তাঁহার পক্ষে একান্তই দুর্লভ বস্তু; তাঁহার কাছে আত্মবেদনা জানাইতেও যে সাহস নাই, জ্যোতির্ম্ময়ী স্বর্গের তারকা—আর শরৎকুমার মর্ত্ত্যের মানব! চিরদিন এই অনলদাহ নীরবে তাঁহাকে হৃদয়মধ্যে বহন করিতে হইবে যে!

"ভগবান, এমন নিষ্ঠুর তুমি! অথবা ইহাই তোমার করুণা? গৃহী হইবার জন্য আমাকে তুমি সৃষ্টি কর নাই। এ জীবন পরার্থে দান করিতেই তুমি ইঙ্গিত করিতেছ। তাহাই হউক, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক, বল দাও প্রভু - বল দাও।"

জ্যোতির্ম্ময়ীও বেশ স্বচ্ছন্দমনে গৃহে ফিরিলেন না। অন্য দিন শরৎকুমারের অজ্ঞাতে তাঁহার উচ্ছ্বসিত আনন্দ-বিকিরণ হইতে তিনি যে কণিকারাশি কুড়াইয়া আনেন, সেই আলোকে অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহার হৃদয় আলোকিত করিয়া রাখে, কিন্তু আজ তাহার পরিবর্ত্তে একটা অন্ধকার বেদনা-ভার লইয়া সেখান হইতে তিনি বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের দুজনের মধ্যে এ কি কুয়াসার ব্যবধান আজ! তাঁহার অন্তঃপ্রাণ "হায় হায়" করিয়া উঠিল, কিন্তু তিনি তাহাকে সবলে কশাঘাত করিয়া—শাসন-বাক্যে বারবার করিয়া কহিতে লাগিলেন, "ভালই ত সে ভালই! রে অবোধ মন,—তুমি এত দিন যাহা চাহিয়াছিলে, ভগবান আজ তাহা গ্রাহ্য করিলেন, এখন দুঃখ করিলে চলিবে কেন? তাঁহার মঙ্গলদান কৃতজ্ঞহৃদয়ে গ্রহণ করিয়া সুখ অনুভব কর। ব্যক্তিবিশেষের জন্য হা হুতাশ করা তোমার

জীবনের উদ্দেশ্য নহে। তুমি দেশের কাজে জীবন দান করিয়াছ, ইহা ভুলিও না গো—ভুলিও না।”

জ্যোতির্ম্ময়ী গৃহে ফিরিয়া দেখিলেন, কুন্দ উপস্থিত নাই,—যে দাসী তাঁহার অপেক্ষায় ছিল—সে বলিল, “কুন্দ-দিদি এসে চ'লে গেলেন,—আপুনি এলে ডাক্‌তে বলেছেন।” জ্যোতির্ম্ময়ী বলিলেন, “না, ডাক্‌তে হবে না—।” দাসী কাঁকুইখানা লইয়া তাঁহার চুল আঁচড়াইতে গেল। জ্যোতির্ম্ময়ী তাহাকে নিরস্ত করিয়া নিজেই তাড়াতাড়ি কোনরূপে দীর্ঘ কেশদাম সংবৃত করিয়া বাঁধিয়া লইলেন। তাহার পর যথাসাধ্য বিনাড়ম্বরে এবং অল্প সময়ের মধ্যে সাজপর্ব্ব সমাধা করিয়া লইয়া পিতার নিকট ছুটিলেন। যাইবার সময় দাসীকে বলিয়া গেলেন, “পণ্ডিত-মহাশয়কে গিয়ে বল, আজ আর পড়ব না, —তিনি ঘরে যেতে পারেন।”

পিতৃকক্ষে আসিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী দেখিলেন, রাজা তখনো প্রস্তুত নহেন, তিনি বেশ মগ্নভাবেই খাতার উপর কলম চালাইতেছিলেন। তাঁহার জন্য পিতা অপেক্ষা করিয়া নাই দেখিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইলেন,—কোন কথা না কহিয়া ধীরপদে আসিয়া তাঁহার স্কন্ধের উপর হাত রাখিয়া দাঁড়াইলেন। রাজা তখন মুখ তুলিয়া ঘড়ির দিকে চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, “তাই ত—৪টে বেজে গেছে যে! আচ্ছা তুই একটুখানি অপেক্ষা কর্‌ রাণী, আমি এখনি আসছি।” জ্যোতির্ম্ময়ী দেখিলেন,—টেবিলের উপর খুব দামী ফ্রেমে আঁটা কালীঘাটের দুই পয়সা মূল্যের একখানি কালীর পট। সেই ছবিখানি হাতে লইয়া তিনি মনোনিবেশপূর্ব্বক দেখিতে লাগিলেন।—

এ কি ভীষণ মূর্ত্তি জগদম্বা প্রকৃতির। শিবকে পদদলিত করিয়া তিনি এখন ভয়ঙ্করা,—নিষ্ঠুরা! কিন্তু প্রকৃতির পক্ষে এই নিষ্ঠুর ভাবেরও যে প্রয়োজন। প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার জন্যই অন্যায় দমনকারিণী প্রকৃতি এখন মুণ্ডমালিনী, ভীমা!

দেয়ালে আধুনিক কোন চিত্রকর-অঙ্কিত মাতৃমূর্ত্তির একখানি পট টাঙ্গান ছিল। নয়ন তুলিয়া একবার মুগ্ধ দৃষ্টিতে তিনি তাহার দিকে নিরীক্ষণ করিলেন। বিশ্বমাতার এই স্নেহ-করুণারূপিণী ভাব কি সুন্দর!—তাঁহার এই ভুবনমোহিনী মাধুরীই ত প্রয়োজনে করালী কালীরূপে রূপান্তরিতা হইয়াছে! বালিকার জীবনের মধুরভাবও প্রয়োজনের পদতলে সম্ভবতঃ এইরূপ বিসর্জ্জন দিতে হইবে, —মাতৃরূপা হইবার সৌভাগ্য লইয়া ত সকলে জন্ম গ্রহণ করে না!”

জ্যোতির্ম্ময়ীর কোমল-মধুর স্বভাবের অংশে একটা দারুণ শিহরণ উঠিল,—তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। রাজা সেই সময় প্রস্তুত হইয়া দ্বারদেশে পদার্পণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, “ঐ পটখানি মা আমাকে বাঁধাবার জন্যে দিয়েছিলেন, বেঁধে এসেছে, তাঁকে পাঠাতে ভুলে গেছি।” জ্যোতির্ম্ময়ী ছবিখানি টেবিলে রাখিয়া কহিলেন, “এখন এইখানেই থাক্‌। ফিরে এসে আমি ঠাকুরমার কাছে নিজেই এখানি নিয়ে যাব।”

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

পণ্ডিত মহাশয় ও কুন্দবালার গল্পও বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল। রাজকুমারী পড়িতে না আসায় দুজনের কেহই ক্ষতি বিবেচনা করেন নাই! ব্যায়াম-উৎসবে কুন্দ উপস্থিত না থাকায় ষোল আনা উৎসবই যে শাস্ত্রীমহাশয়ের পক্ষে বৃথা গিয়াছে, এই কথাই তিনি পুনঃ পুনঃ বলিতেছিলেন। এই পৌনরুক্তিতে অসহিষ্ণু-স্বভাব কুন্দবালার যে ধৈর্য্যচ্যুতি হইতেছিল না—ইহাই আশ্চর্য্য!

পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার বিলম্বিত দাড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে শতবারের পর আর একবার বলিলেন, “সত্যি বলছি কুন্দ, তুমি ছিলে না—আমি দুই চক্ষে অন্ধকার দেখেছি।”

কুন্দ বলিল, “কিন্তু এতে আপনি দুঃখ করছেন কেন? দুঃখ করবার কথা ত আমারি। এমন মহাসমারোহ আমি চর্ম্মচক্ষে দেখতে পেলাম না! আপনি বরঞ্চ সেদিনের বিবরণ খুঁটিনাটি ক'রে বর্ণনা করুন—আমি কানে শুনেও তৃপ্তিলাভ করি।”

“তা যদি বল,—এমন নূতন কিছু বলার কথা নেই,—সবই গতানুগতিক অনুবৃত্তি; অভিনন্দন,—অভিভাষণ,—ব্যায়াম আর বাহবা প্রদান,—এই চতুর্ব্বিধ বিধানেরই আবর্ত্তন বিবর্ত্তন;—তবে—”

“থামলেন যে—? বলুন না!”

“একটি মাত্র আকস্মিক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটেছিল।”

“বলুন না! আগ্রহে যে দম ফেটে উঠলো! দেখবেন, শেষে নারীবধের পাতক লাগবে আপনাকে।”

"আহা! ও কি কথা কুন্দ! শোন, আগেই বোধ হয় শুনেছ,—রাজকুমারী শরৎ ডাক্তারকে মাল্যদান করেছিলেন—"

"এই কথা! কিছু ত আশ্চর্য্য হলুম না। যে জেতে, তাকে মাল্যদান করাই ত আমাদের দেশের সনাতন পদ্ধতি।"

"হ্যাঁ, স্বয়ম্বরা হওয়াও আমাদের দেশের সনাতন পদ্ধতি,—এ স্থলে ফাঁকা মাল্যদানটাই কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছে।"

"সোজা লাঠি গাছটাকেও এমন সহজে আপনারা বাঁকিয়ে—ধনুক ক'রে তোলেন,—আশ্চর্য্য!"

"আরে সংসারটাই এই রকম—লোকের মুখ তুমি ত চেপে রাখতে পার না!"

"বেশ,—লোকে যা বলে বলুক,—আপনি আর এ নিয়ে মাথা ব্যথা করেন কেন?"

"রামঃ? মোটেই না। আমি কেবল তোমাকে বলছি।—দেখ কুন্দ, তোমাকে কোন কথা না ব'লে আমি থাকতে পারিনে,—তুমি ত কই আমাকে কিছু বল না?"

"কিছু ত বলার নেই আমার।"

"তা ত সত্যি! বিশেষ এবার যে রকম গম্ভীর দেখছি, তাতে মনে হয়—যেন মৌনব্রত গ্রহণ করেছ।"

কুন্দ হাসিয়া বলিল, "জীবনটা কি হেসে-খেলে কাটাবার জিনিষ পণ্ডিত-মহাশয়?"

"জীবনটা কাজ করবার জিনিষ,—কিন্তু হেসে-খেলেই কাজ ভাল হয়।

"ভিন্ন মতও ত থাকতে পারে?"

"অবশ্যই। পৃথিবী যে বিপুলা,—তাতে সন্দেহ নেই।"

পণ্ডিত-মহাশয়ের হস্তে তাঁহার বিপুলশ্মশ্রু প্রবল ভাবে আন্দোলিত হইতে লাগিল।

কুন্দ তাহা দেখিতে দেখিতে হাসিমুখে বলিল, "রাজকুমারী ত এখনও এলেন না,—একবার খোঁজ নিয়ে আসি।"

"দরকার কি কুন্দ! তাতে তুমি শুদ্ধ অন্তর্দ্ধান হয়ে পড়বার আশঙ্কা আছে—"

কুন্দ সে অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়া গেল,—কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া পণ্ডিত-মহাশয়ের অন্ধকার মুখ হাস্যোজ্জ্বল করিয়া কহিল, "রাজকুমারী ঘরে নেই! বোধ হয় রাজাবাহাদুরের কাছে গেছেন।"

"পাশের ঘরও বেশী দূরে নয় কুন্দ।"

"দেখুন পণ্ডিত-মশায়, এ রকম ঠাট্টাঠুট্টি করলে আমি কিন্তু চ'লে যাব।"

"আরে ঠাট্টা কে করছে? আমি জন্মে কখনও কোন বিদূষকের পাঠ অভিনয় করি নি। কখনও তা পারব ব'লে কল্পনাও ছিল না। তবে আজ তোমার প্রশংসাবাদে প্রাণের মধ্যে হঠাৎ একটা আশাতীত আশার উদ্রেক হয়ে উঠছে বটে! কে জানে, হয় ত কোন দিন গোপাল ভাঁড়ের আসনও অধিকার ক'রে বসতে পারি। কিন্তু আপাততঃ যা বলছি, এটা পরিহাস নয়। রাজকুমারীর মনের গতিক বড় ভাল মনে হচ্ছে না। পড়া-শুনা ত বন্ধ হয়েছে, সমিতিটা কবে বন্ধ হয়, এখন এই ভয়! ছেলেদের উপর হুকুম জারি হয়েছে যে, তারা যেন বিলিতি জিনিষ ধ্বংস না করে—কেন না ডাক্তার এটা ভাল বলেন না।"

"রাজকুমারীকে আমি এই কথা বলব।"

"রক্ষা কর—ক্ষেপলে কুন্দ?"

"না ক্ষেপি নি,—আমি তাঁকে বলব—তিনি যে পথে চলেছেন—সেটা প্রকৃত দেশোন্নতির পথ নয়। এ কাজে গুরুর উপদেশ চাই।"

"আঃ তাই বল। তা কুটুমির মত গুরু পেলে মন্দ হয় না বটে। পেয়েছ নাকি?"

"মনে ত হচ্ছে।"

"সর্ব্বনাশ! গুরুদেব তোমার স্কন্ধে ভর করলে আমরা দাঁড়াই কোথায়? কিন্তু ব্রাহ্মেরা ত আমি জানি গুরু মানেন না?"

"কেন মানবেন না? এত দিন ত আপনাকেই গুরু ব'লে মেনেছি!"

"তবু ভাল, কিন্তু গুরু ত জীবনে এক জনই হয়। তবে তোমাদের রীতি স্বতন্ত্র হ'তে পারে,—তোমরা একাধিক স্বামীও গ্রহণ ক'রে থাক।"

"দেখুন পণ্ডিত-মশায়, ও-রকম রসিকতা করবেন না—আমার ভাল লাগে না।"

কুন্দের নয়ন ক্রোধদীপ্ত হইয়া উঠিল—সে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। পণ্ডিত মহাশয় কাতর অনুনয় করিয়া কহিলেন, "ক্ষমা কর কুন্দ, এটা যে দোষের কথা তা আমি বুঝতে পারি নি; স্বামি-গ্রহণে দোষ হয় না, আর বল্লেই দোষ হয়? ব'স, ব'স, কুন্দ, রাগ কোরো না,—"

কুন্দ বসিয়া কহিল, "আপনার যে আজ কি হয়েছে—সব কথাই বিকৃত ক'রে বলছেন;—সত্যি কিন্তু আমার বড় রাগ ধরছে।"

"রাগ কোর' না কুন্দ—তা হ'লে ম'রে যাব।—

তোমাদের অভিধানে কোন্ কথা যে শ্লীল এবং কোন্ কথাই বা অশ্লীল, সমস্ত পাণিনি শাস্ত্র উল্টে তা আমার কাছে দুজ্ঞের্য় র'য়ে গেছে। এ সম্বন্ধে আমি একেবারেই গণ্ডমূর্খ,—একটা গল্প করব কুন্দ ?"

কুন্দ চুপ করিয়া রহিল,—তাহার আজ্ঞার অপেক্ষা না করিয়াই পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "দেখ, একবার আমি একটি ব্রাহ্মবাড়ীতে পুরাণ-ব্যাখ্যা করতে যাই।"

ঐটেই যা আপনার আসে—কিন্তু সমিতি হওয়া পর্য্যন্ত পুরাণপাঠও ত আপনি ছেড়ে দিয়েছেন।"

"তবু ভাল,—আমারও এক জন মল্লিনাথ আছে; কিন্তু তুমি যাই বল, মেমসাহেব সে দিন আমাকে বড়ই অপদস্থ করেছিলেন।"

কুন্দ তাঁহার কথার ভঙ্গীতে না হাসিয়া থাকিতে পারিল না, হাসিয়া কহিল, "তাঁর কি আর কোন নাম নেই ?"

পণ্ডিত-মহাশয় উৎসাহিত হইয়া কহিলেন, "সত্যি কথা যদি বলতে হয়, তাঁর বা তাঁর স্বামীর আসল নাম যে কি, তা আমি ঠিক বলতে পারব না। যে বন্ধুটি আমাকে তাঁদের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি পরিচয় করিয়ে দেবার সময় মিসেস্ বটবাল বা ঘটকাল এই রকম কি একটা নাম যেন গিন্নিঠাকরুণের বলেছিলেন; কিন্তু সে নামটা আমার মাথা থেকে কর্পূরবৎ একেবারেই উপে গেছে। মনে আছে কেবল একটুকু যে, তাঁর বাড়ীর চাকর-বাকররা মেমসাহেব ব'লে তাঁকে সম্ভাষণ করছিল।"

"আচ্ছা বেশ! এখন আসল গল্পে নামুন।"

"সে লজ্জার কথা আর কোন্ মুখে বলি! অভিমন্যুবধ ব্যাখ্যার ভূমিকায় যেমন বলেছি যে, অভিমন্যু যখন গর্ভে ছিলেন, তখন পিতা-মাতার আলাপপ্রসঙ্গে তিনি ব্যূহপ্রবেশ-নিয়ম শিক্ষা করেছিলেন,—অমনি মেমসাহেব ত্রস্তভাবে ছোট ছেলে-মেয়েদের সেখান থেকে উঠিয়ে দিলেন,—আমার সহসা বাক্‌রোধ হয়ে গেল, কি না জানি অজ্ঞানকৃত মহাপাপে এরূপটা ঘ'টলো বুঝে উঠতে পারলাম না! ছেলেরা চ'লে যেতে মেমসাহেব বল্লেন, 'ওরূপ খারাপ কথা ছেলেদের কাছে বলা ঠিক নয়।' আমার কণ্ঠতালুকা শুষ্ক হয়ে উঠলো,—মনে করতে চেষ্টা করলুম খারাপ কথাটা কি বলেছি। কিন্তু মস্তিষ্ক তখন শূন্য, কিছুতেই তা বোধগম্য হোল না। পুরাণ-পাঠ ঐ-খানেই শেষ ক'রে আমায় সে দিন চ'লে আসতে হোল। তাই তোমাকে বলছি—তোমাদের শ্লীল ভাষার অভিধানখানা আমাকে তুমি পড়াবে কুন্দ!"

"কি যে বলেন পণ্ডিত-মশায়?"

"না, আমি ঠিকই বলছি। আমি তোমার গুরু হ'তে চাইনে; তুমিই আমার গুরু হও।"

পণ্ডিত মহাশয়ের অনুরাগরঞ্জিত স্বর কুন্দের খারাপ লাগিল না; এই শ্মশ্রুবহুল বিজ্ঞ ব্যক্তিরও যে তাহা হইতে গাম্ভীর্য্য নষ্ট হইয়াছে, ইহাতে সে বেশ একটু গর্ব্ব বোধ করিল। পণ্ডিত মহাশয় তাহার মৌনতায় সাহস পাইয়া আবার বলিলেন, "আমি প্রাণের কথা বলছি কুন্দ, তুমি আমার মন-আসনে দেবীরূপে অধিষ্ঠিত হও, নইলে আমার জীবন ব্যর্থ হবে।"

নিজের এই উচ্ছ্বসিত বাগ্মিতায় পণ্ডিত-মহাশয় নিজেই অবাক হইয়া গেলেন, কুন্দও অসন্তুষ্ট হইল না, কিন্তু তুষ্টির ভাব গোপন করিয়া তুষ্ণীম্ভাব ধারণ করিয়া কহিল, "কি যে বলেন আপনি?"

"বুঝতে পারছ না কুন্দ! তুমি বিনা আমার জীবন বৃথা।"

কুন্দ হাসিয়া ফেলিল, বলিল, "আমি যে ব্রাহ্ম পণ্ডিত-মহাশয়, আপনার জাত যাবে যে?"

"তোমারি পাদপদ্মে জাত-ধর্ম্ম অনেক দিন মনে মনে অঞ্জলি দান করেছি কুন্দ?"

"কিন্তু আমি ত তা করি নি। আমি যে জাতে থাকতে চাই।"

হরি হরি! পণ্ডিত-মহাশয় এতক্ষণ নিজের দিক-টাই দেখিতেছিলেন, কুন্দের তরফ হইতে এ-রকম আপত্তি উঠিতে পারে, তাহা মনেও করেন নাই।

তাঁহার বিস্মিত মনের আবেগ হস্তের সাহায্যে শ্মশ্রুরাশিকে ঘন ঘন দোল দিতে লাগিল। কিছু পরে বলিলেন, "ঠাট্টা করছ কুন্দ!"

"না ঠাট্টা নয়। দেখুন পণ্ডিত-মশায়, এরূপ কথা শোনা আমাদের অভ্যাস নাই, লজ্জা করে, অন্য কথা বলুন।"

পণ্ডিত-মহাশয় হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন, আপাততঃ দাড়ীবেচারীও নিষ্কৃতি পাইল। তাঁহার পুরাতন কথা স্মরণ হইল। লজ্জা ভাঙ্গাইতে অনেকটা সময় লাগিয়াছিল বটে, তার চেয়ে তবু এটা সহজ মনে হইতেছে। তিনি প্রকাশ্যে বলিলেন, "কিন্তু অন-ভ্যাসকেও অভ্যাসে আনা চাই ত!"

"দরকার দেখি না।"

কিন্তু পণ্ডিত-মহাশয় নাছোড়বান্দা,—বলিলেন, "কিসের দরকার নাই? প্রেমানুরাগের?"

কুন্দ হাসি চাপিয়া কহিল, "ধরুন তাই ?"

"আরে—বিশ্বসংসার যে প্রেমে চলছে, তোমার আদেশ ত সে মানবে না কুন্দ !"

"কিন্তু নীরব ভালবাসাই শ্রেষ্ঠ ভালবাসা, 'প্লেটনিক' প্রেমই পবিত্র প্রেম। প্রকাশে তার মাহাত্ম্য চ'লে যায়।"

"তুমি কি সৃষ্টিলোপ করতে চাও কুন্দ? এই বিশ্বসংসারই ত প্রেমের প্রকাশ।"

"কিন্তু, নীরবতায় কি প্রকাশ নেই ?"

"থাকতে পারে—কিন্তু—কিন্তু স্বল্পবুদ্ধি মানব এখনো সে পাঠ শেখে নি। সেই জন্যই ভাব ভাষা চায়,—অনুরাগ মিলন চায়, আর জীবজগতে এই মিলনের পরিণতিই বিবাহ !"

এমন মুক্তকণ্ঠ কোর্টসিপ কুন্দের ভাল লাগিল না। যে সময় বিবাহের নামে বেথুন স্কুলের মেয়েরা খড়্গহস্ত হইয়া উঠিত—সেই সময়ে কুন্দ সে দলের মধ্যে এক জন প্রধান ছিল। অবস্থাচক্রে, বয়সে, জ্ঞানে, তাহার এই মতের হাস্যকারিতা সে বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে,—তবুও সে ভাব তাহার মন হইতে একেবারে মুছিয়া যায় নাই। পণ্ডিত-মহাশয়ের অনুরাগ-প্রকাশে তাহার মন আপত্তি বোধ করিতেছিল না, কিন্তু প্রকাশের পথটা একটু বাঁকা হইলেই তাহার মনঃপূত হইত। সে বিরক্তির স্বরে কহিল, "পণ্ডিত-ম'শায় ও সব কথা বলবেন না, আমি মিনতি করছি।"

"কেন? এতেও কি দোষ আছে ?"

"আছে।"

"কিন্তু তোমার বাপ-মাও ত বিবাহ করেছেন; তাঁরা ত দোষ বিবেচনা করেন নি।"

কুন্দ এ কথায় সত্য সত্য রাগিয়া গেল—বলিল, "যাঁরা দোষ মনে করেন না, তাঁরা ত বিবাহ করছেনই এবং করবেনই। আমি দোষ মনে করি,—আমি করব না।"

পণ্ডিত মহাশয় হতাশভাবে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "কি করবে তুমি ?"

"দেশের কাজ করব।"

"আমিও ত সেই পথের পথিক।"

"কিন্তু আপনারা ভুল পথে চলেছেন,—আমাকে গুরুদেবের আজ্ঞা মেনে চলতে হবে।"

পণ্ডিত-মহাশয় প্রমাদ গণিলেন। কুন্দের স্বরে—তাহার ভাবে-ভঙ্গীতে তিনি একটা দৃঢ়তা দেখিলেন। তাঁহার মন বলিতে লাগিল—কুন্দ কি একটা বিপদচক্রের মধ্যে পা দিতে বসিয়াছে—তিনি কোর্টসিপ ভুলিয়া গিয়া বলিলেন, "তুমি কি ক'রে জানলে যে তাঁদের পথ ঠিক ?

"ঠিক জানি আমি। সন্তোষ-দা বলেছে।"

তিনি বুঝিলেন, কুন্দকে এ পথ হইতে দূরে রাখা এখন তাঁহার সাধ্যাতীত, তাহাদের দলে প্রবেশ করিয়াই তাহাকে রক্ষা করা ছাড়া অন্য উপায় নাই। বলিলেন, "বেশ, আমিও তোমার গুরুর শিষ্য হব। গুরুর দেখা পাব কোথায় ? কি করতে হবে ?"

কুন্দ আহ্লাদের সহিত বলিল, "গুরু এইখানে শীঘ্র আসবেন বলেছেন। তখনই বুঝবেন কি করতে হবে, না হবে—আমি আর কিছু বেশী বলতে পারব না।"

এই সময় দাসী আসিয়া বলিল, "রাজকুমারী আজ পড়বেন নাই। আপুনি বাড়ী যাও গো।"

পণ্ডিত-মহাশয় উঠিয়া দাঁড়াইয়া দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে কুন্দকে বলিলেন, "চল্লেম তবে, গুরুদেব এলে যেন খবর পাই।"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

ম্যাজিষ্ট্রেট-ভবনে গিয়া আজ প্রথম জ্যোতির্ম্ময়ী জানিলেন যে, তাঁহারা বদলি হইয়া প্রসাদপুর হইতে চলিয়া যাইতেছেন।

রাজকুমারী মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন। গৃহে ফিরিয়া খানিকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিলেন, তাহার পর বৈকালিক বেশভূষা খুলিয়া ফেলিয়া মন্দিরে যাইবার সাজ পরিয়া লইয়া কালীর পটখানি আনিবার জন্য রাজার ঘরে গেলেন। তিনি তখন সে ঘরে ছিলেন না, পাশেই শরৎকুমারের ঘর, হয় ত বা এখন তিনি বারান্দাতেই আসিয়া বসিয়াছেন,—একবার বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইবার জন্য মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু হাতের কালী-মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া সেই বিষম পিপাসাও সবলে চাপিয়া লইয়া তিনি গৃহনিষ্ক্রান্ত হইয়া দিদিমার মহলে প্রবেশ করিলেন। দিদিমা মন্দির গমন উদ্দেশ্যে তখন বারান্দায় পদার্পণ করিয়াছেন—জ্যোতির্ম্ময়ীকে দেখিয়া, চরণ সংযত করিয়া কহিলেন, "আজ যে আমার রাধারাণীর অসময়ে উদয় ?—মন্দিরে যাবি বুঝি ? সাজসজ্জা যে সেই রকম ?"

"হ্যাঁ ঠাকুর-মা, অনেক দিন দেব-দর্শনে যাই নি, তাই আজ ইচ্ছে হোল। দেখ দেখি তোমার জন্যে কি এনেছি ?"

ঠাকুর-মা ছবিখানি হাতে লইয়া পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া আহ্লাদ সহকারে কহিলেন, "ঠিক সময়েই এনেছিস্ রাণি,—এখনি মন্দিরে গিয়ে টাঙ্গিয়ে দেব। কালী-মূর্ত্তি সেখানে একখানিও নেই। তাই বুঝি দেবী আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়েছিলেন! স্বপ্ন দেখার পরই পটখানি কালীঘাট থেকে আনিয়েছি।"

"আচ্ছা দাও ঠাকুর-মা—আমি নিয়ে যাচ্ছি।" বলিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী ছবিখানি তাঁহার হাত হইতে স্বহস্তে পুনর্গ্রহণ করিলেন। ঠাকুর-মা তখন তাহার দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিয়া কহিলেন, "দিন দিন যে শুকিয়ে যাচ্ছিস নাতনি! বিরহজ্বালা পুষছিস যে বুকে তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু সবাই যা বোঝে, তোর বাপ ত তা বোঝে না। বাপের তোর ধনুর্ভঙ্গ পণ যে অর্জ্জুন জামাই করবে। আরে ঐ ত সেই!—যুদ্ধ জিতলে, মালা নিলে,—ছদ্মবেশী অর্জ্জুনই ত সে,—তোর বাপকে কে তা বোঝায় বল্ দেখি?"

জ্যোতির্ম্ময়ীর মনের বেদনা মুখে রক্তরাগে ঝাঁপাইয়া উঠিল—পাছে ঠাকুরমা তাহা লক্ষ্য করেন —তাই তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "না ঠাকুর-মা, আমি বিয়ে করব না।"

"কেন লো?"

"সবাই যে বিয়ে করে।"

দিদিমা খুব হাসিয়া উঠিলেন,—নাতনির পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, "ওঃ সেই জন্যে? যেমন বাপ ঠিক তেমনি মেয়ে! সবাই যা করে তা করতে নেই—কেমন? সেই জন্যে তোর বাপও ত বিয়ে করলে না।"

মেয়ে বলিল—"আচ্ছা ঠাকুর-মা, বাবা বিয়ে করেন নি ব'লে তোমার এত দুঃখ, আমি সে দুঃখ নিবারণ করতে প্রাণপণে চেষ্টা করব। আমারও অনেক সময় মনে হয়—বাবার বিয়ে হ'লে ভাল হোত। তুমি একটি ভাল মেয়ে দেখ—তার পর এবার আমরা দুজনে মিলে বাবাকে ধ'রে পড়ব।"

ঈর্ষ্যার পরিবর্ত্তে নিজেই যে জ্যোতির্ম্ময়ী পিতার বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে, ইহাতে ঠাকুর-মা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। মনে মনে বলিলেন, —"হ্যাঁ, অসাধারণ মেয়ে বটে।" মুখে বলিলেন, "বেশ কথা! আগে ত তোর হাতে বাঁধন পড়ুক—তখন বাপের চাদরেও গিরে দিস।"

রসুন-চৌকীর পূরবীরাগ সহসা মন্দিরের আহ্বান-ঘণ্টাধ্বনির মধ্যে থামিয়া পড়িল। রাজমাতা বলিলেন, "চল্ রাণি চল্, আরতির সময় হোল, ফিরে এসে এ পরামর্শ করা যাবে।"

মন্দির-অঙ্গনে পৌছিয়া প্রথমেই রাজমাতা কালী মূর্ত্তিখানি এক জন সেবকের হস্তে দিয়া, কোথায় ইহা টাঙ্গান হইবে, তাহা বলিয়া দিলেন। পুরোহিত এবং অন্যান্য রাজআত্মীয়গণ এতক্ষণ রাজমাতার আগমন-অপেক্ষায় ছিলেন। তাঁহারা মন্দিরে আসিবামাত্র স্তোত্রপাঠ এবং আরতি আরম্ভ হইল। রাজকুমারীর সহিত মহারাণী সপ্তবার দেব-প্রদক্ষিণ করিয়া দেব-সম্মুখে প্রণত হইলেন। প্রণামান্তে জ্যোতির্ম্ময়ী নত-জানু হইয়া করযোড়ে মূর্ত্তিযুগলের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। প্রকৃতিপুরুষের মিলনভাব—এই যুগল-মূর্ত্তিতে আজ তিনি সর্ব্বপ্রথমে মর্ম্মে-মর্ম্মে উপলব্ধি করিলেন। এই মিলনরূপ—কি সুমধুর,—কি মনো-মোহন! জ্যোতির্ম্ময়ী মনে করিয়া আসিয়াছিলেন, শ্যামসুন্দরের চরণতলে তাঁহার উন্মেষিত প্রেমকে আজ অঞ্জলিদান করিয়া—চির-কৌমার্য্যব্রতে শপথ-বদ্ধ হইবেন। পারিলেন না—তাহা পারিলেন না। ভগবানের প্রেমমিলনরূপে তন্ময় হইয়া মোহাচ্ছন্ন ভাবে করযোড়েই তিনি বসিয়া রহিলেন। আরতি শেষ হইয়া গেল, স্তোত্রপাঠ বন্ধ হইল—ঠাকুর-মা তখনও রাজকন্যাকে সেই ভাবে বসিতে দেখিয়া একটু যেন ভীতভাবে ডাকিলেন, "রাণি?" রাণী চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

রাজা তখন গীতগৃহে ঢালা বিছানায় বসিয়া তান-পুরার সুরে গান করিতেছিলেন। জ্যোতির্ম্ময়ী মন্দির হইতে ফিরিয়া গৃহপ্রবেশকালে দূর হইতেই গীত-বাদ্যধ্বনি শুনিয়া এমন নিঃশব্দে পিতার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন যে, তিনি তাহা জানিতেও পারি-লেন না; আত্মহারাভাবে মুদ্রিতনয়নে তিনি গাইতে লাগিলেন—

বড় একেলা গো বড় একেলা!
দুপুর সন্ধ্যা সকালা—
তার অমৃত-কিরণ মাখা
আকাশ-ভরা চোখের দেখা
ধরার পানে ফিরলো না ত হায়রে!—
একটি বারও একটি বেলা!

মূলতান রাগিণীতে তাঁহার ভাববিহ্বল-কণ্ঠোত্থিত পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত এই কয়েকটি ছত্র গৃহে একটি মধুর বিষাদতান বর্ষণ করিতে লাগিল,—শুনিতে শুনিতে জ্যোতির্ম্ময়ীর নেত্র অশ্রুতে ভরিয়া উঠিল, নিজেকে অপরাধী বলিয়া মনে হইল। তিনি যে

পিতার নিকট হইতে দূরে পড়িয়াছেন—এই গানটি যেন ভাল করিয়া তাঁহাকে এই কথা বুঝাইয়া দিল। গানের সুরতান-ভরা প্রত্যেক শব্দটি কি তাহার প্রতি ভর্ৎসনা নহে! রাজকন্যা একরূপ মোহাচ্ছন্ন ভাবেই নতজানু হইয়া পিতার পৃষ্ঠে মুখ রক্ষা করিলেন। রাজা চমকিয়া গান বন্ধ করিয়া কহিলেন, "রাণি!" সে স্বর কি স্নেহানন্দপূর্ণ! এই কণ্ঠ হইতেই কি মুহূর্ত্ত-পূর্ব্বে অমন বুকফাটা বিষাদবেদনা ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল!

রাণী কোন উত্তর করিলেন না, পিতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া চুপ করিয়া রহিলেন; উত্তপ্ত অশ্রুবিন্দুতে রাজার স্কন্ধদেশ ভিজিয়া গেল। তিনি বুঝিলেন, তাঁহার দুঃখের গানে বালিকা ব্যথা পাইয়াছে। তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া শিরশ্চুম্বনপূর্ব্বক ভুলাইবার ছলে সহাস্যে বলিলেন,

"কে মেরেছে রাণীকে মোর, কে কোরেছে মন্দ,
তার সঙ্গে কোমর বেধে করব গিয়ে দ্বন্দ্ব।"

রাণী তখন হাসিলেন। রাজা বলিলেন, "অনেক দিন সেতার বাজাসনি—রাণি—বাজা দেখি!"

জ্যোতির্ম্ময়ীর সেতার-তানপুরাও ভৃত্য সেইখানে আনিয়া রাখিয়াছিল—রাজা সেতারটি তাহার হাতে তুলিয়া দিলেন। জ্যোতির্ম্ময়ী সেতার ধরিয়া একটু বিষণ্ণ হাসি হাসিয়া কহিলেন, "বাবা!"

"কেন রাণি?"

"ও গানটি কি তুমি সম্প্রতি রচনা করেছ?"

রাজা তাহার মনের ভাব বুঝিলেন,—বুঝিয়া বলিলেন, "না রাণি—অনেক দিন।"

জ্যোতির্ম্ময়ী আর কোন প্রশ্ন করিলেন না, বুঝিয়া লইলেন—এই অনেক দিনের অর্থ কি! তখন যেন একটু সুস্থবোধ করিলেন। সেতারটার পরদাগুলা ঠিক করিতে করিতে কহিলেন, "বাবা, আমি তোমার পুরাণ গানের খাতা থেকে একটি গান পেয়েছি—ঠিক আমার মনের মত।"

রাজা কহিলেন, "আমার কোন্ গানটি তোর মনের মত নয়—সেইটি বল দেখি রাণি?"

"এ গানটি বাবা—সব-চেয়ে আমার মনে বসেছে। যেন আমারি মনের কথা তুমি প্রকাশ করেছ। একটি সুর বসিয়ে নিয়েছি,—শুনবে বাবা গানটি?"

রাজা তাহার পৃষ্ঠে সাদর হস্ত বুলাইয়া কহিলেন, "বেশ, গাও হে তুমি গুণী—
আমার গানটি তোমার তানে ভাল ক'রে শুনি।"

সেতারের পরিবর্ত্তে তানপুরাটা হাতে তুলিয়া লইয়া তাহাতে ঝঙ্কার দিয়া রাজকুমারী গান ধরিলেন—

বড় সাধ, বড় আশা, বড় আকিঞ্চন
পরাতে, জননি, তোরে রত্ন-আভরণ!
জানি, দীন হীন অতি, ক্ষুদ্রবল, ক্ষুদ্র মতি,
অপার আকাঙ্ক্ষা তবু না মানে বারণ!
বাসনার বলে বলী, কেবলি আপনা ছলি
অসাধ্য-সাধন-তরে প্রয়াস যতন।
শ্রান্ত ক্লান্ত প্রতিদিন, নিরাশায় আশাক্ষীণ,
তবুও দুরাশা মনে নহে সম্বরণ!
এ দুর্ব্বল বাহু জোরে বিদরি ভূধর-বরে
তুলিবারে চাহি হীরা মাণিক রতন।
মাটী তুলি ফেলি আর উঠে কাচ-শিলা ভার
তাহাই চরণে আনি করি সমর্পণ।
মাগো, এ জীবন সারা—কাটিবে কি এই ধারা!
প্রাণের বাসনা আশা শুধু কি স্বপন?

গান শেষ করিয়া তানপুরাটা যখন জ্যোতির্ম্ময়ী নামাইয়া রাখিলেন, তখন তাঁহার নজরে পড়িল,—বিছানার এক প্রান্তে শরৎ ও অনাদি আসিয়া বসিয়াছেন। রাজাও সেইদিকে চাহিয়া আহ্লাদসহকারে বলিয়া উঠিলেন, "আরে, ডাক্তার যে!" শরৎ হাসিয়া বলিলেন, "গান শোনার লোভ সম্বরণ দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছিলো—ক্ষমা করবেন।"

"ক্ষমা! আজ আমাদের গানের মজলিস যথার্থই সার্থক। কতদিন তুমি আস নি, বল দেখি! ওঃ, কি ভাবনাটাই লাগিয়ে দিয়েছিলে হে!"

শরৎকে দেখিয়া জ্যোতির্ম্ময়ীর হৃদয় আনন্দে উথলিয়া উঠিল, কিন্তু মেঘগ্রস্ত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়—সে আনন্দ সহসা নিরানন্দের মধ্যেই ঢাকিয়া পড়িল।

শরৎ যখন বলিলেন, "রাজকুমারি, আর একবার গানটি গাবেন?"

তখন রাজকুমারী কহিলেন, "বড় শ্রান্ত মনে হচ্ছে ডাক্তার-দা, গাইতে ইচ্ছা হচ্ছে না আর।"

শরৎ আর কিছু বলিলেন না। রাজা বলিলেন,—"আজ যে তোমার মামা তোমাকে দেখতে আসছেন শরৎ। প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁর অপেক্ষা করছি—এতক্ষণ ত আসা উচিত ছিল, বোধ হয় ট্রেণ লেট হয়েছে।"

বিষাদকাতর মন লইয়া রাজকন্যার আর এখন অন্য কাহারও সহিত দেখা করিতে ইচ্ছা হইল না। তিনি তাড়াতাড়ি বলিলেন, "তবে আমি এখন যাই

বাবা। তোমরা ত কাজ-কর্ম্মের কথায় ব্যস্ত থাকবে,—খাবার সময় তাঁর সঙ্গে দেখা হবে।”

নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ ব্যতীত প্রতিদিনই প্রায় রাজা-বাহাদুর অন্তঃপুরে মাতার নিকট বসিয়া ভোজন করিতেন।

আহারান্তে অন্তঃপুর হইতে বৈঠকখানায় আসিয়া বৈষয়িক প্রসঙ্গ উত্থাপনের পূর্ব্বে শ্যামাচরণ কহিলেন, “তাঁরা যে বড় তাগিদ দিচ্ছেন?” বলা বাহুল্য তাগিদদার আর কেহই নহেন, শ্যামাচরণই স্বয়ং এখানে কন্যাকর্ত্তা।

রাজা মূর্খের মত বলিলেন, “আপনিও উকিলদের তাগিদ দিন, টাকা মজুত ত?”

শ্যামাচরণ মাথা চুলকাইয়া কহিলেন, “না, আমি আর এক কথা বলছি। মেয়ে বড় হ’য়ে উঠেছে; আর তাঁরা কালবিলম্ব করতে চান না, আমাকে বলে দিলেন, অঘ্রাণেই দিনটা ঠিক করে যেতে। কিন্তু আপনার সঙ্গে কথা না কয়ে ত আমি মহারাণীকে এ বিষয়ে কিছু বলতে পারিনে।”

রাজা এইবার কথাটি বুঝিলেন, বিস্মিত ভাবে কহিলেন, “ক্ষেপেছেন আপনি!”

“আমি ক্ষেপি নি, কিন্তু ক্ষেপিয়ে তুলেছেন তাঁদের আপনি।”

“আমি তাঁদের ক্ষেপিয়ে তুলেছি? অস্যার্থ?”

“কথাটা কি এতই দুর্ব্বোধ্য! যে মুহূর্ত্তে আপনি কন্যার মালা গ্রহণ ক’রে—তার হাতে আংটি পরিয়ে দিয়েছেন, সেই মুহূর্ত্তেই আপনার ভাবিপত্নী ব’লে তাকে স্বীকার করে নেওয়া হ’য়েছে।”

রাজা সতেজে কহিলেন, “আমার মনে সেরূপ কোন অভিসন্ধিই ছিল না—আপনারা দেখছি বিলিতি—”

শ্যামাচরণ কানে আঙ্গুল দিয়া উঠিলেন, “ছিঃ ছিঃ ও কথা বলবেন না। এ কথা শুনলে—তাঁরা কন্যাকে চিরকুমারী রাখবেন, তবুও আপনাকে কন্যা দান করবেন না—”

এতক্ষণে শ্যামাচরণ কন্যাপক্ষের তরফ হইতে একটা সত্য কথা কহিলেন।

রাজা লজ্জিত হইলেন,—শ্যামাচরণ বলিলেন, “আপনি বিজ্ঞ পুরুষ, আপনার ব্যবহারে লোকে বালকের অবিবেচনা প্রত্যাশা করে না। এখন যদি আপনি তাকে প্রত্যাখ্যান করেন, তা’হলে আপনার ব্যবহারই দুষ্মন্তের ন্যায় অনুচিত হবে।”

রাজা গম্ভীর হইয়া পড়িলেন—কিছু পরে বলিলেন, “অসম্ভব—অসম্ভব, ইচ্ছা থাকিলেও আমার পক্ষে বিবাহ করা এখন অসম্ভব!”

“কেন?”

উগ্র স্বরে রাজা উত্তর করিলেন, “আপনি ত আমার চেয়েও বিজ্ঞ—আর এইটুকু বুঝতে পারেন না? রাণী-মা আমার অবিবাহিত আর তার বুড় বাপ বিয়ে ক’রে ক’নে ঘরে আনবে?”

শ্যামাচরণ হাসিয়া কহিলেন, “বয়সেই যে লোকে বৃদ্ধ হয় না—আজ আপনি তার অকাট্য প্রমাণ দিচ্ছেন। শিশুসুলভ স্বভাব নিয়ে আপনি দেখছি, কল্পনাকাশেই বিচরণ ক’রে বেড়ান, পৃথিবীর মাটীর দিকে মোটেই নজর পড়ে না আপনার।”

রাজাও এইবার একটু হাসিয়া বলিলেন, “অত ভণিতার আবশ্যক কি? খুলেই বলুন না আপনার মনের কথাটা?”

“আপনার কন্যা যে ধরা পড়েছেন, বিশ্বশুদ্ধ লোকে সে খবর জানে—আর আপনি জানেন না?”

“শরৎকুমারকে মালা উপহার দেওয়াতে কথাটা রটেছে বোধ হয়—কিন্তু আমি ত রাণীর ভাবে সে রকম কিছু বুঝি নি, দেশমঙ্গল কার্য্যেই ত সমস্ত প্রাণ মা উৎসর্গ করেছেন। আপনি যা বলছেন, তা যদি সত্য হয়, তা হ’লে আমি খুবই সুখী হই।”

“সর্ব্বতোভাবেই আপনি সুখী হবেন রাজাবাহাদুর। অণুভার বিবাহে আপনারা সকলেই ত আসছেন—তখন বুড়’ শ্যামাচরণকে ঘটক বিদায় দেবেন।”

রাজা হাসিয়া বলিলেন, “বেশ, তাই হবে।”

* * * * *

সে রাত্রি জ্যোতির্ম্ময়ীর অনিদ্রায় কাটিল। সন্ধ্যার সমস্ত ঘটনা কখনও সংলগ্নভাবে কখনও অসংলগ্নভাবে তাঁহার মাথায় ঘুরিতে লাগিল। কালী-মূর্ত্তি আর শ্যামসুন্দর ও রাধারাণীর যুগলমূর্ত্তি, শরতের সুন্দর রূপ আর পিতার বিষাদপূর্ণ কণ্ঠধ্বনির মধ্যে তাঁহার বিভ্রান্তচিত্ত—কখনও আনন্দে, কখনও নিরানন্দে আত্মহারা হইয়া ফিরিতে লাগিল। পাশের পালঙ্কে কুন্দ যে শুইয়া আছে, সে কথা ভুলিয়া গিয়া মৃদু গুণগুণ কণ্ঠে তিনি একবার গান ধরিলেন—

বড় সাধ, বড় আশা, বড় আকিঞ্চন—

দুই চারি লাইন গাহিবার পর তাঁহার মনে পড়িয়া গেল—কুন্দ জাগিয়া উঠিতে পারে—গান থামিয়া গেল। কুন্দ তখন ডাকিল, “রাজকুমারি!”

জ্যোতির্ম্ময়ী এতক্ষণ বিছানায় শুইয়াছিলেন,

উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "তোমাকে জাগিয়ে দিলুম কুন্দদিদি ?"

"না রাজকুমারি, আমারও ঘুম হচ্ছে না, গানটি ভাল ক'রে গাও না ভাই, শুনি !"

"না কুন্দদিদি, কি হবে গেয়ে? গানে ত আমার বাসনা পূর্ণ হবে না।"

কুন্দ বুঝিল কতখানি নৈরাশ্যে তাহার মর্ম্মদাহ হইতেছে। সে কহিল, "একটি কথা বলব রাজকুমারি ? কিছু মনে করবে না ?"

"বল ভাই, বল ! কিছুতে আর কিছু মনে করব না, মনে করবার বলটুকুও হারিয়েছি !"

কুন্দ ব্যথিতচিত্তে কহিল, "আমরা যে পথে মুক্তি চাচ্ছি, সে পথে দেশের মুক্তি নেই রাজকুমারী।"

"বল দিদি, কোন্ পথ ধরব তবে ?"

"আমরা জানিনে সে পথ। আমরা অন্ধ, গুরু সে পথ দেখিয়ে দিতে পারেন। গুরুর ইঙ্গিতে আমাদের চলতে হবে।"

জ্যোতির্ম্ময়ীর ক্ষুব্ধ বায়ু-তরঙ্গিত অশান্ত-হৃদয়ের উপর দিয়া সহসা আশার মৃদুহিল্লোল বহিয়া গেল,—তিনি শান্তভাবে কহিলেন, "তেমন গুরু কোথায় ?"

উত্তর হইল—"আছেন, আছেন !"

"পেয়েছ তুমি ?"

"পেয়েছি।"

"আমিও কি পাব ?"

"নিশ্চয়—নিশ্চয়। অন্তর থেকে যে যাহা প্রার্থনা করে—ভগবান তাকে তা মিলিয়ে দেনই দেন।"

"কবে পাব ?"

"তিনি শীঘ্র এখানে আসবেন। তিনিও এই পথের পথিক।

"কোন্ পথের পথিক ?"

"দেশ-উদ্ধার তাঁদের ব্রত। তাঁরা পথ চিনেছেন—তাঁদের নেতৃত্বে আমরাও পথ পাব।"

অধীর বালিকা নিজের শয্যা ত্যাগ করিয়া কুন্দের শয্যায় আসিয়া আবেগভরে জিজ্ঞাসা করিল, "ঠিক বলছ কুন্দদিদি ? বাসনা সফল হবে আমার ? পারব আমি—পারব—আপনাকে দিতে পারব ?"

বালিকা আর পারিলেন না—তাঁহার হৃদয়ের বিপ্লব অশ্রুধারে উথলিয়া উঠিল,—কুন্দের পাশে শুইয়া তিনি রোদন করিতে লাগিলেন। কুন্দ রাজকুমারীর বাক্যের মর্ম্ম, অশ্রুধারার অর্থ ঠিক বুঝিল না, সস্নেহে মাতার ন্যায় তাঁহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে আবার সে কহিল, "নিশ্চয়, নিশ্চয়,—আশ্বস্ত হও রাজকুমারী।"

রাজকুমারীর অশ্রু-স্তিমিতলোচনে ধীরে ধীরে পূর্ব্বের স্বপ্নদৃষ্ট দেবীমূর্ত্তি বিভাসিত হইয়া উঠিলেন। জ্যোতির্ম্ময়ী বিস্ময়-আকুল ভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ! তুমি মাতা সাম্য-মৈত্রীর অধীশ্বরী, দেবী বিচিত্রা ? বল, বল দেবী, সে দিন কি আবার আসিবে ? তোমার অরুণ চরণ-স্পর্শে ভারত-ভাগ্য-গগন পুনরায় কি পুণ্যপ্রভাত-মহিমায় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিবে ?"

দেবী মৃদু হাসি হাসিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন—স্বপ্নলীন হইয়া পড়িল বালিকার স্বপ্নবাণী।

বিচিত্রার পরিসমাপ্তি

বিজয়ার আশীর্ব্বাদ



শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত

বিজয়ার আশীর্ব্বাদ

১

পৌষ মাস; পুরা শীতের দিন। বারুণী কিন্তু উপরের নির্জ্জন ছোট বারান্দায় দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিল—"এবার কি শীত আসিবে না কি?" হিমালয়ের তুষার-শীতল বায়ু তাহার অঙ্গে যেন বসন্ত-হিল্লোল ছড়াইয়া দিতেছিল।

বারুণীর বয়স উনিশ বৎসর। এই বয়সে সাধারণ বাঙ্গালী ঘরের তরুণীগণ একাধিক সন্তানের মাতা হইয়া পড়েন। বারুণী তাঁহাদের মত সংসারের জ্বালায় এখনও ঝালা-পালা হয় নাই; সে অবিবাহিতা; তাই ষোড়শীর মতই তাহার রূপলাবণ্য। পল্লবিনী লতার মতই তাহার প্রফুল্ল হাবভাব।

অবিবাহিতা হইলেও বারুণী বাগ্‌দত্তা। তাহার ভাবী পতি মিষ্টার দত্ত I. C. S. পাশ করিয়া দেশে ফিরিতেছেন। এখন যুদ্ধের সময়, সমুদ্রপথ যৎপরোনাস্তি বিপৎসঙ্কুল। জর্ম্মাণ ডুবো-জাহাজগুলি সমুদ্রগর্ভে প্রচ্ছন্নভাবে সর্ব্বদাই ঘুরিতেছে এবং সুবিধা বুঝিলেই শত্রু-জাহাজের তলা ফুটা করিয়া দিয়া শত্রু-নাশ করিতেছে। কিন্তু বিপদের ভয়ে কর্ম্মপ্রবাহ বন্ধ রাখা আর জীবনপ্রবাহ বন্ধ রাখা ইংরাজের মনে একই কথা। সুতরাং এই ঘোর সঙ্কটময় বাধাবিঘ্নের মধ্যেও যথাসাধ্য সাবধানতা অবলম্বনে নিয়মিতভাবেই ইংরাজ সমুদ্রবক্ষে ষ্টীমার চালাইতেছেন। আমাদের নব সিভিলিয়ান দত্ত সাহেব এ সময় প্রেমের টানে প্রাণের মায়া অগ্রাহ্য করিয়া ভারতগামী 'ডুনেরা' জাহাজে চড়িয়া বসিয়াছেন।

জাহাজ মধ্যপথ পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে চলিয়াছে, কলিকাতার জাহাজ-আফিস হইতে এ খবর পাওয়া গিয়াছে। আর সপ্তাহখানেকের মধ্যেই ষ্টীমার বোম্বাই জেটিতে আসিয়া পৌঁছিবে। তাহার পর রেলে কলিকাতার পথ দুই তিন দিন মাত্র। তাই বুঝি আনন্দের আতিশয্যে শীতবাতাসও আজ বসন্তের ন্যায়ই বারুণীর এত উপভোগ্য মনে হইতেছিল। নীলাকাশে শুভ্র মেঘের স্তরে কত রকম বিচিত্র চিত্রাঙ্কন ভাসিয়া চলিয়াছে। বারুণী সেই মেঘ-চিত্রের দিকে চাহিয়া একখানি জাহাজ-চিত্র কল্পনা করিয়া লইল। ঐ যে তাঁহারই প্রতিমূর্ত্তি! মুখখানি কি হাসি হাসি! হাসিয়া কি যেন তাহাকে বলিতেছেন। কি সে কথা, তাহা কিন্তু সে বুঝিতে পারিল না; হঠাৎ ছবিখানি মিলাইয়া গেল। কোথা হইতে সহসা রসুনচৌকি বাজিয়া উঠিল। এ যে অসময়ের বাঁশী! পৌষমাসে ত কোন পূজা-পার্ব্বণ বা বিবাহোৎসব নাই। তাঁহারই প্রাণের কথা বাঁশীতে কহিয়া তিনি চলিয়া গেলেন না কি? রসুনচৌকির ভৈরবীতে বারুণী সাহানা তান শুনিতে পাইল। তাহার মাসতুতো বোন সুষমা আসিয়া তাহার এই সুখস্বপ্ন ভঙ্গ করিয়া কহিল—"এই যে দিদিমণি এখানে? আমি ভাবলুম, বুঝি বা সশরীরে নক্ষত্রলোকে যাবার পাখা-টাখা আবিষ্কার ক'রে ফেলেছ!"

বারুণী কহিল, "কেন রে? এরই মধ্যে নক্ষত্রলোকে যাওয়াতে চাস্ আমাকে? আমি ত মোটেই তা'তে রাজি নই।"

"তোমার মনটিকে ত ধরাতে ধরা-ছোঁয়া যায় না, তাই ভাবলুম, বুঝি বা দেহটাকেও উড়োকল বানিয়ে তুল্লে তুমি। বাতাসী বল্লে, সাত রাজ্যি খুঁজেও তোমার দেখা পেলে না।"

"তা খোঁজা-খুঁজিরই বা এত দরকার কি ছিল?"

"তাই ত? কটা বেজেছে, সে হুঁসটা পর্য্যন্ত নেই দেখছি।"

"কটা বেজেছে?"

সুষমা হাসিয়া উত্তরে কহিল, "এই সবে ভোর পাঁচটা। প্রভাতী নহবৎ শুনছ না?"

বারুণীও হাসিয়া তাহার খোলা চুলে একটা টান দিয়া বলিল, "আর ঠাট্টা করতে হবে না। সত্যি কটা বেজেছে?"

সুষমা 'উঁহু উঁহু' করিয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইল। ঘরের ঘড়ীতেও ১০টা বাজিয়া উঠিল। সুষমা কহিল, "ঐ শোনো কটা বাজছে, তোমার জন্য কি সূর্য্যদেব আটকা প'ড়ে থাকবেন নাকি?"

"তাই ত! এরই মধ্যে ১০টা, এখনই বাবা খেতে আসবেন, চল চল—"

"তাঁ'র খাওয়া হয়ে গেছে, তিনি আফিস চ'লে গেছেন।"

বারুণী এতক্ষণে ঠিক বাস্তব রাজ্যে ফিরিয়া আসিল, মনটা খারাপও হইয়া পড়িল। সে রাগ করিয়া কহিল, "বাবা খেতে এলেন, আর তোরা আমাকে একটা খবরও দিলি নি, বেশ ত?"

সুষমা রাগিয়া বলিল, "হাঁ, দোষ আমাদেরই বই কি! বাতাসী ত তোমার হাল ছেড়েই দিয়েছিল; আমি তবু আবার এলুম, তোমার অন্ধি-সন্ধি জানি কি না!"

এই সময় স্বয়ং বাতাসীর আবির্ভাব হইল। হাঁপ ছাড়িয়া, হাঁক ডাকে বারান্দা সরগরম করিয়া সে কহিল, "বাপ রে বাপ, সারা রাজ্যি খুঁজে খুঁজে জানটা বেরিয়ে গেল, চল গো ঠা'করুণ, মা ঠাকরুণ ডাকতে লেগেছে।"

বারুণী বলিল, "আমি যাচ্ছি, তোরা এগো, স্নানটা ক'রে নিয়ে শীগ্‌গিরই আসছি।"

সুষমা বলিল, "তোমার ত শীগ্‌গির? নাবার ঘরে গিয়ে যেন আবার ভাবতে বসো না।"

অল্পক্ষণের জন্য নহবৎ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, আবার বাজিয়া উঠিল। বাতাসী বলিল, "ওদের বাড়ী আজ নূতন জামাই আসছে গো।"

বারুণী হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "ও, তাই বুঝি! আমি ভাবছিলুম, অসময়ে কেন আজ বাজনা বাজছে?"

উত্তরে বাতাসী বলিল, "বাজবে গো বাজবে, এখানেও বাজনা বাজবে। এই বর এল ব'লে।"

বারুণী রাগ প্রকাশ করিয়া ধমক্ দিয়া কহিল —"চ'লে যা এখান থেকে, তোর আর রসিকতা করতে হবে না।"

সুষমা হাসিতে লাগিল; দাসী বলিল, "তা যাচ্ছি গো যাচ্ছি। বর আসুক না আগে, তখন কি আর তোমার কথা মানব। তানার সামনে রস-কথার তুবড়ি ছড়াব, চন্নু আমি। একটুকু শীগ্‌গির আপুনি এস।"

তাহারা চলিয়া গেল। বারুণী রেলিংএ হাতের ভর দিয়া রসুনচৌকির সুরের দিকে মনোনিবেশ করিল। এবার বাঁশী ললিতে বাজিতেছিল। বারুণী গাহিল—

ললিত রাগে ঐ বাঁশরী বাজে!
থেকো না, বঁধু, হে শুধু আর
আমার গোপন মনের মাঝে।
এস মোর অন্তরতম
দাঁড়াও হে বাহির ভরি,
দেখাও হে সুতৃষিত আঁখিরে মরি,
রূপ তব, চিত্তরঞ্জন হে,
নেত্ররঞ্জন বর-সাজে।
ওহে মানসমোহন
কেবলি হে রাখিও না স্বপনে,
দরশনে পরশনে তব প্রেম সত্য বচনে
ভাঙ্গ হে ভাঙ্গ হে ওগো সতনে
আমার মিথ্যা সরম-লাজে।

গান করিতে করিতে বারুণী স্নান করিতে গেল।

২

স্নান-দৌত শুভ্রবেশে এলায়িতকুন্তলা বারুণী জলদেবতার প্রতিমূর্ত্তিটির মতই যখন মাতৃসমীপে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন মাতার সর্ব্বান্তঃকরণ আনন্দপুলকে পূর্ণ হইয়া উঠিল। গৃহপ্রান্তে তখন বসিয়াছিলেন এক জন সন্ন্যাসিনী। বারুণীকে দেখিয়া তাঁহারও কাঠিন্যরেখামণ্ডিত মুখমণ্ডল কোমল স্নিগ্ধ ভাব ধারণ করিল।

ত্রিবঙ্ক লামার ন্যায় আলখাল্লাধারী বলিয়া এই সন্ন্যাসিনীকে বাহিরের লোক বলে কুটিয়া-ভৈরবী

আর দলের লোকের নিকট ইঁহার ডাক নাম ক্ষেপা ভৈরবী।

বারুণীর মাতা অরুন্ধতী আনন্দকল্যাণবর্ষী মুগ্ধ দৃষ্টিতে ক্ষণকাল কন্যাকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়া প্রসন্ন স্বরে বলিলেন, "বারু, দেখ দেখি কে এসেছেন?"

বারুণী গৃহপ্রবেশকালে আশে-পাশে নজর দেয় নাই, এখন সচকিত দৃষ্টিতে মুখ ফিরাইয়া ভৈরবীকে দেখিয়া কুণ্ঠিত ও অপ্রসন্ন হইয়া পড়িল। ইঁহার সহিত কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কাশীধামে অন্নপূর্ণামন্দিরে বারুণীদের দেখাশুনা। সেই হইতে ইঁহারা যে ভৈরবীর কিরূপ সুনজরে পড়িয়াছেন, কলিকাতায় আসিলেই ইনি একবার ইঁহাদের দেখিতে আসিবেনই আসিবেন। ভৈরবী অর্থপ্রত্যাশী নহেন, অতএব অরুন্ধতী ইহাতে তাঁহার নিঃস্বার্থ দর্শনানুরাগই দেখিতে পায়েন। কিন্তু বারুণী তাঁহার এই নিঃস্বার্থ স্নেহের মর্ম্মগ্রহণে একেবারেই অক্ষম। কারণ, যেরূপ বাহ্যিক রঙচঙে ভাবে বালহৃদয় সহজে মুগ্ধ হয়, তাহার অভাব ইঁহাতে সম্পূর্ণ। ভৈরবীর চেহারাখানিও প্রিয়দর্শন নহে, আর সাজসজ্জাও বেশ একটু কিম্ভূতকিমাকার। লামাদের ন্যায় মুণ্ডিত মস্তকে সদ্য-গজান সজারুর কাঁটার মত খোঁচা খোঁচা চুল আর রেখাবলী-ভরা ছাইপাঁশ-মাখা মুখের মধ্যে গাঁজা-ধূমপানজনিত জলন্ত অঙ্গার সম রক্তবর্ণ দুই চক্ষু দেখিলেই বারুণীর প্রাণের ভিতর কেমন একটা ভয়-শিহরণ উঠিত।

তখন অরুন্ধতী থালা সম্মুখে রাখিয়া একখানি আসনের উপর বসিয়া পান সাজিতেছিলেন। কিছু দূরে ঘরের কোণে আসনের উপর উপবিষ্ট ভৈরবী বাম হস্তে গাঁজা রাখিয়া ডান হস্তের আঙ্গুল দ্বারা তাহা মলিতে মলিতে বারুণীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "আয় কলকেমুখী বেটী, কাছে এসে ব'স।" কলিকা হইল তাঁহার প্রাণদাতা গঞ্জিকার আধারবস্তু, অতএব অন্য কোন্ সম্বোধনে আর তৎপ্রতি তাঁহার প্রাণের অনুরাগ এমন পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করিতে পারেন!

কিন্তু ভৈরবীকে দেখিলেও যেমন বারুণী বিরক্ত হয়, তাঁহার কথা শুনিলেও তেমনই তাহার গায়ে জ্বালা ধরে। এমন কি, তাঁহার আদরবাক্যও গালিগালাজের মতই তাহার সর্ব্বাঙ্গে বিঁধিতে থাকে। বারুণী বসিল না, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, ভৈরবী তাঁহার হাতের গাঁজা কলিকার মুখে রাখিয়া তাহা নামাইয়া রাখিয়া, বারুণীর জন্য আনীত টিপ-কৌটা অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। আলখাল্লার এই থলিটি তাঁহার সম্পত্তি-ভাণ্ডার; যত কিছু প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিতে ভরপুর। তিনি চলিবার কালে ইহা জাহাজের পালের মতই ফুলিয়া তাঁহার ক্ষুদ্র দেহটির অগ্রে অগ্রে চলে, আর বসিলে উদরীরোগের আনুমানিক সিদ্ধান্তে ভক্ত-হৃদয় মমতা-পূর্ণ হইয়া উঠে। তাঁহার আলখাল্লার এই চলন্ত মূর্ত্তি দেখিলে দর্শকের হাস্য সংবরণ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে, কিন্তু বাস্ রে! হাসিলে কি আর রক্ষা আছে! ক্রুদ্ধ অভিশাপবাক্যে তৎক্ষণাৎ তাহার লয়প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা। সাধারণ অশ্রাব্য গালিগালাজের বুলি যদিও তিনি ব্যবহার করেন না, কিন্তু তিনি বিড়বিড় করিয়া যাহা বলেন, অভিধান-অলব্ধ সেই দুর্ব্বোধ্য ভাষা তাহাকে অধিকতর ভীত করিয়া তোলে। ভৈরবী খুঁজিয়া পাতিয়া বুকের ভিতর হইতে অবশেষে কৌটাটি বাহির করিয়া বলিলেন, "আয় রে তুফান-তুলুনীর বেটী আয়, টিপ পরিয়ে দিই।"

বারুণী নড়িল না। মা বলিলেন, "যা, ভৈরবী মা'কে প্রণাম কর গিয়ে।"

এই সময় বাতাসী জ্বলন্ত টীকা আনিয়া কলিকার উপরে রাখিল। যদিও ভৈরবীর আলখাল্লার মধ্যে চকমকি প্রভৃতি আগুন প্রস্তুতের সরঞ্জামাদি থাকিত, কিন্তু গৃহস্থ-বাটীতে আসিলে তিনি নিজে আগুন জ্বালাইতেন না। জ্বলন্ত গাঁজার কলিকাটি বাতাসী তাঁহার হাতে ধরিয়া দিবামাত্র ভৈরবী টিপের কৌটা নীচে রাখিয়া দুই হাতে কলিকাটি ধরিয়া সজোরে একবার টান দিয়া ধোঁয়াটা উড়াইয়া দিলেন।

কি বীভৎস-দৃশ্য! বারুণীর অসহ্য হইয়া উঠিল; সে মৃদু স্বরে মা'কে বলিল, "মা, আমি রান্নাঘরে যাচ্ছি।"

ভৈরবী তাহা শুনিতে পাইলেন। গাঁজার ধূম তখন তাঁহার মাথায় বেশ চড়িয়া উঠিয়াছে; ক্ষেপা মেজাজে বলিলেন, "চ'লে যাওয়া হচ্ছে! কোথা যাবি রে দেমাকী বেটী! আয় বলছি, নইলে ভাল হবে না।"

অরুন্ধতী ভীত হইয়া পড়িলেন। দুর্ব্বাসা মুনির

অভিশাপের মতই কথাটা তাঁহার প্রাণে গিয়া বাজিল। করুণ অনুরোধে তিনি ভৈরবীকে বলিলেন, "ভৈরবী-মা, ছেলেমানুষের উপর রাগ করবেন না। যা বারু, যা, প্রণাম কর ওঁকে।"

অতঃপর অরুন্ধতী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বারুণীর হাত ধরিয়া তাহাকে ভৈরবীর নিকটে টানিয়া আনিয়া আবার বলিলেন, "প্রণাম কর।" বারুণী এ বার বিনা বাক্যে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকটে বসিল। ভৈরবী গাঁজার কলিকাতে জোরে আর একটা টান দিয়া হাসিয়া বলিলেন, "ভাল হবে, ভাল হবে বৈ কি, দাও ত মা, দাও ত মা অরুন্ধতী, ধূমধুমানী বেটীকে একটা টিপ পরিয়ে, আমি এবার আকুড়ায় যাই।" অরুন্ধতী মেঝের উপর হইতে কৌটাটি হাতে লইলেন, তাহার পর ঢাকনা খুলিয়া একটি টিপ কন্যাকে পরাইয়া দিলেন। ভৈরবী আহ্লাদে বলিয়া উঠিলেন, "আঃ ম'রে যাই, ঠিক যেন সাগর-জলে তুফানহুলুনি!" বলিয়া তিনি তাঁহার আল-খাল্লার মধ্য হইতে একটি ক্ষুদ্র হুঁকা বাহির করিলেন। এইটি তাঁহার থলির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসবাব। দরকারমত ইহার মস্তকে চড়ে তাঁহার গাঁজার কলিকা,—আর বিনা দরকারে ইহার দেহে-চড়ান তারে তাঁহার আঙ্গুলের আঘাত পড়ে। ভৈরবী কলিকার ছাইটা মেঝের উপর ঢালিয়া দাসীর হাতে দিলেন। সে তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া জল ঢালিয়া কলিকাটা ঠাণ্ডা করিয়া আনিয়া দিল। তখন তিনি কলিকাটি থলির মধ্যে পুরিয়া হুঁকার বীণাটি হাতে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তার পর প্রীং প্রীং করিয়া গান ধরিলেন—

"বম্ বম্ ববম্ ববম্ ভৈরবা ভৈরবী!
দুনিয়া ভরা সাগর তুফান
তোরা—কে মরবি আর কে রবি?
হ্রীং হ্রীং হ্রীং প্রীং প্রীং প্রীং,
কি করলি তুই ও ঠাকুর!
পুণ্যি নিয়ে মন্তি দিলি
ভক্তি ভক্ত সব ফতুর।
বম্ বম্ বম্ গাঁজায় দে দম্ ভৈরবা ভৈরবী।
ভক্তি মুক্তি সিদ্ধি সাধন
ফাঁকিজুঁকি আর সবই?"

গাহিতে গাহিতে তিনি চলিয়া গেলেন।

পরদিন বৈকালবেলা খবর আসিল, মিষ্টার দত্ত যে জাহাজে আসিতেছিলেন, সে জাহাজ ডুবিয়া গিয়াছে।

৩

য়ুরোপব্যাপী মহাসমরের আরম্ভকাল ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ। নিম্নলিখিত কাহিনীটি তাহার বহু বৎসর পূর্ব্বে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। অতএব এখন হইতে ধরিলে সে আজ প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা।

তৃতীয় প্রহর রাত্রি, ঊর্দ্ধদেশে চন্দ্রহীন আকাশ—তারকারাজ্যের একখানি বিরাট—বিচিত্র চিত্রপটের ন্যায় প্রতিভাত। অগণ্য নক্ষত্র-ঘন মৃদু-জ্যোতিঃ ছায়া-পথের উভয় পার্শ্বে কোথাও বা বড় বড় দুই চারিটি উজ্জ্বল গ্রহনক্ষত্র, কোথাও বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারকারাজি শ্রেণীতে শ্রেণীতে, গুচ্ছে গুচ্ছে, মাঝে মাঝে বা বিরল সংখ্যায় সঙ্গিহারা বিজনচারী বেশে দ্যুতি বিস্তার করিতেছিল। নিম্নে গঙ্গাসাগর এই আলোকচ্ছটা বক্ষে ধারণ করিয়া তরঙ্গলীলায়িতরূপে অবিরাম গর্জ্জনে মহাসাগরের উদ্দেশ্যে প্রধাবিত হইয়াছিল।

এমন সময় দুই জন স্ত্রীপুরুষ তীরদেশে বালুকা-পারে কাঁটা-বনের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। ইহারা স্বামি-স্ত্রী। স্ত্রীর বক্ষে একটি নিদ্রিত শিশু সন্তান। সন্ধ্যাকালে পুরুষটি কলাগাছের একটি ভেলার উপর তালপাতার একটি ডোঙা আঁটিয়া এই ঝোপের নীচে রাখিয়া গিয়াছিল। এখানে আসিয়া কলার ভেলা টানিয়া লইয়া স্ত্রীর সহিত সে উপকূলে পৌঁছিল,—তরঙ্গস্পর্শ হইতে দুই এক হাত তফাতে ভেলাখানি নামাইয়া রাখিয়া স্ত্রীর বক্ষ হইতে শিশু সন্তানটিকে লইয়া ডোঙার মধ্যে তাহাকে শোয়াইয়া দিল। শিশু জাগিল না, কান্দিল না, সামান্যমাত্রায় অহিফেন-সেবিত হইয়া সে বেশ অঘোরে ঘুমাইতেছিল।

পত্নী মৃতবৎসা, তাহার সন্তান হইয়া রক্ষা পায় না। এই নিমিত্ত সন্তানটি ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্ব হইতেই সাগরের উদ্দেশে তাহারা শিশুকে মানত রাখিয়াছে। শিশু এখন এক বৎসরের। মাতা আবার অন্তঃসত্ত্বা, এবার মানত রক্ষা না করিলেই নয়। বিলম্ব হইলে দেবতার ক্রোধানলে বর্ত্তমান

পুত্র ও ভাবী সন্তান উভয়েই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, এই বিশ্বাস তাহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল।

শিশুকে ভেলায় শোয়াইয়া, সমস্ত প্রাণ তাহার উপর ঢালিয়া দিয়া, মর্ম্মভেদী আকুল দৃষ্টিতে পিতা-মাতা উভয়েই মুহূর্ত্তকাল তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। নক্ষত্র-দেবতাগণ একসঙ্গে জ্বলিয়া উঠিয়া বালকের মূর্ত্তি জ্যোতির্ম্ময় করিয়া তুলিল। মাতা ক্ষিপ্তের ন্যায় কান্দিয়া শিশুকে ক্রোড়ে উঠাইয়া লইতে গেলেন। স্বামী বনমালী সবল হস্তে তাঁহাকে বাধা দিয়া মনের বেদনা ক্রোধের আগুনে জ্বালিয়া কহিলেন,—"সর্ব্বনাশী, ক্ষান্ত দে, চিরকাল সর্ব্বনাশ ক'রে এসে এখনও তোর আশ মিটল না? নতুন ক'রে আবার সর্ব্বনাশ করতে চাস্?"

এ ভৎর্সনা পত্নী ক্ষেমঙ্করীর মর্ম্মের শিরায় শিরায় বিঁধিল। স্বামী ত ঠিক কথাই বলিতেছেন, অভাগিনী-ই ত সর্ব্ব অনর্থের মূল। সে মৃতবৎসা না হইলে ত আজ এই ভয়ঙ্কর অবস্থায় তাহাদিগকে পড়িতে হইত না। স্ত্রী উত্তোলিত হস্ত গুটাইয়া লইয়া চীৎকার করিয়া কান্দিয়া উঠিল। স্বামীর নয়নও অশ্রুজলে অন্ধ হইয়া গেল। দুই হাতে চোখের জল ঝাড়িয়া ফেলিয়া নরম স্বরে কহিলেন, "একে ঘরে নিয়ে গিয়ে কি রক্ষা করতে পারবি গো তুই? এ যে দেবতার মানত, দেবতার নিবেদিত ধন, কত রকম ছদ্মবেশে ঘরে ঢুকে সাগর-দেবতা তাঁর ধন তুলে নিয়ে যাবেন। একেও বাঁচাতে পারবিনে, আর যেটিকে গর্ভে ধ'রে আছিস, সেটিকেও হারাবি। তুই স'রে দাঁড়া।"

স্ত্রী দুই হাতে চোখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িল। স্বামী দুই হাতে ভেলা ধরিয়া জলে ভাসাইল। কিন্তু মনের কঠোর কর্ত্তব্য কার্য্যতঃ সে ঠিক পালন করিতে পারিল না। সমস্ত প্রাণে ভেলা ঠেলিয়া দিতে সে অক্ষম হইল; কম্পিত দুর্ব্বল-হস্ত-চালিত ভেলা বেশী দূর গেল না; একটিমাত্র বিপরীতগামী তরঙ্গবলে তাহা পুনরায় পিতার হাতের কাছে আসিয়া পৌঁছিল। মাতা ব্যগ্র হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "ফিরে এল গো বাছা আমার! সাগর দয়া ক'রে ফিরে দিলেন আমার কোলের ধনকে তুলে নাও গো, তুলে নাও। আমার বুকে তুলে দাও, বুকটা ঠাণ্ডা হয়ে যাক।"

ভক্তিসংস্কারান্ধ বনমালী কহিল, "কি ক'রে জানব যে, তিনি দয়া ক'রে ফিরিয়ে দিয়েছেন? আমরা যে কাঁদতে কাঁদতে দান করেছি, যদি অশ্রু-হীন চোখে কর্ণরাজার মত বিশ্বাসে ছেলে দান করতে পারি, আর সাগরদেব তখনও যদি ফিরিয়ে দেন, তবেই বুঝব তাঁর দয়া।"

হৃদয়ে ভক্তিবল সংগ্রহ করিয়া অশ্রুহীন নেত্রে সবল হস্তে এবার বনমালী ভেলা ঠেলিয়া দিল। ভেলা আর ফিরিল না,—তরঙ্গে তরঙ্গে উঠিয়া পড়িয়া চলিল। একবার যেন শিশুর ক্রন্দনধ্বনি তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল,—একবার যেন দুইটি ছোট হাত ঊর্দ্ধে উঠিয়া পিতামাতার ক্রোড় প্রার্থনা করিল। তাহার পর আর কিছুই দেখা বা শুনা গেল না। দূর হইতে দূরান্তরে চলিতে চলিতে ভেলাখানি অদৃশ্য হইয়া পড়িল।

* * * *

পিতা-মাতা মানত রক্ষা করিল বটে, কিন্তু ভক্তি-বিশ্বাস তাহাদের মনঃকষ্ট দূর করিতে পারিল না। পুত্রশোকে ক্ষেমঙ্করী পাগল হইয়া গেল। উন্মত্তাবস্থাতেই তাহার একটি কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। ইহার পর হইতে ক্রমশঃ তাহার বাতুলতা যদিও কমিয়া আসিতে লাগিল, কিন্তু পূর্ব্বস্মৃতি সে পুরাপুরি ফিরিয়া পাইল না। এক দিন যে ইহার অগ্রজকে তাহারা সাগরজলে বিসর্জ্জন দিয়াছে, এ কথা তাহার মনে নাই। নবজাত শিশুকে সে তাহার পূর্ব্বশিশু বলিয়াই জানে। পাগলিনী ভুলিল না কেবল পূর্ব্ব-মানতের কথা। এক দিন ইহাকে সাগরজলে নিক্ষেপ করিতে হইবে, এ কথা মনে করিয়া আতঙ্কে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতেই সে কন্যাকে স্তন্য দান করিত।

স্ত্রী পুত্রশোক ভুলিল পাগল হইয়া, স্বামী পুত্রশোক ভুলিতে চেষ্টা করিল গুরু ধরিয়া। গুরুর কৃপায় ধূমপানমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ক্রমশঃ ক্ষেপামীতে তিনি স্ত্রীকেও ছাড়াইয়া উঠিলেন।

মেদিনীপুর জিলার রাঘবপুর গ্রামে বনমালীর নিবাস। গ্রামের মধ্যে সে ছিল এক জন সম্পন্ন লোক। জমী-জমা, গরু-বাছুর, ধানের মরাই, কৃষাণ, ভৃত্য এ সবই তাহার ছিল, ইহা ছাড়া সে মহাজনী কারবারও চালাইত। ইহার দৌলতে গ্রামভরা চালা ঘরের মধ্যে তাহারই ছিল একখানি কোটাবাড়ী। তাহারা নিঃসন্তান, এই দুঃখ ছাড়া

সাংসারিক কোন রকম দুঃখই তাহাদের ছিল না, কিন্তু রোগমুক্ত হইয়া ক্ষেমঙ্করী এক নূতনতর দুঃখের ভিতর পড়িল। সে দেখিল, স্বামী গাঁজার মোহে সর্ব্বস্বান্ত হইতে বসিয়াছেন। দিবারাত্রি প্রায় তাঁহার ভণ্ড সাধু-সন্ন্যাসীর সহবাসে কাটে। তিনি এখন চেলা নহেন, স্বয়ং গুরু। বাটীর উঠানে প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে তিনি বোম্ ভোলানাথ গুরু সাজিয়া বসেন, আর বামাচারী, কামাচারী, তান্ত্রিক, শৈব, উদাসপন্থা, নাগা প্রভৃতি সর্ব্বদলভুক্ত চেলাগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বীভৎস অনাচারে রত থাকে। ক্ষেমঙ্করী সে দিকে মোটেই ঘেঁসেন না, কখন কখন দূর হইতে উঁকি মারিয়া তাহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, তখন উঠানের অগ্নিকুণ্ড হইতে ঝলক উঠিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ যেন ঝলসিয়া দিয়া যায়। তিনি ঘরে ঢুকিয়া কন্যাকে বুকে লইয়া সে জ্বালা নিবৃত্তি করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু এরূপ ভাবে বেশী দিন চলিল না। চেলাদের রসদ যোগাইতে ক্রমশঃ বনমালী যথাসর্ব্বস্ব খোয়াইলেন। জমী-জমা, ধান-চাল, গরু-বাছুর, গহনাপত্র সমস্তই দেনার দায়ে বিকাইল, বাড়ীটিও ক্রমে নীলামে চড়িল। চেলার দল বেগতিক দেখিয়া সরিয়া পড়িল। বনমালী স্ত্রী-কন্যা লইয়া নদীতীরের শ্মশানে আশ্রয় গ্রহণ করিল। গ্রামের লোক চাঁদা করিয়া সেইখানেই একখানি খড়ো-ঘর তাহাদের জন্য বাঁধিয়া দিল। আহার্য্যও তাহারাই যোগান দিতে লাগিল। আমাদের দেশে সাধু-সন্ন্যাসীর অন্নকষ্ট কখনও ঘটে না।

মেয়েটি এই দুঃখ-কষ্টের মধ্যে মাতৃস্নেহে দুই বৎসরের হইয়া উঠিল। তখনও যে স্বামী মানত-পালন জন্য তাহাকে গঙ্গাসাগর তীর্থে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিতেছেন না, এই ভাবিয়া ক্ষেমঙ্করী মাঝে মাঝে আশ্চর্য্য বোধ করিত। তাহার মনে হইত, নেশার ঘোরেই সে কথা তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন, ইহাতে ক্রমশঃ সে বেশ আশ্বস্ত হইয়া উঠিল। এই দৈন্য-দারিদ্র্যের মধ্যে কন্যার মুখ দেখিয়া সে সব ভুলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু স্বামী ভুলিলেও নিষ্ঠুর নিয়তি যে সে কথা ভুলে নাই, ক্ষেমঙ্করী এক দিন ভাল করিয়াই তাহা বুঝিল। সহসা বিনা মেঘে বজ্রপাতের ন্যায় সে কন্যাকে হারাইল। স্নানান্তে এক দিন নদী হইতে ফিরিয়া সে দেখিল, কন্যা অচেতন হইয়া পড়িয়াছে, তাহার মুখ দিয়া ফেনা উঠিতেছে, নেত্রতারকা ঊর্দ্ধে তুলিয়া সে ঘন ঘন শ্বাস ফেলিতেছে। ক্ষেমঙ্করী কন্যাকে একবার নাড়াচাড়া করিয়া চীৎকারপূর্ব্বক কান্দিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে ক্ষুদ্র বালিকার প্রাণ-বায়ুটুকু বাহির হইয়া গেল।

সর্পাঘাতে কন্যার মৃত্যু হইয়াছে, এই অনুমানে বনমালী মৃত কন্যাকে বক্ষে লইয়া জলে ভাসাইতে চলিল, আজ সঙ্গে আগত ক্ষেমঙ্করীর নয়নে জল নাই—মুখে হাহাকার নাই, মৃত কন্যাকে যে তাহারা জলে ভাসাইতে চলিয়াছে, এ জ্ঞান তাহার নাই। তাহার মনে হইল, তাহারা মানত রক্ষা করিতে চলিয়াছে। স্বামী কন্যাটিকে জলে ফেলিয়া দিবার সময় সে যখন চক্ষু বুজিল, মুহূর্ত্তের জন্য পূর্ব্বস্মৃতি তাহার মানসপটে সহসা ভাসিয়া উঠিল; কিন্তু আবার যখন সে চোখ খুলিল, সে স্মৃতি তখন মনের কোণে মিলাইয়া পড়িয়াছে। মানত রক্ষা করিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিয়াই সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। সযত্নে পত্নীর মূর্চ্ছাভঙ্গ করিয়া বনমালী তাহার হস্তে গাঁজার কলিকা তুলিয়া দিয়া কহিলেন, "সর্ব্বদুঃখ দূর হোক্ তোর ক্ষেমা, আমাকে গুরু ব'লে মেনে এই ধোঁয়া পান কর ত লক্ষ্মীটি।"

ক্ষেমঙ্করী স্বামীর চরণে নত হইয়া গাঁজার কলিকা লইয়া মুখে ঠেকাইল। অতিরিক্ত গাঁজা খাইয়া ইহার কিছুদিন পরে স্বামীও ইহলোক ত্যাগ করিয়া গেলেন। সংসার-বন্ধনমুক্ত ক্ষেমঙ্করী ভৈরবীর দলে মিশিয়া দেশ-দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

৪

ইহার ১২ বৎসর পরে কাকদ্বীপের জমীদার নিখিলচাঁদের পত্নী করুণাময়ী বৈদ্যনাথ-মন্দিরের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, অদূরে একটি নির্জ্জন গাছের তলায় এক ভৈরবী বসিয়া আছেন এবং সম্মুখস্থ জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের দিকে চাহিয়া বিড় বিড় করিয়া মন্ত্র পাঠ করিতেছেন। এই ভৈরবীর মাহাত্ম্য তিনি বৈদ্যনাথের অনেকের মুখেই শুনিয়াছেন। করুণাময়ী নিকটে আসিবামাত্র মন্ত্রপাঠ বন্ধ করিয়া ভৈরবী প্রাতঃ-সূর্য্যের দিকে একবার চাহিলেন,

তাহার পর মাটী হইতে শূন্য কলিকাটি হাতে লইয়া তন্মধ্যে গাঁজা ঠাসিতে লাগিলেন। করুণাময়ী নীরবে বসিয়া রহিলেন। কার্য্য শেষ হইলে হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া করুণাময়ীকে ভৈরবী বলিলেন, "ভাল হোক্ বেটী, তোর ভাল হোক্। কি চাস তুই?" বলিয়া তিনি চিমটার দ্বারা অগ্নিকুণ্ডের আগুন উঠাইয়া গাঁজা ধরাইয়া তাহাতে টান দিলেন।

করুণাময়ী বলিলেন, "সেই আশীর্ব্বাদই চাইতে এসেছি, ভৈরবী-মা। আমাকে দয়া করুন।"

ভৈরবী তখন মুখ হইতে ধূম ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "কেই বা ভাল করে, কেই বা মন্দ করে! কি বা ভাল, কি-ই বা মন্দ রে বেটী?"

করুণাময়ী বলিলেন, "ও কথা শুনবো না আমি, ভাল করতেই হবে আমার, নইলে পায়ে হত্যা দিয়ে প'ড়ে থাক্‌ব।"

ভৈরবী গাহিলেন,—

"বম্ বম্ বম্ ববম্ ববম্ ববম্ ভৈরবা ভৈরবী,
তুনিয়া জোড়া সাগর-তুফান, তোরা কে
মরবি আর কে র'বি।"

তাহার পর হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "তুই কি বেটী সন্তানহারা?"

করুণাময়ীর ভক্তি আরও বাড়িয়া উঠিল; অশ্রু মুছিয়া বলিলেন, "তুমি ত বুঝতেই পারছ সব। আমি অধিক কি আর বলব। আমি, মা, বড় দুঃখী, অনেকগুলি সন্তানকে অকালে যমের হাতে তুলে দিয়েছি। সম্প্রতি কোলের ছেলেটিকেও তাঁকে দিয়ে এসেছি। আশীর্ব্বাদ কর, ভৈরবী-মা, যে ক'টি এখনও বাকী আছে, তাদের যেন না হারাই। গ্রহশান্তির জন্য যা তুমি চা'বে, তাই দেব আমি।" করুণাময়ী এই কামনায় সাধু-সন্ন্যাসী দৈবজ্ঞ প্রভৃতি অনেকরই উদরপূর্ত্তি করিয়া আসিতেছেন।

ভৈরবী একটু হাসিয়া কলিকাটা মুখ হইতে হাতে লইয়া বলিলেন, "টাকা-কড়ির ভাবনা অনেক কাল এড়িয়েছি, বেটী! শান্তি-অশান্তিও আমার হাত ধরা নয় রে; ভজন-পূজন, সিদ্ধি-সাধন সব মিছে রে বেটী, সব মিছে। তার পিছে কেন ঘুরে বেড়াচ্ছিস্?"

করুণাময়ী দেখিলেন, টাকার কথা বলিয়া তিনি ভুল করিয়াছেন। মিনতির স্বরে কহিলেন, "ভৈরবী-মা, অজ্ঞানের দোষ নিও না। আমার ছেলেগুলি যেন রক্ষা পায়, এই দয়াটুকু তোমায় করতেই হবে।"

ভৈরবী বলিলেন, "তোর এখন ক'টি ছেলে বেটী?"

করুণাময়ী বলিলেন, "সাতটি ছেলের মধ্যে এখন মোটে দাঁড়িয়েছে তিনটি, ভৈরবী-মা।"

তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে ১৩ বৎসরের একটি বালক আসিয়া মাতার পিঠের দিকে বসিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিল। করুণাময়ী ভৈরবীকে বলিলেন, "এইটি আমার বড় ছেলে।"

ভৈরবী প্রফুল্ল দৃষ্টিতে তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। মাতা পুত্রকে বলিলেন, "যা সাগর, ভৈরবীকে প্রণাম কর।"

বালক প্রণাম করিবার পর ভৈরবী ভূপতিত এক খণ্ড অঙ্গার হস্তে গ্রহণ করিয়া তাহার দ্বারা বালকের কপালে তিলক-রেখা টানিয়া দিয়া কহিলেন, "যা বেটা, তোর আর কোন মার নেই।"

করুণাময়ী আনন্দিত চিত্তে ভৈরবীকে পুনঃ প্রণাম করিয়া পুত্রকে কহিলেন, "যা বাবা, তুই তোর ভাই তু'টিকে এখানে নিয়ে আয় দেখি।"

বালক চলিয়া গেল। ভৈরবী বলিলেন, "তোর এমন সব ছেলে রয়েছে বেটী, তুই তবু কাঁদিস্?"

করুণাময়ী কহিলেন, "আগে ত বলেছি, মা, সাতটির মধ্যে এখন তিনটিতে ঠেকেছে, তাইতে ভয় পাই।"

ভৈরবী বলিলেন, "তবু ত তিনটিও তোর সঙ্গে আছে, বেটী, আমার যে একটিও নেই।"

এই দুঃখের স্বর করুণাময়ীর মর্ম্ম স্পর্শ করিল। ভৈরবী আবার বলিলেন, "তোর সন্তানগুলি যে যম গ্রহণ করেছে, আর আমি যে আমার নিজের ছেলেকে নিজের হাতে জলে ভাসিয়ে দিয়েছি।"

করুণাময়ী স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। ১২ বৎসর পূর্ব্বকার কথা তাঁহার মনে পড়িল। তাঁহার প্রথম গর্ভের শিশু হারাইয়া তিনি তখন বড় কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। স্বামী নিখিলচাঁদ স্ত্রীকে সুস্থ

করিবার অভিপ্রায়ে নিজের ষ্টীমলঞ্চে জলভ্রমণে জমীদারী কাকদ্বীপ পরিদর্শনে আসিলে সেই সময়ে বালকটিকে তিনি এক দিন তীরদেশে লাভ করেন। শিশুহারা করুণাময়ী এই শিশুটিকে পাইয়া দেবাশীর্ব্বাদ-স্বরূপ ইহাকে বক্ষে তুলিয়া লইলেন। অহার পর তিনি অনেকগুলি সন্তানের মাতা হইয়াও ইহাকে জ্যেষ্ঠপুত্রতুল্যই স্নেহচক্ষুতে দেখেন। সাগরলব্ধ বলিয়াই তাহার নাম হইয়াছে সাগরদত্ত।

ভৈরবীর কথায় করুণাময়ীর সহসা মনে হইল, তবে কি আমার সাগরদত্ত এই ভৈরবীরই সন্তান না কি! তিনি একটু দম লইয়া থামিয়া থামিয়া বলিলেন, "যে ছেলেটিকে আপনি দেখলেন, ভৈরবী-মা, সেটিকে আমি গর্ভে ধরিনি, সাগরতীরেই আমরা ওকে কুড়িয়ে পেয়েছিলুম।"

ভৈরবী চোখ বুজিলেন, কিছু পরে চোখ খুলিয়া বলিলেন, "কিন্তু সেটি যে আমার কন্যাসন্তান।" বলিয়া ক্ষিপ্তের মত উঠিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

৫

প্রায় দশ মাস কাল 'ভুনেরা' জাহাজখানি জলমগ্ন হইয়াছে। ইহার মধ্যে সাগরদত্ত ও বারুণী উভয়েরই পিতামাতার চোখের জল যদিও অনেকটা শুকাইয়া আসিয়াছে, কিন্তু মনের আগুন এবং প্রাণের আশা এখনও নিঃশেষে নিবিয়া যায় নাই। মৃতের তালিকায় তাহার নাম না মেলায় হতাশ্বাসভরা প্রাণও মাঝে মাঝে আশাদীপ্ত হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু জীবিতের লিষ্টেও ত তাহার নাম নাই। সে বাঁচিয়া থাকিলে কি কোন না কোন রকমে সে খবরটা মিলিত না, এই ভাবিয়া সেই আশালোকও আবার নিরাশাক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে। এইরূপ আশানিরাশার স্বপ্ন-প্ররোচনায় কখনও বিশ্বাসে, কখনও সন্দেহে, কখনও ধীরচিত্তে, কখনও অধীরপ্রাণে তাঁহারা ভগবৎপ্রসাদ ভিক্ষা করিতেছেন।

নিখিলচাঁদের কেবলই মনে পড়ে সেই পুরাতন দিনের কথা,—যে দিন তিনি সাগরকে তীর হইতে কুড়াইয়া আনিয়া স্ত্রীর তাপিত বক্ষ জুড়াইয়া দিয়াছিলেন। কি সুন্দর দেখিতে ছিল শিশুটি! তাহার মাথাভরা কালো চুল, জলে ভিজিয়া যত্র-কুঞ্চিত অলকদামের ন্যায়ই গুচ্ছে গুচ্ছে তাহার মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। প্রাতঃসূর্য্য বালকের রূপমুগ্ধ হইয়াই যেন সস্নেহে তাঁহার যত কিছু সোনার রং তাহার অঙ্গে ঢালিয়া দিয়াছিলেন। শিশু তীর-দেশ আলো করিয়া ঘুমাইতেছিল। আহা! কাহার শিশু এ! কেমন করিয়া এখানে আসিয়া পড়িল? বুঝি বা কোন নৌকাডুবি হওয়াতে বালক জলে পড়িয়াছিল; বরুণদেব তাহাকে রক্ষা করিয়া তীরে রাখিয়া গিয়াছেন! শিশুকে কোলে তুলিয়া তাঁহার সে দিন এইরূপ কথাই মনে হইয়াছিল। আজ মনে হইল, সাগরদেব শিশুকালে যাহাকে রক্ষা করিয়াছেন, যৌবনেও কি তাহাকে রক্ষা করিবেন না? তাহা যদি না করেন, তবে যে তাঁহার দয়া অর্থশূন্য হইয়া পড়ে।

সাগরদত্তের কথা মনে করিতে করুণাময়ীর বেশী করিয়া মনে পড়িত ভৈরবীকে। তিনি প্রাণ ভরিয়া যে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন, তাহা কি মিথ্যা হইতে পারে? বালকের কপালে তিলকরেখা টানিয়া দিয়া তিনি যে অভয় প্রদান করিয়াছিলেন, দেবীতুল্য ভৈরবীর সেই 'মা ভৈঃ' বাক্য কি নিষ্ফল হইবে? কখনই না—কখনই না। তাহা হইলে সাধন, সিদ্ধি, দৈবশক্তি সবই মিথ্যা।

সাগরকে হারাইয়া বারুণীর মাতারও তাহার শৈশবকালের কথাই অধিক করিয়া মনে পড়িত। তখনও অরুন্ধতীর কোন সন্তানাদি জন্মে নাই। তিনি এই সুন্দর বালকটিকে দেখিবামাত্র করুণাময়ীর সহিত "বেয়ান" পাতাইয়া লইলেন। বলিলেন, "এই ছেলেকেই জামাই করব আমি।"

করুণাময়ী বলিলেন, "ছেলের যদি তোর মেয়েকে পছন্দ না হয়?"

কথাটা অরুন্ধতীর হাস্যকর লাগিল, বলিলেন, "তা হবে না বৈ কি! দেখে নিস্ তখন। তোর ছেলের নাম সাগর, আমার মেয়ের নাম রাখব আমি বারুণী, জানিস্ ভাই!"

"কেন, সাগরিকা নাম ত আরও ভাল।"

অরুন্ধতী বলিলেন, "আরে তো ছেলের যেন সাগরে জন্ম হয়েছে, আমার মেয়ে ত আর সাগরে জন্মাবে না। তুই যদি ছেলের নাম বরুণ রাখ-তিস্, তা হ'লে বরঞ্চ আরও ভাল হ'ত, একটু নতুন রকম শোনাত। সাগর নামটা কিন্তু বড় পচা।"

এইরূপ রহস্যালাপের মধ্যে অরুন্ধতীর পরে পরে কন্যা-সন্তানের পরিবর্ত্তে দুইটি পুত্র-সন্তান জন্মিল। করুণাময়ী বলিলেন, "তুই আমাকে দেখছি ফাঁকি দিলি, এখনও ত তোর মেয়ে হ'ল না?"

কিন্তু সাত বৎসর পরে তাঁহাদের আশা ও ইচ্ছা সফল করিয়া বারুণী জন্মগ্রহণ করিল।

তাঁহাদের এত দিনকার আশা অভিলাষ কি সত্য-সত্যই ব্যর্থ হইয়া যাইবে? এই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহারও মনে পড়িয়া যায় ভৈরবীকে। হায় রে, তাঁহার অভিশাপবাক্য ত ফলিয়াছে, তাঁহার আশীর্ব্বচন কি ফলিবে না?

সর্ব্বাপেক্ষা শান্ত ছিল বারুণী। তাহার মনে কোন সন্দেহই ছিল না। তাহার বিশ্বস্ত হৃদয় বলিত, ফিরিবেনই তিনি—নিশ্চয় ফিরিবেন। সূর্য্যের আলোকে, চন্দ্রের জ্যোৎস্নায়, নক্ষত্রের জ্যোতিতে, মেঘের বর্ণে সে তাঁহার প্রফুল্ল স্বাগত মুখই দেখিত। বাতাস কহিত, তিনি আছেন গো, তিনি আসিতেছেন। তরুলতা, ফুল বা মঞ্জরী সকলেই কহিত, তিনি আছেন, তিনি আসিতেছেন। অটল বিশ্বাসে, দৈববলে বারুণী আশ্বস্ত ছিল।

বারুণীর পিতার বোটানিক্যাল গার্ডেনের পার্শ্বে গঙ্গার ধারে একটি বাগানবাটী ছিল, কিছুদিন হইতে বারুণীরা সেইখানে আসিয়া আছে। আজ বিজয়া-দশমী। স্বামী কলিকাতায় গিয়াছেন, অরুন্ধতী বিকালে করুণাময়ী ও নিখিলচাঁদের সহিত গঙ্গার সম্মুখস্থ বারান্দায় আসিয়া বসিয়াছেন। ইঁহারা তাঁহাকে বিজয়ার প্রণাম করিতে আসিয়াছেন। ইঁহারা বসিয়া গল্প করিতেছিলেন সাগরেরই সম্বন্ধে। অরুন্ধতী কহিলেন, "আর কিছু কি খবর এসেছে?"

নিখিলচাঁদ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উত্তর করিলেন, "খবর ত আর কিছুই পাচ্ছিনে।"

করুণাময়ী বলিয়া উঠিলেন, "আমার কি মনে হয় জান? তুমি এক দিন যেমন না চাইতে তাকে আমার কোলে এনে তুলে দিয়েছিলে, তেমনই এক দিন সে হঠাৎ আমাদের সামনে এসে দাঁড়াবে। কে জানে, সর্ব্বদাই আমার এই কথাই মনে হয়।"

পাশের বোটানিক্যাল গার্ডেনের জেটীতে ফেরি ষ্টীমার একখানা লাগিল। দেখিতে দেখিতে তৎক্ষণাৎ কয়েক জন লোক ষ্টীমার হইতে নামিয়া পড়িল, অনেকেই তাহাদের মধ্যে হ্যাটকোটধারী। করুণাময়ী তাড়াতাড়ি রেলিংএর নিকটে আসিয়া বলিলেন, "দেখ দেখ, ঠিক যেন আমার সাগরের মতই শরীরের গঠন না ঐ ছেলেটির? বিলাত যাবার দিন ঠিক ঐ রকম দেখাচ্ছিল আমার সাগরকে। মুখটা যদি একবার তোলে, তা হ'লে ভাল ক'রে দেখতে পাই।"

এই কথায় সকলেই রেলিংএর নিকটে আসিলেন, কিন্তু ততক্ষণ যাত্রীরা জেটী হইতে বাগানে নামিয়া পড়িয়াছে। নিখিলচাঁদ বলিলেন, "হ্যাটকোট দেখলেই যাকে তাকে তোমার মনে হয়, ঐ বুঝি তোমার সাগর। এ ষ্টীমারে সে আসতে যাবে কেন?"

করুণাময়ীর দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল, সত্যই ত এ বৃথা আশা। ষ্টীমার যখন রাজগঞ্জ অভিমুখে চলিয়া গেল, তখন আবার তাঁহারা চৌকিতে আসিয়া বসিলেন। করুণাময়ী আবার ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমার কিন্তু এখনও মনে হচ্ছে, ও সাগর।"

অরুন্ধতী কহিলেন, "তা হ'তেও পারে। হয় ত কলকাতায় এসে খবর পেয়েছে যে, আমরা এখানে আছি।"

নিখিলচাঁদ বাস্তব জগতের লোক। তিনি পূরা অবিশ্বাসের স্বরে বলিলেন, "তা হ'তে পারে না। তা যদি হ'ত, এতক্ষণ এখানে এসে পড়ত।"

তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে সত্যই সাগর তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সকলে মুহূর্ত্তকাল বিস্ময়-স্তব্ধ হইয়া পড়িলেন। করুণাময়ী আনন্দ-গদগদ-কণ্ঠে কহিলেন, "সত্যই কি তুই বাবা, সাগর? দেবতা দয়া ক'রে তোকে ফিরে পাঠালেন?"

বলিতে বলিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সাগরের গলা ধরিয়া কান্দিতে লাগিলেন। সকলে চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় নির্ব্বাক্ আনন্দে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কখন্ যে বারুণী আসিয়া বারান্দার ধারে দাঁড়াইয়াছে, কেহ তাহা লক্ষ্য করে নাই, কিন্তু সাগর তাহা দেখিল এবং উভয়ের মনের তরঙ্গ অন্যের অলক্ষ্যে উভয়ের চোখের মধ্য দিয়া অন্তরে প্রবিষ্ট হইল।

সহসা আর এক জন নবাগতের আগমনে এ নিস্তব্ধ ভাব সহসা তিরোহিত হইল। এ কি! এ যে ভৈরবী! ভৈরবী আজ সে আলখাল্লা ধারণ করিয়া আইসেন নাই। তিনি এখন গৈরিক-ধারী, তাঁহার কেশগুলিও ঈষদ্দীর্ঘ হইয়া মুখখানিকে অভিনব শ্রীযুক্ত করিয়াছে। করুণাময়ী পুত্রকে ছাড়িয়া দিয়া কহিলেন, "প্রণাম কর এঁকে, সাগর, ইনিই তোমার গর্ভধারিণী।" ভৈরবী পূর্ব্বস্মৃতি ফিরিয়া পাইয়াছেন, তিনি নিকটে আসিয়া কহিলেন, "তুমি মা গর্ভধারিণী না হইয়াও প্রকৃত মাতা, তুমি ইহার ধাত্রী—পালয়িত্রী। নিজের স্তন্যদানে তুমি ইহাকে জীবন দান দিয়াছ। আমি কুন্তীর মত নিষ্ঠুরা মা, ইহাকে পুত্র বলিয়া ডাকিবার অধিকার আমার নাই।"

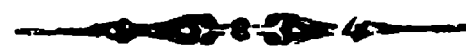
করুণাময়ী বলিলেন, "এ শুভদিনে ও কথা মুখে আনবেন না, ভৈরবী-মা।"

অরুন্ধতী ইতোমধ্যে বারুণীকে দেখিয়া তাহাকে টানিয়া সাগরের পাশে দাঁড় করাইয়া কহিলেন, "আশীর্ব্বাদ কর, মা, তোমার পুত্রকন্যাকে।"

ভৈরবী সানন্দ কণ্ঠে কহিলেন, "স্বস্তি, স্বস্তি, কল্যাণ হোক, কল্যাণ হোক তোদের।"

নীচে গঙ্গার তীরে বিসর্জ্জনের বাজনা বাজিয়া উঠিল। তাহার মধ্য হইতে মধুর বাঁশরীতান ধ্বনিত হইয়া উপরের কয়েকটি লোকের প্রাণে বিজয়ার দিনে আগমনীর মিলন-সঙ্গীতধারা ঢালিয়া দিল।

স্বপ্ন না কি ?



শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত

স্বপ্ন না কি?

——:•:——

১

পূজার ছুটীতে শিমুলতলায় বেড়াইতে আসিয়াছি। ভগিনীপতি জীবনচন্দ্র সরকার এখানকার টেলিগ্রাফ আফিসের হেড বাবু। আজ তাঁহার ডিউটী রাতের বেলা, দিনের বেলা কোন কাজ-কর্ম্ম নাই। তাঁহার আশা ছিল, দিনটা আরামে ঘরে বসিয়া মাসিক কাগজগুলার পাতা উল্টাইবেন। কিন্তু আমাদের পাল্লায় পড়িয়া তাঁহাকে সে সুখে বঞ্চিত হইতে হইল। আমরাও কিছুদিন হইতে এই দিনটির মুখের দিকেই তাকাইয়া আছি। নিকটের পাহাড় হলদি-ঝোরায় গিয়া সে দিন বন-ভোজন করিব, ইহাই ছিল আমাদের সঙ্কল্প। অতএব তিনি রেহাই পাইলেন না। প্রত্যুষে আমরা রুটী, মিষ্টান্ন প্রভৃতি বেশ এক পত্তন ভোজন করিয়া লইলাম। তাহার পর দিদি বাঁশ-বাঁধা একটা ইজিচেয়ারের ডুলিতে বাহক-স্কন্ধে উঠিলেন, আমরা তাঁহার প্রহরী-স্বরূপ পদব্রজে চলিলাম। পাহাড়টি যদিও বেশী উঁচু নয়, কিন্তু চড়াই-পথে উঠিতে নিতান্ত কম পরিশ্রম হয় না। ডুলীওয়ালারা স্থানে স্থানে বসিয়া, কোমরে বাঁধা থলি হইতে তামাকের পাতা বাহির করিয়া হস্ততালুকায় চূণের সহিত মলিয়া খৈনী প্রস্তুত পূর্ব্বক তাহা সেবনে প্রবৃত্ত হইল। আমরাও ইহাতে বিশ্রামের অবসর পাইয়া অসন্তুষ্ট হইলাম না। এইরূপ ঢিলা চালে চলিতে চলিতে আমরা যখন হলদিঝোরার নিকটে সমতল ভূমিতে পৌঁছিলাম, তখন বেলা প্রায় ৯টা। এখানে আসিয়াই দিদি রন্ধনে মনোনিবেশ করিলেন। ভগিনীপতি নিকটে বসিয়া তল্পী-তল্পা খুলিয়া তাঁহাকে যোগাড় দিতে লাগিলেন। আমি পাশে বেকারভাবে দাঁড়াইয়া ভাবিলাম, ভাগ্যিস্ মেয়েজাতটা এখনও নিছক মেয়েমানুষই আছে তাই তবু এখনও একটু-আধটু সেবা-শুশ্রূষা পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু আজকাল মেয়েদের যে রকম পুরুষ গ'ড়ে তোলার প্রস্তাব হচ্ছে, তাহাতে ভবিষ্যৎটা একেবারেই তিমিরাচ্ছন্ন, পুরুষবংশটা তা হ'লে একেবারেই নির্ব্বংশ হবার বিশেষ আশঙ্কা আছে। কিন্তু তা হ'লেই বা এমন কি ক্ষতি! এই ত জামাই বাবু দিদির পাশে ব'সে রান্নার ধোঁয়াটা চুরুটের ধোঁয়ার চেয়েও আরামে উপভোগ কচ্ছেন। তখন না হয় নিজের মুখের চুরুটটা ফেলে দিয়ে উনুনেই দিয়াশলাই ধরান যাবে।"

অতঃপর মনের ভাবটা ইঙ্গিতে প্রকাশ করিয়া দিদিকে বলিলাম, "চল না ভাই, দিদি, একবার একটু ঘুরে আসা যাক্।"

দিদি বলিলেম, "তা হ'লে রাঁধবে কে, মশায়?"

আমি বলিলাম, "জামাই বাবু রয়েছেন কি কর্‌তে? উনি ব'সে খিচুড়ীর হাঁড়িতে কাঠি দিন। তুমি এস, ভাই, বেড়াতে।"

ভগিনীপতি একটা কাষ্ঠদণ্ড আমার দিকে উঠাইয়া বলিলেন, "বটে, খাওয়াচ্ছি তোমাকে ভাল ক'রে। একবার এ দিকে এস ত।" আমি হাসিয়া পলাইলাম।

তাঁহারা রান্না-বান্না লইয়া রহিলেন, আমি ঘুরিয়া অল্প একটু উপরে উঠিয়া ঝরণার পাশের একখানা পাতরের উপর বসিলাম। এই ক্ষুদ্র পাহাড়ে বনানীর কি শোভা! দুই দিকে লম্বা লম্বা তরুশ্রেণী কোথাও অবিচ্ছিন্নভাবে মিলিয়া-মিশিয়া, কোথাও বিচ্ছিন্নভাবে বন-প্রহরীর ন্যায় নীল আকাশের অঙ্গে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। মধ্যভাগে শিখর-প্রদেশ হইতে ঝরণার জলরাশি যেন মহাদেবের জটাজুটপ্রবাহিত গঙ্গাধারার ন্যায় কোথাও বা

উৎক্ষিপ্ত উচ্ছ্বাসে, কোথাও বা ক্ষীণধারায় নীচের পাষাণদেহে পড়িয়া নিরুদ্দেশ প্রবাহে দূরদূরান্তরে যাত্রা করিতেছিল। এই বনস্থলের কোন্ অদৃশ্য স্থানে বসিয়া গৌরী তপস্যারত, কে জানে! কি রুদ্রগম্ভীর দৃশ্য! দেখিয়া মনে হইল, এমন মর্ম্মস্পর্শী শোভা বুঝি আর কখনও দেখি নাই। গত-বৎসর দার্জ্জিলিংয়ে বার্চ্চহিলের রূপেও যে এইরূপ মোহিত হইয়াছিলাম, সে কথা এখন একেবারেই ভুলিয়া গেলাম। হায় রে বিভ্রান্তচিত্ত মানব! কতক্ষণ আমি এইরূপ মুগ্ধচিত্তে বসিয়া ছিলাম, বলিতে পারি না। আহারের ডাকে হঠাৎ চমক ভাঙ্গিল। তখন দেখিলাম, বেশ ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে, অবিলম্বে রন্ধনস্থানে আসিয়া উপনীত হইলাম। দিদি আমার পাতে খিচুড়ী ঢালিতে ঢালিতে বলিলেন, "দেখার সাধ মিটেছে ত? এবার ক্ষিদে মিটিয়ে ভাল ক'রে খা দেখি।"

এই সময় কাঠের বোঝা বহিয়া কতকগুলি বুনো মেয়ে কিছু দূরে একটা গাছতলায় আসিয়া দাঁড়াইল। জামাই বাবু বলিলেন, "দেখার সাধ না মিটে থাকে ত ঐ বনদেবীদের একবার ভাল ক'রে দেখে নাও। দেশে গিয়ে এমন রূপ আর দেখতে পাবে না।"

আমি বলিলাম, "কেন, ওরা কি দেখতে মন্দ না কি? কেমন সুগঠিত বলিষ্ঠ দেহ! আমাদের বাঙ্গালী মেয়েদের মধ্যে এক জনেরও যদি ও রকম চেহারা দেখতে পেতুম ত রাজার হালে বাজারে ব'সে স্বরাজ ঘোষণা কর্‌তুম। আহা, ক্যামেরাটা সঙ্গে না এনে বড় ভুল করেছি।"

জামাই বাবু খিচুড়ীর গ্রাস্ মুখে তুলিয়া বলিলেন, "বাস রে, শুনছ ত তোমার ভাইটির কথা। দেখো ভায়া, বনের মাঝে যেন মনটি হারিয়ে রেখে যেও না—তা হ'লেই সর্ব্বনাশ, এ আমি ব'লে খালাস।"

এইরূপ হাসাহাসি গল্পে আহারটি জমিল ভাল, কিন্তু খাওয়া শেষ করিয়াই ভগিনীপতি গৃহে ফিরিবার ধূয়া ধরিলেন। তখন মাত্র বেলা ২টা। পাহাড়ের দিগ্বিদিক্ সূর্য্যোজ্জ্বল, বনের ছায়াগুলাতেও সোনার রং ফুটিয়া উঠিয়াছিল। পাহাড়ে ঘুরিয়া বেড়াইবার সময়ই ত এই। আমি জিদ ধরিলাম, "তা হবে না। আর একটু ঘুরে ফিরে সেই ৪টার সময় বাড়ী ফেরা যাবে।"

জামাই বাবু কিন্তু নিজের মতলবে অটল থাকিয়া বলিলেন, "বেশ, তুমি তা হ'লে আর একটু থেকে যাও। মগরাকে তোমার কাছে রেখে যাচ্ছি। বাড়ী গিয়ে একটু বিশ্রাম না করলে ত আমার চলবে না। আর পথে নারী-বিবর্জ্জিতা ক'রেও যেতে পারব না। দেখিস্ রে মগরা, বাবুকে ভাল ক'রে পাহাড় দেখিয়ে দিস্। তবে ফিরতে যেন রাত না হয়। তোদের এ ভুতুড়ে দেশ থেকে সন্ধ্যার আগেই নিশ্চয় বাড়ী ফেরা চাই।"

মগরা বলিল, "যে আজ্ঞে।" বহু দিন হইতে বাঙ্গালীর বাড়ী কায করিয়া সে বেশ এক রকম ভাঙ্গা ভাঙ্গা চলনসই বাঙ্গালা বলিতে পারিত।

তাঁহারা চলিয়া গেলেন। আমি একটু এ-দিক্ ও-দিক্ ঘুরিয়া খানিকটা উপরে উঠিয়া ঝরণার ধারে বসিয়া খোসমেজাজে গান ধরিলাম—

ওগো মানসপুরপ্রবাসী,
আঁখি তব দরশন-পিয়াসী—
আশায় স্বপনে মিলায়ে,
থেকো না গো দূরে, ভুলায়ে—
এস এ বক্ষ আলয়ে দুঃখ-কুয়াসা নাশি।"

গানের শেষ কথাটায় ই—ই করিয়া বেশ একটু টান দিয়াছিলাম। পিছনে হাসির রোল উঠিল; ফিরিয়া দেখি, হাসির আবেগে মগরার মোটা-সোটা শরীর কিস্তৃতকিমাকার ভঙ্গীতে আঁকিয়া-বাঁকিয়া উঠিতেছে। আমিও হাসিলাম। না হাসিয়াই বা কি করিব? অসভ্য বুনো মগরা যে আমার গানের সমজদার হইবে, এরূপ মনে করাই ত বোকামী! স্বয়ং তানসেনও ইহাদিগের তৃপ্তিসাধন করিতে পারেন না। তাই অক্ষুব্ধ চিত্তে বলিলাম, "ব্যাপারখানা কি? এত হাসি কেন তোর?"

মগরা। বাবুজীর গান শুনে বড় খুসী আসিল।

আমি। বটে, তা বেশ। আচ্ছা, তবে এবার তুই একটা গান শুনিয়ে আমার মেজাজটা খুসী কর্ দেখি।

মগরা। শুনবে, বাবুজী? তোমাদের রসিক বাবু আমার জন্য একটা গান বেঁধে দিয়েছে।

আমি। রসিক বাবু লোকটা কে?

মগবা। জান না বাবুজী?

সে খানিকটা হাসিল, তাহার পর বলিল, "রসিক বাবু, তিনি রসের কথা কন।"

আমি। আচ্ছা, কি গান বেঁধেছেন তিনি, আমাকে শুনিয়ে দে দেখি।

সে গাহিল :—

"তোম্ তোম্ তানা নানা তা ধিন্ ধিন্ তা ধিয়া।
আও রে মোর পিয়ারীজান্
আও রে পিয়ারীয়া।
তোরে গলায় দিব মটরদানা
কানে ঢেঁড়সিয়া।
তোরে খাইতে দিব মৌয়াপানা
করব তোরে বিয়া॥
বাজবে মাদল ধুম্ ধুম্ গুম্ গুম্
ক্যা বাৎ কেক্কা হিয়া।
আও রে মোর পিয়ারীজান্
নাচ্ রে পিয়ারীয়া॥"

গান শুনিয়া আমারও অবস্থা তাহারই মত হইয়া পড়িল। হাসিতে যেন পাঁজরা ভাঙ্গিয়া পড়িল। মগরার কিন্তু সে হাসির ছোঁয়াচ লাগিল না। সে গম্ভীরভাবে মৃদুহাস্যে বলিল, "বাবুজীর বড্ড হাসি লেগেছে।"

আমি বহু কষ্টে হাসি সামলাইয়া বলিলাম, "তোর পিয়ারীজান্ গান শুনে খুসী হয়েছিল ত?"

সে বলিল, "তা আর হবে না? ভারি নাচন নেচেছিল তানা।"

এই সময় নীচের রাস্তায় মেয়েলী গানের চীৎকার উঠিল। মগরা ত্রাস্তে বলিল, "ঐ গো, সব ঘরে চলেছে, সাঁজ আস্‌ছে। চল, বাবুজী, আর বিলম্ না।"

আমি চারিদিক্ চাহিয়া সাঁজের লক্ষণ কিছুই দেখিলাম না। চারিদিক তখনও বেশ উজ্জ্বল। কেবল আকাশের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটা ম্লানাভ বৃহৎ নক্ষত্রের প্রতিবিম্ব দেখা গেল। ইহা সিরিয়াস বা বৃহস্পতি, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। জ্যোতির্বিদ্যার আলোচনা করি নাই বলিয়া আজ হঠাৎ মনে একটা আপশোষ জাগিয়া উঠিল। যাহা হউক, আমি মগরার কথা অমান্য করিতে পারিলাম না, সঙ্গে সঙ্গেই নামিয়া চলিলাম। সে উপর হইতে নীচে তাহাদের ক্ষুদ্রগ্রামখানি আমাকে দেখাইয়া দিল। সেই দিকেই তখন কাষ্ঠবাহী নরনারী দ্রুত চলিতেছিল। চলিতে চলিতে হঠাৎ পাহাড়ের এক জায়গায় অদ্ভুত ত্রিকোণ চূড়া দেখিতে পাইলাম। মগরা সহসা থমকিয়া দাঁড়াইল; ভীত কটাক্ষে বলিল, "ওঃ, এ কোন্ পথে এসে পড়েছি! যে গান গাওয়ালে, বাবুজী, রাস্তা ভুল হ'য়ে গেল।"

আমি। কেন, এখানে কি?

মগরা। কথা ক'য়ো না মশাই, তফাতে চ'লে এস।

সে এমন হেঁচকা টানে আমাকে কতকটা দূরে আনিয়া ফেলিল যে, তাহার হস্তের ভর না পাইলে নিশ্চয়ই আমি পড়িয়া যাইতাম। সে সেই ত্রিকোণ প্রস্তরচূড়া ছাড়াইয়া পাশের বনের মধ্যে আসিয়া আমার হাত ছাড়িয়া দিবামাত্র আমি একটা গুঁড়ির উপর বসিয়া পড়িলাম। তাহার পর কিছুক্ষণ দম লইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এত ভয় পেলি কেন?"

মগরা। ওটা ভূতের পাহাড়, মশাই।

আমি। দিনের বেলা ভূতের ভয় কি?

মগরা। সাঁজ ত এল।

আমি। ঠিক যেন একটা কাটা গম্বুজের মত দেখতে। উপরে কি পথ আছে?

মগরা। নীচের দিক্ থেকেও একটা সুড়ঙ্গ পথ আছে।

আমি। চল্ না, একবার দেখে আসি।

সে সভয়ে বলিল, "ও যে ভূতের রাজ্যি। পুরান দুষ্ট রাজার আমলে ওটা ছিল জেলখানা। উপর থেকে মানুষকে নীচে ফেলে দিত। আর এখন পাহাড়-পারের কবলা জাতরা এসে ঐখানে মানুষ বলি দিয়ে দেও-পূজা করে।"

হঠাৎ যেন একটা করুণ আর্ত্তনাদ শুনিলাম, কল্পনা না কি? "শুন্‌ছিস্ মগরা?"

মগরা। চল মশাই, ওঠ; পা চালিয়ে চল।

আমি উঠিলাম। আবার সেই অস্ফুট ক্রন্দনধ্বনি! আমাকে তাহা নির্ভীক, সবল, সতেজ করিয়া তুলিল।

মগরা কাঁদিতে লাগিল। বলিল, "ও ভূতের ডাক মশাই—মানুষের কান্না নয়।"

আমি বলিলাম, "মানুষের স্বর এটা নিশ্চয়ই, ভয় কচ্ছিস্ কেন? চল্ আমার সঙ্গে।" আমি তাহার হাত ধরিলাম। এক টানে হাত ছাড়াইয়া

চলিতে চলিতে সে বলিল, "ভূতের সঙ্গে লড়াই করব কি, মশাই, চ'লে এস, আপনি।"

আমি তাড়াতাড়ি তাহার কোমরের কাপড় ধরিলাম, বাধা পাইয়া মুহূর্ত্তকাল সে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, আমি তাহার কোমরের ছোরাখানা টানিয়া লইলাম।

আবার সে দ্রুত চলিতে চলিতে বলিল, "থাম, মশাই, একটু সবুর কর। রাস্তা ছেড়ো না, আমি ওঝা নিয়ে আস্‌ছি।"

বলিতে বলিতে সে অন্তর্দ্ধান করিল।

২

পাহাড়ের কোন্ দিক্ হইতে অস্ফুট মনুষ্যনাদ উঠিয়া কোন্ দিকে যে মিলাইয়া গেল, বুঝিতে পারিলাম না। মগরা থাকিলে তাহা বলিতে পারিত; কিন্তু সে ত চলিয়া গিয়াছে। ঐ পাহাড়স্তম্ভের পাদমূলে সত্যই কি তবে কোন গুহা আছে না কি? আর সেখান হইতেই কি ঐ ধ্বনি উঠিল?

তখনও অন্ধকার হয় নাই। পড়ন্ত সূর্য্যালোকে চারিদিক্ বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। আমি তরু-পত্রঢাকা সেই পাহাড়তলে আসিয়া উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইলাম; কিন্তু কৈ, কোন শব্দই ত শুনিতে পাওয়া যায় না! ফিরিতে গিয়া হঠাৎ গাছের শিকড়ে পা বাধিয়া গেল, পা ছাড়াইতে গিয়া হোঁচট খাইয়া একটা পাতরের উপর বসিয়া পড়িলাম। কি আশ্চর্য্য! পাশেই কি ঐ একটা গুহার মুখ নহে? কে যেন পাতরখানা সরাইয়া ভিতরে ঢুকিয়াছিল; বাহির হইবার সময় তাড়াতাড়িতে গুহামুখ বন্ধ করিতে ভুলিয়া গিয়াছে। একটা উগ্র কৌতূহল আমাকে উদ্রিক্ত করিয়া তুলিল, আমি ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিলাম, সত্যই ইহা একটা সুড়ঙ্গ-মুখ, মুখটা নিতান্ত ছোটও নহে! আমি আস্তে আস্তে মাথা ঢুকাইয়া ভিতরটা দেখিতে চেষ্টা করিলাম, স্থানটা খুব অন্ধকার মনে হইল না, পাশের একটা কোন ফাঁক দিয়া সেখানে আলো ঢুকিতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে ঝরণার মৃদু মৃদু শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিল। কে জানে, এই শব্দই বা তখন গুহাগহ্বরে প্রতিধ্বনিত হইয়া মনুষ্য-কণ্ঠের ন্যায় প্রতীত হইয়াছিল কি না! একবার মনে হইল, ফিরিয়া যাই, কিন্তু কি যেন একটা অলৌকিক শক্তি পিছন হইতে আমাকে গুহামধ্যে ঠেলিয়া দিল। প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, সম্মুখের পরিসর নিতান্ত কম নহে, কিন্তু দাঁড়াইয়া চলিবার উপায় নাই—কারণ, পাহাড় মাথায় ঠেকে। যে পথে আলোক প্রবেশ করিতেছিল, আমি সেই দিক্ লক্ষ্য করিয়া হামাগুড়ি দিয়া চলিলাম। একটা বাঁকা পথে ঢুকিতেই হঠাৎ ঊর্দ্ধদেশ যেন ফাঁক হইয়া পড়িল। আমি সহজভাবে দাঁড়াইয়া তখন আর মাথায় কোন ঠোকর পাইলাম না। আর একটু অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, ইহা একটা ঝরণার ধার। উৎক্ষিপ্ত জলরাশির ছিটায় আমাকে এমন আর্দ্র করিয়া তুলিল যে, আমি আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিলাম না। কিন্তু ফিরিয়া পূর্ব্ব-বাঁকের পরিবর্ত্তে ভুলক্রমে অপর একটা বাঁকপথে ঢুকিয়া পড়িলাম। সেখানকার দৃশ্য দেখিয়া চক্ষু স্থির হইয়া গেল। পাহাড়গাত্র সত্যই মনুষ্যকঙ্কালে পরিপূর্ণ। এতক্ষণ পরে আমার সর্ব্বাঙ্গে একটা আতঙ্ক-শিহরণ উঠিল। দুই এক পা অগ্রসর হইতে না হইতেই পদে বাধা প্রাপ্ত হইয়া একটা মৃতদেহের উপর পড়িয়া গেলাম। কিন্তু ইহা কি মৃতদেহ? নহে ত; ইহার নিশ্বাস-স্পর্শ যে অনুভব করিতেছি। এই ব্যক্তিই কি তখন আর্ত্তনাদ করিয়াছিল? কিন্তু এ ত আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধা পড়িয়া অজ্ঞান হইয়া আছে। কোমরের ছোরাখানা লইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার বন্ধন কাটিয়া দিলাম, তাহার পর আর্দ্র উড়ানিখানা নিঙড়াইয়া তাহার মুখে চোখে জল দিতে লাগিলাম। হঠাৎ সে সচেতন হইয়া উঠিয়া বসিল; ভীতভাবে আমার দিকে চাহিয়া, ভূপতিত ছোরাখানা তুলিয়া লইয়া আমাকে মারিতে উদ্যত হইল। তাহার দুর্ব্বল হস্ত হইতে সহজে যদি ছোরাখানা টানিয়া লইতে না পারিতাম, তাহা হইলে এই গুহাই যে আমার কবর হইত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

সে আর একবার ভীত কটাক্ষে আমার দিকে চাহিল, তাহার পর সন্ত্রস্ত-পদে উঠিয়া ঝরণার ধারের একটা গাছ ধরিয়া নামিয়া পড়িল। বাঁচিল কি মরিল, কে জানে? তাহার আতঙ্কদৃষ্টিতে বুঝিলাম, সে ভাবিয়াছিল, আমি তাহাকে হত্যা করিতে আসিয়াছি।

সে চলিয়া যাইবার পর আমি মুহূর্ত্তকাল স্তম্ভিত

হইয়া বসিয়া রহিলাম; তাহার পর উঠিয়া রুদ্ধশ্বাসে পূর্ব্বপথ ধরিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িলাম, এবার আর কোন বাধা পাইলাম না। উপরে উঠিয়া দেখিলাম, চারিদিক কুয়াসাচ্ছন্ন। অন্ধকারে তরুলতা প্রেতের আকারে দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে। আমি নীরব স্তব্ধ হইয়া ভাবিলাম—এ স্বপ্ন দেখিতেছি না কি? বেশীক্ষণ স্বপ্নের মধ্যে থাকিতে হইল না—আবার জাগরণরাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিলাম। মনুষ্যকণ্ঠস্বর—বনপ্রদেশ হইতে উঠিয়া আমার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, মনে হইল যেন, ডুলীবাহকদিগের চাপা মৃদুকণ্ঠ। ক্রমশঃ একখানা ডুলী বহন করিয়া চারিজন বাহক আমার কাছাকাছি আসিয়া পড়িল। ডুলীস্থিত রমণী, অমুচ্চ কাতর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"মা গো!" বুঝিলাম, ইহাকে বন্দী করিয়া লইয়া যাইতেছে। আমি সহসা একটা অসীম বলে বলীয়ান্ হইয়া উঠিলাম। আসিবার সময় তাড়াতাড়িতে ছোরাখানা ফেলিয়া আসিয়াছিলাম। সেই স্থানে মনুষ্যকণ্ঠ শুনিবামাত্র আত্মরক্ষার জন্য একটা শাখা ভাঙ্গিয়া হাতে লইলাম এবং সেই শাখা ঘুরাইতে ঘুরাইতে ভীষণ স্বরে বলিলাম, "ডুলী এইখানে রাখ্।" ভীত ও আশ্চর্য্য ভাবে মুহূর্ত্তমধ্যে ডুলীখানা মাটীতে ফেলিয়া বাহকরা পলায়ন করিল। বাহকদের সঙ্গের দুই জন লোক আমাকে দেখিবামাত্রই নিরুদ্দেশ হইয়াছিল।

প্রতিপদের চাঁদ পাহাড়ের আড়াল হইতে ঊর্দ্ধদেশে উঠিয়া তাহার সমস্ত আলো রমণীর মুখে ঢালিয়া দিল। কে এ ভুবনমোহিনী প্রতিমা! কোন্ স্বর্গরাজ্য হইতে হঠাৎ মর্ত্ত্যে নামিয়া আসিল?

আমার বিস্ময়-মোহ না ভাঙ্গিতেই রমণী আবার অর্দ্ধস্ফুট কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"মা গো!" কথার স্বরে মনে হইল, তাহার পূর্ণ সচেতন অবস্থা নহে, যেন একটা নেশার ঘোরে সে আচ্ছন্ন। আমি কি করিয়া তাহার চেতনাসঞ্চার করিব, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। উড়ানিখানা খুঁজিতে গিয়া দেখিলাম, তাহাও গুহার মধ্যে ফেলিয়া আসিয়াছি। এই সময় মগরা তাহার ওঝার সহিত আসিয়া হাজির হইল। আমি একটু আশ্বস্ত হইলাম। আসিয়াই ইহাকে দেখিয়া মগরা সবিস্ময়ে বলিল, "এ কি, বাবুজী? একে কোথায় পেলে?"

আমি। যেখান থেকেই পাই, এখন একে নিয়ে চল্।

মগরা। কোথায় গো?

আমি। কোথায় আবার—বাড়ীতে।

মগরা। এ দেখছি, কবলাদের জিনিষ। আমরা নিয়ে যাব কি, বাবুজী? জানলে আর ধড়ে রাখবে না।

আমি। সে ভাবনা তোর নেই। ডুলী ওঠা—

আমার কথা গ্রাহ্য না করিয়া সে বালিকাকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "নেশা ধরিয়েছে। নাক দিকে ধোঁয়া দিয়েছে।"

ওঝা তখন কি মন্ত্র পড়িয়া তাহার মুখে ফু দিতে আরম্ভ করিল। আশ্চর্য্য! রমণী যেন চমকিয়া নিদ্রা হইতে জাগরিত হইল; চারিদিকে চাহিয়া ভয়ে বিস্ময়ে বলিল, "কোথায় নিয়ে এলে আমাকে।"

আমি বলিলাম, "ভয় নেই, তোমাকে বাড়ী নিয়ে যাচ্ছি। উঠা মগরা, দুই জনে বাঁশ ধর, শীগ্‌গির শীগ্‌গির চল্।"

মগরা বলিল, "সেই ভাল। বাড়ী গিয়েই ঝাড়ফুক হবে। কেউ হঠাৎ যদি এসে পড়ে।" বলিয়া ভয়ে ভয়ে সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। সে ডুলীর এক পাশ ধরিয়া পরে ওঝাকে অন্য দিকের বাঁশখানা ধরিতে অনুরোধ করিল। যদিও রমণী তরুণী বালিকা—নিতান্ত লঘুভার; আমার মনে হইতেছিল, আমি একলাই ইহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া যাইতে পারি, কিন্তু ডুলী উঠাইয়াই মগরা গন্ গন্ করিয়া বলিয়া উঠিল, "আপনি ত হুকুম দিলে, শীগ্‌গির চল্—চলি কি ক'রে, পথটা ত কম নয়।"

আমি বলিলাম, "আমিও কাঁধ দিচ্ছি, চল্ এখন।" পথের মধ্যে থামিয়া থামিয়া মগরা বলিল, "কি করলে, বাবুজী! এ যে কবলার জিনিষ, ভূতের খানা। সইবে না—তোমাকে গো সইবে না।"

৩

আমাদের ঘরে আসিয়া সেবা-যত্নে বালিকা যখন কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া উঠিল, তখন তাহার মুখে শুনিলাম, তাহারা মাতা-পুত্রীতে কিছু দিন হইতে

মাতুলাশ্রয় শিমুলতলায় আছে। আমাদের বাড়ীর নিকটেই থাকে। মাতুল কার্য্যবশতঃ আপাততঃ কলিকাতায়; ভৃত্যেরাও সব সময় বাড়ী থাকে না; মাতা তখনও রন্ধনশালায়। মনোরমা দুপুর-বেলা আহারের পর ঘরে আসিয়া একটু বিশ্রাম করিতেছিল, হঠাৎ কে যেন তাহার নাম ধরিয়া ডাকিল। স্বর পরিচিতের মত, কিন্তু তখন তাহার একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল, ঠিক বুঝিতে পারিল না—কাহার গলা। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া প্রাচীরের দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিবামাত্র হঠাৎ কে একজন পিছন হইতে তাহার মুখ বাঁধিয়া ফেলিয়া কোলে উঠাইয়া একেবারে বনপথে প্রবেশ করিল। তাহার পর কি হইল, সে কিছুই জানে না; কারণ, সে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল।

আহা! বালিকার মাতা কন্যাকে এতক্ষণ না দেখিয়া না জানি কিরূপ শোকোন্মত্ত অবস্থায় আছেন! দিদি মগরাকে কিছু বকৃশিশ দিয়া সেই রাত্রিতেই তাহার মাতার নিকট কন্যার সংবাদ পাঠাইলেন; তিনিও ক্ষণবিলম্ব না করিয়া মগরার সহিত এখানে চলিয়া আসিলেন।

শোকোচ্ছ্বাসের মতই সেই ব্যথাকাতর মিলন-দৃশ্য আমাদিগকেও কিরূপ অভিভূত ও আনন্দ-পীড়িত করিয়াছিল, তাহা লেখনীতে প্রকাশ করিতে আমি অক্ষম—কবি হইলে হয় ত বা পারিতাম। দুঃখের বিষয়, আমি কবি নহি; আর সুখের বিষয় এই যে, শোকের তীব্রতা কিম্বা আনন্দের উগ্রতা মানুষের মনে চিরদিন সমভাবে স্থিতিলাভ করিতে পারে না। তাহা হইলে পৃথিবীর কি অবস্থা হইত ?

তাঁহার প্রাণাধিকা কন্যাকে সুস্থ অক্ষতভাবে চিতাগ্নি হইতে যেন ফিরিয়া পাইয়াছেন, এই আশা-তীত অসম্ভব ঘটনা যখন সত্য বলিয়া মাতার মনে প্রতীতি জন্মিল, তখন তাঁহার আনন্দও ক্রমশঃ স্বাভাবিক ভাব ধারণ করিল এবং কন্যার অপহরণ-বৃত্তান্ত তিনি আমাদিগকে খুলিয়া বলিবার অবসর পাইলেন।

ইঁহার স্বামী হরনাথ মিত্র সুনামগঞ্জের জনৈক জমীদার; কয়েক বৎসর যাবৎ হৃদ্‌রোগে ভুগিয়া মাস কয়েকমাত্র ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। অনেক দিন হইতেই তিনি বিষয়কর্ম্ম নিজে তত্ত্বাবধান করিতে পারিতেন না, কিন্তু সে জন্য তাঁহার মনে কোন উদ্বেগ ছিল না। তাঁহার আত্মসম্পর্কীয় প্রিয়-বন্ধু ঘনশ্যাম ঘোষের হস্তে এই ভার দিয়া তিনি খুবই নিশ্চিন্ত ছিলেন। ইহার উপর তাঁহার এতই বিশ্বাস ছিল যে, উইলেও ঘনশ্যাম বাবুকে তিনি কর্ম্মকর্ত্তা করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের দুইটি সন্তান;—একটি পুত্র ও একটি কন্যা। বিষয়ের অধিকারী পুত্রটি সম্প্রতি বিলাতে অধ্যয়ন করিতে গিয়াছে, ৩।৪ বৎসর পরে ফিরিয়া আসিবে; কিন্তু কন্যাকেও তিনি উইলে একখানি বাড়ী ও ৫০ হাজার টাকা দিয়া গিয়াছেন; বিবাহের সময় সুদে-আসলে যৌতুকস্বরূপ ইহা তাহার প্রাপ্য।

দিদি ইহা শুনিয়া বলিলেন, "মেয়েকে ত মিত্র মশায় বেশ দিয়ে গেছেন।"

মিত্রাণী বলিয়া উঠিলেন, "আর যত অনর্থ ত এর জন্যই ঘটছে।"

দিদি বলিলেন, "ঘনশ্যাম বাবু তাঁর ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে টাকাটা হাত করবার চেষ্টায় আছেন বুঝি? ছেলেটি কি সুপাত্র নয়?"

মিত্রাণী বলিলেন, 'তা নয় গো তা নয়, তাঁর নিজের দৃষ্টিই এই দিকে পড়েছে।"

"তবে যে তুমি বল্‌লে, তোমার স্বামীর বন্ধু! তাই আমি ভেবেছিলাম, তিনি বুড় মানুষ।"

"বুড় নয় ত কি? নাতী-নাতনীতে ঘর ভরা। হালে পরিবার মারা গেছে, এখন আমার রত্নটি গ্রাস করবার চেষ্টায় আছেন।"

দিদি হাসিয়া বলিলেন, "সাবাস রে বুড়ো!"

মিত্রাণী বলিলেন, "তুমি ত ভাই হাসছ, কিন্তু সেই ভয়ে আমি দেশছাড়া হয়ে শিমুলতলায় দাদার আশ্রয়ে পালিয়ে এসেছি; কিন্তু এখানেও নিস্তার নেই। আজ তোমরা রক্ষা না করলে আমাদের যে কি অবস্থা হ'ত বল দেখি?"

আমি অদূরে নীরবে বসিয়া তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলাম। মিত্রাণী কৃতজ্ঞতাপূর্ণ নেত্রে প্রথমে আমার দিকে চাহিয়া পরে দিদির পদধূলি গ্রহণ করিলেন। দিদি ব্যস্তসমস্তভাবে প্রতিনমস্কার করিয়া বলিলেন, "ও কি কর ভাই! রক্ষা করেছেন ভগবান্, আমরা উপলক্ষমাত্র। কিন্তু তুমি কি মনে কর, ঘনশ্যাম বাবু সত্যই এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত?"

"নিশ্চয়ই! তাতে কোন সন্দেহই নেই।

সপ্তাহখানেক হ'ল, তিনি শিমুলতলায় এসে পূজোর সময় আমাদের দেশে নিয়ে যাবার জন্যে পীড়াপীড়ি লাগিয়েছিলেন। আমাকে কিছুতেই রাজি করাতে না পেরে শেষে মেয়েকেই চুরী ক'রে নিয়ে গেলেন।"

"কিন্তু হল্‌দিঝোরাতে নিয়ে গেলেন কেন?"

"এটা আর বুঝ্‌লে না, দিদি! সোজা রাস্তায় গেলে যে লোকের নজরে পড়বে! তাই বনের মধ্যে খানিকক্ষণ লুকিয়ে রেখে রাতারাতি ষ্টেশনে নিয়ে যাবার মতলবে ছিলেন।"

এতক্ষণ পরে আমি বলিলাম, "কিন্তু কোন ভদ্রলোক ত ডুলীর সঙ্গে ছিল না।"

"তা কেন থাক্‌বে? বুড়ো ষ্টেশনে অপেক্ষা করছিল। অন্ধকারে রোগী ব'লে চালিয়ে রেলে তুলে দিত। কিন্তু এর পর যে কি করবে, সেই ভাবনাই এখন আমাকে পাগল ক'রে তুল্‌ছে, দিদি।"

দিদি বলিলেন, "যদি অবিলম্বে মেয়ের একটি বিয়ে দিয়ে দিতে পার, তবেই কিন্তু তিনি জব্দ হয়ে যান।"

"তা ত ঠিকই বলেছ, ভাই, আর দাদাও একটি সুপাত্র ঠিক করেছেন। ছেলেটি ওকালতী পড়ছে, মেজাজও ভাল মনে হয়; সে-ও শিমুলতলায় এসেছে আর মাঝে মাঝে দাদার বাড়ী আসা-যাওয়া করে, কিন্তু তবু তার প্রতি আমার মনটা কেমন প্রসন্ন নয়; ঘনশ্যামের সঙ্গে তার একটা কি রকম দূর-সম্পর্ক আছে - ভাইপো না কি হয়।"

দিদি বলিলেন, "এ ভাই তোমার অন্যায়। কথায় বলে কায়েতের কুটুম! সম্পর্ক ধরতে গেলে ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যায়!"

মিত্রাণী বলিলেন, "কিন্তু সে ছেলে সে দিন সকালে এসে ব'লে গেল যে, হল্‌দিঝোরা দেখতে যাচ্ছে, তার পর এই ৩।৪ দিনও আর তার দেখা নেই। সে-ও এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে লিপ্ত নেই ত?"

এই কথা শুনিয়া হঠাৎ আমার মনে সেই যুবার কথা জাগিয়া উঠিল—যাহাকে আমি গুহার মধ্যে বন্ধনমুক্ত করিয়াছিলাম। এই ত সেই যুবা নয়! হয় ত বা পথের কণ্টক বিবেচনায় ঘনশ্যাম বাবুই ইহাকে এইরূপে সরাইবার চেষ্টায় ছিলেন। কিন্তু এই অসম্ভব কল্পনা বেশীক্ষণ মনে স্থান পাইল না।

মিত্রাণী দিদির হাত ধরিয়া সকাতর অনুরোধে বলিলেন, "ভাই, একবার যাকে রক্ষা করেছ, আর তাকে বিপদের মুখে ফেলে রেখো না। তোমাদের বউ ক'রে একে ঘরে তুলে নাও।"

দিদি আমার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন, "তা মেয়ে ত অপছন্দের নয় - কি বলিস তুই?

আমি মনে মনে বলিলাম, "অমৃতে অরুচি কার?" কিন্তু ইহা ত প্রকাশ করিয়া বলা যায় না, তাই মৃদু হাসিয়া মৌনে সম্মতি প্রকাশ করিয়া চলিয়া গেলাম। ঘরে আসিয়া আয়নার সাম্‌নে দাঁড়াইয়া ভাবিলাম, "চেহারাখানা বড় বেমানান্ ব'লে মনে হ'চ্ছে। তা মন্দই বা কি? রাধা ত শ্রীকৃষ্ণের কালো রূপেই মজেছিলেন"

"শুভস্য শীঘ্রম্" বলিয়া ভগিনীপতি কৃষ্ণপক্ষ পার হইতে দিলেন না। তাড়িতবার্ত্তা বহন করিয়া তাঁহার মেজাজটিই হইয়াছে ত্বরিতগতি; তাহার পর এ ক্ষেত্রে তিনি ঘনশ্যাম বাবুকে ব্যর্থ করিবার পক্ষে এই চালটাকেই অব্যর্থ জ্ঞান করিলেন। নবমী তিথিতে যে শুভলগ্ন পাওয়া গেল, সেই লগ্নেই তিনি মঙ্গল অনুষ্ঠান সমাধা করিবার সঙ্কল্প করিলেন। দিদির বাড়ীতেই বিবাহের আয়োজন—খুব চুপচাপে—পুরোহিত ও ২।৪ জন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া আর কাহাকেও বলা হইল না।

বৈকালে বরসজ্জা শেষ করিয়া দিদিরা ক'নে সাজাইতে গেলেন। আমি রাঙ্গাবস্ত্র ও ফুলচন্দন পরিয়া বারান্দায় আসিয়া বসিলাম। তখনও সূর্য্যের আলো কনক ঝরণায় দিগ্‌দিগন্তে স্ফুরিত হইয়া উঠিয়াছিল। রাস্তার অভ্রগুলা দিবা-খদ্যোতের ন্যায় ঝিক্‌মিক্ করিয়া উঠিতেছিল; পাশের মাঠে কাশগুচ্ছের উপরে সূর্য্যের কনকপ্রভা খেলিয়া যাইতেছিল। শিউলী ফুলের সুগন্ধ শরৎকালে বসন্ত জাগাইয়া তুলিয়াছিল। বর্ণের শোভায়, গন্ধের হিল্লোলে চারিদিকে যেন সুখের তরঙ্গ বহিয়া যাইতেছিল! কিন্তু এই আলোকদৃশ্য সম্মুখে রাখিয়া আমার মনে জাগিয়া উঠিল সেই অন্ধকার-গুহার কথা। কে সে যুবক? হইতে পারে, ইহারই সহিত মনোরমা বাগ্‌দত্তা হইয়াছিল। বালিকা যে মনে মনে তাহাকে ভালবাসে না, তাহাই বা কে বলিতে পারে? বিবাহের মুহূর্ত্তে সে যদি আসিয়া উহাকে দাবী করে—তখন? বুদ্ধিতে বুঝিতেছিলাম যে, ইহা

একটা আজগুবী অসম্ভব আশঙ্কা ; কিন্তু ভূতের ভয়ের মত এই চিন্তা কিছুতেই মন হইতে তাড়াইতে পারিতেছিলাম না ! এই সময় রসিকদাদাকে আসিতে দেখিয়া মনটা খুসী হইয়া উঠিল। আসিয়াই তিনি বলিলেন, "এই শুভদিনে এমন গোমসামুখ দেখছি কেন, ভায়া ? তা আমারও কিন্তু সে দিন মনটায় ভারী ভাবনা ধ'রে গিয়েছিল ?"

"সে কোন্‌ দিন, রসিকদাদা ?"

"এই তোমারই মত যে দিন সাজসজ্জা ক'রে বসিয়ে রেখেছিল। তার পর কিন্তু বাসরঘরে যেমনি কানের উপর টান পড়লো, অমনি প্রাণের গান আপনিই খুলে গেল।"

"আমার ত দাদা, গান-টান আসে না ; তুমি আমায় একটু তালিম দিয়ে দাও না।"

"তা বেশ ত, আমি সে দিন যে গানটা গেয়েছিলুম, সেই গানটাই শিখে নাও" বলিয়া রসিকদাদা সুর ভাঁজিতে আরম্ভ করিলেন--"তা না না না, আহা হা হা, উহু হু হু।

মরি মরি উহু উহু,
কুহু কুহু মুহু মুহু কোয়েলা বোলে।
বায়স বুলায় চঞ্চু বায়সী-গলে !
হায় রে হায় ! প্রেয়সী বলে,
আমি আজ ঝাঁপ দিব জলে।
ঝল্‌কে উঠবে চলকানো ঢেউ,
জানবে না গো শুনবে না কেউ,
তলিয়ে পড়বো চুপে চুপে অতল জলে।
হায় রে হায় ! প্রেয়সী বলে,
আমি আজ প্রাণ ত্যজিব যমুনা-জলে !"

আমার কিন্তু গানটি শুনিয়া হাসি আসিল না ; যে অন্ধকার মন হইতে মিলাইয়া গিয়াছিল, তাহা আবার ঘনাইয়া আসিল ; মুখে বলিলাম, "বেশ রসিকদাদা, বেশ ! এই গানটাই আমাকে আজ গাইতে হবে।"

হঠাৎ দেখিলাম, অনেকগুলি লোক বাড়ীর দিকে আসিতেছে। এ আবার কি ? ভগিনীপতি যে বলিয়াছিলেন, বেশী কাহাকেও বলা হইবে না ! দেখিতে দেখিতে তাহারা কাছাকাছি আসিয়া পড়িল। রসিকদাদার গানের তান একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। তিনি সভয়ে বলিয়া উঠিলেন, "বিয়ের দিনে এরা আবার কেন ? এ যে পুলিসের দল !"

আমি বিস্ময়স্তব্ধ হইয়া পড়িলাম।

নিকটে আসিয়া তাহাদের মধ্যে একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার নাম ?"

"রমাপ্রসাদ।"

"রমাপ্রসাদ বসু ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

একজন পাহারাওয়ালার হস্ত হইতে গুহা-পরিত্যক্ত আমার সেই উত্তরীয়খানা লইয়া আর এক জন তখন জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি আপনার ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, "আপনি কোথায় পাইলেন ?"

"আর এই ছোরাখানা ?" দেখিলাম আমার বটে, কোন উত্তর না করিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

"দেখিতেছেন, ইহা রক্তমাখা ?"

দেখিলাম বাস্তবিকই রক্তমাখা ; কিন্তু উহা দিয়া সে দিন যুবকের বন্ধনরজ্জু কাটিয়াছিলাম মাত্র, উহাতে রক্তের দাগ আসিল কিরূপে ? বুঝিলাম, আমার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র চলিতেছে। কি উত্তর দিব, স্থির করিতে না পারিয়া নীরবেই রহিলাম। দারোগা বাবু উগ্রস্বরে বলিলেন, "উত্তর দিন না, চুপ ক'রে রইলেন যে ?" আমি অপরাধীর মত আস্তে আস্তে বলিলাম, "ছোরাখানা আমার বলেই মনে হচ্ছে, কিন্তু ও ছোরা দিয়ে ত আমি কোন দিন রক্তপাত করি নি।"

"রক্তপাত করেছেন কি না, সে কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করছিনে, সে সব কথা থানাতে হবে।" বলিয়া তিনি ইঙ্গিত করিবামাত্র, একজন পাহারাওয়ালা অগ্রসর হইয়া আমার হাতে খুনীর হাতকড়ি আঁটিয়া দিল।

বিবাহের দিনে আনন্দ-সঙ্গীতের পরিবর্ত্তে শোকক্রন্দনে গৃহ ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

* * * * *

বন্দী অবস্থায় যে আমার সময় কিরূপে কাটিয়াছিল, তাহা না বলাই ভাল বলিবার ক্ষমতাও নাই। সে নরক-যন্ত্রণার জ্বালা এখন ভাল করিয়া মনেও আনিতে পারি না, তাই নিষ্কৃতি ; নহিলে মুক্তিলাভেও প্রকৃত মুক্তির সুখলাভ করিতে পারিতাম না। সেই বিষম দুর্দ্দিনে বিধাতা পুরুষকে যন্ত্রণাকাতর প্রাণে অভিশাপ দিতে দিতে প্রত্যাশা করিয়াছিলাম, ফাঁসীদণ্ডেই জীবনের সমাপন হইবে ; কেন না, আমার বিরুদ্ধে প্রমাণ সঙ্গীন--ঘনশ্যাম

বাবু দাসকে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়াই সনাক্ত করিয়াছেন। কিন্তু দৈব মানুষ অপেক্ষাও প্রবল ষড়যন্ত্রী।

*　　*　　*　　*

আজ আমার বিচারের শেষ দিন। বিচারগৃহ লোকে লোকারণ্য। দুই পক্ষের উকীলের বক্তৃতা শেষ হইয়া গিয়াছে। জুরীগণ মতস্থির করিয়া নিজ নিজ অভিমত জজকে জানাইলেন; জজ সাহেব কালো টুপী ধীরে ধীরে মাথায় পরিয়া রায় পড়িয়া শুনাইতে উদ্যত হইলেন। এমন সময় আদালতের বাহিরে একটা বিষম কোলাহল উত্থিত হইল—কে যেন জোর করিয়া প্রবেশ করিতে চাহিতেছে অথচ বাধা পাইতেছে বলিয়া পারিতেছে না। দেখিতে দেখিতে ভিড় ঠেলিয়া সেই গুহার যুবা বিচারকের সম্মুখে উপস্থিত হইল ও উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিল, "আসামী নির্দোষ! আমি মরি নাই-জীবিত। এই যুবকই আমাকে বন্ধনমুক্ত করিয়া উদ্ধার করিয়াছেন, নহিলে কুচক্রীর চক্রে আমার প্রাণ যাইত।" আমার কানের মধ্যে সমুদ্রের জলকল্লোল শুনিতে পাইলাম; কি যে হইতেছিল, ঠিক বুঝিবার পূর্ব্বেই আমার সংজ্ঞালোপ হইল!

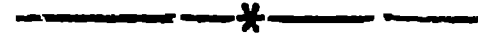
যখন চেতনা ফিরিয়া পাইলাম, তখন রসুনচৌকির মধুর তান আমাকে বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া ফেলিল। এ কোথায় আমি? মরণের পর কি স্বর্গরাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছি! এ কি স্বপ্ন না কি!

নব ডাকাতের ডায়েরি

———*———

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত

নব ডাকাতের ডায়েরি



নাঃ, আর পারা যায় না! দুর্ব্বল মনটার সঙ্গে কিছুতেই আর পারিয়া উঠিতেছি না। আগে বিশ্বাস ছিল, 'স্বদেশী' হইবামাত্র মনের কাপুরুষতা-মালিন্য আপনা হইতে মুছিয়া পুঁছিয়া যায়। কিন্তু বিপরীত জ্ঞানের টনটনে বেদনায়—গ্লানি-জর্জ্জর আত্মাপুরুষ হতাশ্বাসে মর-মর হইয়া পড়িতেছে—উপায় কি করি? কিমৌষধং?

দুঃখের জ্বালায় এক একবার এমনও ইচ্ছা হয় যে, দুর্ব্বলতা-দুর্দ্দান্ত এই হৃৎপিণ্ড-অরিটাকে দুই হাতে চিরিয়া হিরণ্যকশিপু-বধের আনন্দলাভ করি,—তাই বা পারি কই? ইহা ত আর অসহায়া বাঙ্গালী-বধূকে ঘরের কোণে ঠাসিয়া মারা নয়—এ হইতেছে প্রবল দৈত্য আত্মাপুরুষ—ইহাকে মারিতে গেলে নিজেই মরিতে হইবে, তাহা পারি কই? অতএব আবার জিজ্ঞাসা করি—কিমৌষধং? মনের কাপুরুষতা ঘুচাই কিরূপে?

শুনা যায়, আমার পূর্ব্বপুরুষ হরিহর শর্ম্মার নামডাকে বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খাইত। রঘো ডাকাত আমাদের বাস্তুভিটার ধার দিয়া নদী বাহিয়া ডাকাতী করিতে যাইবার সময় উচ্চৈঃস্বরে তাঁর নাম জপ করিতে করিতে নৌকা চালাইত। হরিকর্ত্তা ছিলেন রঘুর অস্ত্রগুরু। লাঠি-তলোয়ারে তিনিই নাকি তার হাতে খড়ি দেন। গুরুভক্ত রঘুবীর ডাকাতীর পর প্রতিবারই নবরত্ন ডালি তাঁহার চরণতলে ধরিয়া দিয়া গুরুপ্রণাম পূর্ব্বক সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিত। তখনকার দিনে এরূপ উপহার গ্রহণ মানহানিকর বা রাজ-অপরাধ বলিয়া গণ্য ছিল কি না, আমার জানা নাই—তবে রঘুবীরের এই সম্মানে হরি শর্ম্মার নামডাক যে খুবই বাড়িয়া গিয়াছিল, দেশের সর্ব্বসাধারণ যে তাঁহাকে অতিরিক্ত ভক্তি-সম্মানের দৃষ্টিতে দেখিত, ইহা বেশ ভাল করিয়াই জানি। এ হেন প্রবলপ্রতাপ হরিহর শর্ম্মার সন্তান যে আমি—আমার সকল তেজ, সকল উদ্দীপনা,—একটা নরম কথাতেই কি না ঠাণ্ডা জল হইয়া যায়! হায় রে! প্রকাশেও এ দুঃখের উপশম নাই—কেবল লজ্জা!

আমার পিতৃঠাকুর ছিলেন—হেয়ার কলেজের এক জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছাত্র। কলেজের ইংলিশ প্রোফেসার ডাক্তার কেমিক্যাল তাঁহাকে সন্তান-তুল্য স্নেহ করিতেন। তখনকার দিনে নাকি গুরুশিষ্যে বিজাতীয় বিসংবাদ ছিল না। এই পুরাদস্তুর পিঠ-থাবড়ান সম্পর্ক—ইংরাজীতে যাকে বলে Patronising ভাব, তাহা যে আমাদের তেজঃবর্দ্ধকর—তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। এ রকম গায়ে হাত-বুলান স্নেহ তাই আজকাল আমরা মোটেই পছন্দ করি না, তবে পিতৃদেব অন্যরূপ বুঝিতেন, শিক্ষকের স্নেহে তিনি আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতেন।

পিতার মৃত্যুকালে আমার বয়স ছিল ১৫ বৎসর। তিনি যখন রোগশয্যায় পড়িয়া, তখন ডাক্তার কেমিক্যাল প্রায়ই তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন, আমাকে সেখানে উপস্থিত দেখিলে, অজস্র মিষ্ট কথা আমার উপর বর্ষণ করিতেন, আমার বালক-মন সহজেই তাহাতে অভিভূত হইয়া পড়িত।

মৃত্যুর সপ্তাহখানেক পূর্ব্বে একদিন বাবা কেমিক্যাল সাহেবকে বলিলেন, "জানেন ত সাহেব, অনেকগুলি সন্তানের মধ্যে এই ছেলেটি আমার বেঁচে আছে, এ'কে আমি মানুষ ক'রে যেতে পারলাম না, আপনার উপরই সে ভার রইলো, দেখবেন, ভবিষ্যতে এ যেন মানুষ হয়।"



বলা বাহুল্য, আমিও হেয়ার স্কুলে পড়িতাম। পিতৃ-বিয়োগের পর আমার পড়াশুনার প্রতি কেমিক্যাল সাহেবের এমন তীব্রদৃষ্টি পড়িল যে, আমি ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলাম। বছরখানেক টিঁকিয়া থাকিতে পারিলে, এণ্ট্রান্সটা সহজেই পাশ করিতে পারিতাম। কেন না, তিনি নিজে যত্ন করিয়া সন্ধ্যাকালে আমাকে পড়াইতেন; ছাত্র-জীবনে ইহা পরম সৌভাগ্য। কিন্তু অতিরিক্ত সুখ-সৌভাগ্য বহু সময়ে অসুখেরই কারণ হইয়া উঠে; অন্ততঃ এ সৌভাগ্য আমি বরদাস্ত করিতে পারিলাম না। বছর ত বছর বটে, দিনও নয়, মুহূর্ত্ত ত নয়ই। বারোটা মাসে ছুটীগুলা সব পুরা-পুরি বাদ-সাদ দিয়া তবুও ত অন্ততঃ দু'শ পঁয়ত্রিশ দিন বই হাতে করিয়া দিন কাটাইতে হইবে বৎসরে! পিতৃমৃত্যুতে স্বাধীনতার আস্বাদ পাইয়া এই দীর্ঘকাল বন্দী অবস্থায় কি কাটান যায়! মনে করিতেও দম বন্ধ হইয়া উঠিত! ইহার উপর, আমার উপর ক্লাশের ছাত্র-বন্ধুরা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিলেন যে, কেমিক্যাল সাহেব মানুষ গড়িবার ছলে আমাকে বাঁদর বানাইবার চেষ্টায় আছেন; তখন আর আমাকে পায় কে? নিজেকে মানুষ করিয়া তুলিবার ভার নিজের হাতে লইয়া মাস কতক যাইতে না যাইতেই স্কুল ত্যাগ করিলাম।

আবাল্য আমি 'স্বদেশী।' দুধে-দাঁত বোধ হয় তখনও আমার সব ভাঙ্গে নাই, যখন আমি সদলবলে দোকানীদের বিলাতী কাপড় পুড়াইয়া আসিয়াছি। এ বার স্কুল ছাড়িয়া রীতিমতভাবে বিপ্লবপন্থী হইয়া পড়িলাম।

কিন্তু এমন গোপন কথাও কেমিক্যাল সাহেবের নিকট গোপন রহিল না। কি করিয়া যে এ খবর তাঁহার কানে পৌঁছিল, তাহা এখনও পর্য্যন্ত আমার নিকট রহস্যপূর্ণ। ইচ্ছাশক্তির এ কোন-রূপ অবিদিত ক্রিয়া না কি? কে জানে? কিন্তু আমার খবরকে ধরা আর আমাকে ধরা ত আর এক কথা নয়। তাঁহার চিঠি বহাবহিতে ডাক-পিয়নের জুতার তলাটাকে ক্ষয়রোগে ধরিল, শিকলকাটা মুক্ত পাখী আমি, কিন্তু তবু তাঁহাকে ধরা দিতে চাহিলাম না। না চাহিলে কি হয়—? দৈব যে স্বয়ং ক্ষমতার অধীন, ইচ্ছাশক্তির দাস—আমরা যদি শুধু এই সত্যটুকুর মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতে জানিতাম, তাহা হইলে ভারতের ভাগ্য-লিপি উল্টাইয়া যাইত। যাক্। ধরা না দিয়াও একদিন আমি ধরা পড়িয়া গেলাম।

তখন বেলা ২টা, আমি শ্যামবাজার হইতে ট্রামে ভবানীপুর যাইতেছিলাম. কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে দেখিলাম, এক জন হ্যাটকোটধারী সেই গাড়ীর দিকে দ্রুতপদে চলিয়া আসিতেছেন। কে ও? কেমিক্যাল সাহেব ত নন? হইতেও পারেন তিনি, এই সময় লেক্‌চার শেষ করিয়া কোন কোন দিন বাড়ী যান। আর ঠিক এই সময়েই কি না আমি চৌরঙ্গীর ট্রামে চড়িয়া বসিলাম কি দুর্ব্বুদ্ধি আমার! আপশোষটা লজ্জায় এবং সন্দেহ সত্যে পরিণত করিয়া কেমি-ক্যাল সাহেবের পাদুটা গাড়ীর পাদানীর উপর যখন চড়িল, তখন আমার বুকটা দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল; ইচ্ছা হইল, গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া এ লজ্জাভয় নিবারণ করি; কিন্তু তৎপূর্ব্বেই সাহেব আমার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়া 'হ্যাল্লো' বলিয়া হাত বাড়াইয়া দিলেন। তাঁহার স্বরে তাঁহার সমস্ত মুখে কি আনন্দ-স্ফূর্ত্তি! সেই আনন্দধারা আমার লজ্জানুতাপপূর্ণ মনকেও বেশ একটু আর্দ্র করিয়া তুলিল, বিস্মৃত অনুরাগ-প্রীতি আমার ইচ্ছাকে উপেক্ষা করিয়া ধীরে ধীরে আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল।

* * * *

সাহেব বলিলেন—মর্ম্মান্তিক অনুনয়পূর্ণ স্বরে বলিলেন, "তোমার পিতার কাতর মৃত্যুবাণী আমি যে কিছুতেই ভুলতে পারিনে, তুমি স্কুল ছেড়ে গিয়ে পর্য্যন্ত আমার মনে শান্তি নেই। কথা রাখ নবকুমার, স্কুলে আবার ভর্ত্তি হও - জীবনটা নষ্ট কোরো না - তোমার প্রতিভাশক্তির বিকাশ কর।" বলিয়া এক মুহূর্ত্ত নীরব হইয়া রহিলেন; তাহার পর শক্তি সংগ্রহ করিয়া যেন বলিলেন—"ও পথ ছাড় নবকুমার, ওতে দেশেরও মঙ্গল নেই, তোমারও মঙ্গল নেই, প্রকৃত উপদেশ শোন, ও পথ ছাড়। আবার পড়াশুনা ধর।"

তাঁহার কাতরতায় মনটা বড়ই নরম হইয়া গেল, বলিতে লজ্জা করে—আমার চোখ দুটা জলে ভরিয়া উঠিল। আমি আন্তরিকভাবে

তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলাম। তিনি আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন,—"স্কুলে ভর্ত্তি হবে—আমি আজই তোমার নামে টাকা জমা দিব।"

"বেশ।"

"বল, ও দলে আর মিশবে না? কথা দাও নবকুমার; প্রতিজ্ঞা কর?"

আমি নীরব হইয়া রহিলাম। মন বলিল,—তা-ও কি কখনো হয়?" কিন্তু মনের মত পরিবর্ত্তনশীল পদার্থ এ দুনিয়ায় বোধ হয় আর দুটি নাই—অন্ততঃ আমার পক্ষে। সাহেবের জুতার দিকে চাহিয়া মন যে কথা ভাবিল, তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া তাহা ভুলিয়া গেল—তাঁহার অনুনয়পূর্ণ কাতর-দৃষ্টিতে দৃষ্টি রাখিয়া আমি বলিতে যাইতেছিলাম—"আচ্ছা, বেশ, তাই হবে।" কিন্তু মনের কথা মুখে ফুটিবার পূর্ব্বেই গাড়ীটা সশব্দে থামিল—আর ধীরেন গুরুগম্ভীর মূর্ত্তিতে আমাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইবামাত্র আমাদের বাক্‌রোধ হইয়া গেল! এতক্ষণ গাড়ীর এ অংশে আমরা দুই জন মাত্র ছিলাম। তৃতীয় ব্যক্তিকে আসিতে দেখিয়া কেমিক্যাল সাহেবও নীরব হইয়া গেলেন; ট্রামও চৌরঙ্গীর পথে আসিয়া পড়িল,—তিনি নামিবার সময় এইটুক শুধু বলিয়া গেলেন—সন্ধ্যার সময় আমি যেন তাঁহার কাছে যাই—তিনি আমার প্রতীক্ষায় থাকিবেন।

* * * *

তিনি চলিয়া গেলে ধীরেন জিজ্ঞাসা করিল, "কি কথা হচ্ছিল শুনি?"

আমি একটু বাদসাদ দিয়া মোটামুটি সবই তাহাকে বলিলাম। সে শুনিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "হাঁ, সাহেবের তোমার ইচ্ছা চিরদিনই আমরা ওদের পদানত হয়ে থাকি। দেখিস্, ওসব মিষ্ট কথায় ভুলিস্‌নে?"

"আরে ক্ষেপেছে? কোথায় যাচ্ছ ধীরেন-দা?"

"যাচ্ছি- কামাখ্যাধামে একটা কাযের চেষ্টায়, বুঝলে ত?"

"কামাখ্যাধামে! আমাকে কিন্তু এবার সঙ্গে নিতে হবে."

"পার্‌বি তুই?"

"নিশ্চয়?"

"বিশ্বাস হয় না। তুই যে রকম দুর্ব্বল! রাস্তার কুকুর একটা এক ঘা লাঠী খেয়ে কুঁই কুঁই কর্‌লে তোর চোখে জল আসে, কালীঘাটে পাঁঠা বলি দেখ্‌লে মূর্চ্ছা যাস্।"

"আরে সে আলাদা কথা। নিরপরাধ বেচারা জীবগুলির প্রতি নিষ্ঠুরতা বা স্বার্থের জন্য তাদের বলি দেওয়া -"

"তা বল্লে চল্‌বে না! রক্তপাতে অভ্যস্ত হ'তে হবে। পরীক্ষা দিতে পারবি?"

"নিশ্চয়। কি কর্‌তে হবে বল?"

"শান্তার পাঁঠাকে নিয়ে এসে, স্বহস্তে তার মুণ্ডপাত ক'রে—কাল আমাদের বোন ভোজন করা দিকি?"

* * * *

শান্তা আমার পিসীমার মেয়ে, আমার চেয়ে বছর চারেকের ছোট। পিসীমা বিধবা, মেয়েটিকে লইয়া আমাদের বাড়ীতেই থাকেন। পিসীমার যত্ন-আদরে মাতৃহারা শিশু আমি কোনদিনই মাতার স্নেহের অভাব বুঝি নাই, বরঞ্চ অতিরিক্ত স্নেহ পাইয়া স্নেহের অনাদর করিতেই শিখিয়াছি।

শান্তা একটি কুকুর ও একটি ছাগশিশু পালন করিয়াছিল, এই দুই জীবের আশ্চর্য্য রকম ভাব—তাহারা দুটিতে জড়াজড়ি করিয়া খেলা করিত, যেন দুটি বিড়ালছানা। শান্তা দুপুরবেলা মেঝের উপর মাদুর বিছাইয়া শুইয়া থাকিত—তাহার এই বন্ধু বাচ্ছা দুইটি তাহার গায়ের উপর ডিগ-বাজি খেলিয়া বেড়াইত। ছাগশিশুটিকে লইয়া গেলে, বাড়ীটা যে কি রকম বিষাদপূর্ণ হইবে, মনে করিতেও মনটা বিষাদাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। কিন্তু দেশমাতৃকার চরণে সর্ব্বস্ব বলি দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছি, এ রকম কষ্ট দুঃখ ত তাহার তুলনায় সামান্য।

ভোরবেলা বাড়ীর কেহ উঠিবার পূর্ব্বেই ছাগ-শিশুটাকে গোয়ালঘর হইতে বাহির করিয়া লইয়া চম্পট দিলাম। আশ্চর্য্য! বাচ্ছাটা একবার ডাকিল না! সে ভাবিল, আমি তাহাকে স্নেহের আশ্রয়ে উঠাইয়া লইলাম! তখনও শান্তা শয়ন-কক্ষে, তার কুকুরটা সে সময় তাহার ঘরে ঘুমাইতেছিল। অতএব আমার কার্য্যে কোনই বাধা পড়িল না। আমি তাহাকে লইয়া বালিগঞ্জ ষ্টেশনে নামিয়া অনতিদূরে একটি নিভৃত জঙ্গলে

আসিয়া থামিলাম, সেখানে আমার বন্ধুগণ বন-ভোজনের আয়োজনে ব্যস্ত ছিল।

তাহার পর যাহা ঘটিল, সেই নিষ্ঠুর ব্যাপারের বর্ণনা না করাই ভাল। বধকালীন ক্রন্দনপরায়ণ ছাগশিশুর স্নেহ অনুনয়পূর্ণ কাতর ভর্ৎসনা-দৃষ্টি আমার প্রাণে যে শেল বিদ্ধ করিয়া গিয়াছে, ভবিষ্যতে উচ্ছ্বসিত নর-রক্তধারাও আমার মনে সেরূপ অনুতাপ বিঁধাইতে পারে নাই।

২

যাহা ভাবিয়াছিলাম, দেখিলাম, মোটেই তাহা নয়। স্বদেশী ডাকাতীতে ভয়-ভাবনার কারণ—ষোল আনায় কড়াক্রান্তি মেলে কি না সন্দেহ—এক কথায় বাধাবিপত্তি নাই বলিলেই হয়। যাত্রার সময় অতীত যুগের আত্যাগীয় কাহিনী স্মরণ করিতে করিতে কালীমাতার নামডাকে বিজন জঙ্গলপথ যখন প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিলাম—তখন আপনাদিগকে ভীমার্জ্জুন তুল্যই মহারথী বলিয়া মনে হইয়াছিল, অপূর্ব্ব বীরত্ব প্রদর্শনে ইতিহাসে অমরকীর্ত্তি রাখিয়া যাইবার আশায় মনঃপ্রাণ আত্মগৌরবে নাচিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবামাত্র প্রাণের সেই ভরপুর উপন্যাস শূন্যে বিলীন হইয়া পড়িল—বুঝিলাম, এ রণও নহে, মরণও নহে, একতরফা শূন্য আস্ফালন মাত্র। হায়! হায়! কার্য্যান্তে মনটা বড়ই দমিয়া গেল!

মুখোসধারী আমরা সংখ্যায় ছিলাম—১৮ জন। যাত্রা করিয়াছি—শ্রীবাবুর বাড়ীর উদ্দেশে—লক্ষ্মীপুর। আগেই পথঘাট বাড়ী-ঘর দেখিয়া চিনিয়া ম্যাপ আঁকিয়া লওয়া হইয়াছে। আজ যে শ্রীবাবু বাড়ী নাই, কার্য্যোপলক্ষে তিনি কলিকাতায়—সে খবরও আগেই জানিয়াছি। শ্রীবাবু এক জন মহাজন, তেজারতি কারবারে হঠাৎ ফাঁপিয়া উঠিয়াছেন, ঘরে নগদ টাকা-কড়ি তাঁর যথেষ্ট থাকে! একতলা পৈতৃক কুঠী শীঘ্রই দোতলা হইবে শুনিতেছি; কিন্তু আমাদের লুণ্ঠন-কার্য্যে সুবিধা যোগাইবার জন্যই, বোধ হয়, এখনও একতলাই রহিয়া গিয়াছে। পুলিসথানা তাঁহার বাড়ী হইতে অধিক দূরে নহে, আধ ক্রোশ অপেক্ষাও নিকটে—তাহা ছাড়া এ কালে ডাকাতীর ভয়ও লোকের মন হইতে এক রকম মুছিয়া গিয়াছে, ডাকাতের বীরত্ব এখন গালগল্প মাত্র। অতএব শ্রীবাবু তাঁহার কানন-ভবনদ্বারে দুইজন ভোজপুরী প্রহরী রাখিয়াই এ যাবৎ নিশ্চিন্তভাবে কাল-যাপন করিতেছিলেন, সহসা বিনা মেঘে বজ্রপাত তুল্য আমরা তাঁহার শান্তি-ভবনের শান্তি-নিদ্রা ভঙ্গ করিলাম।

তখন রাত্রি প্রায় ১২টা। আমরা সকলে বাগানের সীমানা ধীরে ধীরে পার হইয়া, সদর দ্বারে পৌঁছিয়া দেখিলাম, বহির্ভাগে দুইখানা খাটিয়ার মধ্যে একখানা অনধিকৃত, সম্ভবতঃ ইহার মালিক প্রভুজীর সহিত কলিকাতা যাত্রা করিয়াছে, অন্য খাটিয়াখানির অধিকারী দিব্য আয়েসে নাক ডাকাইয়া নিদ্রা দিতেছে। সার্চ্চলাইট তাহার মুখে পড়িবামাত্র, সে ঘুমাচ্ছন্ন চোখেই পাশের লাঠীখানার উদ্দেশে হাত বাড়াইয়া "কোন্ হ্যায় রে, কোন্ হ্যায় রে," করিয়া ডাক ছাড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিবার চেষ্টায় ব্যর্থ হইয়া ভ্যাবাচাকা খাইয়া গেল। সর্দ্দার মহাশয় তাহার মুখের কাছে পিস্তল ধরিয়া বলিলেন, "কথা কহিবে কি গুলী তোমার বুকে পড়িবে।" অন্যেরা অচিরাৎ খাটিয়ার সহিত তাহাকে দড়ী-বুনন করিয়া ফেলিল। ইহার পর এক জন পিস্তলধারীকে তাহার নিকটে এবং কয়েকজনকে বাহিরে পাহারায় রাখিয়া আমরা ৮ জনে দ্বার-প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইলাম। দ্বার দেখিলাম ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ। ভাঙ্গিবার উপক্রম করি-তেছি, এমন সময় দৈব আমাদের সহায় হইলেন, দ্বার ভাঙ্গিবার আর প্রয়োজন হইল না। ভিতর আঙ্গিনায় যে চাকর শুইয়া থাকিত—বাহিরের অস্পষ্ট গুঞ্জন শুনিতে পাইয়া, প্রভু আসিয়াছেন ভাবিয়া সে যেমন দরজা খুলিয়া দিল, অমনই আমরা কয়েকজন হুড়মুড় করিয়া গৃহে প্রবেশ করিলাম। চাকরটা "ডাকাত ডাকাত, সাবধান হও বাবু" বলিতে বলিতে দ্রুতপদে কোথা দিয়া কোথায় যে পলাইল, তাহাকে আর ধরা গেল না। লোহার সিন্দুক থাকে বাড়ীর ভিতরে অর্থাৎ অন্তঃপুরে, সে খবরও আমরা আগেই পাইয়া-ছিলাম। দরজায় চারিজনকে রাখিয়া, আমরা চারিজনে ভিতর-বাড়ীতে ছুটিলাম। পূর্ব্বেই

বলিয়াছি, শ্রীবাবু সেদিন বাড়ী ছিলেন না— তাঁহার বাবা, কাকা বা মামা এমনই কোন এক জন বৃদ্ধ একটি ছোট বাক্স লইয়া গুড়ি মারিয়া অন্দরের সুঁড়িপথ অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, সর্দ্দার তাঁহার পিঠে আস্তে আস্তে বন্দুকের আগার দ্বারা দুই একটি টোকা লাগাইয়া সসম্মানে কহিলেন, "পালাবার পথ বন্ধ, বাক্সটি ফেলে দিতে আজ্ঞা হোক।" বৃদ্ধ মুখ তুলিয়া চাহিলেন, কি সে করুণ ভীতভাব! সভয়দৃষ্টি! সহযোগীর হাতের টর্চ্চলাইটের রঙ্গিন আলোক যেন শবের পাংশু মুখে নাচিয়া উঠিল। বৃদ্ধ কম্পিত হস্তে বাক্সটা ভূতলে রাখিয়া ক্রন্দনপরায়ণ হইয়া কহিলেন- "আমার তরঙ্গিণী এ বাক্স আমার কাছে গচ্ছিত রেখেছে। তার বিধবা মেয়ের গহনা। কি জবাবদিহি কর্‌ব তাকে ?"

"বল্‌বেন—তার ধন খুব সৎকার্য্যে লেগেছে; চাবির গোছাটা দিলেন না ত? ফেলে দিন ঠাকুমশায়।"

বৃদ্ধ ভাবিতেছিলেন, বাক্স ফেলিয়া দিলেই তিনি রেহাই পাইবেন, কিন্তু আমাদের আব্দার তাহাতেই নিবৃত্ত নহে দেখিয়া, অগত্যা চাবির গোছাটাও ফেলিয়া দিয়া একটু ক্ষীণ অভিমান প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "এই নে বাবারা এই নে, দেখিস্ যেন কাউকে প্রাণে মারিস্‌নে।"

অতঃপর তিনি কাতরচিত্তে দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজিয়া সারসপক্ষীর ন্যায় অন্ধ সাজিয়া বসিয়া রহিলেন; আমরা আলমারি, সিন্দুক লণ্ডভণ্ড করিয়া মাল-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলাম। স্ত্রীলোকরা ছেলে কোলে করিয়া ঘোমটা টানিয়া এক ঘর হইতে অন্য ঘরে চলিয়া যাইতে লাগিলেন, আমরা সম্মানভরে নমস্কারপূর্ব্বক সমকণ্ঠে বলিলাম—"যান মাঠাকুরুণরা যান, আপনাদের আমরা কিছুই বল্‌ব না কিন্তু—"

"কিন্তু দেশের কাযে কিছু ভিক্ষা দিয়ে যেতে হবে, বেশী কিছু নয়, হাতের অনন্ত দু'গাছি খুলে দিয়ে যান্।

"গলার হারগাছাও খুলে ফেলুন।"

"নথটাও বাদ রাখবেন না, আজকাল নথের ফ্যাসান একেবারেই উঠে গেছে- জানেন ত?"

"লোহাগাছি হাতে রেখে বালাজোড়া দিতে কি কষ্ট বোধ কর্চ্চেন? বাঙ্গালীর মেয়ে ত আপনারা; পুণ্যলাভের জন্য কোলের ছেলেকেও ত সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে থাকেন। দিন মাঠাকুরুণ—দেশের কাযে দান দিয়ে পুণ্যলাভ করুন?"

ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে সকলে অলঙ্কারহীন হইতে লাগিলেন, মাতাদের অলঙ্কারে দেশমাতাকে সাজাইবার মানসে আমরা উৎফুল্লভাবে সে দান গ্রহণ করিলাম।

মা'র অঞ্চলধারী একটি ছোট মেয়ে মুখোসগুলার দিকে চাহিতেছিল, আর কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল। এক জন তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "এস ত লক্ষ্মী এ দিকে।" সে খুব জোরে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। এই সময় সহসা আমার মুখোসের দড়িটা খুলিয়া মুখোসটা আমার মুখ হইতে নামিয়া পড়িল। মেয়েটি ছুটিয়া আসিয়া আমার পা জড়াইয়া ধরিল, তাহার বোধ হয় মনে হইল, এই ভীষণ দৈত্যকুলে আমি প্রহ্লাদ, আমার নিকট হইতে করুণা পাইবে সে। সে ঠিকই আঁচিয়াছিল, আমার ইচ্ছায় কার্য্য হইলে, আমি তাহার গহনা লইতাম না; কিন্তু আমি এখন যন্ত্রমাত্র, সর্দ্দারের ইঙ্গিতচালনায় আমি তাহার হাত হইতে বালা দু'গাছি খুলিয়া লইলাম। একটা অনুতাপের তীব্র ঝাপটায় অন্তস্তল ভেদ করিয়া সে কাতর ক্রন্দনে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। আমি বার বার "বন্দে মাতরম্" মন্ত্রের জপে সে আলোড়ন শান্ত করিয়া লইলাম।

অর্দ্ধঘণ্টাকাল মাত্র আমাদের কার্য্যের সময় নির্দ্দিষ্ট। তাহার মধ্যেই আমরা টাকা-কড়ি অলঙ্কারাদি যথেষ্ট বাঁধিয়া লইয়া থলি-স্কন্ধ সৈনিকবেশে সদর-দ্বারে উপনীত হইলাম।

এই সময় পলাতক ভৃত্যের সহিত কয়েকজন পাড়াপ্রতিবাসী এবং জন দুই চৌকিদার পুরুষ আমাদের কাছাকাছি আসিয়া পড়িল। সকলের হাতে বড় বড় লাঠী, কিন্তু তাহা চালনার অবসর তাহাদের ভাগ্যে আর ঘটিয়া উঠিল না। ঘন ঘন বন্দুকের আওয়াজে তাহাদিগকে চিত্রাঙ্কিতের ন্যায় দাঁড় করাইয়া রাখিয়া, চোরাই মালসহ আমরা তাহাদের পাশ দিয়াই বীরদর্পে বুক ফুলাইয়া চলিয়া গেলাম।

৩

ইহাই স্বদেশী ডাকাতী! এত সহজে এরূপ সর্বনাশা জয়লাভ এক বাঙ্গালাদেশেই সম্ভবে! আত্মরক্ষার জন্য একখানা খাঁড়া—অর্থাৎ বড় রকম দা ঘরে রাখিতেও বাঙ্গালীর অধিকার নাই। এই অবাধ জয়লাভে আত্মপ্রসাদ লাভ করিব কি, মন দুঃখ-গ্লানিতেই ভরিয়া উঠিল। বাঙ্গালার প্রকৃত অসহায় অবস্থা বেশ ভাল করিয়াই হৃদয়ঙ্গম করিলাম। তবুও যে এ দেশে ঘন ঘন ডাকাতী হয় না, রাজভয় তাহার প্রকৃত কারণ নহে, বাঙ্গালী জাতি যে কিরূপ শান্তিপ্রিয় নিরীহ প্রকৃতির লোক—ইহা হইতে তাহাই বুঝা যায়। হায় হায়! কত শৌর্য্যবীর্য্য মনুষ্যত্বের বিনিময়ে এই শান্তিটুকু আমরা কিনিয়াছি!

দ্বিতীয়বারে আমরা নৌকা-ডাকাতী করি। সেবারেও বেশ সহজে সিদ্ধিলাভ হইয়াছিল। কিন্তু তৃতীয়বারে আমরা নিরাপদে ফিরিতে পারি নাই। আমাদের কৃপায় ক্রমে লোকরাও সচেতন হইয়া উঠিতেছিল। এই মুমূর্ষু নির্জীব জাতিকে প্রাণবন্ত সজীব করিয়া তুলিলাম আমরা অঙ্গুলিগণ্য নগণ্য কয়েকজন বালক! ইহা কি আমাদের গৌরবের কথা নহে? রাজপুরুষগণও আমাদের ধরিতে না পারিয়া ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িয়াছিলেন।

তৃতীয়বারেও নৌকাযোগে ডাকাতী করিতে যাই। ডাকাতীর পর মালপত্রসহ আমরা যখন নদীর প্রায় কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছি, সপুলিস জমীদারের লোকজন দুই পাশ হইতে আমাদের আক্রমণ করিল। Fire করিতে অর্ডার পাইলাম পুলিসও বন্দুক ছুড়িল। তবে অন্ধকার রাত্রি - পুলিসের হ্যারিকান লণ্ঠনের আলো মাঝে মাঝে এক একবার এক একদিকে মাত্র আলোক নিক্ষিপ্ত করিতেছিল, সেই জন্য আত্মরক্ষার সুযোগ আমরা যথেষ্ট পাইয়াছিলাম। একটিমাত্র ছেলে বন্দুকের গুলীতে আহত হইয়া পড়িল, কিন্তু সে অবস্থায় তাহাকে নৌকায় তোলা সহজ নহে বুঝিয়া, সর্দ্দার তৎক্ষণাৎ তাহার মস্তক দেহবিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। দুই জন দেহ লইয়া গেল, ছিন্ন মস্তক তুলিয়া নদীতে নিক্ষেপের ভার পড়িল আমার উপর। একদিন আমার পাঁঠা কাটিতে কষ্টের সীমা ছিল না, আর আজ সেই আমিই সর্দ্দারের হুকুমে অনায়াসে বন্ধু বালকের ছিন্নমুণ্ড তুলিয়া লইয়া অন্ধকার পথে তীরের দিকে ছুটিলাম। সোজা পথে নৌকা ধরিতে গেলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা, সকলেই আমরা ঘুরপথে যাত্রা করিলাম। পথ-ঘাট আগে হইতেই যদিও চেনা-জানা, তবুও অন্ধকারে আমি কেমন দিশাহারা হইয়া দলবিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলাম। নৌকায় উঠিবার যখন শেষ সঙ্কেত-ধ্বনি পড়িল, তখনও আমি তীরে পৌঁছিতে পারি নাই। ছুটিয়া ছুটিয়া পথ চলিয়া দু'মিনিটের মধ্যেই যদিও একটা আঘাটায় আসিয়া পৌঁছিলাম, কিন্তু নৌকা তখন প্রায় মধ্য-জলে সশব্দে বাহিত হইয়া চলিয়াছে; তাহার নিশানখানা অন্ধকারেও দুলিয়া দুলিয়া আমার পরিত্যক্ত অসহায় অবস্থা বেশ পূর্ণভাবেই ইঙ্গিত করিয়া জানাইল।

বিজন নদীতীরে তৃতীয় প্রহর নিশাকালে যূথভ্রষ্ট মেষসম আমি একা, না, ঠিক একা নহে—আমার সাথী হস্তে সেই ছিন্ন মুণ্ডটি! আমারি সমবয়সী বালক ছিল সে—কি ভালই বাসিতাম তাহাকে! মুণ্ডটি দুই হাতে ধরিয়া গভীর স্নেহভরে সেই মৃত মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম—নক্ষত্র জগতের সমস্ত কিরণ-কণা তাহার উপর কেন্দ্রীভূত হইয়া উঠিল,—কি প্রশান্ত কি প্রফুল্ল সে মৃতমুখ,—হসিভরা চোখ দুটি আমাকে যেন সান্ত্বনা প্রদান করিতে লাগিল, তবু কষ্টে চখে জল ভরিয়া উঠিল, আমি চক্ষু নিমীলিত করিলাম। কতক্ষণ এরূপে বসিয়া ছিলাম, জানি না—সহসা যেন পশ্চাতে পদশব্দ শুনিলাম, আর ত ভাবনা চিন্তার সময় নাই—আত্মরক্ষার সময় আসিয়া পড়িয়াছে। আমি তাড়াতাড়ি জলে নামিয়া দাঁড়াইয়া মুণ্ডটা নদীর গভীরতর প্রদেশে নিক্ষেপ করিলাম, পরে উঠিয়া অন্য স্থানে গিয়া দাঁড়াইলাম। তখন ভোরের আলোক ফুটিতে আরম্ভ হইয়াছে, দেখিলাম—পিরাণটা রক্তমাখা, তাড়াতাড়ি তাহা খুলিয়া জলে ফেলিয়া দিয়া, নদী-পাড়ের নীচে নীচে কভু বা বালু-পথে, কভু বা কাদা-পথে, কভু কাঁটা-ঝোঁপের মধ্যে দিয়া চলিতে লাগিলাম।

কি সে উৎকট ঔৎসুক্য! বলিয়া প্রকাশ করা যায় না। যিনি ভুক্তভোগী, তিনিই মাত্র আমার সে সময়ের নিদারুণ যন্ত্রণা বুঝিতে পারিবেন। একবার নিশ্বাস গ্রহণের জন্য একটা ঝোঁপের মধ্যে

বসিয়া পড়িলাম,—তখন ধুতীর উপরেও দুই এক স্থানে রক্তের দাগ লক্ষ্য করিলাম। কাপড়খানা কাচিতে আবার জলে নামিলাম।

ঐ, ঐ, আবার পদশব্দ! তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঝোঁপের মধ্যে বসিলাম। পদশব্দ ক্রমশঃ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল, দীর্ঘকায় দুই জন লোক ঝোঁপের কাছাকাছি আসিয়া দাঁড়াইয়া জলের দিকে নামিল; আমি ধীরে ধীরে জ্বালাময় রুদ্ধ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া দেখিলাম—তাহারা ধীবর, নৌকাখানা জলে টানিয়া দাঁড় বাহিয়া যখন তাহারা চলিয়া গেল—তখন মনে হইল, আমিও ত উহাদের সহিত যাইতে পারিতাম; নিশ্চয়ই বলিলে উহারা আমাকে লইয়া যাইত। কিন্তু হায়! তখন সময় চলিয়া গিয়াছে!

আবার পদশব্দ! উঁকি মারিয়া চাহিলাম—লালপাগড়ীর চূড়া নজরে পড়িল। আর রক্ষা নাই! গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়া গেল; কিন্তু পাগড়ীধারী এদিকে আসিল না; অন্য পথে চলিয়া গেল; হাঁফ ফেলিয়া, ধীরে ধীরে উঠিয়া উজলে নামিলাম। কি তৃষ্ণা! যেন মুমূর্ষু ব্যক্তির পিপাসা! জলপান না করিতে পারিলে এখনই প্রাণ বাহির হইয়া যাইবে। অঞ্জলি ভরিয়া অমৃত পান করিলাম, দেহে বলসঞ্চার করিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম—তখনও সূর্য্যোদয় হয় নাই—পূর্ব্বগগন লাল হইয়া উঠিয়া—তাঁহারই উদয় অপেক্ষা করিতেছে,—এখনও নদীতীর নির্জ্জন, সবেমাত্র দুই এক জন বৃদ্ধা অনতিদূরে ঘাটে নামিতেছেন; দুই এক জন চাষা লাঙ্গলধারী বলদ লইয়া মাঠের দিকে চলিতেছে। জমীদারবাড়ীর ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া ছয়টা বাজিল। মাত্র দুই ঘণ্টা আমি এই তীরে ঘোরা-ফেরা করিতেছি; মনে হইল, এই দুই ঘণ্টার মধ্যে যুগ-যুগান্তর আমার মাথার উপর দিয়া চলিয়া গেছে! কোথায় লুকাই! কোথায় পালাই! হে ভগবান্, রক্ষা কর, পথ দেখাও; এই অসহায় বালককে আশ্রয় দাও।

আমি একমনে সেই বিপদের কাণ্ডারীকে ডাকিতে লাগিলাম। আবার পদশব্দ! উঠিবার শক্তি হারাইলাম। নিদারুণ ঔৎসুক্যে হৃৎপিণ্ড যেন ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইল, আমি সকল শক্তি হারাইলাম! এ কষ্টের অপেক্ষা বন্দী হওয়া ত ভাল! ভগবান্ সে প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন। দুই জন লোক হন্ হন করিয়া আমার নিকটেই এবার আসিতে লাগিল। এক জন বলিল, 'এই যে—এই যে! দেখ দেখি, ও কে এক জন ব'সে ওখানে?" মুহূর্ত্তমধ্যে উভয়েই আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, আমি বন্দী হইলাম।

* * * *

রাজনৈতিক বন্দীর যে কিরূপ অবস্থায় দিন কাটে—তাহার বিশদ বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে ইহা এখন আলোচ্য বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে! বস্তুতঃ এ জাতীয় জীবের অবস্থা করাত-মধ্যবর্ত্তী শম্বের ন্যায় শোচনীয়। একদিকে নির্জ্জন কারাবাসের মানসিক পীড়ন, অন্যদিকে স্বীকার-গৃহের শারীরিক পীড়ন। এই উভয়বিধ নৈষ্ঠুর্য্যই যে সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম হইতে বৃহত্তম মাহাত্ম্যে সুসভ্য-জাতির মহত্তম কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। এই মহাপীড়ন সহ্য করিয়াও বন্দী বালকেরা যে বাঁচিয়া ফিরে, ইহাও কম আশ্চর্য্যের বিষয় নহে! তাহারা মহাপ্রাণ বা মহাপাষাণ!

ব্যাটারির আঘাতে হাত-পা ভাঙ্গে না; কিন্তু হাড়ে হাড়ে যে ভীষণ বেদনা অনুভূত হয়, তাহাতে মানুষকে পাগল করিয়া তোলে। ইহা ছাড়া আরও দুই একরূপ ভয়ঙ্কর পীড়ন আছে, তাহা লেখনীমুখে প্রকাশযোগ্য নহে। কেন যে দুর্ব্বলপ্রকৃতির লোক এই পীড়ন-মুখে approver হইয়া দাঁড়ায়, তাহা সহজেই বুঝা যায়। আমি কিন্তু এতদিনে বুঝিলাম—আমি কাপুরুষ নহি। নরম কথায় আমি যতই টলমল্ করি না কেন, পীড়ন-কষ্টে আমি অটল ছিলাম। তবে সে কষ্ট হইতে ক্ষণিক নিষ্কৃতিলাভের জন্য মিথ্যা কথা অজস্র বলিয়া যাইতাম। এ সব উপায়ে আগে হইতেই শিক্ষিত হইয়াছিলাম! পুলিসকে ধাঁধা দিবার জন্য স্বীকার উক্তিতে প্রায়ই অজানা-অচেনা এমন সব জমীদারপুত্রের নামোল্লেখ করিতাম যাহাদের ধরা-ছোঁয়াও সহজ নয় এবং বিদ্রোহিতা করাও সম্ভব নয়। কিন্তু আজকালকার কালে কি যে সম্ভব, কি যে অসম্ভব, তাহা ত বুঝা যায় না। পুলিস মহাজনরা সেই সব কল্পিত সহযোগীদের সন্ধানে শূন্যে ফাঁদ পাতিতে ছাড়িতেন না! একবার কিন্তু সত্য সত্যই বড় অনর্থ ঘটিয়াছিল। শান্তিপুরের জমীদারপুত্র শশধর আমাদের এক জন সহযোগী, এই খবরটা আমি পুলিসকে

দিই। অথচ কোথায় যে শান্তিপুর, তাহাও কখন দেখি নাই;—সেখানে জমীদার আছে কি নাই, তাহার পুত্রই বা কে, তাহাও জানি না। একদিন সত্যসত্যই পুলিস শান্তিপুর হইতে শশধরনামক একটি ছেলেকে আমার নিকট আনিয়া হাজির। এ জমীদারপুত্র নয়, তাহার শ্যালকপুত্র। তাহাতে কি আসে যায়! শশধর নামও সে ধরে আর স্কুলেও পড়ে। তার ঘরে কংগ্রেসওয়ালার দু'একখানা ছবি, দু' একখানা যুগান্তর, সর্ব্বোপরি গীতার ছোট্ট এডিসন পকেট-বুক দু'একখানাও নাকি পাওয়া গিয়াছে; প্রমাণ চূড়ান্ত! তবুও আমি কিন্তু তাহাকে চিনিলাম না। ইহার ফলে লাঠীর সামান্য গুঁতো খাইয়া সে বেচারা বিদায় লাভ করিল—কিন্তু আমার অদৃষ্টে যে পীড়ন লাভ হইল, তাহা এমনই ভীষণ হইতে ভীষণতর যে, অবশেষে তাহার নিবৃত্তি হইল কোথায়—তাহা আমার মনে নাই। কষ্টে যখন চোখ বুঝিলাম, তখন মনে হইল, যমদূত আমার শিয়রে দাঁড়াইয়া! কিন্তু আমার ত বাঁচিবার সাধ তখনও মিটে নাই! ধরণী কি সুন্দর! পিতার স্নেহ, পিসীমা'র আদর, বয়স্যপ্রীতি, শান্তার ভালবাসা সকলই কি সুন্দর! (পিতা যে লোকান্তরে, সে কথা ভুলিয়া গিয়া ছিলাম।) সর্ব্বোপরি সুন্দর আমার দেশ। তাহার বন্ধন এখনও ঘুচাইতে পারি নাই,—আমার কাযও ত ফুরায় নাই!

ঐ দেখা যাইতেছে, স্বাধীনতার উন্মুক্ত অমৃত-ভাণ্ডারদ্বার, দুই পদ অগ্রসর হইবামাত্র ব্যাকুল প্রাণের তৃষ্ণা দূর হইবে, অমৃতপানে জীবন অমর হইয়া উঠিবে,—পারিব না, আমি মরিতে পারিব না, আমার কায এখনও ফুরায় নাই, আমার দেশ-মাতৃকা এখনও অধীনতার শৃঙ্খলে বাঁধা!

চোখ খুলিয়া গেল! এ কি, কোথায় আছি! এ ত আমার সে কারাগৃহ বা পীড়নগৃহও নয়! পুলিসের লোকরাই বা কোথায়? আমি পাশ ফিরিলাম,—এ কি! কাহার স্নেহময় চক্ষু আমার মুখের উপর স্থাপিত? কেমিক্যাল সাহেব না? কেমিক্যাল সাহেব আমার কপালে হাত দিয়া আনন্দপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "ভাল আছ তুমি, নবকুমার?"

"হ্যাঁ ভালই আছি। এখানে কি ক'রে এলুম? আপনি এনেছেন?"

"এ হাসপাতাল। তোমার অসুখ করেছিল—তাই এখানে আছ। আর একটু ভাল হও, তখন বাড়ী যেতে পারবে। তুমি মুক্তি পেয়েছ।"

এ কথায় বিশ্বাস করিতে যেন সাহস হয় না। ক্ষীণকণ্ঠে অর্দ্ধস্ফুটস্বরে আনন্দ-বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম—"মুক্তি পেয়েছি?"

"হ্যাঁ, তুমি মুক্তি পেয়েছ। মিথ্যা-মিথ্যি পুলিস তোমাকে কষ্ট দিয়েছে—নিশ্চয়ই তুমি দোষী নও।"

কেমিক্যাল সাহেবের হাত ধরিয়া আনন্দকৃতজ্ঞতায় বালকের ন্যায়ই আমি কাঁদিতে লাগিলাম। বলা বাহুল্য, কেমিক্যাল সাহেবই আমার পক্ষে দাঁড়াইয়া আমি যে সুচরিত্র—এই প্রমাণে আমাকে পুলিসের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়াছেন।

আশ্বিন মাস; বোধন বাদ্যের আগমনী-সঙ্গীতে চারিদিক্ আনন্দপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে—আমি মহাশক্তিকে ভক্তি জানাইতে গিয়া কেমিক্যাল সাহেবের প্রতিই ভক্তিনত হইয়া ভাবিলাম—"যদি ভারতে এইরূপ দশ বিশটাও কেমিক্যাল সাহেব থাকিতেন, তাহা হইলে ইংরাজ-রাজ্য আজ প্রেমরাজ্য হইয়া উঠিত।"

এখন আমি প্রকৃতই good boy, এণ্ট্রেন্স দিবার মানসে আবার স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছি, খুন ডাকাতী যে স্বাধীনতার পথ নয়, ইহা আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্তু তবুও—! তবুও আমার চিত্ত প্রশান্ত হয় না। অধীনতাবন্ধন ছেদন করিবার আকুলতাও এখনও নিবে নাই। যদি সময় আসে, যদি কোন পথ-প্রদর্শক কাম্যফল-লাভের উজ্জ্বলতর উৎকৃষ্টতর পথ দেখাইয়া দেন—তবে আমি যে সর্ব্বাগ্রে জীবন-মরণ-পণে পুনরায় তাঁহার নিশানতলে গিয়া দাঁড়াইব, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

কে বলিতে পারে, কেমিক্যাল সাহেবের ন্যায় কোন বিদেশী মহাপুরুষই তাঁহার হস্তের বিশাল মশাল-আলোকে আমাদের অন্ধকার পথ আলোকিত করিয়া তুলিবেন না? হিউম সাহেবও ত ছিলেন বিদেশী!

গল্প-প্রবন্ধমঞ্জুষা

—*—

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত

ষষ্ঠ—৩১

গল্প-প্রবন্ধমঞ্জুষা

---*---

কান্তিবাবুর খোসনাম

শ্রীমান্ কান্তিচন্দ্র নবনামকরণে কবিব্যসন; লাই-ব্রেরী-ঘরে বসিয়া তিনি কবিতা লিখিতেছিলেন এবং দুই চারি ছত্র শেষ করিয়া, মনের আনন্দে তাহা আবৃত্তি করিয়া যাইতেছিলেন। কবিতাটি অদ্য সন্ধ্যার সময় তাঁহাদের নব-সাহিত্য-সভায় পঠিত হইবে।

"মরি আজ দখিণা হাওয়ায়
কোন্ কাননের বিদেশিনী কোন্ সুরে গান গায়?
কম্পিত থর-থর—পল্লব মর-মর,
হৃদয় হা-হুতাশে করে হায় হায়!
মরি দখিণা হাওয়ায়।
মধুর চাঁদিনী আজি
ফুটেছে ফুলের সাজি
যেন শুদ্ধ ভোজবাজি—
নিশার দিশায়!
মরি দখিণা হাওয়ায়।
আমার প্রাণের ফুলটি কেন—
শুকাইয়ে যায়!
ওরে বাতাস দে রে আশাস
দে রে রঙিন দোল,
মনকে আমার মদির রসে
মাতাইয়ে তোল।
কলি ফুটুক মুঞ্জরিয়া—
অলি উঠুক গুঞ্জরিয়া
নদী ছুটুক কল্লোলিয়া
প্রেমের মমতায়.
মরি দখিণা হাওয়ায়।
আয় বসন্ত আয় রে ভূমা
ছড়িয়ে দে রে রঙ্গে চুমা—
অঙ্গ আঙ্গিনায়,
ছল-ছলিয়ে কল-কলিয়ে
প্রাণের কলস দে ভরিয়ে
কাণায় কাণায়—.
মরি দখিণা হাওয়ায়।"

কান্তিচন্দ্রের দক্ষিণ হাওয়ার কবিতা দক্ষিণ হাওয়াতেই কিন্তু মিলাইয়া যায় নাই, আরও এক জনের কানের মধ্য দিয়া মরমে পশিতেছিল।

এখন সবেমাত্র বেলা দুইটা, কিন্তু পাশের খালি বাড়ীর মালীমহলে সন্ধ্যাবেলা আজ সুমিত্রা দাসীর নিমন্ত্রণ আছে। সেখানে আজ মালীরা সখের কৃষ্ণযাত্রা করিবে;—নামজাদা উড়ে কনসার্টওয়ালারাও সেখানে আসিয়া জুটিয়াছে—তাহারা যাত্রার পর্ব্বে পর্ব্বে হারমোনিয়ম-বেহালাতে গড়ের বাদ্য বাজাইবে, যাত্রা অপেক্ষা ইহা শুনিবার লোভই সুমিত্রার অধিক। তাই আজ বেলাবেলি সান্ধ্য-পাট শেষ করিবার অভিপ্রায়ে দাদাবাবুর ঘরের কিরোসিন-বাতিটা সে লইতে আসিয়াছিল। আসিয়া কবিতাপাঠ শুনিয়া—সুমিত্রা দরজার পাশে দাঁড়াইয়া গেল; পড়া থামিলে ঘরে ঢুকিয়া বলিল—"বড় ভাল লাগে মোর দাদাবাবুর গান—শুনিকিরি খালি কান্না পায়।" বলিয়া সে খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। সুমিত্রা উড়েনী, আধাবয়সী; কিন্তু সাজসজ্জার আড়ম্বরে বয়সটাকে একান্তই কাঁচাইয়া তুলিয়াছে সে। তাহার খাট চুলের ঝুঁটিটি শাড়ীর ছেঁড়া পাড় দিয়া অতি মনোমোহন-রূপে বাঁধা,—দুঃখের বিষয়, এই যত্ন-রচিত কেশ-বিন্যাস তাহার সচরাচর লোকের নজরে পড়ে না—মাথার কাপড়ের আড়ালে ঢাকা পড়িয়া যায়। কিন্তু সীঁতির দুই পাশ হইতে তাহার সম্মুখের কপালের উপর তেল-জব-জবে পেটে পাড়ান চুলের যে বাহার খুলিয়াছে, তদ্দর্শনে বৃদ্ধ কুণ্ডলিমালীর অন্ধ নয়নেও সহসা সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের দিব্যদৃষ্টি ফুটিয়াছে। সুমিত্রাকে দেখিলেই সে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে এবং গোপনে ও প্রকাশ্যেও বার

বার সেই মনমাতানো রূপ-সজ্জার তারিফ না করিয়া থাকিতে পারে না। সুমিত্রার পরণে লাল-পেড়ে শাড়ী, গলায় পুঁথির মালা, কানে সোনার চাকতি, নাকে খুঁটা মুক্তার নাকছাবি, হাতে রূপার বাউটি, এতদ্ব্যতীত বাকী অঙ্গপ্রত্যঙ্গ উল্‌কিভূষণে ভূষিত। সহসা সুমিত্রার আবির্ভাব উপলব্ধি করিয়া, চমকিয়া কান্তিচন্দ্র সেই দিকে চাহিয়া, ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, "তুই এলি কোথা থেকে, চ'লে যা বল্‌ছি! আমাকে বিরক্ত করিস্ নে।" সুমিত্রা দাদাবাবুর বকুনিতে বিন্দুমাত্র না টলিয়া, উল্‌কির উপর রস-কলিকাটা 'চেপটা-চোপটা' মুখখানা দেরাজের উপর প্রতিষ্ঠিত আরসির প্রতিবিম্বে একবার দেখিয়া লইয়া হাসিয়া বলিল, "আহা মরি—সীতে ঠাকুরাণী অশোকবনে হায় হায় করুছেন—শুনি বুক ফাটি-কিরি উঠিছে।"

কান্তি আবার ক্রুদ্ধস্বরে বলিল্—"হাসি হচ্ছে দেখ না, চ'লে যা বল্‌ছি এখান থেকে!"

সুমিত্রা দমিবার পাত্রী নয়—বেশ সপ্রতিভ-ভাবেই উত্তর করিল, "হাস্‌ছি না দাদাবাবু—কান্নায় মোর বুক ফাটিকিরি যাউছি—হায় রে সীতে ঠাকরুণ জনমদুখিনী জনক-কন্যে!"

কান্তিচন্দ্র আবার তাহাকে একটা তাড়া দিল—তাড়া খাইয়া সে অনুরোধের স্বরে বলিল—"দাদা-বাবু গো, আর একবার গানটি বল না গো।"

এই সময় কান্তির একজন বয়স্য যদি না আসিয়া দেখা দিত, তবে আরও কতক্ষণ ধরিয়া এইরূপ অভিনয় চলিত, কে জানে। নবাগতকে দেখিয়া, খুঁটির উপরকার অঞ্চলটা মাথার উপরে আর একটু টানিয়া দিয়া, তেলের বাতিটা মেজের উপর হইতে তুলিয়া লইয়া সে চলিয়া গেল। গৃহের বাহিরে গিয়াই এমন অপরূপ স্বরে হাসিয়া উঠিল যে, তাহা হাসি বা কান্না, নিপুণ দার্শনিকই তাহা বলিতে পারেন।

বিনয় কান্তিবাবুর কাছে আসিয়া ঝুঁকিয়া টেবলের কাগজের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "লিখছ তা হ'লে? আমি তোমাকে তাড়া দিতে এসেছিলুম—বন্ধু!"

"এসেছে, বেশ করেছ—শোন দেখি, একবার—বল দেখি, কেমন লাগে?"

বিনয় বলি, "একবারে রাত্রেই শোনা যাবে; একটু কায আছে—এখনি যেতে হবে।" কান্তি চৌকি হইতে উঠিয়া—বন্ধুর হাত ধরিয়া তৈলমলিন-তায় প্রতিদ্বন্দ্বিপরায়ণ পাশের চৌকিখানার উপর তাহাকে বসাইয়া বলিল—"ছোট্ট কবিতা, বেশী সময় যাবে না, শুন্‌তেই হবে বিনদা? যদি তোমার ভাল লাগে, তবেই কম্‌পিটিসনে যেতে মন যাবে।"

কবিতাটি সে সুরে-লয়ে-তানে আবৃত্তি করিয়া বন্ধুবরকে শুনাইল। শুনিয়া বিনয় মাথা নাড়িয়া প্রশংসিতদৃষ্টিতে কহিল, "হ্যাঁ, হয়েছে ভাল, ছন্দটা ঠিক যেন রবিবাবুরই—আর অনেক কথাও এর মধ্যে তাঁর,—অথচ ঠিক অনুকরণও নয়—আজ সভা থেকে নিশ্চয়ই তুমি উপাধিভূষিত হবে: ভাল কথা, ভারতলক্ষ্মীর বিজ্ঞাপনটা কি দেখেছ?"

"না, সময় কই? কাগজখানাও ত আমি এখনও পাই নি।"

"প'ড়ে দেখিস্ তবে সুবিধামত। রেখে যাচ্ছি কাগজখানা—আমি এখন চল্লুম।"

বিনয় চলিয়া গেল, সগর্ব্বে সানন্দে কান্তি আর একবার কবিতাটা পড়িল—তাহার পর খাতাখানা যথাস্থানে রাখিয়া বলিল, "আচ্ছা, এইবার দেখা যাক, কি খুঁৎ ধরেন আমার বিদুষী ভগিনী—তাঁর কাছ থেকে ত এক দিনও একটু মনখোলা প্রশংসা পেলুম না। এণ্ট্রেন্স পাশ করেছেন তিনি ফার্ষ্ট ডিভিসনে, এই গরবেই গেলেন প্রশংসা যা কিছু সব যেন তাঁরই প্রাপ্য। আরে, কবিতা লেখা—আর পাশ করা কি এক কথা না কি? পাশ হচ্ছে ত লাখো লোক—আর কবিতা লিখতে পারে ক'জন। তিনিও কবিতা লিখতে সুরু করেছেন—তা যদিও বুঝতে পেরেছি—ছেঁড়াখোড়া দু' একটা কাগজের টুকরতে তার নমুনা পাওয়া গেছে, ভাঙ্গা টুকরিতে স্থান পাবারই তা জিনিষ বটে। যা হ'ক্, এটা যদি ভাল না বলে ত নিশ্চয় বুঝব Jealeusy! —সেরেফ Jealousy! তা ছাড়া আর কিচ্ছু নয়।"

২

শান্তির বিধবা মাতা শান্তিকে লইয়া ভ্রাতার বাড়ীতেই থাকেন। কান্তিচন্দ্র শান্তির মামাতো ভাই, উভয়ে প্রায় একই বয়সী, কান্তি বছরখানেকের মাত্র বড়। এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা দিয়াছিল দুইজনে

একই সঙ্গে, কিন্তু শান্তি পাশ হইল প্রথম বিভাগে—আর কান্তিচন্দ্র টায়টোয়ে দুই চার নম্বর গ্রেসে—থার্ড ডিভিসনে পাশ-নাম রক্ষা করিল। পরীক্ষকদিগের একান্ত পক্ষপাতিতাবশতঃই যে এমনটা হইল, মেয়ে বলিয়াই যে শান্তি তাঁহাদের নেক্‌-নজরে পড়িয়াছে, ইহাতে কান্তিচন্দ্রের বা তাহার বন্ধুগণের বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। এই উপলক্ষে কিছুকাল ধরিয়া প্রত্যেক পরীক্ষকের আদ্যশ্রাদ্ধের আলোচনায় কান্তিচন্দ্রের মজলিসঘরটি বেশ সরগরম হইয়া উঠিল। কিন্তু ইহার পর কান্তিবাবু যখন শুনিলেন, শান্তি এল্‌-এ পরীক্ষায় দাঁড়াইবারও সঙ্কল্প করিতেছে, তখন তাঁহার মন এতই খারাপ হইয়া গেল যে, বন্ধুদিগের খাস মজলিস এবং খোসগল্প কিছুই আর তাঁহাকে খুসী করিতে পারিল না। বে-ইজ্জৎ হইবার ভয়ে, স্কুল-কলেজের সহিত সম্পর্ক উঠাইয়া—গান্ধী মহারাজের জয়গানে মাতিয়া তিনি ননকোনিশান ধরিলেন।

পিতা অনুনয়-বিনয় করিয়া বলিলেন, "গান্ধী মহারাজার জয়গান গাচ্ছিস—গা বাবা, বেশ; আমরাও ত গাচ্ছি—বিশ্বসংসারশুদ্ধ সবাই গাচ্ছে, কিন্তু স্কুল-কলেজ ছাড়বি কেন বাবা, সে জন্য, ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে শেষে গণ্ডমূর্খ হয়ে থাকবি।"

ছেলে উত্তর করিল, "গণ্ডমূর্খ হয়ে থাকা ত আমার উদ্দেশ্য না,—পড়াশুনা আমি ঘরেই করব, পরীক্ষা না দিলে কি আর লোকে বিদ্বান্ হয় না? রবিবাবু ত এতবড় বিদ্বান্ লোক, তিনি ক'টা পাশ করেছেন, বলুন ত ?"

কান্তিচন্দ্র পিতা-মাতার সবেধন নীলমণি! কি জানি, বেশী পীড়াপীড়ি করিলে যদি বা সে বিবাগী-ই হইয়া যায়, অতএব আর উচ্চবাচ্য না করিয়া ছেলের পড়ার জন্য ঘরে মাষ্টার রাখিয়া দিয়াই তিনি মনের ক্ষোভ নিবৃত্তি করিলেন।

এ দিকে দৈবনির্ব্বন্ধে, শান্তির ভাগ্যবলে,—হইতে পারে কান্তিরও অদৃষ্টজোরে - হঠাৎ শান্তির একটি ভাল বর জুটিয়া গেল, ফলে পাশের সংকল্পে তাহার এইখানেই ইতি পড়িল। কান্তিচন্দ্র হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন! ননকোর কৈফিয়ৎ যতই টানুন না, তিনি বি এ, এম্‌-এ-ধারী বোনের পাশে এন্ট্রেন্স পাশ ভাই! কথাটা এমন বিশ্রী শুনাইত এ খর্ব্বতার হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়া বন্ধুদের লইয়া বোটানিক্যাল গার্ডেনে গিয়া সে এক দিন পিক্‌নিক করিয়া আসিল।

পাশের পড়া ছাড়িল বলিয়া শান্তি কিন্তু লিখাপড়া ছাড়িল না। বিবাহের অল্পদিন পরেই ইঞ্জিনিয়ার হইবার মানসে স্বামী বিলাতে চলিয়া গেলেন—আর শান্তি স্বামীর মনের মত হইবার মানসে ঘরে বলিয়া যথাসম্ভব বিদ্যাবুদ্ধির পরিচালনায় প্রবৃত্ত হইল। ছেলেবেলা হইতেই শান্তির গল্পকবিতা লিখার দিকে ঝোঁক ছিল, . যত্ন পরিশ্রমে তাহার রচনা-প্রতিভা দিব্য ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। মাঝে মাঝে দুই একটি গল্প কবিতা বেনামা সহীতে মাসিক পত্রিকার সম্পাদকগণের নিকট সে পাঠাইয়া দিত এবং পরে আনন্দ-বিস্ময়ে দেখিত, কোন কোনটি যথাসময়ে প্রকাশিত হইয়াছে। এ খবর কিন্তু শান্তি কান্তিবাবুকে কোন দিন জানায় নাই, কারণ, সে জানিত—দাদা এ কথা শুনিলে সন্তুষ্ট হইবেন না। হইলে কি হয়—সত্যের মহিমা স্বতঃ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, দুই একখানা ছেঁড়া কাগজের টুক্‌রা কান্তিবাবুর হাতে আসিয়া পড়ায় তিনি সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিলেন,—মাথা নাড়িয়া ভাবিলেন, "শান্তি দেখছি পরীক্ষার পড়া ছেড়ে চুপচাপ ব'সে নাই—ভিতরে ভিতরে একটা কাণ্ডকারখানা বাধাবার চেষ্টায় আছে। যাক্, এ ক্ষেত্রে আমাকে হার মানাতে পারবে না। দেখা যাক্, তার বিদ্যার কত দৌড়।"

কান্তিচন্দ্রও স্কুল-কলেজ ছাড়িয়া কবিতা লিখিতে সুরু করিয়াছিলেন, এবার রীতিমত উদ্যমে লিখা আরম্ভ করিলেন। রবিবাবুর কাব্যগ্রন্থে তার সেল্ফ, আলমারী ভরিয়া গেল এবং অবিলম্বে সাহিত্য-সভার প্রতিষ্ঠা হইল। তাহার পিতা ভাবিলেন, ননকো দলে মিশিয়া পিকেটিং করিয়া কোন্ দিন ছেলে জেলে যাইত—তাহার অপেক্ষা ইহা ভালই হইয়াছে। কাশীরামের মহাভারত এবং কৃত্তিবাসের রামায়ণ তিনি এই সভায় দান করিলেন।

শান্তি তাহার লিখার কথা দাদার কাছে প্রকাশ করে নাই, কিন্তু কান্তি কবিতা লিখিয়াই সগর্ব্বে বোনকে শুনাইতে আসিত। এ ক্ষেত্রে যশোলাভের প্রত্যাশা সে বড় একটা করিত না; জানিত,

এ বড় কঠিন ঠাঁই, কিন্তু শেলি-বায়রণের ন্যায় তাহার কবিত্ব-প্রতিভা যে সমালোচনা এবং সমালোচকের বহু উর্দ্ধে, নিন্দা-প্রশংসার অতীত অমরশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহাই সে শান্তিকে অনুভব করাইতে আসিত।

কান্তি যখন শান্তির ঘরে ঢুকিল, তখন সে লিখিতেছিল। কান্তিকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি কাগজপত্রগুলা দেরাজবন্দী করিল—কিন্তু দীর্ঘ কাগজের লিখা পৃষ্ঠাটা কান্তির নজর এড়াইল না। কান্তি হাসিয়া বলিল, "কি লিখা হচ্ছিল। আমাকে দেখেই অমনি ঢাক গুড়-গুড়! কাল বুঝি মেল-ডে?"

শান্তি হাসিয়া বলিল, "সে খবরটাও ত রাখ দেখছি।"

কান্তি বলিল, "তোর জন্যে রাখিনে- আমার টিটবিটটা আসে যে। কিন্তু কাল মেল আসবে—মেল যাবে ত সেই পরশু। বাস্ রে, কি বড় বড় চিঠি। ফেল করবি দেখছি তুই জামাইবাবুকে। কি যে মাথামুণ্ড এত লিখিস, আমি ত ভেবেই পাই নে!"

"আচ্ছা, তোমার সময় আসুক না, দেখা যাবে তখন তুমি কি কর।"

আমাকে এমন fool পাস্ নি। সে সময়টা কবিতা লিখলে আমার পরকালের কাজ হবে। একটা নতুন কবিতা লিখেছি—শোন্ দেখি!" ভাবসহযোগে কবিতা পাঠ করিয়া শান্তির মুখের দিকে চাহিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন লাগলো?"

শান্তি বলিল, "বেশ।"

অপ্রত্যাশিতভাবেও কান্তি এই উত্তরই প্রত্যাশা করিতেছিল। শান্তি ঠেকিয়া শিখিয়াছে, দাদার কবিতার প্রশংসা করিতে পারে না—তাই দাদা এমন চটিয়াছে তাহার উপর যে, লাইব্রেরীর বই একখানা চাহিয়া আর সে পায় না। আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল, অতএব আজ আর সে অপ্রিয় সত্য কথা কহিল না; আরও এক কথা, তাহার পূর্ব্বের কবিতা হইতে ইহা অনেক ভাল।

কান্তি শান্তির প্রশংসালাভে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া বলিল, "বিনয়েরও এ কবিতাটা খুব ভাল লেগেছে।"

"সেই আসল কথা। আমি আর সত্যি কবিতার মর্ম্ম কি বুঝি। শুনে কি বল্লে বিনয়?"

"সে ত একেবারে মসগুল! বল্লে, ঠিক যেন রবি বাবুর কবিতাই সে শুনছে।"

এতটা বাড়াবাড়ি শান্তির সহ্য হইল না; বলিয়া ফেলিল, "তোমরা দশে মিলে দেখছি রবিবাবুর অস্তিত্বটাই লোপ ক'রে ফেল্বে।"

কান্তি কিন্তু এ কথায় রাগ না করিয়া প্রসন্ন-মুখেই বলিল, "কি যে বলিস্? তাঁর অনুকরণে তাঁকে ত আমরা বাড়িয়েই তুলছি।"

"তা সত্য! কাকের রব নইলে ত সূর্য্য প্রকাশ হয় না। আচ্ছা, তোমার সে কবিতাটা 'ভারতী কি নিয়েছে?"

"ভারতী? সে হ'ল মেয়ের কাগজ, হাড়হদ্দ পক্ষপাতি! যদি তোর নাম নিয়ে দিতুম, তা হ'লে হয় ত বা নিত"

শান্তি হাসিয়া বলিল, "কোনও এক সময়ে মেয়ের কাগজ ছিল বটে 'ভারতী', কিন্তু এখন ত তোমার স্বজাতিরাই 'ভারতীর সম্পাদক।"

"আমার স্বজাতিদের ত বিজাতির প্রতি আরও বেশী মায়া, 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় আমাদের আশা-ভরসা বড়ই কম।" বলিতে বলিতে কান্তির হাতের কাগজখানা হঠাৎ নীচে পড়িয়া গেল, সে তুলিতে গিয়া দেখিল—আরও একখানা কাগজ সেখানে পড়িয়া আছে। শান্তির খাতা হইতে সেখানা নীচে পড়িয়া গিয়াছিল, শান্তি তাহা লক্ষ্য করে নাই। কাগজখানা হাতে লইয়া কান্তি বলিল, "এও যে কবিতা, তুইও দেখছি আমার দেখাদেখি কবিতা লিখতে ধ'রেছিস্—তা ভাল।"

শান্তি অনুনয় করিয়া কাগজখানা ফিরিয়া চাহিল, কান্তি না দিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল—

"সত্য কহি সখি সত্য কহি,
চঞ্চল বায়ু আমি চপল নহি।
আমি—ভালবাসি ভালবাসাতে
ভালবাসি সবে হাসাতে
পুলক রঙ্গ ভাসাতে
আমি অধীরে বহি।
আমি কাহারও দুঃখ ভুলি না,
কাহারে কভু ত ছলি না,

কুসুমে ফোটাই গন্ধে
পাখীরে ডাকাই ছন্দে
তরঙ্গে নাচায়ে তটিনী
রসেতে ভরায়ে ধরণী
প্রমোদ-মত্ত রহি।
আমি প্রেমের নিপুণ সারথি,
চির-কৈশোরে চির-নিপুণগতি।
যৌবন-মদ-রঙ্গে, বরণ ফুটায়ে অঙ্গে
মিলনে বিরহ আনিয়া
সুখেতে দুঃখ টানিয়া
জীবন স্বপনে মোহি
কৌতুক-নট আমি কপট নহি।
সখি কপট নহি।"

পড়িয়া কান্তি বলিয়া উঠিল, "ভারী মজা ত। আমরা দুজনেই লিখেছি বাতাসের কবিতা। আচ্ছা, মজা করবি একটু, ভাই?"

"কি মজা?"

তোরটা আমার নামে—আর আমারটা তোর নামে 'ভারতী'তে পাঠান যাক্—দেখ, কোন্‌টা তাঁরা নেন্? নামের মাহাত্ম্যে তারা চলে কি না, এতেই বুঝতে পারবি।"

"বেশ! আমার তাতে আপত্তি নেই।"

রাত্রিতে সাহিত্য-সভায় দুই কবিতাই কান্তি তাহার বলিয়া পাঠ করিল। সভায় বাহবা রব পড়িয়া গেল এবং সাহিত্যিকরা মিলিয়া তাঁহার নামকরণ করিলেন, অমৃতাম্বুজনিধি কবিবাসন।

৩

ভারতলক্ষ্মী কাগজে কান্তি বিজ্ঞাপন দেখিল—একটি ভাল গল্পের জন্য ১০০৲ টাকা পুরস্কার!

এতদিন সে কবিতাই লিখিতেছিল—এইবার সে গল্প লিখিতে প্রবৃত্ত হইল। শুধু কবিতা লিখিয়া বাহিরে সে সাহিত্যিক নাম লাভ করিতে পারিবে না—গল্পও লিখিতে হইবে, ইহা সে বুঝিল কিন্তু গল্প লিখিতে বসিয়া সে দেখিল, কবিতা লিখা তাহার পক্ষে যতটা সহজ, গল্প লিখাটা সে রকম নয়। প্লটগুলি মাথায় যেমন আসে, কাগজে-কলমে লিখিতে গেলেই অন্যরকম হইয়া যায়, একের মুণ্ড অন্যের ধড়ে গিয়া পড়ে। অনেক কষ্টে একটি গল্প শেষ করিয়া সে বিনয়কে শুনাইল; কিন্তু এ হেন বন্ধু বিনয়—যে তাহার কবিতা চোখ বুজিয়া শুনিয়া আহা উহু করে; সে-ও কিন্তু আজ কান্তির গল্পের প্রশংসা করিতে পারিল না। অগত্যা কান্তি আর একটা লিখিল, খ্যাতনামা লেখকদিগের রচনাংশ বাজেয়াপ্ত করিয়া লইয়া নিজের আখ্যানটি কোন রকমে সাজাইয়া তুলিল। তাহার বার বার মনে হইতে লাগিল, শান্তি যদি গল্পটি দেখিয়া শুনিয়া তাহার মনের মত করিয়া লিখিয়া দেয়—তবে ইহার শ্রী ফিরিতে পারে। কিন্তু তাহা হইলে ত শান্তির কাছে ন্যূনতা স্বীকার করিতে হয়! তবে দায়ে পড়িয়া মানুষ কি না করে! অনিচ্ছা সত্ত্বেও গল্পটা হাতে লইয়া সে শান্তির ঘরে গেল। গিয়া দেখিল, শান্তি ঘরে নাই—টেবলের উপর তাহার অসমাপ্ত একখানা চিঠি পড়িয়া আছে। বুঝিল— লিখিতে লিখিতে সে কোথাও গিয়াছে, এখনি আসিবে। চিঠিটা সে পড়িতে আরম্ভ করিল—

"প্রিয়তম"

এ কি রকম সম্বোধন? বন্ধু বিনয় তার স্ত্রীর নিকট হইতে যে সব চিঠি পায়—তাহাতে সম্বোধনের কি চমৎকার ঘটা।—প্রাণ আমার, প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মা, হৃদয়সর্ব্বস্ব, এইরূপ কত অপরূপ মনমাতান ডাকে ভরা সে চিঠি! আর শান্তি লিখিতেছে শুধু—ছোট্ট একটি প্রিয়তম শব্দ! "ছি!" নিমিষের মধ্যে এইরূপ ভাবিয়া লইয়া আবার সে পড়িতে আরম্ভ করিল—

"প্রতি সপ্তাহে তোমার চিঠিখানির জন্য কিরূপ আকুল-আগ্রহে অপেক্ষা ক'রে থাকি, তা কি বুঝতে পার না তুমি? নিশ্চয়ই তা পার না। পারলে হাজার কাযের মধ্যেও একটু সময় ক'রে নিয়ে দু'লাইনও লিখতে। কেন বল দেখি, গত মেলে চিঠি পেলুম না? অসুখ করে নি ত? কত রকম ভাবনাই যে হচ্ছে। আসছে মেলে যদি চিঠি না পাই ত কি যে করব জানি না। মিস ক্রিষ্টিকে তা হ'লে চিঠি লিখব। হয় ত বা তার সঙ্গেই তুমি আমোদ ক'রে কোথাও বেড়াতে গেছ—আর আমি এ দিকে ভেবে মরছি। তা যদি শুনি, তা হ'লে কিন্তু ভয়ানক রাগ করব।

"আগের চিঠিতে লিখেছিলে, টাকার টানাটানি পড়েছে তোমার। বাড়ী থেকে যত টাকা

পাবার আশা করেছিলে, তা পাও নি। টাকা পেলে কি না, জানার জন্য খুবই উৎসুক হয়ে আছি! আমি যদি তোমাকে এই সময় কিছু পাঠাতে পারতুম! বার বার সেই কথাই ভাবছি। ভাবছি শুধু তা নয়—প্রাণপণ চেষ্টাও করছি।

"আমার ছোট গল্পগুলি সংগ্রহ ক'রে পাঠালে 'বসুমতী' ছাপতে রাজি আছেন, কিন্তু তার সঙ্গে দু'একটা নতুন গল্পও দিতে হবে। একটা শেষ ক'রে ফেলেছি। আজ রাতে দু'টা পরিচ্ছেদ লিখে ফেলতে পারলে আরও একটা শেষ হয়ে যাবে! আমি তা হ'লে কালই সমস্তগুলা একসঙ্গে ডাকে দিতে পারব। গল্পগুলা পেলেই তাঁরা আমাকে তিনশ' টাকা পাঠাবেন বলেছেন। তোমার জন্মদিনে শ্রীচরণে সে উপহার গিয়ে পৌঁছিবে। ভাবতেও এত আনন্দ হচ্ছে।

"ভাল কথা, 'ভারতী' খানা পেয়েছ কি না, লিখলে না ত? তোমার কেমন লাগলো, জান্‌বার জন্য আমি যে এ দিকে ছটফট করছি—"

এই পর্য্যন্ত লিখিয়া পিয়নের হাঁকে তাড়াতাড়ি শান্তি নীচে মেল-চিঠি আনিতে গিয়াছিল। পদশব্দ শুনিয়া, সে গৃহে ফিরিবার আগেই কান্তি সরিয়া পড়িল। যাইতে যাইতে ভাবিল—"বাহা রে মেয়ে! তলে তলে কত কাণ্ডই করছ তুমি,—পুরুষদের হার মানালে দেখছি। এবার আমাদেরই হাতাবেড়ি নিয়ে রান্না-ঘরে গিয়ে বসতে হবে—আর তোমরা নিখিলকাব্যের ম্যানেজারি করবে। সেটি কিন্তু হঠাৎ করতে দিচ্ছিনে, ঠাকরুণ।"

* * * *

"ও সুমিত্রা, বলি ও সুমিত্রা রাণি, কোথায় যাওয়া হচ্ছে?"

সুমিত্রা দাদাবাবুর এই আদরের ডাকে গলিয়া গিয়া হাসিয়া বলিল—"দিদিমণির চিঠিপত্র ডাকে দিতে যাউছি, দাদাবাবু।"

"কি চিঠিপত্র দেখি,।" এই বলিয়া সুমিত্রার হাতের কাগজপত্রগুলা কান্তি নিজের হাতে উঠাইয়া লইল।

সুমিত্রা ফিস ফিস করিয়া বলিল—"দিদিমণি রাগ করবে দাদাবাবু, বলো না—তুমি দেখিছ চিঠিপত্তর।"

"তা কেন বলব; সুমিত্রারাণীকে কি আমি বকুনি খাওয়াতে পারি।"

গল্পগুলি হাতে পাইয়া কান্তির হৃদয় আশানন্দে কাঁপিয়া উঠিল, সে বলিল, "তা তুমি আর কেন যাবে, আমিই ত ডাকঘরে যাচ্ছি—অমনি এগুলো-ও ডাকে দিয়ে দেব।"

"তা দিও দাদাবাবু, দিদিমণিকে বলিব, মুই ডাকে দিউছি। মালী ডাকছি কেন, শুনিকিরি আসি।"

কম্পাউণ্ড হইতে ঘরে আসিবার সময় কান্তি আকাশপথে চিঁহি চিঁহি কাতর ক্রন্দনধ্বনি শুনিল। উপরে চাহিয়া দেখিল, উড়ন্ত চিলের মুখে একটা মুরগীর বাচ্ছা? তাহার বক্ষে একটা করুণ কম্পন উঠিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে তাহা মিলাইয়া গেল!

* * * *

শান্তি হা-প্রত্যাশা করিয়া দিন গণিতে লাগিল, সপ্তাহ কাটিল—মাস যায়, কই, 'বসুমতী'র নিকট হইতে ত কোন উত্তর পাওয়া গেল না। স্বামীর জন্মদিন আসিতেও ত আর বেশী বিলম্ব নাই—শান্তি সম্পাদককে আর একখানি পত্র লিখিল। উত্তর আসিল—লেখিকা শান্তিবালার কোন গল্পই আফিসে পৌঁছে নাই। শান্তির বুকের পাঁজরাখানা যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল।

কিছুদিন পরে ভারতলক্ষ্মীতে প্রকাশিত "চৌর্য্য-মাহাত্ম্য" নামে একটি গল্পের প্রশংসা নানা কাগজে বাহির হইতে লাগিল। আর কোন গল্প যদি লেখক না-ও লিখেন—এই গল্পটিতেই তিনি সাহিত্য জগতে অমরনাম লাভ করিবেন, এমন কথাও কেহ কেহ বলিয়াছে। ভারতলক্ষ্মী একখানা কিনিয়া শান্তি গল্পটি পড়িল, এ কি! এ যে তাহারই গল্প, কেবল নামের বদল—এবং স্থানে স্থানে দুই চারিটা কথার পরিবর্ত্তন।—লেখক স্বনামধন্য শ্রীকমলাকান্ত মর্ম্মমস্থিত অমৃতাম্বুজকণ্ঠ কবি-ব্যসন।

সাহিত্যে দেশবন্ধু

১

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুতে সমগ্র দেশ শোকাভিভূত। সকলেরই অন্তরে গভীর বেদনা এবং মুখে মর্ম্ম-উথলিত ভাষা—"সর্ব্বনাশ হইল!" দেশের নরনারী তাঁহার প্রতি কিরূপ নির্ভরপরায়ণ ছিল, অকৃত্রিম হিতকামী বন্ধুবিশ্বাসে তাঁহাকে কতদূর শ্রদ্ধাভক্তি করিত, তাহা তাঁহার মৃত্যুর পর আবালবৃদ্ধবনিতার শোকাঞ্জলিদান হইতে অতি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। চিত্তরঞ্জন মহাত্মা গন্ধীর ভক্ত হইয়া অসহযোগব্রত গ্রহণ করেন, কিন্তু ভক্তির এমনই প্রভাব যে, দেশবন্ধুর চিতাহুতির দিন মহাত্মা স্বয়ং তাঁহারই প্রবর্ত্তিত কাউন্সিল-গ্রহণের সহায়তা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছেন।

সত্য কখনও মরে না। তাহার প্রভাব চিরস্থায়ী। দেশবন্ধুর নশ্বর দেহ বিনষ্ট হইলেও তাঁহার কার্য্যপ্রভাব চিরশ্রস্মিরূপে ভারতে চির-বিরাজমান রহিল। মৃত্যুতে তিনি আমাদের নবজীবন লাভের শক্তি দান করিয়া গেলেন। আমরা যদি এই শক্তি গ্রহণ করিতে পারি, তবেই সে দানের সার্থকতা। শোক করিবার দিন ফুরাইয়া আসিল। এখন যদি তাঁহার অনুদ্‌যাপিত দেশমঙ্গলব্রত উদ্‌যাপনে আমরা যথাসাধ্য শক্তি অর্পণ করি, তবেই তাঁহাকে প্রকৃত সম্মান দান করা হইবে। তাঁহার সম্মানরক্ষার অর্থই আত্মসম্মানরক্ষা। শয়নে স্বপনে যে চিন্তা পলে পলে তাঁহাকে মরণের পথে টানিয়া লইয়া চলিয়াছিল, তাহা তাঁহার নিজের স্বার্থচিন্তা নহে। লক্ষ লক্ষ লোকের স্বার্থের মধ্যে তাঁহার ক্ষুদ্র স্বার্থ জলবুদ্‌বুদের ন্যায় বিলীন হইয়া পড়িয়াছিল। সমগ্র দেশের মঙ্গলই তিনি আত্মমঙ্গল বলিয়া জানিয়াছিলেন। কেবল জানেন নাই—প্রাণ, মন, দেহ দিয়া সেই জ্ঞান কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টায় ছিলেন।

ভগবান্ আমাদের প্রয়োজনমত যুগে যুগে নেতা প্রেরণ করেন। চিত্তরঞ্জন ছিলেন, ভগবৎ-প্রেরিত শক্তিমান্ দেশপ্রেমিক, ভারতবর্ষের স্বরাজ-নেতা। মহাত্মা গন্ধী বলিয়াছেন,—দেশবন্ধু স্বরাজের জন্যই বাঁচিয়া ছিলেন এবং স্বরাজের জন্যই দেহপাত করিয়াছেন। অতএব এমন যদি কোন দিন আসে—যে দিন আমরা পৃথিবীস্থ অন্যান্য স্বাধীন দেশের নরনারীর সঙ্গে সমকক্ষভাবে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিব, সেই দিনই আমাদের দেশবন্ধুর অপূর্ণ আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে এবং একমাত্র ইহাতেই তাঁহার স্বর্গগত আত্মা পরিতৃপ্তি লাভ করিবে।

চিত্তরঞ্জন যে দেশের কি ছিলেন, কি গুণে যে তিনি সমগ্র দেশের অন্তঃকরণ অধিকার করিয়া গিয়াছেন—কত বড় বড় লোক ইহার ব্যাখ্যানিরত হইয়া ভাষার দৈন্য অনুভব করিতেছেন, এমনই বিরাট অপূর্ব্ব ছিল তাঁহার দেশপ্রেম, মাহাত্ম্যময় ছিল তাঁহার আত্মত্যাগ এবং কর্ম্মশক্তি। তবে আমি আর এ সম্বন্ধে বেশী কথা কি লিখিব? আমি শুধু বলিতে পারি, তাঁহার কবিতার সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা। সাহিত্যের দিক হইতে তাঁহাকে যেন ভাল করিয়া আমাদের এখনও দেখা হয় নাই। আশা করি, অতঃপর সাহিত্য-মন্দিরেও তাঁহার যথাযোগ্য আসন নির্দ্দিষ্ট হইবে।

তিনি যে বেশী কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহা নহে; ক্ষুদ্রায়তন চারি পাঁচখানি পুস্তকের মধ্যে তাঁহার কবিতার সমষ্টিসংখ্যা এক শতের অধিক হইবে কি না সন্দেহ। কিন্তু এক চন্দ্রও তমোহরণ করেন; একটি বিদ্যুৎ-কণিকার মধ্যেও বজ্রতেজ নিহিত। সংখ্যাবহুলদানে তিনি সাহিত্যভাণ্ডার সাজাইতে না পারিলেও ভাবসম্পদে তিনি তাহা অলঙ্কৃত করিয়াছেন। তাঁহার সকল কবিতাই তাঁহার অন্তর্নিহিত ভাবের যেন সাধনা—তাঁহার জীবনেরই যেন রহস্যময় ভবিষ্যদ্বাণী,—যে মহাপ্রেম তাঁহার জীবনকে চিরদিন আচ্ছন্ন, অভিভূত, ব্যথিত-আকুল করিয়া রাখিয়াছিল—তাহারই যেন মূর্ত্তিমন্ত বহির্বিকাশ। তাঁহার এই ছন্দোময়ী ভাষার মধ্য দিয়া তাঁহার অন্তরতম মানুষটিকে আমরা স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাই বলিয়াই এ কবিতাগুলি এত মূল্যবান্। তাঁহার অন্তরব্যাপী আদর্শ মহাপ্রেমকে ধরিবার জন্য তাঁহার যে আকুলতা, 'মালা'গ্রন্থের "প্রেম ও প্রদীপে" তাহা সুস্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত।—সে কবিতা এইরূপ—

আজি এ সন্ধ্যার মাঝে তব বাতায়নে
কেন রাখিয়াছ ওগো ! প্রদীপ জ্বালিয়া ?
তোমার ও প্রদীপের কনক-কিরণে
আমার সকল মন উঠে উজলিয়া !
কেন রাখিয়াছ আহা ! সুখ-বাতায়নে
সোহাগে স্বহস্তে ওই প্রদীপ জ্বালিয়া ?
আপনারে কেহ কভু পারে কি রাখিতে
আলোকের অন্তরালে গোপন করিয়া ?
তোমার লাবণ্য-মূর্ত্তি পড়ে না আঁখিতে
ছায়া তার পড়িয়াছে দেয়াল ভরিয়া !
অসংখ্য আকাঙ্ক্ষা জাগে দেখিতে দেখিতে
কেন রাখিয়াছ, ওগো ! প্রদীপ জ্বালিয়া ?

২

অন্ধকার-ঘেরা এই সন্ধ্যার মাঝারে
কেন গো জ্বালিলে দীপ, খুলিলে দুয়ার—
কেন গো এমন ক'রে ডাকিছ আমারে
সমস্ত পরাণ ভ'রে—পরাণ-মাঝারে !
আমি অশ্রুজল লয়ে—শুধু চেয়ে থাকি
আমি ত জ্বালিনি দীপ, কি করিবা ডাকি ?

৩

তবু মনে হয়, তুমি শুনেছ আমার
অন্তরের আর্ত্তস্বর—অন্তর-মাঝারে !
নিবাও প্রদীপ তব, বন্ধ কর দ্বার,
এস ভেসে স্বপ্ন-সম অন্তর-আঁধারে।
জ্বাল গো প্রদীপ জ্বাল অন্তরে আমার
অন্ধকার-ঘেরা এই সন্ধ্যার মাঝার !

৪

তোমার চঞ্চল দীপ আলোক বন্ধন ;
ব্যথিছে সকল মন সর্ব্বাঙ্গ আমার !
কত না অশান্ত সুখ অজানা ক্রন্দন
ঝাপটিছে গরজিছে অন্তরে আমার !
হে মোর নিষ্ঠুরা ! কি যে বেদনা-বন্ধনে
টানিতেছ সর্ব্ব হৃদি তব সন্নিধানে !
কি ব্যাকুল বাসনার আকুল ক্রন্দনে
ভরিয়া গিয়াছে চিত্ত তোমারি সন্ধানে !
প্রজ্বলিত হৃদিমাঝে, শূন্য সব ঠাঁই !
হে প্রেমনিষ্ঠুরা ! আমি যে তোমারে চাই।
—প্রেম ও প্রদীপ।

মাঝে মাঝে তাঁহার কবিতায় তাঁহার প্রেম-সাধনার মধ্যে একটি গভীর নিরাশা দেখা যায়। অতীতের একটি শুভমুহূর্ত্তে তাঁহার দেবী তাঁহার হৃদয়ে যে প্রদীপ জ্বালাইয়াছিলেন, পরমুহূর্ত্তে যেন তাহা নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। আকাঙ্ক্ষাময় ও অতৃপ্তিময় মহাশূন্যের মধ্যে তাঁহাকে ভাসাইয়া তিনি অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন। তখন হাহাকার করিয়া তিনি বলিয়া উঠিতেছেন,—

জীবন, জীবন কোথা ?—যেন নিরবধি,
মরণ নিশ্বাস বহে অতৃপ্তি লইয়া,
যেন চুপি চুপি ওই—কাঁদাইছে হৃদি,
অতীত সে জীবনের প্রতিধ্বনি দিয়া।
জীবন, জীবন কোথা ?—ভ্রান্তি স্বপনের,
দৃপ্ত সুরা পান ক'রে শুধু ভুলে থাকা !
এ কিহাসি ! এ কি কান্না ! শুধু ব'সে ব'সে
ভবিষ্যের চিত্রপটে অতীতের আঁকা।
মহান্ মুহূর্ত্ত এক জীবনে পশিয়া
ভাসাইয়া ল'য়ে গেছে—গ্রাসিছে সকল !
কোথা তুমি কোথা আমি, গেছে হারাইয়া
রয়েছে অনন্ত ব্যথা হৃদয়-সম্বল।
সে ব্যথা বাজিছে আজো ; আমার জীবন
তারি যেন প্রতিধ্বনি, আর কিছু নয় !
যত হাসি যত অশ্রু যাতনা স্বপন,
করেছে জীবন যেন মহাশূন্যময়।
—মহাশূন্য।

কিন্তু মহাজন ও মহাপ্রেমিক চিরদিন কল্পিত শূন্যতা লইয়া থাকিতে পারেন না। কার্য্যশক্তির দ্বারা তাহাকে তাঁহারা পরাজয় করিতে চাহেন। তাই কবিকে যখন মহাশূন্য ঘিরিয়া ফেলিল, তখন তিনি বলিয়া উঠিলেন,—

মোছ আঁখি, মনে কর এ বিশ্ব-সংসার
কাঁদিবার নহে শুধু বিশাল প্রাঙ্গণ,
রাবণের চিতাসম যদিও আমার
জ্বলিছে জ্বলুক প্রাণ, কেন গো ক্রন্দন ?
অপরের দুঃখ-জ্বালা হবে মিটাইতে
হাসি-আবরণ টানি দুঃখ ভুলে যাও,
জীবনের সরবস্ব অশ্রু মুছাইতে,
বাসনার স্তর ভাঙ্গি বিশ্বে ঢেলে দাও।

হায় হায় জনমিয়া যদি না ফুটালে
একটি কুসুমকলি—নয়ন কিরণে
একটি জীবন-ব্যথা যদি না জুড়ালে
বুকভরা প্রেম ঢেলে,—বিফল জীবনে।
আপনা রাখিলে, ব্যর্থ জীবন সাধনা
জনম বিশ্বের তরে—পরার্থে কামনা।

- মালা।

তিনি আঁখি মুছিয়া কার্য্যে নামিলেন, কিন্তু কার্য্যে নামিয়াও তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছেন না। কবি যেমন শতচ্ছন্দ গাঁথিয়াও মনে করেন, তাঁহার অনেক ভাবই প্রকাশ করা হইল না,—সেই-রূপ যিনি মহাকর্ম্মী, তিনি শত কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াও মনে করেন, তাঁহার ঈপ্সিত কর্ম্ম অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল। তাই কবির কর্ম্মহৃদয় বিফলতা-নিপীড়িত হইয়া বলিয়া উঠিল,—

ওরে রে পাগল!
জ্বলিছে নয়নে তব কি নব বাসনা,
কি গীত রয়েছে বাকি;—কি নব বাজনা?
উচ্চারিত হয় নাই কি প্রেম-মন্তর,
কোন্ পূজা লাগি তব আকুল অন্তর?
আমি ত দিয়াছি যা' কিছু আছিল সার
ওরে রে পাগল, ওরে পাগল আমার!
নিবিড় নয়ন হ'তে দিয়াছি দরশ,
এ শুভ্র দেহের আমি দিয়াছি পরশ,
পরাণের প্রীতি-পুষ্প, প্রতি হাসি গীত,
জীবন-যৌবন-ভরা সকল সঙ্গীত,
তোমারে করেছি দান! কি চাহ আবার,
ওরে রে পাগল, ওরে পাগল আমার!
তোমারে করেছি পূজা, দেবতা সমান,
প্রভাতে মধ্যাহ্নে গাহি সুমঙ্গল গান;
সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালি, ধুপ ধুনা দিয়া
আরতি করেছে মোর প্রেমপূর্ণ হিয়া!
আর কি করিব দান, কি আছে আবার।
ওরে রে পাগল, ওরে পাগল আমার।
সন্ধ্যাশেষে পুনর্ব্বার করেছি বরণ
সমস্ত রজনী ভ'রে করেছি স্মরণ,
তোমারে, তোমারে শুধু; হাসিয়া প্রভাতে
আনিয়াছি পুষ্পাঞ্জলি ভরিয়া দু'হাতে।
আর কি আনিতে পারি কি আছে আমার—
ওরে রে পাগল, ওরে পাগল আমার!
সকল ঐশ্বর্য্যে আমি সাজায়েছি ডালি,
পরিপূর্ণ প্রাণে মোর করিয়াছি খালি,
আরো যে চাহিছ তুমি! কি দিব গো আনি,
চাও যদি ল'য়ে যাও শূন্য প্রাণখানি।
তবে কি মিটিবে আশ, চাহিবে না আর?
ওরে রে পাগল, ওরে পাগল আমার!

—মালা।

তাঁহার কর্ম্মজীবনের নিরাশ মুহূর্ত্তে তিনি ভগবানের প্রসাদ ভিক্ষা করিয়া আবার বললাভ করিতেছেন।—

এ পথেই যাব বঁধু! যাই তবে যাই!
চরণে বিঁধুক কাঁটা তাতে ক্ষতি নাই!
যদি প্রাণে ব্যথা লাগে, চোখে আসে জল,
ফিরিয়া ফিরিয়া তোমা ডাকিব কেবল।
পথের তুলিব ফুল কাঁটা ফেলি দিব।
মনে মনে সেই ফুলে তোমা সাজাইব!
গুন গুন গাহি গান পথ চলি যাব—
মনে মনে সেই গান তোমারে শুনাব!
দরশন নাই দিলে কাছে কাছে থেকো!—
যদি ভয় পাই বঁধু! মাঝে মাঝে ডেকো!

—অন্তর্য্যামী।

এই রূপে আমরা দেখিতে পাই, তাঁহার সমস্ত কবিতাই একটি মহাপ্রেমের ভাব-প্রেরণা। এই ভাবে তিনি কখন হাসিতেছেন, কখনও কাঁদিতেছেন। সেই প্রেমকে কখনও কর্ম্মরূপে, কখনও ধর্ম্মরূপে, কখনও বা প্রিয়ারূপে পাইতেছেন, কখনও বা হারাইয়াও ফেলিতেছেন। যেমন তাঁহার কার্য্যের মধ্যে, তেমনই তাঁহার কবিতার মধ্যেও ভাব ও ভক্তি, জ্ঞান ও শক্তি, চিন্তা ও কল্পনা—এ সকলে একটি আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য আমরা দেখিতে পাই।

মৃত্যুর বহুপূর্ব্বে তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী ঈপ্সিত রূপিণীর দর্শন লাভে আনন্দের উচ্ছ্বাসভরে বলিতেছেন:—

আমি যে তোমারে চাই, সন্ধ্যার মাঝারে
তোমার ও প্রদীপের আলো-অন্ধকারে;
সকল সুখের মাঝে, সর্ব্ব-বেদনায়!
কর্ম্মক্লান্ত দিবাশেষে চিত্ত ছুটে যায়

ওই তব প্রদীপের আলো-অন্ধকারে
কোথা তুমি লুকাইয়া, তাই খুঁজিবারে!
হে মোর লুকান ধন! হে রহস্যময়ি!
আজি জীবনের শেষ আজো তুমি জয়ী!
তোমারে খুঁজেছি আমি আলোকে আঁধারে
সারাটি জীবন ধরি; মরণ-মাঝারে—
সকল সুখের মাঝে সর্ব্ব-সাধনায়!
আজি শ্রান্ত জীবনের ধূসর-সন্ধ্যায়
হে মোর লুকান ধন! আজো তুমি জয়ী!
আজো খুঁজিতেছি তোরে হে রহস্যময়ি!
একই সন্ধ্যা আমাদের পরে
ঢালিয়াছে ঘন ছায়া তার!
আমাদের দু'জনের তরে
পাতিয়াছে মহা অন্ধকার!
আর কিছু নাই—কেহ নাই
আছি আমি · আছে অন্ধকার,
আছ তুমি, আর কেহ নাই
আছে শুধু সাঁজের আঁধার!
হাসি কহে প্রদীপ তোমার
আমি আছি—কোথা অন্ধকার?
—প্রেম ও প্রদীপ।

ইচ্ছা করিতেছে তাঁহার সব কয়খানি গ্রন্থ হইতেই দুই চারিটি করিয়া কবিতা এখানে তুলিয়া দিই। কিন্তু স্থানের স্বল্পতা বশতঃ তাহা পারিলাম না। যদি সুবিধা ও সুযোগ হয়, তবে ভবিষ্যতে বিশদ ভাবে তাঁহার গ্রন্থ-সমালোচনা করিবার অভিপ্রায় রহিল। এই স্থানে আর একটিমাত্র কবিতা উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। এই কবিতার মধ্যে দেখিতে পাই, এতদিন তিনি কর্ম্মের গোলক-ধাঁধার মধ্যে ঘুরিয়া যে পথটি সন্ধান করিয়া বেড়াইতে ছিলেন, হঠাৎ যেন তাহা আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন।—

সব তার ছিঁড়ে গেছে! একখানি তার
প্রাণমাঝে দিবানিশি দিতেছে ঝঙ্কার!
সব আশা ঘুচে গেছে! একটি আশায়
ভূলুণ্ঠিত প্রাণলতা আকাশে দোলায়!
সব শক্তি সব ভক্তি যা কিছু আমার
এক সুরে প্রাণ-মাঝে কাঁদে বার বার!
সব কর্ম্ম-শেষে আজ, মন একতারা
বাজিতেছে সেই সুরে অন্ধ দিশাহারা!
সেই পথ লাগি আজ মন পথ-বাসী
সেই পথখানি মোর গয়া গঙ্গা কাশী!

ইহাই কি স্বরাজের পথ? ধন্য তুমি দেশবন্ধু! তোমার আত্মীয় স্বজন তোমাতে ধন্য! আর তোমার দেশবাসী আমরাও তোমাকে বন্ধুরূপে পাইয়া ধন্য!

ইংরাজের সহিত
সুরেন্দ্র-প্রসঙ্গ

কিছু কাল পূর্ব্বে দেশনায়ক সুরেন্দ্রনাথকে লইয়া এক জন ইংরাজের সঙ্গে আমার বেশ একটু বচসা হইয়াছিল।

ইংরাজ-মণ্ডলী আজকাল সুরেন্দ্র বাবুকে মডারেট বলিয়া খাতির করেন। কিন্তু তখনকার দিনে ইঁহাদের মতে তিনি ছিলেন এক জন ঘোর Extremist, এমন কি, ইঁহাকেই তাঁহারা বিদ্রোহিতার প্রধান প্রবর্ত্তক বলিয়া মনে করিতেন। সে দিন সে ইংরাজটির তৎপ্রতি বিদ্বেষ-বিষবর্ষিত বাক্যে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিয়াছিল. অথচ তাঁহার সেই জ্বালাময় সমালোচনার মধ্যে বেশ একটু কৌতুকও অনুভব করিয়াছিলাম। তখন আমি 'ভারতীর' সম্পাদক ছিলাম। সম্ভবতঃ কোনও এক দিন এই বাদানুবাদ 'ভারতী'রই কাযে লাগিয়া যাইবে, এই মনে করিয়া সে দিনের কাহিনী তখন খাতায় টুকিয়া রাখিয়াছিলাম, কিন্তু পরে আর তাহা ছাপাইবার অবসর ঘটিয়া উঠে নাই। আজ এত দিন পরে দেখিতেছি, সে কথা প্রকাশের ঠিক সময় আসিয়াছে। ভারতে জাতীয়তা উদ্বোধনের যিনি আদিগুরু, তাঁহার স্মৃতিকল্পে শ্রাদ্ধতর্পণস্বরূপ সেই কাহিনী আজ নিম্নে বিবৃত করিতেছি।

সেই সময় মাণিকতলার বিদ্রোহী দলের বিচার চলিতেছিল। খুদিরামের সবেমাত্র ফাঁসী হইয়া গিয়াছে। সেই বিপ্লবযুগে আমি এক দিন এক জন ইংরাজ-মহিলার বাটীতে চা-পানের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলাম। তাঁহার স্বামী ছিলেন এক-খানি সচিত্র পাক্ষিক কাগজের প্রোপ্রাইটর। আমার ছোট ছোট গল্প মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের কাগজে প্রকাশিত হইত। সেই সূত্রেই তাঁহাদের সহিত আমার আলাপ-পরিচয়।

চা-পানের পর মিসেস্ পি সদ্যপ্রকাশিত কাগজ-খানা আমাকে দেখিতে দিলেন। প্রথম পাতাখানা উল্টাইবামাত্র দেখিতে পাইলাম, খুদিরামের ছবি। ছবিখানি দেখিয়া অসতর্কভাবে হঠাৎ বলিয়া উঠি-লাম, "খুব ত ভালমানুষী নরম চেহারা! আহা, দেখিলে মায়া করে!"

মিঃ পি বলিলেন, "কিন্তু কায যা করেছে, তা ত একটুও নরম নয়।"

আমি। তা সত্য। তবে স্ত্রীহত্যার অভিপ্রায়ে সে কিন্তু এ কায করে নাই। কিংবা তার হাতেই যে খুনটা হয়েছে, এমনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তা ছাড়া যে রকম তার কচি বয়স, এই বিবেচনায় গভর্ণমেণ্ট যদি তাকে ফাঁসী না দিয়ে নির্ব্বাসন-দণ্ড দিতেন, তবে আমার বিশ্বাস, ভবিষ্যতে তার জীব-নের ধারা একেবারেই উল্টে যেত।

মিঃ পি বলিলেন, "আমার মতে সঙ্গে সঙ্গে দলপতিদের লট্‌কে দিলেই ঠিক হ'ত। এ সকল কার্য্যের জন্য আসলে দায়ী তারাই।"

আমি তাঁহার কথার কোন উত্তর না দিয়া পাতাগুলি উল্টাইয়া যাইতে লাগিলাম। দুই এক-খানা পাতার পরই নজরে পড়িল সুরেন্দ্র বাবুর ছবি। সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলাম, "এ কি! সুরেন্দ্র বাবুও যে এখানে?"

মিঃ পি। তিনিই ত যত নষ্টের গোড়া! তিনিই ত ছেলেদের এ সকল কাযে উত্তেজিত করে তুলেছেন।

আমি উত্তেজিতভাবে বলিয়া উঠিলাম, "কি বল্‌ছেন আপনি? তিনি ছেলেদের দেশানুরাগধর্ম্ম শিখিয়েছেন বটে, কিন্তু বোমা ফেল্‌তে বা গুপ্তহত্যা কর্‌তে ত শেখান নি! বিদ্রোহিতার পক্ষপাতী তিনি একেবারেই নন। তিনি একান্তই মডারেট।"

মিঃ পি অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া কহিলেন, "মডারেট! তিনি পাকা Extremist। যখন বিপিন পালের দল তাঁকে ছাড়িয়ে উঠলো, তখনই তিনি Moderate সাজলেন। লোকটা ভারী চালাক (clever)।"

আমি। মডারেট বা Extremist দলের মধ্যে বিশেষ কি প্রভেদ, তা আমি জানি না। তবে দেশাত্মবোধ প্রচার করাই যদি চরমপন্থীবাদ হয়, তবে ইঁহাকেই যথার্থ আদিগুরু বলা যায়। আর খুন-জখম করাই যদি চরমপন্থীর কায হয়, তা হ'লে ইনি একান্তই মডারেট।

কিন্তু মিঃ পি কিছুতেই তাঁহার ধুয়া ছাড়িলেন না। খুব জোরের সহিত বলিলেন, "নিশ্চয়ই তিনি extremist. Extra extremist দলের আবি-র্ভাবেই এখন তিনি মডারেট নাম নিয়েছেন। যেমন ইংলণ্ডে প্রথমে Liberal নামধেয় দলকে যারা ছাড়িয়ে উঠলো, তারা দাঁড়াল Radical; এ শুধু একটা নামের ঘোরফের। আসলে সব হাঙ্গামার মূল হচ্ছেন ইনি—এই সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জি! বরিশালের যে গোলযোগ ঘটে, সেও এঁরই জন্য। ইনি ছেলেদের ক্রমাগত এই শিক্ষা দিচ্ছেন যে, সমস্ত বাধাবিঘ্ন

পদদলিত ক'রে চলো (trample under your foot)।"

আমি বলিলাম, "বাধাবিঘ্ন দলিত করার অর্থ ইংরাজদলন নয়। দেশের মঙ্গল করতে হ'লে বাধা-বিঘ্নের উপর দিয়ে চলতেই হবে। এ একটা সহজ সত্য। আপনাদের "হেপেনি" (Half-a-penny) বুকের উপদেশ।"

মিঃ। তা নয়, আপনি ওকে জানেন না, ও-কথার গুপ্ত অর্থ নিশ্চয়ই ইংরাজ-দলন। জানেন না কি,—উঁহাকে যে বাঙ্গালার রাজা ক'রে তুলেছে। (He was crowned as the King of Bengal)

আমি বলিলাম, "এখানে রাজা অর্থে গুরু। তিনিই কি না প্রথমে দেশানুরাগ শিক্ষা দেন।"

মিঃ পি। গুরুকে কি ছাতা ধরে ? তাঁর মাথায় যে এ ছেলেরা ছাতা ধরেছিল।

মনে মনে হাসিয়া ভাবিলাম, হায় রে, তোমরাই ভারতের হর্ত্তাকর্ত্তা-বিধাতা। প্রকাশ্যে কহিলাম, "হাঁ, শিষ্যরা গুরুর মাথায় ছাতা ধরে বৈ কি। আপনারা কি দেখেননি, অনেক সময় শিষ্যরা গুরুর মাথায় ছাতা ধ'রে রাস্তায় শোভাযাত্রা ক'রে চলেছে।"

মিঃ পি। তা জানি আর নাই জানি, এটা ত ঠিকই জানি যে, মিঃ ব্যানার্জ্জিই ছেলেদের বয়কট শিখিয়েছেন।

আমি। তাতে দোষ হয়েছে কি ? দেশোন্নতি-চেষ্টা ত রাজার বিরুদ্ধাচরণ নয়। দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি করতে গেলেই স্বদেশী পণ্যগ্রহণে বদ্ধপরিকর হ'তে হবে।

মিঃ পি। ওঃ, আপনি বলছেন স্বদেশীর কথা। কিন্তু স্বদেশী ও বয়কট, এ দুটো ত এক জিনিষ নয়।

আমি। এক বৈ কি ! স্বদেশী পণ্য গ্রহণ করতে গেলেই বিদেশী বর্জ্জন অনিবার্য্য।

মিঃ পি আপনি দেখছি, তা হ'লে ভাল ক'রে বেঙ্গলী কাগজখানা পড়েন না। কাগজখানা তলিয়ে পড়লেই বুঝা যায়, ইংরাজ-বিরুদ্ধে বিদ্রোহিতা জাগানই সম্পাদকের মনোগত অভিপ্রায়। তবে সেয়ানা ছেলে এখন সুর বদলাচ্ছেন।

আমি। আপনারাই ভুল। এ রকম Idea আমাদের দেশেরই নয়। যদি কেউ বিদ্রোহিতা শিক্ষা দিয়া থাকে, ত আপনারাই—

মিঃ পি। "আমরা ?" এইরূপে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া একটু থামিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ মিস্ নোবল্ অনেকটা mischief করেছেন, আমি জানি। কিন্তু আপনি জানেন, গভর্ণমেণ্ট সে জন্যে তাঁকে সরিয়ে দিয়েছেন ?"

আমি বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিলাম, "সত্যি না কি ? আমি তা ত জানি না।"

মিঃ পি বলিলেন, "খুব সত্যি। এ দেশে গভর্ণমেণ্ট তাঁকে আর আসতে দেবেন না।"

তাঁর স্ত্রী এতক্ষণ নির্ব্বাক্ ভাবে আমাদের কথা-বার্ত্তা শুনিয়া যাইতেছিলেন। এইবার তিনি বলিয়া উঠিলেন, "মিস্ নোবল এখন এলেই আমার স্বামীর সঙ্গে তাঁর ভয়ানক ঝগড়া হ'ত। এ দেশের বিরুদ্ধে কোনও কথা বল্লেই মিস্ নোবল্ রেগে উঠে বলতেন, 'তোমার স্বামী native-hater, আমি আর এর মুখদর্শন করব না' আমি চল্লুম, আর কখনও তোমা-দের বাড়ী আসব না। আমি তখন তাঁকে অন্য ঘরে নিয়ে গিয়ে ফলটল খাইয়ে ঠাণ্ডা করতুম।' কিছু পরে তিনি আবার জল হয়ে যেতেন।"

মিঃ পি বলিলেন, "ও কথাটা কিন্তু এক-বারেই ঠিক নয়। আমি মোটেই native-hater নই। আমি nativeদের সত্যিই ভালবাসি। এ সকল idea তাদের পক্ষেই ক্ষতিজনক। তিলক ত স্পষ্ট করেই বোমা-হত্যার প্রশংসা করেছেন।"

আমি উত্তেজিত স্বরে কহিলাম, "সে ত অনু-বাদের কথা। মূল লেখা থেকে ত তাঁর বিচার হয় নি ! আজকাল কথায় কথায় তিলকে তাল ক'রে তুলে sedition প্রমাণের চেষ্টা হচ্ছে। এ policyটা গভর্ণমেণ্টের পক্ষেই ক্ষতিজনক। অনেক ছোটখাটো কথা গভর্ণমেণ্ট নোটীশ নিলেই বড় হয়ে যায়। ছেলেদের বন্দে মাতরম্ নিয়ে ফুলার যদি ও রকম গোলমাল না করতেন, তা হ'লে এ সব অনর্থ কিছুই হ'ত না। বন্দে মাতরম্ যে গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধ কথা, এ আমাদের লোকের মাথাতেই ছিল না।"

মিঃ পির কথার সুর হঠাৎ বদলিয়া গেল। বলিলেন, "দেশের লোক যদি গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধ-ভাবই মনে পোষণ করে, তাতেই বা দোষ কি ? দেশটা হ'ল তাদের নিজের। যদি বিদেশীদের তাড়িয়ে তারা স্বাধীন হবার ইচ্ছা ও চেষ্টা করে, সে, প্রশংসারই কথা।"

বেচারী মিসেস্ এই কথা শুনিয়া ভারী ভীত হইয়া পড়িলেন, পাছে আমি তাঁহার কথার ফাঁদে পড়িয়া যাই। তিনি আমাকে সতর্ক করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "আমার স্বামী তামাসা করছেন।"

মিঃ পি একটু অবজ্ঞার সুরে কহিলেন, "তামাসা

কেন, আমি ত সত্যই মনে করি, এরা যদি স্বাধীন হ'তে পারে ত হোক্। তবে কথা হচ্ছে এই যে, তোমাদের এক কড়ার সামর্থ্য নেই ।ঘরে একটা অস্ত্র রাখবার পর্য্যন্ত অধিকার নেই, আর দু'একটা বোমা ছুড়ে দেশ উদ্ধার করতে চাও তোমরা, তা ত আর হ'তে পারে না। যদি সত্য লড়তে পার ত লড়, তাতে কারও কিছু বলবার নাই। কৃতকার্য্যতাতে পাপস্পর্শ করতে পারে না, কিন্তু এরূপ গুপ্তহত্যার উপদ্রব নিতান্তই নির্ব্বুদ্ধিতা (Silliness)।"

আমি বলিলাম, "আপনি বলছেন নির্ব্বুদ্ধিতা —কেন না, তাদের হাতে অস্ত্র-শস্ত্র নাই,--কিন্তু আমার মতে তারা নির্ব্বোধ, কেন না, এরূপ অধর্ম্ম আচরণকে তারা দেশমুক্তির উপায় স্বরূপ মনে করছে। কিন্তু আমি ত আগেই বলেছি, খুন-জখম ত আমাদের দেশের idea নয়, এটা হচ্ছে আপনাদের দেশের আদর্শ। দেখেছেন ত, যারা এ সব কাযে লিপ্ত, তারা সকলেই প্রায় ছেলে-ছোকরা। আলিপুরের বিচারাধীনে ১০।১৫ বছরের ছেলে পর্য্যন্ত আছে। এ রকম বাচ্ছাদের কাছ থেকে দূরদর্শিতা বা বিবেচনা প্রত্যাশা করা যায় না। দেশমঙ্গলের ইচ্ছা ভূতের মত তাদের পেয়ে বসেছে। এই উত্তেজনার আবেগে তারা কি করছে বা না করছে, তা নিজেই তারা জানে না।"

মিঃ। কিন্তু ছেলেরা যে শুধু উপলক্ষ মাত্র। এখানে বুড়োলোকেই ত তাদের উত্তেজিত ক'রে তুলছে। আমি যদি গভর্ণমেণ্ট হতুম, তা হ'লে এ দেশের ধরণেই এ দেশের বিচার করতুম। অর্থাৎ বিচারের কোন আড়ম্বর না ক'রে যেখানেই sedition এর সন্দেহ, সেইখানেই লটকে দেবার হুকুম চালাতুম। যেমন এ দেশে আগে মুসলমান সম্রাটরা করতেন।

কথাটা অত্যন্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। আমি ইতঃপূর্ব্বেই বিদায় লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম চলিতে চলিতে বলিলাম, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, আপনি সম্রাট নন। তবে আপনি রাজা হ'লে আপনার রাজ্য যে স্থায়ী হ'ত না, এটা ধ্রুব নিশ্চয়। অত্যাচারবশতঃই মুসলমান্-রাজত্ব লোপ পেয়েছে।"

আশা ছিল, এ কথার পর তিনি আর কিছু বলিবেন না। কিন্তু তাঁহার ঘাড়েও তখন ভূত চাপিয়াছিল। আত্মসংবরণে তিনি সম্পূর্ণ অক্ষম। আমাকে গাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিবার সেই স্বল্প সময়টুকুর একটি মুহূর্ত্তও অপব্যয় না করিয়া চলিতে চলিতে বলিলেন, "তা কেন? আমি চূড়ান্ত শাস্তির বিধানে চূড়ান্তভাবে সমস্ত crime এর উচ্ছেদসাধন করতুম।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু পৃথিবী তাতে স্বর্গ হয়ে উঠতো মনে হয় না। বরঞ্চ মানুষের আর্ত্তনাদ নরকের ভীষণতাকেও ছাপিয়ে উঠতো। সে যাই-হোক্, গভর্ণমেণ্ট যদি আপনার উপদিষ্ট নীতি অনুসারে চলেন, আমিও তাতে আপত্তি দেখি না। আমরা অযোগ্য হ'লে আমাদের নিধনই শ্রেয়ঃ। যোগ্যের রক্ষাই জগতে প্রার্থনীয়।"

কোচম্যান গাড়ী চালাইয়া দিল। আমার কথার উত্তরে তিনি যদি আরও কিছু বলিয়া থাকেন, তাহা আর শুনিতে পাইলাম না।

ইহার পর তাঁহাদের সহিত আমি আর কোন সম্পর্ক রাখি নাই।

কবিতা-পারিজাতহার

---*---

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত

কবিতা-পারিজাতহার

—*—

ক্ষণিক ভুলে

কবির ক্ষণিক ভুলে—
লেখাভরা তাঁর পাতাটি খাতার
লুটায় তরুর মূলে।
উপর হইতে ফুলের পাঁপড়ি
কালির আখর হেরি,
হাসিয়া ঢলিয়া ভুরু বাঁকাইয়া
বলে—"কি রূপেরি ছিরি।"
সুগম্ভীর স্বরে খাতার আখর
পাতার কুসুমে কয়—
"হেস না, হেস না, গরবিণি এত—
গরব ভাল ত নয়।
দু'দণ্ডের রূপ চেয়ে না দেখিতে
চকিতে তোমার ঝরে;
তখন, বল ত গুণ-কীর্ত্তনে
কে রাখে অমর ক'রে?"
"তুমি সেই জন! পেনু দরশন—
ভাগ্য আমার ভাল;"—
নমি বলে ফুল, বিস্ময়ে আকুল
"কালো যে জগৎ-আলো।"

নমামি ত্বাং

মিশ্র-বেহাগ—কাশ্মীরী খেমটা।

নমামি ত্বাং ভারতি, হৃদয়-কমলদলবাসিনি!
নমামি ত্বাং বাণি, রাগ-রাগিণী-বিকাশিনি!
নমামি ত্বাং নন্দননন্দিতাং সুরনরবন্দিতাং
বীণাপাণি।
তব প্রেম-পরশরস-রাগে—
পুলকিত, মোহিত চিত নিত জাগে—
গীত অনুরাগে;
নমামি বাগ্‌বাদিনী সরস্বতি! ভক্তচিত্তে
দিব্যজ্যোতির্বিভাসিনী।

সত্যেন্দ্র কবির

অমরা-প্রয়াণ

১

গুরু গুরু গর্জ্জনে বারি-ধারা বহে,
কি জানি প্রমত্ত ত্বানে কি কথা সে কহে।
এমন বর্ষণ-ক্ষণে, বিরহী যক্ষের মনে,
যে ছন্দ উঠিল জাগি তাহা ত এ নহে।

২

উন্মত্ত মাতন এ যে ভৈরব-নর্ত্তন,
বিশ্ব-বীণা-যন্ত্র-তন্ত্রে ঝঙ্কৃত প্লাবন।
মূর্চ্ছনায় মুচ্ছনায়, বিদ্যুৎ চমকি যায়,
অশনি-মৃদঙ্গ-তালে চলে প্রভঞ্জন।

৩

গাছে গাছে উন্মাদন-শিহরণ দোলা,
তরঙ্গিণী রঙ্গ-ভঙ্গে নটী চঞ্চলা।
মেঘে মেঘে কোলাকুলি, শিখী নাচে পুচ্ছ তুলি,
নৃত্য-শ্রান্ত দিগ্‌ভ্রান্ত আষাঢ়ান্ত বেলা।

৪

সহসা পশ্চিম নভে আরক্তিম রবি,
স্তব্ধ বরষার নৃত্য! স্তব্ধ দিক্‌ছবি!
ধূ ধূ চিতা জ্বলে তীরে, নর-নারী ভাসে নীরে,
মর্ত্ত্য ত্যজি স্বর্গধামে চলেছেন কবি!

সত্যেন্দ্র-স্মৃতি

১

'বিলাপ কাকলী-হীন, অশ্রু-হীন হোক—
তবু এ যে বুক-ফাটা জ্বালাময় শোক!
সত্য আর সত্য নাই!
কি কথা শোনালে, ভাই?
আপনার হ'তে সে যে আপনার লোক!

২

ছিল না সে একা মোর, ছিল বিশ্বজন;—
যখনি ডেকেছি তবু পেয়েছি দর্শন!
আজ এ ব্যাকুল ডাকে
আকুল না করে তাকে!
এ দুঃখ হায় রে প্রাণে বড় অসহন!

৩

কি সুন্দর নম্র-মূর্ত্তি প্রশান্ত আনন।
সত্যে ধ্রুবচিত্ত, প্রীতি-প্রফুল্ল নয়ন!
হাসিমাথা ওষ্ঠাধরে
ধীর স্নিগ্ধ বাক্য ঝরে;
লভিলে প্রশংসা তা'র—সার্থক রচন!

৪

আজ ধরিয়াছি গান দুঃখ-মন্দ্র সুরে;
কোথা তুমি? শুনিছ কি দাঁড়াইয়া দূরে?
আমার হৃদয় হায়!
তৃপ্তি নাহি মানে তায়?
দরশ-হরষ লাগি পরাণ যে ঝুরে!

৫

ছেড়ে গেছে সত্য; আজি অমর্ত্ত্যের তুমি!
হাহাকারে ভ'রে গেছে সারা বঙ্গ-ভূমি!
স্তন্য-সুধা চাপি বুকে
বাণী-মাতা মৌন মুখে—
কাতরে নাড়েন তব ছন্দ-ঝুমঝুমি!

৬

তব স্মৃতি তব প্রীতি হে কাব্য-প্রেমিক!
অমর্ত্ত মূর্ত্তিতে আজি ছেয়েছে চৌদিক!
তোমার কবিত্ব-রসে—
ত্রিকালে বেঁধেছে যশে—
মৃত্যুঞ্জয় তুমি ওহে কবি পৌরাণিক?

খেয়াযাত্রীর শেষ কথা

১

এখনো ত নাহি এল
পারের পিতম নেয়ে!
দয়া কর ভোলা ভায়া—
নিয়ে চল খেয়া বেয়ে!
ঐ যে গো আঘাটায়,
সারাবেলা অপিথায়
ব'সে আছে ম্লান মুখে
দাদু মোর কচি-মেয়ে!
রবি ঐ ডোবে ডোবে—
রাখাল ফিরিছে গেয়ে,
দয়া কর দয়া কর—
চল জোরে জোরে বেয়ে!

২

ওর যে কেহই নাই,
হায় দাদা আমি ছাড়া!
যখন দুধের মেয়ে
তখন মা-বাপ-হারা।
নাহি যাব যতক্ষণ,
খাবে না ত ততক্ষণ
থালে বাড়া তপ্ত ভাত
হয়ে যাবে পান্তা পারা।
সাঁঝের দীপটি জ্বেলে
রহিবে সে পথ চেয়ে!
চল ভাই দয়া কর—
চল জোরে জোরে বেয়ে!

৩

জানিস্ ত তোরেও সে
কত ভালবাসে ভোলা।
ভোলে না দেখিলে কভু
দিতে মুড়ি ভাজা-ছোলা।
ঐ কি উঠিছে ধ্বনি
বড় যে প্রমাদ গণি!
সমুখের গ্রামখানি
ধোঁয়ায় দেখি যে ঘোলা!
ঐ বুঝি ঝড় আসে!
কাঁদে বাছা ভয় পেয়ে,
চল ভাই দয়া কর
চল্ চল্ জোরে বেয়ে।

৪

ঐ যে হাঁসের সার
উড়ে চলে কালো মেঘে !
দমকি পবন বয়
ঢেউ ছোটে রেগে, বেগে !
টান্ টান্ জোরে টান্,
আমারে দে দাঁড় খান,—
দুটো দিনো ভগবান্—
না দিলি রে তারি নেগে।
কে তবে দেখিবে তায় !
বলি দাদা ধরি পায়
তুলে নিস্ হাত ধ'রে
অশ্রু-জল মুছাইয়ে।

নববর্ষে

হে ভারতি হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী-রাণি !
নববর্ষে দাও বর, শোনাও মা সুখকর
সৌভাগ্যসূচিত মহাবাণী !
অয়ি দেবি অনাদি প্রবীণা,
কালাতীত ত্রিকাল নবীনা,
ছাড়ি দীনা তপস্বিনী-সাজ,
কিরীটিনী রূপ ধর আজ,
ভূপতিতা বীণা তুলি করে
ত্রিলোকনন্দন সুরে স্বরে —
গাও নব রাগিণী কল্যাণী
যুগে যুগে লও পূজা দেবি বীণাপাণি !

অনাদি মন্ত্র

আকাশে কি উঠে গীতি বাতাসে কি ভাব বয় ?
কি মন্ত্র অনাদি যন্ত্রে ধ্বনিত নিখিল ময় ?
"ভালবাসা ভালবাসা—
বিশ্ব বাঁধা প্রেমবলে—"
নীরবে মহান্ রবে
এই কথা সবে বলে।
এ ধ্রুব পরম সত্য
খণ্ডিবারে যে বা চায়,—
সেই শুধু মিথ্যাবাদী
সেই ব্যর্থ দুনিয়ায়।

হায় রে অভিমানী !

ও আমার সূর্য্যমুখী
ও গো কুসুমরাণী,
শুধাই তোরে চুপে চুপে গোপন একটি বাণী।
এমন তোমার রূপের ঘটা !
এমন বর্ণ এমন ছটা !
লুকাও তুমি কিসের তরে
মধুর গন্ধখানি ?
কমলিনী আকুল হেসে,
গোলাপ দোদুল গন্ধে ভেসে
প্রেমিক অলি শুনায় এসে
সুখের গুন্‌গুনানি।
কার অযতন কাহার ভুলে
তুমি আনন শূন্যে তুলে,
সাঁঝ না হ'তে পড় ঢুলে
হায় রে অভিমানী !

৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(পূজনীয় বড়দাদা)

ওহে ভ্রাতঃ ! আমার ত ছিলে না একার,
বিশ্বপ্রেমে বাঁধা তুমি দাদা সবাকার ;
যে এসেছে কাছাকাছি,
ছোট বড় নাহি বাছি,
আলিঙ্গিয়া ধরিয়াছ বক্ষের মাঝার।
পশু-পক্ষী ভয়হীন,
তব বন্ধু চিরদিন,
চড়ে কোলে, উঠে শিরে অপূর্ব্ব ব্যাপার।
ওহে দ্বিজোত্তম কবি,
কলি ধন্য তোমা লভি,
প্রণমি তোমারে স্মরি বার বার, বার ॥
স্বভাব সরস জ্ঞানী কি সৌম্য মুরতি ;
বরপুত্র কবিতার কল্পনা-সারথী।
"স্বপ্ন-প্রয়াণে' তব দেখালে কি অভিনব
অপরূপ ছন্দোময়ী বাণী মূর্ত্তিমতী ॥
কুসুম দুলিল ছন্দে ! বিহঙ্গ কূজিয়া বন্দে !
তরঙ্গ-বিক্ষেপে তালে তাণ্ডব যতি !
মর্ত্ত্যে উঠে জয়কার !
চমৎকার ! চমৎকার !!
রবি-শশী স্বর্গে করে আনন্দ আরতি !!
তোমার মহিমা গানে, মনপ্রাণ ধন্য মানে,
লহ শোক-পুষ্পাঞ্জলি সাশ্রু প্রণতি ॥

সম্পূর্ণ